প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৯

প্রকাশক :
শ্রী অজিত কুমার জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৯

বর্ণ সংযোজনা :
রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
স্টারলাইন
১৯এইচ/এইচ/১২ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিতে
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

## প্রবন্ধসূচী

# প্রথম প্রকাশ উপলক্ষ্যে
## প্রকাশকের নিবেদন

পূজনীয় গ্রন্থকর্তার সামাজিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিবার সময় পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে "বাবুর গঙ্গাযাত্রা" ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি ৩০ হইতে ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের নানা প্রবন্ধে যে সকল সামাজিক ব্যাধির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—আধুনিককালে তাহাব প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছে যদিও, তবু পুরাকালে সেই সকল ব্যাধির প্রকোপাবস্থায় সেগুলি সমাজের গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার যে কী একান্ত আগ্রহ লেখকের ছিল তাহাই এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে জাজ্বল্যমান। বর্ত্তমান কালের অনেক সামাজিক সমস্যার মিমাংসাও এই সকল রচনার পত্রে পত্রে এখানে-ওখানে লুকাইয়া আছে, সমজদার লোক চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

এই পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধ পূজনীয় লেখক কর্ত্তৃক নানা সভায় পঠিত হইয়াছিল। "উপসর্গের অর্থ-বিচার" প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষদের দুই অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল এবং সেই দুই অধিবেশনে আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত বিদ্বজ্জনের মধ্যে দুই এক জনের সহিত পূজনীয় বক্তার কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদ হওয়ার দরুণ তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ বক্তার বক্তব্যগুলি মূল প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধটির কিয়দংশ বাদ দিয়া পরিবর্ত্তিত আকারে এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা যখন চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং বঙ্গের যুবকেরা যখন আত্মবিস্মৃত হইয়া ঘোরতর বিনাশের পথে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়াছিল তখনই পূজ্যপাদ লেখকের দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব" প্রবন্ধটি প্রবাসী পত্রিকায় বাহির হয় এবং পুস্তিকাকারে পুনঃ প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাখানি বিলম্বে হস্তগত হওয়ার দরুণ প্রবন্ধটি বর্ত্তমান গ্রন্থের শেষভাগে স্থান পাইল।

১৯২০ — শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

# ভূমিকা

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরই সমগ্র ঠাকুর পরিবারে যিনি সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সন্তান দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ক্ষণজন্মা মানুষটির পরিচয় নিছক পারিবারিক পরিচিতির গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, কিংবা লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপেই তাঁর খ্যাতি, তাও না, নিজের বিরল প্রতিভার গুণেই ইনি সমসাময়িক কালে সমগ্র বঙ্গীয় সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

কোনো কোনো শব্দ বহুল ব্যবহারে অথবা অসতর্ক ব্যবহারে তার প্রাপ্য গৌরব ও গুরুত্ব হারায়। এমনি একটি শব্দ হল প্রতিভার বহুমুখীনতা। ইংরেজিতে যাকে বলে varsatality। বাস্তবে বহুমুখীপ্রতিভার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ মেলে। এক কিংবা একাধিক গুণপণাব সুবাদেই অথবা বৈশিষ্ট্যের কারণেই ব্যক্তি বিশেষের বিশেষণে 'বহুমুখী প্রতিভা' ব্যবহৃত হতে দেখি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন Varsatile নানা বিষয়ে এই জ্ঞান তপস্বী মানুষটির ছিল অন্তহীন কৌতূহল। নানা বিষয়েই ইনি রেখে গেছেন বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ। তখনও তাঁর পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর জীবিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবী। গৃহে কিছুদিন শিক্ষালাভের পর তিনি ভর্তি হলেন সেন্ট পল্‌স স্কুলে। এখানে দু'বছর পাঠাভ্যাসের পর তিনি ভর্তি হলেন হিন্দু কলেজে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তিনি কখনই সন্তুষ্ট ছিলেন না, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করেন এবং স্বাধীনভাবে গৃহে জ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই জ্ঞান সাধনা তাঁর চলেছিল আমৃত্যুকাল। দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠভ্রাতা রবীন্দ্রনাথকেও আমরা দেখেছি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বীতস্পৃহ হয়ে 'বড়দাদা'র মতই গৃহে সারাজীবন স্বাধীনভাবে জ্ঞানানুশীলনে ব্রতী হতে। অনেক বিষয়েই জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনের মিল লক্ষণীয়। গৃহে স্বাধীনভাবে শিক্ষার্জন তার মধ্যে অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথেরও নানা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ছিল এবং সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ পদচারণা আমাদের মুগ্ধ করেছে। তবু তাঁর মুখ্য পরিচয়, তিনি কবি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তাঁর অন্যান্য সত্তাগুলিকে তুলনামূলক ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অনুরূপভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দার্শনিক সত্তা তাঁর অন্যান্য পরিচয়কে যেন কিছুটা ম্লান করে দিয়েছে। একথা ঠিকই যে দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রিয় বিষয় দর্শনশাস্ত্র। মূলতঃ কান্ট ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকদের গ্রন্থাদি তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। বিশেষতঃ জার্মান ও ফরাসী দার্শনিকদের গ্রন্থাদি তাঁর অধীত ছিল। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রেও তাঁর ছিল সুগভীর ব্যুৎপত্তি। তাঁর প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে, কবির মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে। আত্মতত্ত্বের সন্ধানে তাঁর মন

ছিল গুহায়িত। তত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় তিনি ছিলেন অক্লান্ত। দার্শনিক প্রবন্ধকার রূপে তাঁর খ্যাতি ছিল বিদ্বজ্জন মণ্ডলীতে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন রামনারায়ণ পণ্ডিতের কাছে। বস্তুত বাল্যাবধি তাঁর ছিল সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে সুগভীর অনুরাগ। বাল্মীকি বিরচিত 'রামায়ণ' এবং কবি কালিদাস বিরচিত 'মেঘদূত' ছিল তাঁর অতীব প্রিয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ১৭, তখন মেঘদূত কাব্যের অনুবাদ করেন। এটি ছিল তাঁর পদ্যানুবাদ। প্রকাশকাল ১৮৬০।

দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-র সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্য সচেতন পাঠক মাত্রেরই পরিচয় বিদ্যমান। এই রূপক কাব্যটির প্রকাশকাল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষতার সঙ্গে কবি তাঁর স্বপ্ন জগৎ পরিক্রমণ এতে চিত্রিত করেছেন। 'স্বপ্ন প্রয়াণ' সম্পর্কের কবির মন্তব্যটি প্রসঙ্গত স্মর্তব্য :

'সেই সময়, তত্ত্ববিদ্যার আলোচনায় মশগুল ছিলুম তাই জন্য উহাতে metaphysics ঢুকিয়াছে'। দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত অপর কাব্যগ্রন্থটি হ'ল 'কাব্যমালা', প্রকাশকাল ১৩২৭ বঙ্গাব্দ। এই কাব্যগ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি কবির মধ্যম বয়সের রচনা।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্য আর একটি পরিচয় তিনি প্রাবন্ধিক। বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন : 'সংসারে লোকের অনেক দিক থাকে, সংসারীকে অনেক দিকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অনেক কার্য করিতে হয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের যদি কোন দিক থাকে, যদি তিনি সমগ্র কিছু আরাধনা করেন, তবে তাহা একমাত্র জ্ঞান.....।' এই জ্ঞানব্রতী মানুষটি তাই বলে কৃপণের মত শুধু নিজের মধ্যেই জ্ঞান সঞ্চয় করে রাখেননি, আমাদেরও তার ভাগ দিয়ে গেছেন অকৃপণভাবে। নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি রচনা করে গেছেন— যেমন জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, বালক, মানসী, সাধনা, সাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ইত্যাদিতে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাদুর্ভাব (১৮৬৩), তত্ত্ববিদ্যা (১ম খণ্ড- ১৮৬৬, ২য় খণ্ড- ১৮৬৭, ৩য় খণ্ড- ১৮৬৮ এবং ৪র্থ খণ্ড- ১৮৬৯), সোনার কাটি রূপার কাটি (১৮৮৫), সোনায় সোহাগা (১২৯২ বঙ্গাব্দ), আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা (১৮৯০), সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা (১৮৯১), সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৮৯২), অদ্বৈত মতের প্রথম ও দ্বিতীয়। 'সমালোচনা' (১৩০৪), অদ্বৈত মতের সমালোচনা (১৩০৩), আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত (১৩০৬), ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন (১৩০৬), আচার্য্যের উপদেশ (১ম- ১৩০৬), আচার্যের উপদেশ (২য়- ১৩০৮), বিদ্যা এবং জ্ঞান (১৯০৬), একটি প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর (১৯০৬), বঙ্গের রঙ্গভূমি (১৩১৪), হারামণির অন্বেষণ (১৯০৮), দেখিয়া শিখিয়া কি ঠেকিয়া শিখিব (১৯০৮), নানা চিন্তা (১৩২৭), প্রবন্ধ-মালা (১৩২৭), চিন্তামণি (১৩২৯), উপসর্গের অর্থবিচার (১৯০৮)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিক সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। সাময়িক পত্রের সম্পাদক রূপেও তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনাতেই 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ। দীর্ঘ সাত বৎসরকাল তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৪ থেকে ১৯০৯ এই সুদীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাটি সম্পাদনা করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন (১৮৯১)।

রবীন্দ্রনাথের সর্বোত্তম সৃষ্টি তাঁর সঙ্গীত, দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মত অত গান রচনা না করলেও সর্বমোট ২৮টি ব্রহ্মসঙ্গীত এবং মাত্র দুটি প্রেম সঙ্গীত রচনা করেন। একটি জাতীয় সঙ্গীতেরও তিনি রচয়িতা।

দ্বিজেন্দ্রনাথ আকার মাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবক। নূতন নিয়মে তিনি জ্যামিতি লিখেছেন। বাংলায় শর্ট হ্যান্ড লিখন পদ্ধতিরও তিনিই প্রথম প্রবর্তক। তাঁর ' রেখাক্ষর বর্ণমালা' প্রকাশিত হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। বাংলা পরিভাষা রচনাতেও দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধ তথা স্বাদেশিক চেতনা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মূলতঃ তাঁরই পরামর্শে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে 'হিন্দুমেলা'র সূচনা হয়। তিনি নিজেও এই হিন্দুমেলার সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন বেশ কয়েক বৎসর (১৮৭০ থেকে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত)। পরিচ্ছদে, আচরণে এবং ভাষায় তিনি দেশীয় ভাবের অনুসরণ করতেন। স্বদেশী সঙ্গীত রচনাতেও তিনি মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন।

নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক যোগ। ১৮৯৪ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ এই চার বৎসরের জন্য তিনি পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার তিনি সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৮৮২)। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সাল পর্যন্ত তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন। National society'র তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের মূল সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য পদে বৃত হন ১৮৯০ সালে। পরে ১৮৯৯ সালে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন।

এ হেন তত্ত্বজ্ঞানী মানুষটি আবার হেঁয়ালি রচনা করতে ভালবাসতেন। গণিত ছিল তাঁর প্রিয়। এক সময়ে বাঁশি বাজিয়েছেন। নানা ধরনের বাঁশি তাঁর সংগ্রহে ছিল। সত্যব্রত, ঋষিকল্প মানুষটির ললিতকলাতেও সমান আগ্রহ বাস্তবিকই আমাদের বিস্মিত না করে পারে না।

স্বাধীনতাকামী, দেশানুরক্ত, জ্ঞানব্রতী, স্বদেশ আত্মার পূজারী অথচ জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন দীর্ঘজীবী। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী, তখন তাঁর বয়স ৮৫ বৎসর। পিতৃপ্রতিম জ্যেষ্ঠতম ভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নটি স্মর্তব্য : 'চিরদিন বহির্বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন নিরাসক্ত, অন্তর্নিবিষ্ট ধ্যান পরায়ণ ছিল তাঁর চিত্ত....। পশুপক্ষীর প্রতি তাঁর সকরুণ আত্মীয়তা ছিল প্রসারিত, তরুলতার প্রতি কারো রূঢ় হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। শব্দ ও অর্থের রহস্যভেদের আশ্চর্য অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন প্রবীণ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন ক্রীড়া পরায়ণ বালক.......। আপনার নিত্য প্রয়োজন ব্যাপারে তাঁর ছিল যদৃচ্ছাকৃত অসজ্জিত অবহেলা......একদিকে আত্মতত্ত্বের সন্ধানে তাঁর মন ছিল গুহাশ্রিত, অন্যদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে তাঁর কবিহৃদয় সর্বত্র পেয়েছে আনন্দিত প্রবেশাধিকার, তাঁর নিভৃত অবকাশ ছিল গভীর গবেষণায় অভিনিবিষ্ট....।

সাধকের আত্মাভিমানের দুর্গতি তাঁকে কোনোদিন স্পর্শ করে নি।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার কৃত জ্যেষ্ঠতম ভ্রাতার এই মূল্যায়ন যে কোনোভাবেই অতিরঞ্জিত নয় তা বলাবাহুল্য। বরং বলা চলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামগ্রিক এই মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য অত্যন্ত নিরপেক্ষ, objective assessment।

আমরা এইবার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট রচনাগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। তবে তৎপূর্বে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনাবলীর গদ্যশৈলী সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

(ক) দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় সন্ধি ও সমাসবদ্ধ' শব্দের বহুল ব্যবহার করেছেন— এতদনুসারে, খদ্যোতালোকে অনেকানেক (সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ) ; পরীক্ষোত্তীর্ণ, স্বাভিমত, ঈশ্বরারাধনা, পুরুষার্থ সাধনোপযোগী (দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব?); সাধ্যানুসারে, আরম্ভোদ্যম, স্থূলাভিষিক্ত, মনুষ্যোচিত (সোনায় সোহাগা) ; মধ্যমার্গীয়, বঙ্গভাচার, প্রচারোপযোগী, ধর্মনিয়মানুসারে, স্পষ্টাক্ষরে, বিদ্যানুশীলন, স্বদেশানুরাগ (নব্য-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি) ; তাৎপর্য্যার্থ, অনুমোদনোপযোগী, অধিকারায়ত্ত, প্রত্যভিমুখে (সভাপতির অভিভাষণ) ; আদরাধিক্য, চিরার্জ্জিত, বহ্বার্জ্জিত, বিপরীতাচরণ, বহুকালার্জ্জিত, কর্ত্তব্যানুযায়ী, বৃথায়াসপরায়ণ, সভ্যতানুরাগ, (মুখ্য এবং গৌণ) ; কার্য্যাভিসন্ধি (কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুইপ্রকার লোক) ; প্রতাপানল, কিঞ্চিন্মাত্র, রসনাগত, শুদ্ধান্তঃকরণ (সোনার কাটি রূপার কাটি) ; উত্তমাধম, আরক্তাভ্যন্তরে, অনেকানেক, অধিকারাভ্যন্তরে, ন্যায়ান্যায়, অঙ্কুরিতাবস্থা, বিজ্ঞানালোচনা, বেদোপনিষদ, কৃপাবলোকন, মুখাবলোকন, লুপ্তাবশিষ্ট, (উপসর্গের অর্থবিচার); ঈশ্বরানুরাগ, দেশানুরাগ, অন্তর্বিভাগ (সাধনা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য) ; নাট্যাভিনয়, উপহাসাস্পদ, ব্রহ্মোপাসক, কর্ম্মোদ্যম, চিরোন্নতিশীল, অজ্ঞানান্ধকার (আর্য্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত); নবাভ্যাগত, নস্যাচ্ছ, বেদাভ্যাস, প্রমাণাভাব, ভদ্রাভদ্র, কালাতিপাত, প্রত্যানয়ন, বিদ্বন্মণ্ডলী, দক্ষিণাভিমুখে (আর্য্যামি এবং সাহেবিয়ানা)।

(খ) দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করেছেন। এর ফলে একদিকে তাঁর ব্যবহৃত গদ্য যেমন শাণিত হয়েছে, তেমনি বক্তব্যও অনেকাংশে লক্ষ্যভেদী হয়েছে—

(i) মাথা নাই তার মাথা ব্যথা—বর্তমানকালে যেহেতু বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণই অবশিষ্ট রয়েছে, তিন বর্ণের মানুষ এক বর্ণে ক্রমে ঠেকেছে, তখন তিন বর্ণকে এক শব্দে জ্ঞাপন করার জন্য আর্য্য শব্দের সাহায্য বাঞ্ছা করাকে লেখক এই প্রবাদের সাহায্যে কতখানি অর্থহীন তা বুঝিয়েছেন। (আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা)

(ii) মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা— কেবল ব্রাহ্মণকেই আর্য্যের কোটায় অবরুদ্ধ করে রাখা হলে যে ব্রাহ্মণ এমনিতেই মৃতপ্রায় তার উপর তাকে অতিরিক্ত আঘাত করা হবে বোঝাতে লেখক প্রবাদটির সাহায্য নিয়েছেন। (আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা)

(iii) বজ্রের বাঁধন ফস্কা গিরে—ধর্মশাসনের বেশি কড়াকড়িতে পরিণামে যে ভাল হয় না, তা বোঝাতেই লেখক এই প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন। (সাধনা-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)

(iv) পুরোহিতকে দিয়ে কতকগুলি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণ করানোর চেষ্টাকে লেখক 'রোজাকে দিয়া ভূত ঝাড়ানো'র প্রয়াস বলেছেন। (সাধন-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)

(v) ত্রিগুণতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক মৎস্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। শুষ্ক পুষ্করিণীর তলদেশে অবস্থানরত জল পিয়াসী মৎস্যের স্বপ্নের জলে সাঁতার দিয়ে কিছু পরিমাণে সুখানুভূতি লাভকে লেখক 'দুধের সাধ ঘোলে মেটানো' বলেছেন। (সাধনা-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)

(vi) বাবা ও বাবু'র মধ্যেকার পার্থক্য যে শুধুই আক্ষর উচ্চারণগত এই পার্থক্য বোঝাতে কঠিন জ্যামিতিক প্রমাণের সহায়তা গ্রহণকে লেখক 'মশা মারতে কামান পাতা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। (বাবুর গঙ্গাযাত্রা)

(vii) 'বাবু' যে 'বাবা' শব্দের পাঠান্তর, সেটি যার জানা নেই, তার অবস্থাকে লেখক ভাবাতত্ত্ব বিদ্যার 'ক অক্ষর গোমাংসে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। (বাবুর গঙ্গাযাত্রা)

(viii) বাবুর গঙ্গাযাত্রার রাজনৈতিক চালের প্রসঙ্গে লেখক তাঁর অনভিজ্ঞতা জ্ঞাপনকালে বলেছেন 'আমার মতন গরীব আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে প্রয়োজনাভাব।'

(বাবুর গঙ্গাযাত্রা)

(ix) স্বদেশ প্রেমের যথাযথ পরিচয় না দিয়েই যে বা যারা তথাকথিত সার্বভৌমিক উদারতার স্বাক্ষর রাখতে বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা প্রদর্শনের প্রয়াস করেন, তাদের প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, 'গাছে না উঠতেই এক কাঁদি'। (সোনার কাটি রূপার কাটি)

(x) একটি প্রচলিত প্রবাদকে লেখক বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেছেন : লোকে বলে বেল পাক্‌লে কাকের কি—আমি বলি কাক পাক্‌লে বেলের কি।

(সোনার কাটি রূপার কাটি)

(xi) সহজ সাধ্য কার্যাবলী সম্পাদন সূত্রে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারপরে আয়াস সাধ্য কার্যাদিতে প্রয়াসী হতে হয়, এই উপদেশকেই লেখক পরিহাস করে বলেছেন, 'ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইতে হয়'। (সভাপতির অভিভাষণ)

(xii) পণ্ডশ্রমের থেকে দূরে থাকা কর্তব্য বলতে গিয়ে লেখকের মন্তব্য, 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া'। (সভাপতির অভিভাষণ)

(গ) রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'বড়দাদা যেমন কথ্যভাবায় সহজ সরল করে প্রবন্ধ লিখতে পারেন, আমরা সেরূপ পারি না। এটা তাঁর স্বাভাবিক শক্তি।' বস্তুত এ বক্তব্যও আতিশয্য দুষ্ট নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেক সময়েই একেবারে চলিত আদলে গদ্য লিখেছেন, এমনকি ক্রিয়াপদটিরও চলিত রূপ ব্যবহার করেছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন শৈলীটি চমৎকার ভাবে চলিত আদলে রচিত হয়েছে, ব্যতিক্রম থেকে গেছে ক্রিয়াপদগুলির সাধু ব্যবহার। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হল—

(i) প্রকৃতি হচ্ছেন মাতা, জীবগণ হচ্চে প্রকৃতি মাতার পুত্র, এবং পরস্পরের ভ্রাতা।

(বিদ্যা এবং জ্ঞান)

(ii) সত্ত্বগুণের ধর্ম হচ্চে প্রকাশ, তমোগুণের ধর্ম্ম হচ্চে অপ্রকাশ, রজোগুণের ধর্ম্ম হচ্চে প্রকাশ হইতে অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ, এইরূপ ছট্‌ফটানি। প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে নাবা হচ্চে অনুলোম পদ্ধতি ; অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে ওঠা হচ্চে প্রতিলোম পদ্ধতি।

(বিদ্যা এবং জ্ঞান)

(iii) একই ষোলো আনা একদিকে যেমন একটাকা, আর একদিকে তেম্নি চৌষট্টি পয়সা ; প্রভেদ কেবল এই যে, একটাকা মোট ষোল আনা ; চৌষট্টি পয়সা ভাঙ্গা ষোলো আনা।

(সাধনের সত্য)

(iv) যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞেশ্বর হচ্চেন শিব কিম্বা মঙ্গল, সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্চেন সতী কিম্বা সত্তা-রূপিনী দেবী।

(আর্য্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত)

(v) ..........ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায়ই বলো, আর নীতিশাস্ত্রের ন্যায়ই বলো, নিজস্ব সম্পত্তির ভাব দুয়েরই গোড়া কথা। (উপসর্গের অর্থ বিচার)

(vi) Consciousness হচ্চে বীজ, বিষয় বুদ্ধি হচ্চে অঙ্কুর, বিজ্ঞান হচ্চে ডালপালা, প্রজ্ঞা হচ্চে ফল। (উপসর্গের অর্থ বিচার)

(vii) লোকে বলে বেল পাক্‌লে কাকের কি—আমি বলি যে, কাক পাক্‌লে বেলের কি। (সোনার কাটি রূপার কাটি)

(viii) ...... ভাষার প্রচলিত প্রথার উপরে বৈয়াকরণিক পণ্ডিতের পুঁথিগত বিদ্যার তর্জ্জন গর্জ্জন খাটে না। প্রচলিত প্রথাটিকে আপনারা কম লোক ঠাওরাইবেন না। প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণও দিতে পারে। কে বলে যে, প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণ মানে না? ব্যাকরণ খুবই মানে!

(সভাপতির অভিভাষণ)

(ix) সখীমণি ঘাটে জল তুল্‌তে গিয়েছিল—জল তুলে এনে আমাকে বল্লে যে, রাস্তায় লোকের ভীড় হয়েছে এম্নি যে, দুই দণ্ড তাকে পথের একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, আর প্রজারা সবাই মিলে যা বলছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সে শুনেচে, তার চকের সাম্‌নে প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর, খুচরো চাসা ভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে বল্‌ছিল যে, তারা না খেয়ে মর্‌বে তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশ সুদ্ধ লোক না খেয়ে মচ্চে আমি তা চকে দেখ্‌তে পারব্ না, তার আগে যাতে তা আমাকে দেখ্‌তে না হয়, আমি তা না-খেয়েই হোক্ আর যা-খেয়েই হোক—যেমন করে হোক্—করে কম্মে চুকে নিশ্চিন্তি হব।(সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ)

(x) গোঁড়ার আর কোনো গুণ তাঁহাদের থাক্ বা না থাক্ তাহার প্রথম অক্ষরটি তাঁহাদের খুবই আছে— গোঁড়ামির গোঁটি তাঁহাদের খুবই আছে। কিন্তু বলিতে কি—জাত গোঁড়াদের গণ্ডির ভিতরে তাঁহাদের সে গোঁয়ের কোনো জারিজুরি খাটে না— সেখানে তাঁহারা কোনো গতিকে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের গোঁ একেবারেই ধোঁ হইয়া গিয়া তাঁহারা নিতান্তই ধোঁড়া বনিয়া যান। (সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা)

উপরের দৃষ্টান্তগুলি প্রমাণ করে কথ্য ভাষা রচনায় লেখকের পারদর্শিতাকে, ক্ষেত্র বিশেষে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামপদের সাধুরূপ প্রত্যাহৃত হলে একেবারেই কথ্য ভাষার দৃষ্টান্তে পরিণত হতে পারত।

(ঘ) দ্বিজেন্দ্রনাথ এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যেগুলি ব্যবহারের চল তেমন ছিল না, বা আজও তেমন চল হয়নি। যেমন সাভাপত্য (সভাপতিত্ব বা সভাপতির কার্য অর্থে), অব্যাকৃত (অবিকৃত অর্থে) সভাপতির অভিভাষণ) ; বৈশদ্য (বিশদ করা অর্থে), বৈকারিক (বিকারের বিশেষণ) (মুখ্য এবং গৌণ ; বৈলাতিক (বিলাতের বিশেষণ কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুইভাবের দুইপ্রকার লোক) ; যথাকালিক (কাল অনুযায়ী) (নব্য-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি) ; ধাতবিক (সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা) ; সার্বভৌনিক (সর্বজন ব্যবহৃত, প্রচলিত প্রথায় সিদ্ধ) (সভাপতির অভিভাষণ) ; নমস্কার্য্যা (নমস্কার লাভের যোগ্য)

(সভাপতির অভিভাষণ) ; ষড়যন্ত্রীতব্য (সভাপতির অভিভাষণ), শারীরিক (organic এর বাংলা) (সভাপতির অভিভাষণ) , আদরভাজন (আদরণীয়) (সভাপতির অভিভাষণ) ; সার্বদেশিক (বাবুর গঙ্গাযাত্রা) ; সম্মার্জক (সোনার কাটি রূপার কাটি)।

(ঙ) ভাববাচ্যের বাক্য ব্যবহারের দিকে লেখকের প্রবণতা লক্ষিত হয়।

(i) যন্ত্র এবং যন্ত্রাঙ্গগুলার দিশী প্রতিশব্দ যেখানে যত পাওয়া যায় সেগুলা আগে ত খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করা হোক ; বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক্ যে, প্রত্যেকের এবং অনুমানের প্রণালী পদ্ধতি কোন্ দর্শনের মতে কিরূপ ; তাহা হইতে কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করা হোক ; (সভাপতির অভিভাষণ)

(ii) অতএব, হুকুম হইল,--বাবুকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায়। (বাবুর গঙ্গাযাত্রা)

(চ) দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রায়শই ভাবগম্ভীর বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু বিষয়ের গাম্ভীর্য রক্ষা করেও মাঝেমাঝেই তাঁর পরিহাসপ্রিয়তাকে অর্গলমুক্ত করে দিয়ে তাঁর রচনায় এক ভিন্নতর মাত্রাকে যুক্ত করেছেন। এই পরিহাসপ্রিয়তা নিছক উদ্দেশ্যহীন থাকেনি, কিংবা গুরুগম্ভীর বক্তব্য শোনায় অথবা পাঠে ক্লান্ত শ্রোতাকে অথবা পাঠককে তাৎক্ষণিক রিলিফ দেওয়ার উদ্দেশ্যেও সক্রিয় থাকেনি। স্নিগ্ধ রসিকতার মাধুর্যে একদিকে তাঁর যুক্তিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন, অন্যদিকে তাঁর সম্ভাব্য বিরুদ্ধ পক্ষীয় মতের অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল—

(i) বলিতে কি—না পড়িয়া পণ্ডিতকে সংক্ষেপে N P P কে তত আমি ডরাই না—যত আমি ডরাই পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে, PK D.P কে। (সভাপতির অভিভাষণ)

(ii) বাঙ্গালী-ইংরাজ, সংক্ষেপে বাঙরাজ, একপ্রকার উভচর জীব ; ইংরাজীতে যাহাকে বলে amphibious creative ইহারা চৌরঙ্গীর অন্তঃপাতী আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুঁসড়িয়া থাকিয়া ঘুমের ঘোরে মনে করেন—"স্বর্গে আছি", কিন্তু সে যে স্বর্গ তাহা একপ্রকার ত্রিশঙ্কুর স্বর্গ—না দেশী, না বিলাতি। ব্যাংরাজের আর এক নাম—"বাঙ্গালী সাহেব"।

(সভাপতির অভিভাষণ)

(iii) ..:.. দেশ কাল পাত্র—বিবেচনাশূন্য অনুকরণের আর এক নাম হনুকরণ।

(কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক)

(iv) বাঙ্গালীরা হ্যাট-কোট পরিলেই তাহাদের বক্তৃতাশক্তি আকাশ ছাপাইয়া উঠিবে—ইংরাজি সরস্বতী উপযাচিকা হইয়া তাহাদের রসনায় আড্ডা গাড়িবেন—ও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেও তিনি সেখান হইতে নড়িবেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নিশ্চয়ই ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিনের মধ্যে একবার করিয়া প্রত্যহই হ্যাট কোটি পরিতেন, নহিলে তিনি কখনই অত বড় একজন দেশবিখ্যাত লোক হইতে পরিতেন না।

(সোনার কাটি রূপার কাটি)

(v) ......' লামাঞ্চা নগরের বীরকেশরী ডনকুইক্‌সোট্ যতবার কোমর বাঁধিয়া পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে গিয়াছেন, ততবার উল্টাইয়া পড়িবার মধ্যে তিনিই অশ্ব হইতে উল্টাইয়া পড়িয়াছেন—তা বই পৃথিবী এক তিলও উল্টায় নাই। এইরূপ করিয়া যখন তাঁহার সমুদয় দন্তগুলি একে একে অন্তর্ধান করিল তখন তিনি দর্পণে আপনার ভগ্নদণ্ড চপেটিত কপোল মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই আপনার নাম দিলেন "বিষণ্ণ মুখাকৃতি বীর" (Knight

of the sorrowful figure! রোগ তো আর গায়ে ফলে না!

(আর্যামি এবং সাহেবিআনা)

(ছ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল নিজের বক্তব্যকে সুপরিস্ফুট করতে উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সহায়তা গ্রহণ। বস্তুত গুরুগম্ভীর তাত্ত্বিক বিষয়গুলির আলোচনা এইসব দৃষ্টান্তের অবতারণায় অনেক বেশি আস্বাদনীয় যেমন হতে পেরেছে, তেমনি এক ধরনের বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটায় রচনায় অন্যবিধ সৌকর্য সাধিত হয়েছে। সর্বোপরি বক্তব্যও তাঁর পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন—

পারিভাষিক সমিতির কাজ কেন যথাযথভাবে চলছে না তার কারণ দর্শাতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন—

(i) সমিতি সূতা পাইলে কাপড় বুনিতে পারেন কিন্তু সূতা পাকাইতে জানেন না ; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ কাপড় বুননের জন্য সূতা পাকাইতে পারেন, কিন্তু কাপড় বুনিতে জানেন না। দুইদল পৃথক থাকিলে দোঁহারই হস্ত অসাড় হইয়া যায় ; দুইদল জোটবদ্ধ হইলে দোঁহারই কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে। (সভাপতির অভিভাষণ)

(ii) ......প্রত্যেক সংবাদপত্র সম্পাদকের কলমদানে দুইটি করিয়া কলম থাকে—তাহা ও সোনার কাটি, রূপার কাটি। একটি লেখনী বা রসনা জ্যান্ত মানুষকে বা সমাজকে মারিয়া রাখিবার গুণ জানে—সেইটি রূপার কাটি। আর একটি লেখনী বা রসনা মৃত মনুষ্যকে বা সমাজকে বাঁচাইয়া তুলবার গুণ জানে—সেইটি সোনার কাটি। (সোনার কাটি রূপার কাটি)

(iii) একই প্রকার কর্মেন্দ্রিয়ের অঙ্কুর যেমন মৎস্য দেহে পাকনা-রূপে, পক্ষি-দেহে ডানা-রূপে, এবং মানব-দেহে হস্তরূপে পরিণত হয়, তেমনি খুব সম্ভব যে, বি উপসর্গের গোড়ার অর্থ বিভিন্ন অবস্থা গতিকে বিভিন্ন শাখা-অর্থে পরিণত হইয়াছে।

(উপসর্গের অর্থ-বিচার)

(iv) বালকেরা জলশূন্য ক্ষুদ্র কলসীতে করিয়া পুতুলের মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে ঘট্‌ঘট্ শব্দ করে, কেননা তাহা না করিলে "জল ঢালা হইতেছে" এ বৃত্তান্তটি একেবারেই অপ্রমাণ হইয়া যাইবে! এইরূপ যুক্তি কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই দুই একজন বাঙ্গালী সাহেব কথায় কথায় ইংলণ্ডকে হোম্ বলিয়া নির্দেশ করেন, কেননা তাহা না করিলে তিনি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই সাহেব—এ বৃত্তান্তটি প্রমাণাভাবে মারা পড়িয়া যাইবে!

(আর্যামি এবং সাহেবিআনা)

(v) ভূতকালের স্মরণ এবং ভবিষ্যতের উন্নতি, এ দুয়ের মধ্যস্থলে বর্ত্তমানের সাধনা। পর্বত হইতে যেমন নদী উপত্যকায় নামিয়া আসে, ভূতকালের স্মরণ তেমনি আপনা-আপনি বর্ত্তমান নামিয়া আসে,— (সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)

(vi) আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড রথ ; তার সারথী হচ্চে সেকেলে শাস্ত্র, আর অশ্ব হচ্চে লোকাচার। সারথীটি বার্দ্ধক্যের বশতাধীনে এমনি অথর্ব হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি অশ্বকে চালান কিম্বা অশ্ব তাঁহাকে চালায়—তাহা বলা কঠিন! (সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)

(vii) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নৌকার হাল্ বিদ্যা-বুদ্ধিরূপী আনাড়ি মাঝির হস্তে সঁপিয়া না দিয়া জ্ঞানকে কাণ্ডারী পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য ; (বিদ্যা এবং জ্ঞান)

(viii) জ্ঞান হচ্চে নিয়ামক— যেমন হিতাহিত জ্ঞান কর্ত্তব্য—কার্য্যের নিয়ামক ; প্রেম

হচ্ছে উদ্দীপক— যেমন স্ত্রীপুত্রের প্রতি ভালবাসা অর্থাগমের উপায়-চিন্তার এবং উপায়-চেষ্টার উদ্দীপক ; কর্মোদ্যম হচ্ছে পরিচালক বা আয়োজক—যেমন উদ্যমশীল বণিক নগর—গ্রামে কৃষিজাত শস্যের পরিচালক।

(আর্যাধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত)

(জ) পৌরাণিক আখ্যানের রূপকধর্মিতা বিশ্লেষণে দ্বিজেন্দ্রনাথকে বিশেষ আগ্রহী ও তৎপর দেখা গেছে। তাঁর এইসব রূপক বিশ্লেষণ সকলের পক্ষে যে গ্রহণযোগ্য হবে তা হয়ত নয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাধীন চিন্তার পরিবাহী, এবং মননশীলতার পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই—

(i) যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞেশ্বর হচ্চেন শিব কিনা মঙ্গল ; সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্চেন সতী কিনা সত্য-রূপিনী দেবী। অতএব শিবের সহিত সতীর বিবাহ আর কিছু না— মঙ্গলের সহিত সত্যের বিবাহ।

(আর্যাধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত)

(ii) শিবের নামই যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর হইয়া তিনি যে যজ্ঞভঙ্গ করিলেন-এর অর্থ কি আমাকে বুঝাইয়া দেও! অর্থ খুবই স্পষ্ট। শিব যে কারণে কামকে ভস্ম করিলেন সেই কারণেই কাম-প্রধান যজ্ঞ ভঙ্গ করিলেন।

(আর্যাধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত)

(iii) .....শ্রীকৃষ্ণ যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই কালীয়—নাগকে (অর্থাৎ সর্পের উপাসক কোন বলবান অনার্য জাতিকে) দমন করিয়া আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

(আর্যাধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত)

(iv) বকাসুরের চঞ্চু বিস্ফারিত করা এবং জরাসন্ধকে দুই চির করিয়া বিভক্ত করা—দুইই আর কিছু না—ইংরাজীতে যাহাকে বলে শত্রুর রাজ্যকে দুই বিরোধী partyতে split করা এবং আমাদের দেশের রাজনীতি-শাস্ত্রে যাহাকে বলে ভেদ উৎপাদন করা।

(আর্যাধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত)

(ঝ) বেশ কিছু রচনাতেই দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাজাত্য প্রেমের পরিচয় মেলে। তিনি দেশীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্যের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল, অপরপক্ষে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন অন্ধ অনুচিকীর্ষাকে। তাই বলে তিনি সংকীর্ণ দেশপ্রেমের দহে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। বিদেশীয় যা কিছু ভাল, গ্রহণ যোগ্য তা গ্রহণে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। তাঁর মতে, '.....মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয়ভাব অনুশীলন করিলেই বাঙ্গালীদের মঙ্গল হইবে।' রামমোহন প্রবর্তিত একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে বলতে গিয়ে লেখক তাঁর দেশানুরক্তির পরিচয় দিয়ে বললেন—

(i) একেশ্বর-বাদের জয়-ধ্বজার অধীনেই হিন্দু-মুসলমান বাঙালি যোদ্ধা শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে, মাতা-ভারতভূমি।

(সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)

(ii) হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা ধর্মেই কেবল মুসলমান—কিন্তু জাতিতে ভারতবর্ষীয়। এখন আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জিত— জেতা সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এখন মুসলমানেরা কোনো হিসাবেই আমাদের পর নহে। তাহাদের দেশ হিন্দুস্থান—ভাষা এবং পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী,—

এবং উভয়েই আমরা হিন্দু জাতি। (সোনার কাটি রূপার কাটি)

(iii) আমি অনেক বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিকারের পূর্বলক্ষণ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে ক্রন্দন করিয়াছি—আজ প্রকাশ্যে ভ্রাতৃগণের সমক্ষে ক্রন্দন করিয়া হৃদয়ের চির-সঞ্চিত বেদনার ভার-লাঘব করিলাম মাত্র)। (সোনার কাটি রূপার কাটি)

ক্ষেত্রবিশেষে লেখক কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। স্বাজাত্যবোধের আতিশয্যে মধুসূদন কর্তৃক 'তিলোত্তমা সম্ভবে' বাজপক্ষীকে 'পক্ষরাজ' বলায় তিনি প্রতিবাদ করেছেন।

(ঞ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন, অধ্যাত্ম জগতের মানুষ। এককথায় তাকে আমরা ভগবত প্রেমী বলতে পারি। ঈশ্বরপ্রাণতা তাঁর সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নানা উপলক্ষ্যেই তাঁর সেই ঈশ্বর-বিশ্বাসের অকপট ও আন্তরিক প্রকাশ ঘটেছে।

(i) ...... পরমেশ্বর আমাদের কাণ্ডারী — কি ভয়। রাত্রি প্রভাত হইবে—তরঙ্গের উদ্দাম অবসান হইবে—ঘূর্ণাবর্ত ঘোর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে— নৌকা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া শান্তির কূলে উপনীত হইবে—ধন্য পরমাত্মার করুণা, ধন্য পরমাত্মার প্রেম, ধন্য পরমাত্মার মহীয়সী শক্তি। (আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত)

(ii) মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অসীম করুণায় আমি আমার নির্জীব হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের যেটুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া ধরাইয়াছি, তাহা সাধ্যানুসারে আপনাদের সমক্ষে অনাবৃত করিলাম।' (আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ রচনার সময়ে একটা অন্তরঙ্গতার পরিবেশ রচনা করতেন, প্রবন্ধ রচনায় তাঁকে আলাপচারিতার ঢং অনুসরণ করতে দেখা গেছে। ফলে শ্রোতা কিংবা পাঠকের সঙ্গে তাঁর যেন এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হত। এতে শ্রোতা বা পাঠক অনেক বেশি মনোযোগী হতে বাধ্য হন। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য নিশ্ছিদ্র যুক্তির সমাবেশ ঘটানো। একজন প্রতিপক্ষকে কল্পনা করে নিয়ে তার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী অথবা যুক্তির উল্লেখ করে তিনি নিজস্ব যুক্তির জাল বিস্তারে প্রয়াসী হতেন। তবে কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে—বাঙালীয়ানা, হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে তা ধরা পড়েছে। আর তাঁর দুর্বলতা ছিল দর্শন তত্ত্বের আলোচনায়। অনেক সময়েই তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা ঘটিয়ে তার আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রসঙ্গ থেকে তাঁকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতে দেখা গেছে। সর্বোপরি বক্তব্য বিষয়কে sound যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কিছু অতিকথন করে ফেলেছেন ক্ষেত্র বিশেষে। তবু এতৎসত্ত্বেও প্রাবন্ধিক ও গদ্যশিল্পী রূপে দ্বিজেন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমালোচকের ভাষায়, 'দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য ছিল। একদিকে তাহাতে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব নাই তেমনি আর দিকে তাহা প্রতিভাময় কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রভাব হইতেও মুক্ত। ঐ গদ্যরীতি একেবারে তাঁহার নিজস্ব। যে মন লজিক ও কল্পনার সমাবেশে গঠিত, এ গদ্যরীতি তাহারই সৃষ্টি।'

'দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব' প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ২০ ডিসেম্বর, ১৯০৮। স্বল্প দৈর্ঘ্যের রচনা। লেখক কল্পিত এক চরিত্রের অবতারণা করে পরস্পরের কথোপকথনের ভঙ্গীতে প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। লেখাটিতে লেখকের ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় লভ্য। লেখক স্বাধীনতা ও স্বরাজকে সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেছেন। তবে স্বরাজ লাভের জন্য ধর্ম নির্ভর হওয়ার উপরেই লেখক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধর্মভ্রষ্ট হওয়ার কারণে ফরাসী

বিপ্লবে আকাঙ্ক্ষিত পরিণতি লাভ ঘটল না বলে লেখকের অভিমত। বিধি ও অবিধি পর্যায়ে লেখক কর্তব্য অকর্তব্য নির্দেশ করেছেন। আধ্যাত্মিকতার উপরেই তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনা যখন চরমে বঙ্গীয় যুবকেরা যখন আত্মবিস্মৃত হয়ে চরম বিনাশের পথে, তখন লেখক এই প্রবন্ধটি লেখেন প্রবাসী পত্রিকায়।

'আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা' প্রবন্ধটি ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। এটির প্রকাশকাল ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০। এই প্রবন্ধে লেখক ব্রাহ্মণদের সমালোচনা করেছেন, 'এক্ষণকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মস্তকের উপরি অঞ্চলে শিখা দেদীপ্যমান কিন্তু তাহার ভিতর অঞ্চলে শাস্ত্র চিন্তার পরিবর্তে অন্নচিন্তা বলবতী। তাছাড়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিণতিও আলোচিত হয়েছে। ম্যাক্সমূলার বর্ণিত আর্য এবং অমরকোষে উল্লিখিত আর্য্যের স্বাতন্ত্র্য লেখক কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। চার ধরনের আর্যের কথা লেখক বলেছেন বৈদিক, পৌরাণিক, বৈজ্ঞানিক এবং সঙ আর্য। লেখকের মতে এদেশে যাঁরা আর্যোচিত কর্ম সম্পাদন করেছেন তাঁরা হলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর। অপরপক্ষে যারা শূন্যগর্ভ আস্ফালনে সোচ্চার তাদের আচরণকে বলেছেন 'আর্য্যামি'। আর্য্যামি রোগের সূত্রের সন্ধান করে লেখক প্রতিবিধানেরও উল্লেখ করেছেন।

'সোনার কাটি রূপার কাটি' প্রবন্ধটি বউবাজারস্থিত সাবিত্রী লাইব্রেরীর ১২৯১ সালের ২৯শে মাঘের অধিবেশনে পঠিত। এটির প্রকাশকাল ২রা জুন, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। লেখক রূপকথার সোনার কাটি রূপার কাটির রূপকে হিন্দু সমাজের বিকার নাশের পন্থা নির্দেশ করেছেন। প্রবন্ধটির শুরুতে লেখক রূপকথা শোনার পরিবেশ এবং রূপকথায় আগ্রহী শ্রোতার ভূমিকার উল্লেখ করে চমৎকার প্রেক্ষাপটটি রচনা করেছেন। আমাদের তথাকথিত সংস্কারগুলি সম্পর্কিত সমালোচকদের ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটিয়েছেন। বাঙ্গালী রাক্ষসীর হাঁক ডাকের সঙ্গে ইংরাজ রাক্ষসের হাঁক ডাকের সাদৃশ্যমূলক উল্লেখে প্রবন্ধটিতে এক ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়েছে। তথাকথিত ইংরেজিয়ানার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন লেখক। তাঁর মাতৃভাষা প্রীতির পরিচয়ও প্রবন্ধটিতে লভ্য।

'বাবুর গঙ্গাযাত্রা' লঘু চালে রচিত। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে লেখক তাঁর বক্তব্য কে উপস্থাপিত করেছেন। সিদ্ধান্ত প্রমাণ, প্রশ্ন, উত্তর, পর্যায়গুলি রক্ষিত হয়েছে। বাঙ্গালীদের অন্ধ অনুচিকীর্ষা সমালোচিত হয়েছে, বিশেষতঃ অন্ধ সাহেবিয়ানা। বাঙ্গালী সাহেবকে লেখক বলেছেন 'ব্যাং' বা 'কাঙ্গালী সাহেব'। যা কিছু দেশীয় তাকে অবজ্ঞা করার যে এক ধরনের মানসিকতা লেখক তার অসারত্ব প্রমাণে সচেষ্ট।

'সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা' প্রবন্ধে লেখক ইয়ং বেঙ্গল এবং রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দোষ ক্রটির উল্লেখ করে সেগুলি থেকে মুক্ত হবার পরামর্শ দিয়েছেন। ইয়ংবেঙ্গলদের দোষ বলতে লেখক স্বেচ্ছাচারিতা, ঔদ্ধত্য এবং স্বদেশ সম্পর্কিত অনভিজ্ঞতাকে বুঝিয়েছেন, অপরপক্ষে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নির্বিচার গতানুগতিকতায় বিশ্বাস, অকর্মণ্য কৌলিক দাম্ভিকতা এবং উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও শিল্প সম্পর্কিত অনভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করেছেন। শুধু দু'পক্ষের ক্রটি গুলিকেই নির্দেশ করেননি লেখক। দুই শ্রেণীর মানুষের গুণাবলীরও উল্লেখ করেছেন। ইয়ংবেঙ্গলদের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা এবং উনবিংশীয় শতাব্দীর, বিজ্ঞান ও শিল্পের রসগ্রাহিতা ; অন্যপক্ষে সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজের গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বজন প্রিয়তা এবং স্বদেশীয় সদাচারের প্রতি আস্থা—উভয়পক্ষের গুণাবলীকে গ্রহণের দ্বারাই বঙ্গ সমাজের উন্নতি বিধানের পরামর্শ দিয়েছেন।

'সোনায় সোহাগা' প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য স্বজাতীয় সভ্যতার সব কিছুকে বাতিল করে—

অন্য দেশীয় সভ্যতাকে তার স্বর্ণাভাষিক্ত করা অপপ্রয়াসেরই নামান্তর। তাঁর মতে নব্য-বঙ্গের উৎপত্তির মূল ইংরেজী এবং বাঙ্গালী সভ্যতার সমন্বয়, স্থিতির মূল ব্রাহ্মসমাজ এবং গতির মূল ইংরেজি বিদ্যালয়। রামমোহন রায়ের অবদানকে লেখক সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন।

'মুখ্য এবং গৌণ' প্রবন্ধে বঙ্গ সমাজের অবস্থার উন্নতি কিরূপে সম্ভব, লেখক সেই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন বাঙ্গালীদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করার, দ্বিতীয়ত বাঙ্গালীকে তার বাঙ্গালীত্বও রক্ষা করতে হবে। সার্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার উপরে লেখক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাবের অনুশীলন কাম্য। স্বাধীনতা লাভের জন্য উপায় অবলম্বন আবশ্যক। লেখকের মতে অবশ্য আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। সকল স্বাধীনতার মূল এটিই।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে লক্ষ্য এবং উপায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, মুখ্য এবং গৌণের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। হৃদয়ের সভ্যতা লেখকের মতে মুখ্য সভ্যতা, অন্যদিকে আর সব সভ্যতা গৌণ। অথবা আমাদের মুখ্যকে ত্যাগ করে গৌণকে আশ্রয় করা অনুচিত।

'নানা চিন্তা' গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৩২৭। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলি হল সাধনা-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বিদ্যা ও জ্ঞান, সাধনের সত্য, আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত এবং সংঘাত, সভাপতির অভিভাষণ, উপসর্গের অর্থ বিচার এবং দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব। গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলির অধিকাংশই নানা সভায় পঠিত হয়েছিল। প্রথম প্রবন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাধনার মধ্যেকার পার্থক্য উল্লিখিত হয়েছে। প্রতীচ্যে যেখানে দেশানুরাগকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়, প্রাচ্যে তৎপরিবর্তে স্থান পায় কুলানুরাগ। প্রতীচ্য কুলানুরাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দেশানুরাগকে স্থাপন করেছে। বিস্মৃত হলে চলবেনা যে কুলানুরাগ দেশানুরাগের নিম্নতন পর্যায়ের। এদেশে দেশানুরাগ সঞ্চারিত হয় নি, নিছক প্রতীচ্যের প্রভাবে পেট্রিয়ট হবার সাধ জেগেছে অনেকের মধ্যে। লেখকের পরামর্শ, ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে সক্ষম হব। দেশানুরাগের উপরে অবস্থান ঈশ্বরানুরাগের। দেশানুরাগ যেখানে বাহুবলে দেশ জয় করে, সেখানে ঈশ্বরানুরাগ হৃদয়ের অনুরাগে পৃথিবী জয় করেন। ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্য লেখক ভগবদ্গীতার অনুসরণে আয়ত্ত করার উপদেশ দিয়েছেন, জোর দিয়েছেন নিষ্কাম সাধনার উপরে, যার জীবন্ত প্রমাণ রামমোহন।

'বিদ্যা এবং জ্ঞান' প্রবন্ধে একাধারে যাঁরা বিদ্বান এবং জ্ঞানী তাঁদের 'সোনায় সোহাগা' বলেছেন। বিদ্যা এবং জ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্য লেখক নির্দেশ করেছেন, তৎসহ বিদ্যা ও জ্ঞানের দুই বিভিন্ন পথের ঠিকানাও তিনি নির্দেশ করে দিয়েছেন। লেখক বলেছেন বিদ্যা নানা, তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন সত্যের অনুশীলনে রত, কিন্তু জ্ঞান এক আর সেই জ্ঞানের লক্ষ্যও এক, পথও তার একটিই। জ্ঞানের লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় মূল সত্তা এবং তার একটি পথ হল অধ্যাত্মযোগের সাধন। বিদ্যার পথ যেখানে অন্বয় ব্যতিরেকের, সেখানে জ্ঞানের হল যোগের পথ। অবিমিশ্র বিদ্যায় অন্তরাত্মার গভীরতম আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মায়, সেই অধিকারেই পরমাত্মার দর্শন লাভ সম্ভব।

'সাধনের সত্যে' লেখক সাধনের সত্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে ধ্বনিস্ফূর্তি ওঙ্কার, তেজস্ফূর্তি বরণীয় ভর্গঃ এবং জ্ঞানস্ফূর্তি ধী—এই নিয়েই অখণ্ড পরিপূর্ণ সমগ্র সত্তা।

'আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত' প্রবন্ধটি বোধবর্মার গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রচনায় লেখকের মননশীলতা, পাণ্ডিত্য যুক্তিবোধের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং দর্শন জ্ঞানেরও স্বতঃই প্রকাশ ঘটেছে। লেখক প্রচলিত নানা পৌরাণিক আখ্যানের রূপক ভেদ করে অন্তর্লীন সত্যকে আবিষ্কার করেছেন। বুদ্ধের আবির্ভাব কালের প্রেক্ষিতটি বস্তুগত দৃষ্টিতে উপস্থাপিত। তাঁর ভূমিকা ও গৌরবও বিশ্লেষিত হয়েছে যথাযথভাবে। লেখকের মতে 'বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্বোচ্চশ্রেণীর ধর্মবীর'। কেন বুদ্ধদেব ঈশ্বর প্রসঙ্গে-পরাঙ্মুখ ছিলেন, কেনই বা তিনি পরম নির্বাণের পথের পথিক হননি, লেখক সেসব ব্যাখ্যা করেছেন। কেন বৌদ্ধরা বুদ্ধের পরবর্তী কালে অবলোকিতেশ্বর, অমিতাভ বুদ্ধ এবং আদি বুদ্ধের কল্পনা করেন, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর মধ্যে কেমন করে বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুপ্রবেশ ঘটল, ইতিহাস সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করলেও লেখক যুক্তির সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করেছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের সঙ্গে বেদান্ত দর্শন এবং সাংখ্য দর্শনের ঐক্যও প্রদর্শিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য যখন বিপন্ন তখন পরশুরাম, শ্রী রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ পৌরাণিক ইতিহাসের তিনটি মুখ্য সন্ধিক্ষণে তাঁদের কিরূপে আবির্ভাব ঘটে এবং আধিপত্য বিস্তার করেন তার চমকপ্রদ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

'সভাপতির অভিভাষণ'টি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি। এই প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যপরিষদ গৃহীত কর্মসূচীর যেমন পর্যালোচনা করেছেন, তেমনি পরিষদের করণীয় কি সে বিষয়েও উল্লেখ করেছেন। লেখক প্রস্তাব করেছেন একটি 'বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলনে'র, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষার পরিভাষা সঙ্কলনের, উত্তম অনুবাদ গ্রন্থের এবং বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য প্রভৃতির আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ বিষয়ে। প্রবন্ধটিকে একটি গঠনমূলক প্রস্তাব বলা চলে।

'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধটি লেখকের অন্যবিধ পরিচয় বহন করে। প্র, পরা, বি, সং প্রভৃতি উপসর্গগুলির অর্থ বিচারে প্রয়াসী হয়ে লেখক তাঁর শব্দ বিদ্যায় পারদর্শিতার পরিচয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রবন্ধে লেখক তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। Scholastic Deduction এবং Baconian Induction এই দ্বিবিধ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে প্রবন্ধটিতে। তবে তুলনামূলক ভাবে লেখক ঈপ্সিত সাফল্যলাভ করেছেন শেষোক্ত পদ্ধতির সহায়তায়।

সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ'টি গতানুগতিক ভাষণ মাত্র নয়, তা তথ্য পূর্ণ এবং লেখকের বহু পঠন শীলতার পরিচয়বাহী। গল্পচ্ছলে লেখক দেখিয়েছেন আমাদের দেশে বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহারের পরিণতি।

দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনার এক ধরনের প্রসাদগুণ আছে। তাছাড়া জটিল ও দুরূহ তত্ত্বাদিকে তিনি এমন সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন, যার ফলে সেগুলি পাঠকের বোধগম্য হয়। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী পাঠের এক আলাদা আনন্দ, দুঃখের বিষয় সকলের ক্ষেত্রে তা লাভ করা যায় না।

# বিস্মৃত মানুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালী জাতির সহজাত আত্মবিস্মরণের জগদ্দল পাথরে চাপা পড়া এক বিস্মৃত প্রতিভা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঐতিহ্যগত প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। কিন্তু আত্মপ্রচারে বিমুখ একান্ত আপনভোলা ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ চিরদিনই অন্তরাল থেকে গিয়েছেন। বস্তুত কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতির' পাতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণের' উল্লেখ না থাকলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের সঙ্গে বহু শিক্ষিত মানুষের পরিচয়ও সম্ভবত থাকত না।

দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা সংকলন ও প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা তাই যথার্থই একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনীয় কাজ। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার অন্বেষণ এই রচনা সংগ্রহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলেও এই সূত্রে মানুষ দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিচয় লাভ করার চেষ্টাও জাতির কর্তব্যের অঙ্গ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে সবিশেষ চিন্তিত ছিলেন তাঁর আত্মভোলা স্বভাবের জন্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথরে দ্বিতীয় স্ত্রী হেমলতা ঠাকুরকে মহর্ষি বলেছিলেন "তোমার শ্বশুরমশায়ের জন্য আমার বড়ো ভাবনা। উনি নিজের জন্য কখনো কিছু চাননি। আমার কাছে একবারও বলেন নি যে এটা ওঁর দরকার। ......... উনি নিজের জন্যে কখনো কিছু করতে পারেন না।" (নূতনতর মানুষ দ্বিজেন্দ্রনাথ, হেমলতা ঠাকুর) রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র বংশের মেয়ে, পরবর্তীকালে ঠাকুরবাড়ির বধূ হেমলতা ঠাকুর— শান্তিনিকেতনে যিনি বড়মা নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় শ্বশুরমশাই দ্বিজেন্দ্রনাথের আত্মভোলা, সরল এবং শিশুপ্রকৃতির একটি ছবি তুলে দিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম্পর্কে হেমলতা দেবীর লেখার বিশেষ প্রশংসা করে মন্তব্য লিখে দিয়েছিলেন—" খুব ভালো। সভায় নিশ্চয় পড়ে নানালোকের নানা বিস্তর বাজে বকুনি কমানো উচিত— কাকামশাই।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সহজ-সরল মনের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেক সময়েই অনেক অযথার্থ মন্তব্য করা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বাজে বকুনি' বলেছেন,— যা আদৌ সত্য ছিল না। ১৩৪৬, চৈত্র সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত হেমলতা দেবীর লেখায় দেখি কিভাবে একজন ধ্যানপরায়ণ মানুষ অশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও সাংসারিক বিষয়ে একান্তই অনভিজ্ঞ ছিলেন— একেবারে শিশুর মতন।

হেমলতা ঠাকুরে লেখা থেকে দেখি "বৈকালে গরম লুচি ভেজে সামনে এনে দিয়েছে। লুচিতে হাত ঠেকিয়েই বল্লেন, একি লুচি। ঘি চপচপ করছে লুচির সারা গায়ে, আমার হাত শুদ্ধ নষ্ট হলো ঘি লেগে; লুচির প্লেট আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন 'যাও জল দিয়ে লুচি ভেজে আনো।' ঘি দিয়ে বুঝি আবার লুচি ভাজে।' লুচির প্লেট হাতে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে চাকরকে ঘি দিয়ে লুচি না বেলে দুটি শুকনো ময়দা দিয়ে লুচি ভেজে আনতে বলা হল। ...... লুচি দেখে বাবামশায় খুব খুশি, বললেন এইতো ঠিক হয়েছে, দেখলে জল দিয়ে ভেজে কেমন হলো। খাওয়ার শেষে আস্তে আস্তে পাল্লাচ্ছলে বলতে হল, ফুটন্ত গরম জলে কাঁচা ময়দা বেলে ছেড়ে দিলে ময়দার কাই হয়ে যাবে, লুচি হবে না। ...... বাবামশায়ের

তখন হঁশ হলো, বললেন, তাই তো গরম জলে ময়দা দিলে গুলে কাই হয়ে যাবে তো বটেই। আচ্ছা কান্ড আমার.... বলেই পাড়া জাগানো হাসি....।

হেমলতা দেবী লিখছেন "একবার একজনকে নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে বলতে ভুলে গেছেন। নিমন্ত্রিত যথাসময় এসে উপস্থিত। বাবামশায় গল্প করছেন, খাবারের আর নাম নেই। অনেক বেলা হয়ে গেল, খাবার আসেনা ভদ্রলোক উস্‌খুস্ করছেন, ভাবছেন— "তবে কি বড়বাবু (সে সময় ঘরে বাহিরে অনেকে তাকে বড়বাবু বলতেন) খাবারের কথা ভুলে গেছেন।" নিজের কথা চাপা দিয়ে তিনি বাবামশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন— "আপনার খাবার সময় হয়নি?" সেকথা বলতেই বাবামশায়ের মনে পড়ে গেল যে তিনি এই ভদ্রলোককে খেতে বলেছেন। তখন তাঁর চিৎকার দেখে কে—আনো লুচি, আনো মিঠাই— সে এক হৈ হৈ কান্ড।"

ছোটভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা থেকেও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুর মত সরল মনের একটি পরিচয় পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আমার বাল্যকথা' রচনায় লিখেছেন "একজন বড়দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—বড়দাদা ঠিক সেই সময় বেরোবার উদ্যোগে আছেন—তাঁর বন্ধুর গাড়ী নিজের গাড়ী মনে করে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন, সে বন্ধু বসেই আছে বসেই আছে— অনেকক্ষণ পরে বাড়ী ফিরে এসে দেখেন তাঁর বন্ধু এখনো সেখানে বসে—বড়দাদা শেষে কারণ জানতে পেরে অপ্রস্তুত ও হাসতে হাসতে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে তাকে সান্ত্বনা করলেন।" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন কিভাবে পাখীরা দ্বিজেন্দ্রনাথের হাত থেকে খাবার খেয়ে যাচ্ছে।" কত কাঠবিড়ালী তাঁর গায়ের উপর দিয়ে নির্ভয়ে চলে যাচ্ছে।"

হেমলতা দেবীর লেখা থেকে জানতে পারি দ্বিজেন্দ্রনাথের চাওয়ার পরিমাণ ছিল কত যৎসামান্য। খাতা-কাগজ, কলম-পেন্সিল, খানকতক তত্ত্বজ্ঞানের গ্রন্থ, কাগজের বাক্স তৈরীর জন্য কিছু ব্রাউন পেপার।

জ্যামিতির অনুশীলন ছিল তাঁর একটি প্রিয় বিষয়। জ্যামিতির মাপ ও হিসেব অনুযায়ী বাক্স তৈরি করার কাজের নাম তিনি দিয়েছিলেন 'বক্সোমেট্রি।'

বাংলা সাংকেতিক অক্ষর তথা শর্টহ্যান্ড সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বারাই। এই কাজের সূত্রে তিনি ছড়ার মত যে সব কবিতা লিখেছেন তার একটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শিশুবধূ ফুলকুমারী
　　আলতা পরি পায়
হাক্কা পেড়ে হলদে শাড়ী
　　বাগিয়ে পরে গায়
যেই শুনলি পাল্কী এল
　　অমনি তাড়াতাড়ি
ভেস্কিবাজী দেখতে গেল
　　বেলফুলের বাড়ী।

বেশ কিছু সঙ্গীত রচনা করছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। পত্নীর বিয়োগ ব্যথায় কাতর দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত একটি গান—

পত্নীর বেদনা অস্থির প্রাণ
কর হে আমারে শান্তি দান।

এই গানটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থের একটি সংস্করণে ভুল করে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি পরিভাষা তৈরি করা। বিভিন্ন রচনা থেকে সংকলিত পরিভাষার কিছু উদাহরণ দেখলে বোঝা যায় এ বিষয়ে তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্ব।

উদাহরণ হিসেবে—প্রদত্ত পরিভাষার পাশে বন্ধনীতে কোন রচনায় তা ব্যবহার করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হল।

Artificial Selection– কৃত্রিমপাত্র নির্বাচন (বিদ্যা ও জ্ঞান)।
Magnifying Glass– প্রবর্ধক কাঁচ (বিদ্যা ও জ্ঞান)।
Mechanics– যন্ত্রবিদ্যা (বিদ্যা ও জ্ঞান)।
Feudal System– ক্ষাত্রতন্ত্র (সাধনা-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য)।
Heredity– পৈতৃক সংস্কার (আর্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত)।
Subconscious– অব্যক্ত চেতন (সারসত্যের আলোচনা)।
Autocracy– স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা চিঠি)।
Phenomenon– অবভাস (হারামনির অন্বেষণ)।
Theory– সিদ্ধান্ত (সভাপতির ভাষণ)।
Theoritical Science– তাত্ত্বিকবিজ্ঞান শাস্ত্র (সভাপতির ভাষণ)।
Protoplasam– জীবাঙ্কুর (বিদ্যা ও জ্ঞান)।
Survival of the fitest– যোগ্যতমের উদ্বর্তন (বিদ্যা ও জ্ঞান)।

বলাবাহুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা অনুসন্ধান করলে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুমুখী প্রতিভার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরলোকগত শিক্ষক সোমেন্দ্রনাথ বসু এ বিষয়ে উৎসাহী করে তুলেছিলেন বলেই দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা অনুসন্ধান ও সংগ্রহের যে কাজ হাতে নিয়েছিলাম, তা আংশিক সার্থক হলো অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্সের স্বত্বাধিকারী অজিতকুমার জানার আগ্রহে—'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রকাশের মাধ্যমে। অজিতবাবু একটি জাতীয় কর্তব্যও সমাধা করলেন তা বলাবাহুল্য। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে তাঁর পিতামহ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকাশ করার কাজে সহায়তা করতে পেরে আমিও ব্যক্তিগত ভাবে ধন্য।

অমিত দাস
সম্পাদক, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মশতবর্ষ কমিটি।

# দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব?

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যখন ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বোমা প্রভৃতি আপদগুলা'র নামও আমরা জানিতাম না, আর, বাহাত্তর সালে কোন্ জম্মে কবে একবার আমাদের এই সোনার ভারতে দুর্ভিক্ষের পদধূলি পড়িয়াছিল, তাহার হৃদয়-বিদারণ আখ্যায়িকা শুনিলে আমাদের মনে হইত— আর এখন আমাদের ভয় নাই, এখন আমরা রাম রাজ্যে বাস করিতেছি। যখন, যেদিকে চক্ষু ফিরাইতাম সেই দিকে দেখিতাম প্রসন্নবদনে লক্ষ্মী হাসিতেছেন—সে একদিন ছিল। তখন, আমার রঘুবংশের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে, কুমার সম্ভবও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ইতিমধ্যে একদিন, মাঘ ভারবী না জানি কাণ্ডখানা কিরূপ—তাহা পাতা উল্টাইয়া দেখিতে গিয়া দিব্য একটি পাকা ঢঙের শ্লোক আমার চক্ষে পড়িল। তাহার শেষ চরণটি আজিও ভুলি নাই, সেটা এই ঃ—"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ—হিতও যেমন মনোহারিও তেমি, এরূপ বচন দুর্লভ।" ইহার খোলসা তাৎপর্য্য এই ঃ—অপ্রীতিকর হিতবাক্যও সুলভ, আর, মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যও সুলভ, প্রীতিজনক হিতবাক্যই দুর্লভ। হিতবক্তার তবে তো দেখিতেছি মৌনাবলম্বন করাই শ্রেয়। তোমার শাস্ত্রে কি লেখে?

॥ ২ ॥ আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোনো প্রয়োজন করে না—চোক কাণ বুজিয়া তাহা বলিয়া ফ্যালাই ভাল, যে শোনে সে শুনিবে, যে না শোনে না শুনিবে, তুমি তো বলিয়া খালাস্। তুমি যদি জানিতে পারিয়া থাক' যে গঙ্গার ঘাটে কুম্ভীরের আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে, তবে সে কথা সহরময় রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে এটা সত্য যে জ্ঞানের হিতবাক্য কাহারো প্রাণে সহে না, তাহা এক কাণ দিয়া শ্রোতার মস্তিষ্কসদনে প্রবেশ করে—শুদ্ধ কেবল ভদ্রতা'র অনুগ্রহে ভর করিয়া, কিন্তু প্রবেশ করিয়া যখন দেখে যে, হৃদয়দ্বারে কপাট বন্ধ, তখন বসিতে না পাইয়া আর এক কাণ দিয়া সুড় সুড় করিয়া বাহির হইয়া যায়। মনস্তুষ্টিকর অহিত বাক্যের কুহকে ভুলিয়া রসাতলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে এরূপ কৃপাপাত্র আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, পরন্তু তাহাদের মধ্য'কার একজন'কেও আজ পর্য্যন্ত দেখিলাম না যে, সে কাহারো হিতবাক্য শুনিয়া সৎশিক্ষা লাভ করিয়াছে। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। যে শেখে, সে ঠেকিয়া শেখে। বলিতেছি বটে "ঠেকিয়া শেখে" কিন্তু ঠেকিয়া শেখা বলে কাহাকে তাহা যদি শোনো, তবে তোমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিবে ঃ—ঠেকিয়া শেখা'র আর এক নাম মৃত্যুমুখে প্রবেশ করা। দশজন স্নানযাত্রী গামছা কাঁধে করিয়া গঙ্গার ঘাটে আসিয়াছে দেখিয়া তুমি তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে বলিতেছ "জলে নাবিও না—গঙ্গায় কুম্ভীর দেখা দিয়াছে।" পাঁচজন তোমার সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া এক কোমর জলে, আর পাঁচজন তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটু হাঁটু জলে নাবিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। কোমর-জলের মহারথীরা চক্ষিতের মধ্যেই জলগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল;—ইহারই নাম ঠেকিয়া

শেখা! হাঁটু-জলের অৰ্দ্ধরথীরা প্রস্তর্গাত ডাঙ্গায় উঠিল;— ইহারই নাম দেখিয়া শেখা।

॥ ১॥ শুনিয়া শিখিলেই তো আপদ চুকিয়া যায়, তাহা হইলে ঠেকিয়া শিখিতেও হয় না, দেখিয়া শিখিতেও হয় না। শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন?

॥ ২॥ লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে; তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।

॥ ১॥ বেস্ যা হো'ক্ তুমি বলিলে! তুমি কি আর জান' না যে, কচি বয়সের মনুষ্যও মনুষ্য, যুবা বয়সের মুনষ্যও মনুষ্য, প্রবীণ মনুষ্যও মনুষ্য? সত্য বলিতে কি—তোমার মতো লোকের মুখে "মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়াছে" এইরূপ একটা আগা পাছতলা রহিত বেখাপ কথা শুনিলে থামার কেমন কেমন ঠ্যাকে!

॥ ২॥ বলিলাম আ্যাক—শুনিলে আর! আমি বলিলাম "লোকের বয়স, "শুনিলে "মনুষ্যের বয়স!"

॥ ১॥ আমি তো জানি—মনুষ্য নামই লোক।

॥ ২॥ সেদিন তোমার অষ্টম বর্ষীয় বালকটি যখন তোমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিল যে, "সকালে পড়া মুখস্থ ক'রেছি, বিকালে পড়া মুখস্থ ক'রেছি, আবার এখন রাত্রে পড়া মুখস্থ করিতে বলিতেছ! অতবার ক'রে পড়া মুখস্থ ক'রে লোকে পাগল হয়ে যায়, "এ কথার প্রত্যুত্তরে তুমি যাহা তাহাকে বলিলে তাহা তো আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি! তুমি বলিলে "তোর এখনো গোঁপ দাঁড়ি ওঠে নি—তুই আবার লোক হ'সি কবে? যা'—পড়্‌গে যা'।" লোক শব্দের এইরূপ বিশদ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা তোমারই মুখে যখন আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তখন আমি কেমন করিয়া জানিব যে, তোমার অভিধানে মনুষ্য নামই লোক—একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালকও লোক!

॥১॥ তুমিতো ঘর-সন্ধানী (Detective) মন্দ না! বমাল শুদ্ধ আমাকে পাকড়া করিয়াছ! তোমার সঙ্গে কথা কহা দেখিতেছি বিপদ! তুমি যদি, সখে, একটা কাজ কর—বড্ড ভাল হয়; আশ পাশের ধাঁকড়া কথার চুলচেরা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি আমাকে তোমার পেটের কথাটি পরিষ্কার করিয়া খুলিয়া-খালিয়া বল,' তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।

॥২॥ বলি তবে শোন :—এটা তুমি তো জান'ই যে ঘুম পাড়ানী মাসী-পিসীর সেদিনকার ছেলে'কে বড় হইয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখিলে আঁচলের কোণ দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলেন "আমি উহাকে বুকে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি!" ঘোড়া পেট থেকে পড়িয়াই ঘোড়া হয়, গোরু পেট থেকে পড়িয়াই গোরু হয়; কিন্তু মানুষের একি বিপরীত কাণ্ড—অন্যে তাহাকে মানুষ না করিলে সে মানুষ হয় না। কচি বয়সে মনুষ্য যখন পিতামাতা'র নিকট হইতে এক-মেটে শিক্ষা লাভ করে, তখন সে অৰ্দ্ধ মানুষ হয়; তাহার পরে পাঠদ্দশায় যখন শিক্ষকদিগের নিকট হইতে দোমেটে শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে চরিয়া খাইতে শেখে, তখনই সে পুরা মানুষ হয়। কচি-বয়সে গৃহ মনুষ্যের জীবন-ক্ষেত্র; এই জীবন-ক্ষেত্রে মনুষ্য পানাহার করিতে শেখে, পায়ে হাঁটিতে শেখে, বসিতে দাঁড়াইতে শেখে, মাতৃভাষা শেখে, জীবনে যত কিছু মুখ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার প্রণালী সমস্তই অবলীলাক্রমে শেখে। মনুষ্যের এইরূপ কচি বয়সের শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে কিছু, শিক্ষা শব্দের বাচ্য নহে; কেননা এ বয়সে মনুষ্য সন্তান

শিখিব মনে করিয়া কিছুই শেখে না; তাহার মাতাপিতা এবং ভ্রাতা ভগিনীরা যাহা তাহাকে গিলাইয়া দ্যায়, তাহাই সে হাসিয়া খেলিয়া গলাধঃকরণ করে। বাচ্ছা-মনুষ্যের শিক্ষা এক প্রকার অযাচিত দানগ্রহণ। আদিম জীবন ক্ষেত্রে মনুষ্য ঐরূপ অযাচিত দান গ্রহণের পথ দিয়া জীবন নির্বাহের নানাবিধ অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার কার্য্যে অশিক্ষিত পটুতা উপার্জ্জন করে। জীবন ক্ষেত্র হইতে মনুষ্য যখন মানস ক্ষেত্রে ভর্ত্তি হয়, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার শিক্ষার গোড়া পত্তন আরম্ভ হয়। মানস ক্ষেত্র কি? না বিদ্যালয়। বিদ্যালয়কে মানসক্ষেত্র বলিতেছি এই জন্য—যেহেতু মনোযোগই এ ক্ষেত্রের প্রধানতম শিক্ষাপ্রণালী। মনুষ্যের পঠদ্দশার শিক্ষকের বাক্য মন দিয়া না শুনিলে তাহার বিদ্যাশিক্ষা অন্য কোনো উপায়ে ঘটিয়া ওঠা সম্ভবে না। পাঠদ্দশার বয়সই প্রধানতঃ মনুষ্যের শুনিয়া শিখিবার বয়স। মনুষ্যের পঠদ্দশার বয়স অতীত হইলেই সেই সঙ্গে তাহার শুনিয়া শেখার বয়স অতীত হইয়া যায়। মানস ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবার সময় পণ্ডিত মহাশয়ের, তথৈব, অধ্যাপক মহাশয়ের ছাত্রেরা মনোযোগের পথ দিয়া বিদ্যাবুদ্ধি উপার্জ্জন করে। বুদ্ধি পরিস্ফুট হইবার পূর্ব্বে, মনুষ্য সন্তান, শিক্ষক যাহা বলে তাহাই শুনিয়া শেখে; বুদ্ধিবিকাশের পালা সাঙ্গ হইলে মনুষ্য যখন মানস ক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে ভর্ত্তি হয়, অথবা যাহা একই কথা—বিদ্যালয় হইতে লোক সমাজে ভর্ত্তি হয়, তখনই সে লোক হয়। মনুষ্য যতদিন বালক থাকে, ততদিন সে কাহারো নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হয় না; পক্ষান্তরে বুদ্ধির ফুটন্ত অবস্থায় লোক-সমাজের বাতাস গায়ে লাগিয়া বালক যখন লোক হইয়া ওঠে (ডার্বিনের শাস্ত্রানুসারে—বানর যখন 'বা' পরিত্যাগ করিয়া নর হইয়া ওঠে) তখন গোঁপ দাড়ির প্রাদুর্ভাবে তাহার মুখের চেহারাও যেমন ফিরিয়া যায়, পদগৌরবের প্রাদুর্ভাবে তাহার মনের ভাবও তেমি ফিরিয়া যায়, পদগৌরবের প্রাদুর্ভাবে তাহার মনের ভাবও তেমি ফিরিয়া যায়; মন তখন বলে—অন্যের নিকট হইতে কোনো কথা শুনিয়া শিখিলে আপনার বুদ্ধিকে অপমান করা হয়।" এতগুলা কথা আমার পেটের মধ্যে ছিল, তাই তুমি যখন বলিলে "শুনিয়া শিখিতে লোকে এত পরাঙ্মুখ কেন," আমি তাহার উত্তর দিলাম যে, "লোকের শুনিয়া শিখিবার বয়স অতীত হইয়া গিয়াছে, তাই তাহারা শুনিয়া শিখিতে পরাঙ্মুখ।"

॥ ১॥ তুমি যাহা বলিলে—সবই সত্য; কিন্তু তথাপি ঐ বিষয়টির

সম্বন্ধে একটা বিষম ধন্দ আমার মনে উপস্থিত হইয়াছে—সেটা'র একটা মীমাংসা আশু প্রয়োজনীয়; কথাটা এই :—মনুষ্য যখন বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তখন, কচি বয়সে মাতা কিম্বা ধাত্রী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বিপদ হইতে রক্ষা করে; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যের পরামর্শ শুনিয়া চলিতে ভার বোধ করে, সে ব্যক্তি যদি কুবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া বিপথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হয়, তবে কে তাহাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে?

॥ ২॥ আমাদের দেশের একটি পুরাতন শাস্ত্রবচন এই যে, "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্ম্মকে যে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করে। গৃহক্ষেত্রে পিতামাতা কচি বালকের জীবনের নিয়ামক, শিক্ষাক্ষেত্রে গুরু বয়ঃপ্রাপ্ত বালকের মনের নিয়ামক, কর্ম্মক্ষেত্রে বুদ্ধি বিষয়ী লোকের কর্ম্মের নিয়ামক; এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। এটাও তেমি দেখা চাই যে, কুশিক্ষা যেমন শিক্ষা নামের যোগ্য নহে, কুবুদ্ধি তেমি বুদ্ধি নামের যোগ্য নহে। সুবুদ্ধিই বুদ্ধি, আর, ধর্ম্মবুদ্ধিই সুবুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। কর্ম্ম করিবার বস্তু; ধর্ম্ম, ধরিয়া থাকিবার বস্তু। কর্ম্ম, বুদ্ধির দাঁড়; ধর্ম্ম, বুদ্ধির হাল। কর্ম্মক্ষেত্রের বিষয়ী লোকেরা যখন বিপথে পদার্পণ করিতে

উদ্যত হয়, তখন তাহারা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে—কেবল যদি তাহারা ধর্ম-বুদ্ধির কথায় কর্ণপাত করে; তাহা যদি না করে, তবে আর নিস্তার নাই।

॥ ১ ॥ ধর্ম্ম, বুদ্ধির হাল, তাহা তো বুঝিলাম; কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইবে কোন্ দিক বাগে? কূলবাগে অবশ্য! তবেই হইতেছে যে, কূলের ঠিকানা নির্দ্দেশ করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। দাঁড়, তুমি বলিতেছ কর্ম্মকে, হাল বলিতেছ ধর্ম্মকে ইহা শুনিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিলাম; কূল তুমি বলিতেছ কাহাকে, সেইটিই এখন জিজ্ঞাসা।

॥ ২ ॥ কূল, আমি বলি, পুরুষার্থকে। পুরুষার্থ, স্বাধীনতা, স্বরাজ্য মুক্তি, শব্দ বটে চারিটা—কিন্তু বস্তু একই। মনুষ্য-পক্ষী যখন আপনার পক্ষে ভর করিয়া উড়িতে শেখে উড়িতে শিখিয়া আপনি আপনার নেতা হয় তখন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ধর্ম্মবুদ্ধি স্বাধীনতা মুক্ত অরণ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে, আর, কুব্জা পাপ-বুদ্ধি ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আহ্বান করে। এক শ্রেণীর পক্ষী অধিদেবতার আহ্বান শুনিয়া মুক্তির অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সুপথে চলে, আর এক শ্রেণীর পক্ষী উপদেবতার আহ্বান শুনিয়া ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিপথে চলে। মনুষ্য যখন মানসক্ষেত্র হইতে বিদ্যা-বুদ্ধি সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে স্বপদে ভর দিয়া দাঁড়ায় তখন সে আপনাকে চালাইবার ভার আপন হস্তে টানিয়া লইয়া স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই তো আর স্বাধীন হওয়া যায় না। স্বাধীন হইতে হইলে স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই। যাহারা স্বাধীনতার মুক্ত অরণ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সুপথে চলেন তাহারা স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করেন, আর যাঁহারা ক্ষণিক সুখের স্বর্ণ পিঞ্জরের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া বিপথে চলেন, তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতার অযোগ্য হইয়া পড়েন। সুপথ যাত্রীরা প্রাণপণ চেষ্টায় স্বাধীনতার যোগ্যতা উপার্জ্জন করেন, কাজেই তাঁহারা অভীষ্ট ফল লাভে কৃতকার্য্য হন। বিপথ যাত্রীরা গাছে না উঠিতেই এক কাঁধির জন্য আগ্রহান্বিত হন কাজেই অভীষ্ট ফলে বঞ্চিত হ'ন। পুরুষার্থের কূলে পৌঁছিতে হইলে তাহার প্রকৃষ্ট উপায় কি—তাহা বলি শোন ঃ—

(১) কূলের প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়া ঠিক পথে হাল বাগাইয়া ধরিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার যোগ্যতা লাভ করা চাই।

(২) রীতিমতো বিদ্যা শিক্ষা এবং কাজ শিক্ষা করিয়া মাঝ পথের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা চাই।

স্বাধীনতাও যা স্বরাজ্যও তা একই; তা'র সাক্ষী—স্বাধীন = স্ব + অধীন অর্থাৎ আপনি আপনার অধীন; স্বরাজ = স্ব + রাজ অর্থাৎ আপনি আপনার রাজা; দুয়ের ভাবার্থ অবিকল সমান। যাঁহারা স্বাধীনতা এবং স্বরাজ্যের কাঙ্গালী, তাঁহাদের দুইটি বিষয় সর্ব্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য।

### প্রথম স্মর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের অধীনতা স্বাধীনতার সোপান; সৌরাজ্য (অর্থাৎ মঙ্গলরাজ্য) স্বারাজ্যের সোপান; ধর্ম্মবন্ধন মুক্তির সোপান।

### দ্বিতীয় স্মর্ত্তব্য।

স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার বিপরীত পথ, নৈরাজ্য (অর্থাৎ অরাজকতা) স্বরাজ্যের বিপরীত পথ, মোহবন্ধন মুক্তির বিপরীত পথ।

এই দুইটি বিষয় সর্ব্বদা স্মরণে জাগ্রত রাখা কর্ত্তব্য। স্বারাজ্য কিছু আর আমাদের পোষা কুকুর নহে যে তাহাকে আমরা ডাক দি'বা মাত্র তৎক্ষণাৎ সে দৌড়িয়া আসিয়া আমাদের পদলেহন করিতে থাকিবে! স্বারাজ্য লাভ করিতে হইলে একদিকে চাই ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিয়া স্বারাজ্য ভোগের যোগ্যতা লাভ করা, আর একদিকে চাই রীতিমত জ্ঞান এবং কাজ করিয়া বিধিমত প্রকারে অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা লাভ করা। সৌভাগ্যশালী জাপানীরা তাহাই করিয়াছে; আর সেই জন্য—তাহারা যে কার্য্যে হাত দিতেছে, তাহাতেই সোনা ফলিতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা যদি অন্তর্দাহের উত্তেজনায় অথবা দুষ্ট সরস্বতীর কুমন্ত্রণায় ঐরূপ যোগ্যতা এবং উপযোগ্যতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই রুষীয় ভল্লুকের প্রতি গুলিগোলা চালাইতে আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তাহারা সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের নখের আঁচড়ে এবং দাঁতের কামড়ে ধনে প্রাণে মারা যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। জাপানীরা তাহাদের এই নিজ বুদ্ধিসম্ভূত নূতন উদ্যমের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে কেমন অপরাজিত চিত্তে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই! তাহারা রাগের মাথায় চীন রাজাকে ছারখার করিয়া দিতে পারিত—তাহা তাহারা করে নাই; উল্টা আরো তাহারা চীনদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য যত্নের ত্রুটি করে নাই। তাহারা কন্‌গ্রেস্‌বীরদিগের ন্যায় আপনা-আপনি'র মধ্যে কামড়াকামড়ি আঁচড়া-আঁচড়ি এবং ঢুসাঢুসি করিয়া জাতীয় অধঃপতনের দিব্য একটা জমকালো সোপান গাঁথিয়া তুলিতে পারিত—তাহা তাহারা করে নাই; উল্টা আরো তাহারা প্রভূত ধন ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিয়া, আপনাদের মধ্যে যাহাতে বিবাদ বিসম্বাদের চিহ্নমাত্রও না থাকে, তাহার যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করিতে স্বল্পমাত্রও কালবিলম্ব করে নাই। রুষীয় বন্দীদিগের প্রতি শত্রুচিত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা না করিয়া বন্ধুচিত যত্ন সমাদর এবং সম্মান প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র ভারবোধ করে নাই। এরূপ জাতির জয় হইবে না তো কাহার জয় হইবে? আমাদের দেশের এই যে একটি পুরাতন বাক্য "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" ইহা অব্যর্থ বেদবাক্য। ধর্ম্মই যোগ্যতা'র নিদান; আর ডারুইনের কথা যদি সত্য হয়, তবে যোগ্যতাই জয়ের নিদান। ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ জনসাধারণই স্বারাজ্য লাভের যোগ্যপাত্র। জাপানের অধিবাসীরা ধর্ম্মকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিজয়লক্ষ্মী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আপন হস্তে জাপানের গলে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন "চিরজীবী হও" আশীর্ব্বাদ করিয়া। আমাদের দেশের স্বারাজ্য-পন্থীদিগকে আমি তাই জোড়হস্তে বলি—"দেখিয়া শেখো। নচেৎ ঠেকিয়া শিখিতে হইবে।" ঠেকিয়া শেখা যে কি সর্ব্বনেশে শেখা তাহা যে জানে সেই জানে। বিপথ-যাত্রী যখন উঠিতে পড়িতে, বসিতে দাঁড়াইতে ঘা খাইয়া চৈতন্য লাভ করে, তখন সে বিপদে পড়িয়া বলিবার সময় বলে "এ পথে বাপ মা বলিয়া ডাকিলে কেহ সাড়া দিবার নাই" অথচ চলিবার সময় চলে—কি সর্ব্বনাশ—সেই পথেরই আলেয়া'র পশ্চাৎ পশ্চাৎ! ফল কথা এই যে, বিপথে চলা যখনই যাহার প্রাণের সামিল হইয়া হাড়ে মিশিয়া যায়—নূতন লব্ধ জ্ঞানের নূতন পথে চলা তখনই তাহার পক্ষে মৃত্যু তুল্য। একে তো এই দশা—তাহার উপরে যদি আবার বিপথ যাত্রীর দুর্ব্বুদ্ধি ঘাড়ে চাপে, তবে আর রক্ষা নাই! তখন সে হিতবক্তার মুখপানে খট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া দম্ভ সহকারে বলে—"আমি বিনাশের পথে যাইব—আমার খুসী! তুমি বলিবার কে? আমি তোমার হিতবাক্য শুনিতে চাহি না!" ইহার উত্তরে ভদ্রলোকটি কিছু আর তাহাকে

বলিবে—"খুব তুমি বাহাদুর" বলিয়া আপন মনে ইষ্ট দেবতার নাম জপিতে থাকে।

॥ ১ ॥ সভ্য জাপান সেদিনকার ছেলে বই না—তাহার গলা টিপিলে দুধ বেরোয়! পক্ষান্তরে সুসভ্য ইউরোপের বয়ঃক্রম হইতে চলিল চারি শতাব্দীর বেশী বই কম না। দেখিয়া যদি শিখিতেই হয়, তবে ইউরোপ আমেরিকার খ্যাতনামা মহাত্মাদিগের পরীক্ষোত্তীর্ণ প্রণালী পদ্ধতিই আদর্শ পদবীতে দাঁড় করাইবার জন্য উপযুক্ত, তা বই একটা অকালপক্ক কচি ছেলে'র কাণ্ডকারখানা দেখিয়া শিখিবার জিনিসই নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে তো আর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ইতিহাস লেখকের অভাব নাই; তাঁহাদের লিখিত তরো বেতরো অভ্যুদয় বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ, দেখিবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার-বর্জ্জিত। নৈরাজ্যের মধ্য হইতেই স্বারাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে।*

॥ ২ ॥ ফরাসীস্ দেশের অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দীয় নৈরাজ্যের মধ্য হইতে কিরূপ স্বারাজ্য মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা তো আর কাহারো দেখিতে বাকি নাই। সেটা সে একটা সর্ব্বনেশে কালসর্প তেমন বিষাক্ত কালসর্প কোথাও আর দেখা যায় না! ইংরাজীতে তাহার নাম Revolution, আর দেশীয় ভাষায় তাহার নাম রাষ্ট্রবিপ্লব। সেই সহস্রশিরা সর্পটাকে সুদূরদর্শী প্রথম নেপোলিয়ন খুব ভালমতেই চিনিতেন আর, চিনিতেন বলিয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য বিহিত বিধানে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু হইলে হইবে কি ধর্ম্মের নামে নহে পরন্তু গর্ব্বস্ফীত জাতীয় গৌরবের নামে তিনি তাহার বিষ দাঁত ভাঙিতে গিয়াছিলেন তাই হিতে বিপরীত হইল। ঐ দুরন্ত কালসর্পটায় কোপে পড়িয়া অবধি, তাহার বিষশ্বাসে জ্বলিয়া পুড়িয়া ফরাসীস্ দেশের অধিবাসীরা একদিনের জন্যও সৌরাজ্যসুখ যে কাহাকে বলে তাহা জানিল না। স্বারাজ্যের যোগাড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়া মার্কিনেরাই বা কেন (জাপানীদিগের মতো) অত্যল্প কালের মধ্যে অবলীলাক্রমে আশাতীত ফল লাভ করিল, আর ফরাসীসেরাই বা কেন আজও পর্য্যন্ত তাহাদের হেঁট মস্তক উত্তোলন করিতে পরাভব মানিয়াছে? ইহার গোড়ার কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ভূতগত উচ্ছৃঙ্খলতা'র ভূতগত ফল হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়া পত্তন করা হইয়াছিল ধর্ম্মের উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য লাভ, ফরাসদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল অবিদ্যা দম্ভ মাৎসর্য্য এবং অধর্ম্মের উপরে তাই তাহার ফল হইল জাতীয় অধঃপতন। পুরাকালের একটি শাস্ত্র বচন শ্রবণ করঃ—

"অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ—অধর্ম্ম দ্বারা দুরাত্মজনের সমস্তই হস্তায়ত্ত হয়, "ততো ভদ্রানি পশ্যতি— তাহার পরে মঙ্গল দৃশ্য সকল দেখা যায়," "ততঃ সপত্নান্ জয়তি—তাহার পরে শত্রুদিগের উপরে জয় লাভ হয়," "সমূলস্তু বিনশ্যতি"—তাহার কপালে কিন্তু লেখা আছে "সমূলে বিনাশ"। ধর্ম্মভ্রষ্ট ফরাসীস্ জাতির ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। তার সাক্ষী ঃ—

(১) অধর্ম্মে নৈধতে তাবৎ।

অধর্ম্ম দ্বারা ফরাসীস্ রাজ চক্রিতের মধ্যে বিপ্লব কর্ত্তাদিগের হস্তায়ত্ত হইল।

(২) ততো ভদ্রানি পশ্যতি।

তাহার পরে চারিদিকে মঙ্গলের সুখস্বপ্ন দেখা দিতে আরম্ভ করিল, আর, সেই সুখ-স্বপ্নের আবেশে ফ্রান্স, ইংলণ্ড আইঅরলণ্ড পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশ-বিদেশের রাস্তায় রাস্তায় কোলাকুলির ধুম পড়িয়া গেল।

* নিঃ + রাজ = নীরাজ = রাজ-বর্জ্জিত। নৈরাজ্য = অরাজকতা।

(৩) ততঃ সপত্নান্ জয়তি।

তাহার পরে ভীষণ রক্তারক্তির মধ্য দিয়া প্রথম নেপোলিয়ন মাথা তুলিয়া উঠিয়া ভোগের ধনকে অর্দ্ধেক ইউরোপ আপনার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে আনয়ন করিলেন।

(৪) সমূলস্তু বিনশ্যতি।

তাহার পরে ফরাসীসদিগের স্বারাজ্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। বিদেশীয় রাজারাজড়ারা একযোট হইয়া তাহাদের চিরাভিলষিত স্বারাজ্যের মস্তকে বজ্রাঘাত করিল।

ফরাসীস্ দেশীয় ধর্ম্মদ্বেষী আদিম বিপ্লব-কর্ত্তারা যেরূপ একটা বিশাল মহাযজ্ঞের ফাঁদ ফাঁদিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন; তাহা দক্ষযজ্ঞেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। সে মহাযজ্ঞে বড় বড় দেবতাদের সবাইকে বিহিত বিধানে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সাম্যদেব'কে (Equality-কে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, মৈত্রী দেবীকে (Fraternity-কে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, স্বাধীনতা দেবীকে (Liberty-কে) নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কেবল শিব'কে (মঙ্গল'কে) এবং সতীকে (সদ্ধর্ম্মকে) অপমানিত করিয়া ঠেলিয়া রাখা হইয়াছিল। কুহকিনী অবিদ্যা-দেবীর ভানুমতি (enlightenment) নামের ভেল্কি বাজিতে দেশবিদেশে সাম্য ভ্রাতৃভাব এবং স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে হইবে—এই ছিল যজ্ঞকর্ত্তাদিগের প্রাণগত সংকল্প। এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপারের প্রস্তাবনা শেষে গড়াইল আসিয়া কোথায়—শুনিবে? ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ শ্রীসমৃদ্ধির সমস্ত আশাভরসা প্রথম নেপোলিয়নের সঙ্গে সেন্টহেলেনায় গোর প্রাপ্ত হইল; তাহার পরে ছিটা ফোঁটা যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকি ছিল, তাহা দ্বিতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ইংলণ্ডে গোর প্রাপ্ত হইল। গড়াইল আসিয়া এইখানে!

পক্ষান্তরে মার্কিন্ দেশীয় স্বারাজ্যপন্থীরা ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিয়া একটি কথাও মুখে উচ্চারণ করে নাই—একটি কার্য্যেও হস্ত প্রসারণ করে নাই; অপর কোনো জাতির ন্যায্য অধিকারের অন্তঃপাতি সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিখণ্ডেও হস্ত-প্রসারণ করে নাই, আবার তাঁহাদের নেতা যিনি ওয়াশিঙটন তাঁহার তো কথাই নাই! তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার ছিলেন বলিলেই হয়, তাই তাঁহাদের স্বারাজ্যের জয়-পতাকায় "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল্ করিতেছে তারকা-বেশে।

॥ ১ ॥ তোমার একথা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম—যদি ইংরাজের নিকট বুয়ারের যুদ্ধে পরাজিত না হইত।

॥ ২ ॥ কে বলিল বুয়ারেরা পরাজিত হইয়াছে—পরাজিত হইতে তাহাদের শত্রুপক্ষেরাই পরাজিত হইয়াছে। ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক যিনিই যাহা বলুন্ না কেন, যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে বিগত বুয়ার যুদ্ধে ইংরাজদিগের লাঞ্ছনা গঞ্জনা, ধনহানি, মানহানি এবং প্রতাপহানির একশেষ হইয়াছে। কিন্তু বুয়ারদের কি হইয়াছে? কিছুই হয় নাই! বরং তাহারা পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা জাতীয় গৌরবসোপানের অনেক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে বই একধাপও নীচে নামে নাই;—আর যে-এখন কোনো বলবান্ জাতি তাহাদিগকে ঘাঁটাইতে সাহসী হইবে তাহার পথ জন্মের মতো অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বুয়ারদিগকে ধর্ম্মপুস্তক হাতে করিয়া রণে অবগাহন করিতে দেখিয়া ইংরাজ দোকানদার বণিকেরা মৃদুমন্দ হাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বঙ্গের ধামাধরেরা হাসির চোটে ভূত ভাগাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সহস্র হাসিলেও আমার এ বিশ্বাস একচুলও টলিবে না যে, বুয়ারেরা যে পরাজিত হইয়াও জয়ী হইয়াছে তাহার

কারণ ঐ। কি? না ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া।

বৃথা আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি। বুয়ারদের জাপানিদের এবং মার্কিনদের প্রদর্শিত মনুষ্যত্বের দৃষ্টান্ত কি আমাদের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট এং লক্ষ্মীভ্রষ্ট বিপথ্গামীদিগের মনের এক কোনেও স্থান পাইতে পারে? তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না! আমরা এতদিন ঠেকিয়া শিখিয়াও এখনো আমাদের ঠেকিয়া শিখিবার আশ মিটিতেছে না। নৈরাজ্যই আমাদের স্বারাজ্যের আদর্শ; পিপীলিকার পক্ষই আমাদের জয়পতাকা'র আদর্শ; আর আমাদের রাজনৈতিক গোরা-গুরুদিগের প্রসাদাৎ একটি জপমন্ত্র যাহা আমরা শিখিয়াছি তাহাই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র, তাহা এই :— "ঈশ্বর চাহিনা—ধর্ম্ম চাহিনা—কেবল চাই স্বারাজ্য—খাঁটি স্বারাজ্য—যাহার গায়ে ঈশ্বরের এবং ধর্ম্মের নাম গন্ধও নাই সেইরূপ নিষ্কণ্টক স্বারাজ্য।"

॥ ১ ॥ তুমি এই যে বেশ শক্ত শক্ত কথাগুলি বলিলে, তাহা হিতবাক্য হইতে পারে, কিন্তু মনোহারী একটুও না!

"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

আমি তাই বলি যে, তোমার ব্যবস্থানুযায়ী তিক্ত হিতবচনের সঙ্গে একটু আধটু মনোহারি বচনের অনুপান মিশাইয়া উহাকে সুখসেব্য করিয়া লইলে ভাল হয়। আমি একটা অনুপানের জোগাড় করিয়াছি—বোধ করি তাহা চলিতে পারে, তাহা এই :—

স্বারাজ্য-পথের আমরা নূতন ব্রতী। সে পথে যাত্রা করিবার সময় পদে পদে আমাদের যে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতন ঘটিবে, তাহা ঘটিবারই কথা। পাঠশালার ছাত্রেরা যেমন লিখিতে লিখিতেই ক্রমে ক্রমে হাত তাহাদের পাকিয়া ওঠে, তেমি আমাদের দেশের স্বারাজ্য-পন্থীরা কোমর বাঁধিয়া কাজ করিতে করিতেই ক্রমে ভুল ভ্রান্তি ব্যতিক্রম এবং পতনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আপনা হইতেই ঠিক্ পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। পথের মাঝপথে তাহাদিগকে বিভীষিকা দেখাইয়া নিরুদ্যম করিয়া দেওয়া উচিত হয় না।

॥ ২ ॥ কোনো পাঠশালার ছাত্র যদি আমাকে বলে যে, "লিখিতে লিখিতেই আমার হাত পাকিয়া উঠিবে; 'এটা ঠিক্ হয় নাই' 'ওটা ঠিক হয় নাই' বলিয়া লোককে বিরক্ত করিও না" তবে আমি তাহাকে বলিব এই যে, 'তোমার হাত পাকিবে তাহা তো জানি, কিন্তু চাও তুমি কি? ইজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, না সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও—সেই কথাটি আমাকে ভাঙিয়া বল।' যদি ইজিবিজি লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে যথেচ্ছা মতে লেখনী যেমন চালাইতেছ তেমি চালাইতে থাকো,' তাহা হইলেই ইজিবিজি লেখায় তোমার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি সুন্দর ছাঁদের লেখায় হাত পাকাইতে চাও, তবে আদর্শ লিপি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া, যত্নের সহিত তাহার প্রদর্শিত পথে লেখনী চালনা করিতে থাক,' তাহা হইলেই ক্রমে হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মতো সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া উঠিবে।' আমি তাই বলি যে, স্বারাজ্য-পন্থীরা যদি বিধিপূর্ব্বক অভীষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হ'ন, তাহা হইলেই ক্রমে ভালো'র দিকে, অর্থাৎ ইষ্টসিদ্ধির' দিকে, তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে দেখিতে দেখিতে—তার সাক্ষী জাপান; আর, তাহার পরিবর্ত্তে যদি অবিধিপূর্ব্বক ব্যতিক্রম কার্য্যে পতঙ্গলিকাপ্রবাহের ন্যায় চোখ কাণ বুজিয়া অগ্রসর হ'ন তাহা হইলে অনিষ্টসিদ্ধির দিকে তাঁহাদের হাত পাকিয়া উঠিবে তর্‌তর্ করিয়া; তার সাক্ষী—ফরাসীস্ রাষ্ট্রবিপ্লব। কাহাকেই বা আমি বলিতেছি বিধি আর, কাহাকেই বা আমি বলিতেছি অবিধি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে প্রণিধান কর :—

## অবিধি

(১) গাছে না উঠিতেই এক কাঁধি'র প্রত্যাশা।

(২) স্বারাজ্যের যোগ্যতা-লাভে জলাঞ্জলি দিয়া স্বারাজ্যের অধম নাট্যাভিনয়।

(৩) জন্মভূমি যেমন মাতা, ধর্ম্ম তেমি পিতা, এ কথাটি ভুলিয়া-বসিয়া থাকিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা'র দৌরাত্ম্যে পিতাকে দেশ ছাড়া করিয়া—মাতাকে "সুফলা, শ্যামলা" প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি বাক্যালঙ্কার পরিধান করাইয়া কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা প্রদান।

## বিধি

(১) ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম ধরিয়া থাকিয়া স্বারাজ্যের যোগ্যতা-উপার্জ্জন।

(২) রীতিমত জ্ঞান শিক্ষা এবং কাজ-শিক্ষা করিয়া বিহিত প্রণালীতে অভীষ্ট-সাধন করিতে পারিবার মতো উপযোগ্যতা উপার্জ্জন।

(৩) পুরাতন ভারতের ভগবদ্গীতা প্রভৃতি লোকপূজ্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের বাক্যামৃত পানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া নব্য ভারতের হিতার্থে কাজের মত করিয়া মানুষের মত মানুষ হওয়া।*

---

* সংক্ষেপে বলিলাম, "গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের বাক্যামৃতপানে আত্মাকে পবিত্র করিয়া"—কিন্তু এই ক্ষুদ্র কথাটির ভিতরে ভাব যে-একটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা প্রকাণ্ড বিশাল; এমনি বিশাল যে, তাহা রীতিমত বিবৃত করিয়া ব্যক্ত করিতে গেলে; একটা বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। এখানে তাহার যৎস্বল্প ইঙ্গিত আভাস জ্ঞাপন করা ভিন্ন তাহার অধিক আর কিছুই হইতে পারে না। সে ইঙ্গিত-আভাস এই :—

খৃষ্টানদিগের বাইবেল আছে; মুসলমানদিগের কোরাণ আছে; ভারতবাসীদিগের তেমন-তরো কোন একটা ধর্ম্মশাস্ত্র কি নাই? অবশ্যই আছে : ভগবদ্গীতা! গীতা যেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র, অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত গীতশাস্ত্রের প্রভেদও তেমি আশ্চর্য্য প্রভেদ। তার সাক্ষী :—বাইবেলের পুরাতন বিধান ইহুদীজাতির ঐকান্তিক পক্ষপাতী; বাইবেলের নববিধান খৃষ্টানসম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী; কোরাণ মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক পক্ষপাতী, এমন কি তাহা কাফেরদিগের প্রতি খড়্গহস্ত; কিন্তু গীতাশাস্ত্রে, পক্ষপাতের নাম গন্ধও নাই—উল্টা আরো জগৎসুদ্ধ সর্ব্বপক্ষের সমন্বয় তাহার পাতায় পাতায় গাঁথা রহিয়াছে। গীতাশাস্ত্র দেশ-কাল-জাতি-নির্বিশেষে পৃথিবীসুদ্ধ মনুষ্যমণ্ডলীর মহাশাস্ত্র। তা ছাড়া, তাহা জ্ঞানীর জ্ঞানশাস্ত্র, ভক্তের ভক্তিশাস্ত্র কর্ম্মীর কর্ম্মশাস্ত্র। এখানে আমি একটি ইংরাজি প্রবাদকেই সার করিতেছি— A word to the wise is sufficient। তা বই, সবিস্তারে গীতাশাস্ত্রের গুণ-কীর্ত্তন একপ্রকার সমুদ্রে অর্ঘ্য প্রদান। ঈশ্বরারাধনার অমৃতরস, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল জ্যোতি, যোগের তেজোময় অধ্যাত্ম-শক্তি, ধর্ম্মের ধৃতি, অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের পুরুষার্থসাধনোপযোগী যত কিছু পাথেয় সম্বল আছে, ভগবদ্গীতা পাঠে সমস্তই হাত মেলিয়া পাওয়া যায়। ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র জাতিবিশেষের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, তাহা মনুষ্যের ধর্ম্মশাস্ত্র—আত্মার ধর্ম্মশাস্ত্র। তাই তাহার বাক্যামৃতপানে আত্মা পবিত্র হয়—ভগবদ্ভক্ত হয়—বিশ্বপ্রেমী হয়—কর্ত্তব্য কর্ম্মোৎসাহী হয়—সদানন্দচিত্ত হয়—অকুতোভয় হয় তেজোময় জ্যোতির্ম্ময় এবং মধুময় হয়। ভগবদ্গীতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মনুষ্য হিন্দু হয় না, মুসলমান হয় না, খ্রীষ্টান হয় না, ইহুদী হয় না, প্রটেষ্টাণ্ট হয় না, কাথলিক হয় না; হয় তবে কি? না মনুষ্য। অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনুষ্য—মানুষের মতো মানুষ।

# আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা*

আমাদের দেশে যখন জাতি-ভেদের গোড়াপত্তন হয় নাই সেই মান্ধাতারও পূর্ব্বের আমলে একটি নবাভ্যাগত পরাক্রমশালী জাতি উত্তর অঞ্চল হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম কোণে আড্ডা গাড়িয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন এবং ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীদিগকে দস্যু বলিতেন। তাহার পরে যখন জাতিভেদের সবে-মাত্র গোড়াপত্তন আরম্ভ হইয়াছে সেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক মান্ধাতার আমলে আর্য্য বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ সম্মিলিত একটা জেতৃজাতি বুঝাইত এবং শূদ্র বলিতে অধীনস্থ বিজিত দস্যুগণ বুঝাইত। এই প্রাচীনকালের ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতিকে যদি একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা যায় তবে এইরূপ দাঁড়ায় যে তাহার মুড়াখানি ব্রাহ্মণ, পেটিখানি ক্ষত্রিয় এবং ল্যাজাখানি বৈশ্য ; কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগে সে মৎস্যটির ল্যাজা এবং পেটি, অর্থাৎ বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়, কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া অবশিষ্ট থাকিবার মধ্যে কেবল মুড়াখানি মাত্র অর্থাৎ একা কেবল ব্রাহ্মণ মাত্র অবশিষ্ট আছে—তাহাও না থাকারই মধ্যে ; কেন না, কাল-রাক্ষস কাহাকেও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে— বিশেষতঃ অমন একটা শাঁসালো সামগ্রীকে! বলিব কি—নিদারুণ রাক্ষসটা সেই শত-যোজন-ব্যাপী তিমি মৎস্যের দশযোজন-ব্যাপী মুড়াখানির ভিতর হইতে সমস্ত রস-কস শুষিয়া গলাধঃকরণ করিয়াছে—তাহার বিন্দু-বিসর্গও অবশিষ্ট রাখে নাই! ফলেও তাই দেখা যায় যে, এক্ষণকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মস্তকের উপরি-অঞ্চলে শিখা দেদীপ্যমান কিন্তু তাহার ভিতর-অঞ্চলে শাস্ত্র-চিন্তার পরিবর্ত্তে অন্নচিন্তা বলবতী! এক্ষণকার ব্রাহ্মণও যেমন তাহার উপনয়নের শ্রীও তেমনি! পৈতার সময়ে নূতন ব্রহ্মচারী কোথায় বারো বৎসর গুরু-গৃহে বাস করিয়া বেদ অভ্যাস করিবেন—তাহা না করিয়া তিন দিবস কারাগৃহে বাস করিয়া নিছক আলস্যে দিনপাত করেন! পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা সত্যসত্যই উপবীত গ্রহণান্তে গুরুগৃহ থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা প্রত্যহই নগরে পল্লীতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন এবং সেই সূত্রে প্রত্যহই তাঁহারা গণ্ডা-গণ্ডা শূদ্রের মুখ দর্শন করিতেন—তাহাতে তাঁহাদের সাদা পৈতা কালো হইয়া যাইত না! কিন্তু এক্ষণকার নূতন ব্রহ্মচারী শূদ্রের ভয়েই অস্থির—পাছে শূদ্রের অপবিত্র মুখ কোনো-গতিকে তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হয় এই ভয়ে তিনি তিন দিবস ঘরে কপাট বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকেন! ইহার অর্থ আর কিছু না—"আমি যখন শূদ্রের মুখ দেখিতেছি না তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, আমি তপোবনে বাস করিতেছি!" মনকে প্রবোধ দিবার কী চমৎকার যুক্তি-কৌশল! এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী হইয়াই—বালকেরা জলশূন্য ক্ষুদ্র কলসীতে করিয়া পুতুলের মাথায় জল ঢালিবার সময় মুখে ঘট্ ঘট্ শব্দ করে, কেননা তাহা না করিলে "জল ঢালা হইতেছে" এ বৃত্তান্তটি একেবারেই অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। এইরূপ যুক্তি-কৌশলের বশবর্ত্তী

---

হইয়াই—দুই এক জন বাঙ্গালী সাহেব কথায় কথায় ইংলণ্ডকে হোম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেননা তাহা না করিলে তিনি যে বাঙ্গালী নহেন কিন্তু প্রকৃত-পক্ষেই সাহেব—এ বৃত্তান্তটি প্রমাণাভাবে মারা পড়িয়া যাইবে! এ সিদ্ধান্তটিও তেমনি যে, শূদ্রের মুখ নূতন ব্রহ্মচারীর নয়নগোচর হইলে তিনি যে তপোবনে গুরুর সম্মুখে বসিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন—এ বৃত্তান্তটি একেবারেই নস্যাৎ হইয়া যাইবে। এসব ছেলেমি কাণ্ড পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না—এগুলি হচ্চে অধুনাতন টোলের অধ্যাপকদিগের নস্যাক্ত মস্তিষ্কের নূতন সৃষ্টি। একজন নৈয়ায়িক স্মার্ত্তবাগীশ বলিতে পারেন যে, কলিযুগের বিধানে তিন দিবস কারাগৃহে বদ্ধ থাকা'র নামই বারো বৎসর গুরুগৃহে বেদাভ্যাস করা। তাহা যদি তিনি বলেন, তবে তাঁহার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, অতগুলা কথা না বলিয়া দুই কথায় তিনি এইরূপ বলিলেই তো বলিতে পারিতেন যে কলিযুগের বিধানে সূত্র-গুচ্ছ-ধারী শূদ্রের নামই ব্রাহ্মণ।

মুড়া যিনি ব্রাহ্মণ—তাঁহারই যখন এই দশা, তখন, পেটি যিনি ক্ষত্রিয় তাঁহার তো কথাই নাই। মুড়াটির মজ্জা না থাকুক্...কঙ্কালখানা আছে ; পেটির আবার তাহাও নাই। কাল-রাক্ষস এমনি তাহাকে নিকিয়া পুঁছিয়া পরিষ্কাররূপে উদরস্থ করিয়াছে যে, কুত্রাপি তাহার চিহ্ন মাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান অব্দে ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল পরশুরামেরকোপানলকেই আমাদের মনে পড়াইয়া দেয়। আমরা আমাদের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে রাম সিংহ লছমন সিংহ প্রভৃতি পশ্চিম ভারতের সিংহরা নামেই সিংহ ; তা ভিন্ন ভারতের এ মুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত দাপাইয়া বেড়াইলেও কেহ বলিতে পারিবেন না যে, তাহার ত্রিসীমার মধ্যে তিনি কোথাও একটা সিংহ দেখিয়াছেন অথবা কোথাও ক্ষত্রিয় দেখিয়াছেন। ত্রেতাযুগের পরশুরাম যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাকী রাখিয়াছিলেন—দ্বাপর-যুগের কুরুক্ষেত্র তাহা নিঃশেষিত করিয়া ছাড়িয়াছে। বৈশ্য আবার ততোধিক রহস্য! বর্ত্তমান অব্দে কে যে বৈশ্য আর কে যে বৈশ্য নয় তাহা "দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!" খুব সম্ভব যে, পুরা-প্রচলিত অসবর্ণ-বিবাহের দ্বিমুণ্ড রাক্ষস ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই মুখের শোষণ-বলে, সমস্ত বৈশ্য-শোণিত উদরস্থ করিয়া অবশেষে অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনই যখন সশরীরে বর্ত্তমান ছিল, তখন সেই তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দেরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এক্ষণকার এই কলিযুগের কঠোর অব্দে আর্য্যের মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য বাদে একা কেবল ব্রাহ্মণই অবশিষ্ট। বর্ত্তমান কালে তিন বর্ণ যখন এইরূপ এক বর্ণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তখন আর্য্যশব্দের সাহায্যে তিন বর্ণকে এক সঙ্গে জোড়া দিবার জন্য কাহার কি এত মাথাব্যথা পড়িয়াছে বলিতে পারি না। তিন-বর্ণই যখন নাই—তিন বর্ণের মধ্যে যখন এক বর্ণই কেবল আছে—তখন তিন বর্ণকে এক শব্দে জ্ঞাপন করিবার জন্য আর্য্য-শব্দের সাহায্য যাজ্ঞা করা নিতান্তই "শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া"—মাথা নাই তার মাথা ব্যথা। তবে কি একা কেবল ব্রাহ্মণকেই আর্য্যের কোটায় কারারুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে? তাহা করিলে নিরীহ ব্রাহ্মণ বেচারী অ্যাকে মরিয়া রহিয়াছে, — সেই মড়া'র উপরে খাঁড়ার ঘা দেওয়া হইবে। রাজপুরুষেরা আমাদের দেশের কোনো মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে Gentleman-এর Certificate প্রদান করিলে তাহাতে যত তাঁহার মান-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হয় তাহা বুঝাই যাইতেছে! সেরূপ করিলে শুধু যে কেবল তেলা

মাথায় তেল দেওয়া হয় তাহা নহে, তাহাতে প্রকারান্তরে লোককে জানানো হয় যে, পূর্ব্বে ইঁহার মাথায় তেল ছিল না—দয়ার্দ্রচিত্তে আমরা ইঁহার মস্তকে বিলাতি পোমেটম লেপন করাতে ইঁহার পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে ; অর্থাৎ পূর্ব্বে ইনি ভদ্রলোক ছিলেন না—আমরা ইঁহার হস্তে জেণ্টেলম্যানের সার্টিফিকেট প্রদান করাতে তাহারই অমোঘমন্ত্র বলে আজ অবধি ইনি ভদ্র লোকের শ্রেণীভুক্ত হইলেন। আমাদের দেশের কোনো চির-প্রসিদ্ধ বংশের ভদ্রলোককে Gentleman এর Certificate প্রদান করা এবং ব্রাহ্মণ জাতিকে আর্য্য উপাধি প্রদান করা দুইই অবিকল সমান। ফলে, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া আর্য্য বলিলে ব্রহ্মণ্যদেব তাহাতে তুষ্ট না হইয়া বরং রুষ্টই হ'ন ; তাঁহার রোষের কারণ এই যে আর্য্য তো সকলেই—ক্ষত্রিয়ও আর্য্য—বৈশ্যও আর্য্য—এবং কলিযুগের নূতন শাস্ত্র অনুসারে যাঁহার লোহার সিন্দুকে টাকা আছে কিম্বা নামের অন্ত-ভাগে দুই চারিটি ইংরাজী অক্ষর আছে তিনিই আর্য্য! ব্রাহ্মণ তো আর সেরূপ আর্য্য নহে! শাস্ত্রের বিধান মতে ক্ষত্রিয়-বীর্য্যও ব্রহ্মতেজের নিকটে নত-মস্তক! তা'র সাক্ষী—বাল্মীকির রামায়ণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে "ধিক্‌বলং ক্ষত্রিং বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং" ক্ষত্রিয় বল ছার বল—তাহাকে ধিক্! ব্রহ্মতেজই—বল।" ভাগীরথী শুধুতো আর নদী ভাগীরথী নহে, শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেবী ভাগীরথী , তেমনি, ব্রাহ্মণ শুধু তো আর আর্য্য-শর্ম্মা নহে—শাস্ত্রের বিধান মতে তিনি দেব শর্ম্মা। গঙ্গাস্নানকে গঙ্গাস্নান না বলিয়া কেহ যদি বলেন নদী-স্নান, তবে তাহা শ্রবণ মাত্রে—এমন যে শীতলসলিলা দেবী, ভাগীরথী,রোষের বাড়বানলে তিনিও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ওঠেন না। তেমনি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজকে ব্রহ্মতেজ না বলিয়া কেহ যদি বলেন "আর্য্যতেজ"—ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রকে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র না বলিয়া কেহ যদি বলেন "আর্য্য-শাস্ত্র"—ব্রাহ্মণ জাতিকে ব্রাহ্মণ-জাতি না বলিয়া বলেন "আর্য্যজাতি", তবে তাহাতে ব্রহ্মণ্যদেবের কর্ণে শেল বিদ্ধ হইবারই কথা।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, এক্ষণকার কালে তিন বর্ণকে এক শব্দে বাচন করিবার জন্য আর্য্য শব্দের সাহায্য বাঞ্ছা করা শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া এবং এক্ষণে দেখা গেল যে, ব্রাহ্মণকে আর্য্য উপাধি প্রদান করিলে ব্রহ্মণ্যদেবকে প্রকারান্তরে অপমান করা হয় , — তবেই হইতেছে যে, বর্ত্তমান কলিযুগে ভারতবর্ষের কোনো জাতি-বিশেষকে অথবা কোনো জাতি-সমষ্টিকে লক্ষ্য করিয়া জাতিবাচক অর্থে আর্য্য-শব্দ ব্যবহার করা নিতান্তই বিড়ম্বনা। অতএব অধুনাতন কালে আর্য্য শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে কিরূপ স্থলে তাহাকে কিরূপ অর্থে প্রয়োগ করা যুক্তি-সঙ্গত তাহা একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আর্য্য শব্দের অর্থ কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া কোথাকার জল কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক , এই বিবেচনায় এইখানে তাহার একটা চুম্বক আলেখ্য প্রদর্শন করা যাইতেছে।

আমাদের দেশে আর্য্য-শব্দের প্রয়োগ প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের চতুঃসীমার মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল; তাহার পরে তাহা ভারতবর্ষের দক্ষিণাভিমুখে এবং পূর্ব্বাভিমুখে ক্রমশই দূরে দূরে পরিব্যাপ্ত হইয়া কলিকাতার বাজার সুলভ দুগ্ধের ন্যায় সর্ব্ব-ঘটেই অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। মহাজনপল্লীর অভিধানে যেমন পোনেরো আনা জল-মিশ্রিত এক আনা দুগ্ধ-ও দুগ্ধ শব্দের বাচ্য—কলিযুগের অভিধানে তেমনি অন্ততঃ যে-সে বংশীয় বড়মানুষ আর্য্য নামে

অস্তিত্বের। এই খেদে আর্য্য-শব্দ আমাদের দেশে এতকাল পর্য্যন্ত অমরকোষের কোটরাভ্যন্তরে মুখ মুড়িসুড়ি দিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কালাতিপাত করিতেছিল—লোকালয়ে তাহাকে বড় একটা বাহির হইতে দেখা যাইত না ; — বিশেষতঃ মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাবকালে আর্য্য নারীদিগের দেখাদেখি আর্য্য-শব্দের বহিস্ফূর্ত্তি একেবারেই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ অকস্মাৎ একি মহামারী ব্যাপার! বিদ্বজ্জন-পুরের পথে ঘাটে মাঠে হাটে আর্য্য শব্দের একি প্রবল বন্যা! আমাদের দেশে আর্য্য শব্দের রাতারাতি এই যে নূতন অভ্যুদয়, ইহার মূল প্রবর্ত্তক মনুও না, যাজ্ঞবল্ক্যও না, পরাশরও না, বেদব্যাসও না—তবে কে? আর কে— উক্ষতরণ (অর্থাৎ Oxford) চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীমন্ ম্যাক্সমূলার ভট্টাচার্য্য-চূড়ামণি।

ইতিপূর্ব্বে আর্য্য-জাতিকে একটা মৎস্যরূপে কল্পনা করা গিয়াছে, এক্ষণে আর্য্য-শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতিকে সেইরূপ কল্পনা করা হো'ক। পুরাণের একস্থানে এইরূপ একটা উপন্যাস আছে যে, একটা মৎস্য প্রথমে এক হাঁড়ি জলে প্রতিপালিত হইয়াছিল ; কালক্রমে যখন সে বড় হইযা হাঁড়ির সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে একটা ডোবার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল ; যখন সে আরো বড় হইয়া ডোবার সীমা ছাড়াইয়া উঠিল তখন তাহাকে পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল ; এইরূপ করিয়া মৎস্যটা ক্রমশই যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া অবশেষে যখন সমুদ্র হইতে মহা-সমুদ্রে প্রবেশ করিল তখন ক্রমে সেখানেও তাহার স্থান সংকুলন হওয়া ভার হইয়া উঠিল। কিন্তু আমাদের দেশে আর্য্য শব্দের প্রয়োগ-পদ্ধতি এ যাবৎ কাল পর্য্যন্ত ঠিক্ তাহার বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল ; ক্রমশই তাহা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর জলাশয়ে সংক্রামিত হইয়া—এককালে যাহা শত-যোজনব্যাপী তিমি মৎস্য ছিল কালক্রমে তাহা কীট হইতে কীটাণুতে পরিণত হইতে লাগিল। ইউরোপ এসিয়া এবং আফ্রিকার ত্রিবেণীসঙ্গম হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পুষ্করিণীতে এবং তথা হইতে অমরকোষের ডোবার ভিতরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরীহ মৎস্যটি মর্ত্ত্যলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছিল—তাহার যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন মহাত্মা ম্যাক্সমূলার ভট্ট দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে সেই সংকীর্ণ কারাগার হইতে আলোকে বাহির করিয়া আনিয়া—আবার তাহাকে তাহার পুরাতন বাসস্থানে—সূর্য্যের উদয়াস্তস্পর্শী মহা-সমুদ্রে—প্রত্যানয়ন করিলেন।

অতএব ম্যাকস্‌মূলারের আর্য্য স্বতন্ত্র এবং অমরকোষের আর্য্য স্বতন্ত্র।

এতদিন ধরিয়া আর্য্য-শব্দ আমাদের দেশে কচিৎ কোনো সংস্কৃত পুঁথির অসূর্য্যম্পশ্য নিভৃত নিকেতনে কীটে কীটে জর্জ্জরিত হইতেছিল—কেহই তাহাকে পুছিত না ; এতদিনের সাড়াশব্দ-রহিত চুপচাপের পরে—শ্রীমন্ ম্যাক্সমূলার ভট্ট বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর কর্ণকুহরে আর্য্য-মন্ত্রের ফুৎকার প্রদান করিয়া তাঁহাদের প্রসুপ্ত আর্য্যতেজ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন—এখন আর রক্ষা নাই! যখন ম্যাক্সমূলারের নামও কেহ জানিত না—ম্যাক্সমূলার যখন পাঠশালায় হামাগুড়ি দিতেছেন—সেই মান্ধাতার আমল হইতে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় শ্রুতি স্মৃতি-নিহিত সার সার বচনগুলি ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে—সে দিকে কেহই বড় একটা কান পাতিতেন না ; রামমোহন রায়ের আমল হইতে মহানগরীর বক্ষপ্রদেশে বেদ-উপনিষদের প্রশান্ত গম্ভীর অথচ অমিয়ময় বাক্য-সকল বিশুদ্ধ সংস্কৃত-স্বরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে— তাহা কাহারো

গ্রাহ্যে আসিল না ; বিলাত হইতে আর্যামন্ত্রের আমদানি হইল—আর আমাদের দেশশুদ্ধ সমস্ত কৃতবিদ্য যুবক আর্য্য আর্য্য করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন ; তাঁহাদের সহস্র কণ্ঠের উদ্গীরিত আর্য্য নামের চীৎকার ধ্বনিতে ইয়ঙ্বেঙ্গলের গাত্রে থরহরিকম্প উপস্থিত হইল ; ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যদেব দানোয়-পাওয়া শব-দেহের ন্যায় মৃত্যুশয্যা হইতে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া পৈতা মাজিতে বসিয়া গেলেন এবং কিরে-কির্ত্তি কোমর বাঁধিয়া সন্ধ্যা-গায়ত্রী মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিলেন ; ইতিপূর্ব্বে কোনো পুরুষেই যাঁহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনার চৌকাট মাড়াইতে সাহসী হ'ন নাই সেই সকল ব্রাহ্মণেতর বংশের তত্ত্ববাগীশেরা অকস্মাৎ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে আরম্ভ করিলেন ; — শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে ঠেলিয়া আপনারা জ্ঞান-সমুদ্রের উঁচা পাড়ে আরোহণ পূর্ব্বক যোগ-যাগ তন্ত্র-মন্ত্র বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতি যেখানকার যতকিছু নিগূঢ় রহস্য সমস্তই বিস্মৃতির রসাতল-গর্ত্ত হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য সুধীবর বেশে (সু ধীবর-বেশে) কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন ; কাহারো জালে একটা তাঁবার চাক্তি উঠিল, তিনি ভাবিলেন "এমন উজ্জ্বল সুবর্ণ তো একালে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" কাহারো জালে একটা সাত-রাজার-ধন মাণিক উঠিল অমনি "এ আবার কি—দূর" বলিয়া তিনি তদ্দণ্ডেই তাহা রসাতলে ফেরত পাঠাইলেন। ম্যাক্সমূলার ভট্টের অভ্যুদয়ের-পূর্ব্বে আর্য্য বলিয়া যে একটা শব্দ অভিধানে আছে তাহা তাঁহারা জানিতেন কি না সন্দেহ! তাহার পরে ম্যাক্সমূলার যখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীময় আর্য্য-মন্ত্রের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাহার দুই একরত্তি ছিটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাদের মানস-ক্ষেত্রে আর্য্যামির অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই বৃত্তান্তটি স্মরণে জাগ্রত রাখিবার মানসে ম্যাক্সমূলার ভট্টকে আমরা গোস্বামী বলিয়া সম্বোধন করিব এবং বঙ্গীয় নব্য আর্য্যদিগকে গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিব। গোস্বামী শব্দের মুখ্য অর্থ ধরিতে গেলে গোস্বামী বলিতে যদিচ গো-রক্ষক বুঝায়, কিন্তু সে অর্থে গোস্বামী উপাধি ম্যাক্সমূলার ভট্টকে কিছুতেই শোভা পায় না ; কেননা তিনি খড়দ'র গোস্বামীও নহেন—শান্তিপুরের গোস্বামীও নহেন—তিনি উক্ষতরণের অর্থাৎ Oxford এর গোস্বামী , অনেক উক্ষ Ox এবং গো যেখানে নিত্য নিত্য গোলোকে তরিয়া যায় সেই উক্ষতরণের তিনি গোস্বামী! তাঁহাকে যদি গোরক্ষক অর্থে গোস্বামী বলা যায় তবে প্রকারান্তরে বলা হয় "যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক!" অতএব তাহাতে কাজ নাই! আমরা তাঁহাকে চলিত অর্থেই গোস্বামী বলিব। গোস্বামী কিনা মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু—এই অর্থেই আমরা তাঁহাকে গোস্বামী বলিব। অনতিপরেই প্রকাশ পাইবে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক-আর্য্য এবং তাঁহার শিষ্যদিগের সদ্যআর্য্য দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ফল কথা এই যে, আর্য্য চারি প্রকার— (১) বৈদিক আর্য্য, (২) পৌরাণিক আর্য্য, (৩) বৈজ্ঞানিক আর্য্য, (৪) সদ্য আর্য্য।

প্রথম, বৈদিক আর্য্য ; —ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আর্য্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল উপাদান তাহাই বৈদিক আর্য্য।

দ্বিতীয়, পৌরাণিক আর্য্য, — পৌরাণিক আর্য্যের চতুর্দ্দিকে কোনো প্রকার জাতীয় গণ্ডির ঘের দেওয়া নাই— সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই তাহার উদার ক্রোড়ে স্থান পাইতে পারেন; তাহার সাক্ষী—পুরাণে লিখিত আছে "কর্ত্তব্যমাচরণ্ কার্য্যমকর্ত্তব্যমনাচরণ্। তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে

স বা আর্য ইতি স্মৃতঃ।" অর্থাৎ "কর্ত্তব্য আচরণ করিয়া এবং অকর্ত্তব্য অনাচরণ করিয়া যিনি প্রকৃত আচারে দৃঢ়নিষ্ঠ হ'ন তিনিই আর্য্য শব্দের বাচ্য।"

তৃতীয় বৈজ্ঞানিক আর্য্য ; —এই আর্য্যই গোস্বামীর আর্য্য ; এ আর্য্যের বিশাল পরিধির অভ্যন্তরে বাঘে-গরুতে একত্রে জল-পান করে ; ইংরাজ বাঙ্গালী, ফরাসীস্ জর্ম্মান্, রুষীয় পোল্, সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরের সহিত মেলামেশা করে ; এ আর্য্যের সুবিস্তীর্ণ ললাটে এই মন্ত্র-বচনটি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে যে, "উদারচেতসাং পুংসাং বসুধৈব কুটুম্বকং" উদারচেতা পুরুষ-দিগের সমস্ত পৃথিবীই জ্ঞাতি-কুটুম্ব।

চতুর্থ, সঙ্ আর্য্য ; —এইটিই গোস্বামীর শিষ্যদিগের আর্য্য ; এ আর্য্য বৈদিক আর্য্য নহে ইহা বলা বাহুল্য ; কেননা, সত্য-যুগের বৈদিক আর্য্য যাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের মূল উপাদান এবং ত্রেতা-যুগের আর্য্য যাহা ঐ তিন বর্ণের সমষ্টি এ দুই আর্য্য কলিযুগের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে পারে না—কেমন করিয়াই বা স্থান পাইবে? এ ছার কলিযুগে ক্ষত্রিয়ও নাই, বৈশ্যও নাই ; কাজেই এক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সমষ্টি বলিতে কেবল আকাশ-কুসুমই বুঝায়—তা ছাড়া আর কিছুই বুঝায় না। এ আর্য্য পৌরাণিক আর্য্য নহে ; কেননা পৌরাণিক আর্য্য জাতি-বিচার না করিয়া সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি-মাত্রকেই ক্রোড়ে লইতে প্রস্তুত—গুহ চণ্ডালকেও তিনি ত্যজ্য পুত্র করেন নাই। পৌরাণিক আর্য্য সদাচারের পক্ষপাতী—সঙ্ আর্য্য সদসৎ সকল-প্রকার লোকাচারের পক্ষপাতী ; এ আর্য্য সামান্য একটি লোকাচারের পান হইতে চুন খসিলেই—কি যেন একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছে মনে করে ; গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হইয়া বিলাত-ফেরতাদিগের প্রতি গোবরের ব্যবস্থা করে ; ঢাল নাই খাঁড়া নাই নিধিরাম সর্দ্দার হইয়া উনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে ; নিরীহ সেকেলে পৌরাণিক আর্য্যের সাধ্য কি যে, এ আর্য্যের নিকটে এগোয়! এ আর্য্য বৈজ্ঞানিক আর্য্যও নহে ; কেননা গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য, ইংরাজ বাঙ্গালি ফরাসিস্ জর্ম্মান প্রভৃতি সকল আর্য্যজাতিকেই ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করে ; কিন্তু এ আর্য্য আপনার দলের মূষিকসম্প্রদায়-ভুক্ত আর্য্য ছাড়া আর আর সমস্ত আর্য্যকেই—সিংহ-সম্প্রদায়-ভুক্ত আর্য্যকেও—ম্লেচ্ছ বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর শিষ্যদিগের আর্য্য—বৈদিক আর্য্য নহে, পৌরাণিক আর্য্যও নহে, বৈজ্ঞানিক আর্য্যও নহে—তাঁহারা যে কোন আর্য্য সেইটিই বিষম সমস্যা! স্পষ্ট কথা বলিতে কি—এ আর্য্য আর্য্যই নহে কেবল আর্য্যের একটা ভান—আর্য্যের একটা প্রহসন! একটি জ্যেঠতাত বালক যে রকমের জ্যেঠতাত-এ আর্য্যটি ঠিক্ সেই রকমের আর্য্য। জ্যেঠতাত বালকের জ্যেঠামি যেমন একটা রোগ, এ আর্য্যের আর্য্যামি তেমনি একটা রোগ। অতঃপর গুরুর বৈজ্ঞানিক আর্য্য এবং শিষ্যের সঙ্ আর্য্য উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া কাহার কিরূপ ভাবগতি তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক।

মহর্ষি ব্যাসের প্রণীত স্মৃতির অভ্যন্তরে সুন্দর একটি বচন আছে— সেটি এই ; —"নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ" "ব্রাহ্মণের এমন বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা" এই ঋষিবাক্যটি'র নিক্তির ওজনে গুরু এবং শিষ্য দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন আর্য্যকে তৌল করিয়া দেখিলেই কাহার কিরূপ মূল্য তাহা তদ্দণ্ডেই ধরা পড়িবে।

ব্যাস ঋষি বলেন যে, একতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচায়ক লক্ষণ ; — গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্যের একতা এমনি জগদ্ব্যাপী যে, তাহা ইংরাজ বাঙ্গালী ফরাসীস প্রভৃতি নানা দেশের নানা আর্য্য-জাতিকে সাজাত্য-পাশে বন্ধন করিয়া ফেলিয়াছে। পক্ষান্তরে তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের আর্য্য একতা'র এমনি বিরোধী যে, যদিও তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্য এক্ষণে ক্ষত্রিয়-শূন্য এবং বৈশ্য-শূন্য সুতরাং হাত পা খোঁড়া, আর ব্রাহ্মণ জাতি সে আর্য্যের মস্তক হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান-বিহনে তাহা মস্তিষ্ক-বিহীন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাঁহারা গায়ের জোরে বলিতে ছাড়েন না যে, সেই হাত-পা-খোঁড়া মস্তিষ্ক-বিহীন ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সন্তানেরাই প্রকৃত পক্ষে আর্য্য, আর ইউরোপের হস্ত-পদ-বিশিষ্ট জ্ঞানবান এবং তেজীয়ান আর্য্যেরা আর্য্যই নহে—তাহারা সকলেই স্লেচ্ছ! নরাধম! বর্ব্বর!

ব্যাস-ঋষি বলেন "সমতা ব্রাহ্মণের একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ" ; — বৈজ্ঞানিক আর্য্যের এমনি উদার সমতা-গুণ যে তাহা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যস্থিত জাতিগত উচ্চ-নীচ ভাব একেবারেই লোপাইয়া সমভূমি করিয়া দিয়াছে , পক্ষান্তরে, গোস্বামীর শিষ্যদিগের সখ্ আর্য্য আত্ম-গরিমায় ভোঁ হইয়া আপনার বেলায় তিলকে তাল দেখেন এবং অন্যের বেলায় তালকে তিল দেখেন। এটা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্য-জাতির ভাল মন্দ স্বভাব চরিত্র হরেদরে সমান—তাই কতকগুলা ছেলে-ভুলানিয়া অমূলক যুক্ত দ্বারা সকল লোককেই তাঁহারা এই নিগূঢ় তত্ত্বটি বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এবং ইউরোপীয় আর্য্যের শকুন-মাতুলের প্রপিতামহ! অর্থাৎ যেন পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে শকুনি ছিলেন—দ্যূতক্রীড়া ছিল না—রমণীহরণ ছিল না—দ্বেষ হিংসা মদ মাৎসর্য্য এসব কোনো বালাইই ছিল না—প্রভ্যুত সকলেই ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বনে বনে তপস্যা করিয়া বেড়াইতেন! তাহার পরে কালিদাসের সময়ে যেন ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা মদ্যপান বেশ্যাসক্তি অভিসার এ সকল কিছুই জানিতেন না—সকলেই জিতেন্দ্রিয় যোগীপুরুষ ছিলেন। তাহার আরো কিছুদিন পরে যেন চাণক্য ছিলেন না— নরহত্যা ছিল না! রঘুনন্দনের ন্যায় দিগ্বিজয়ী স্মার্ত্তবাগীশেরা মূল-গ্রন্থ-সকলের শব্দ এবং অর্থ অবলীলাক্রমে উল্টাইয়া দিয়া (এমন কি ব-য়ের পেটকাটিয়া তাহাকে র করিয়া গড়িয়া তুলিয়া) যেন হয়কে নয় করিতে জানিতেন না—প্রবঞ্চনা প্রতারণা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না! ভারতবর্ষের আর্য্যেরা সকলেই যুধিষ্ঠির, সকলেই রামচন্দ্র! আর, ইউরোপীয় আর্য্যেরা সকলেই চাণক্য, সকলেই শকুনি। কি চমৎকার সমতা!

ব্যাস-ঋষি বলেন যে, সত্যতা ব্রাহ্মণের তৃতীয় আর-একটি পরিচয় লক্ষণ ; — গোস্বামীর আর্য্যের সত্যতা সূর্য্যালোকের ন্যায় দেদীপ্যমান! সে সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাবতীয় আর্য্য ভাষার অস্থিতে অস্থিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রোমে রোমে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে গোস্বামীর শিষ্যদিগের যত কিছু সত্যতা সকলই মুখের ফুঁ, হাতের ফক্কা! তাঁহারা বলিবার সময় বলেন "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি, মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি" — গঙ্গা হইতে শত যোজন দূরে থাকিয়াও যিনি গঙ্গা গঙ্গা বলেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন" অথচ প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সময়—যিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করেন তাঁহারও যে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেন আর যিনি কোনো জন্মেই গঙ্গার ত্রিসীমা মাড়া'ন না তাঁহারও সেই পাপের সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধান

করেন, "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ" এ বচনটির প্রতি এতই যদি তাঁহাদের অটল শ্রদ্ধাভক্তি তবে বিলাত ফের্তা বঙ্গীয় যুবকদিগের প্রতি গোবর খাইবার বিধান না দিয়া গঙ্গাস্নানের বিধান দিলেই তো হইতে পারে—তাহা তাঁহারা না দে'ন কেন? তবেই হইতেছে যে, তাঁহাদের শাস্ত্রের বিধানে নিষ্পাপ ব্যক্তিরই পাপ ধৌত হইয়া যায়, পাপী ব্যক্তির কোনো পাপই স্বস্থান হইতে তিল মাত্রও বিচলিত হয় না। তাঁহাদের ঔষধ সেবনে নীরোগ ব্যক্তিই আরোগ্য লাভ করে— রোগী ব্যক্তি যেমন আছে তেমনি থাকে। কি চমৎকার সভ্যতা!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোস্বামীর বৈজ্ঞানিক আর্য্য যেমন একতা সমতা এবং সভ্যতার একটি জ্বলন্ত আদর্শ, তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের সঙ্‌আর্য্য তেমনি অনৈক্য বৈষম্য এবং অসভ্যতার অগাধ পঙ্করাশি। গোস্বামী তাঁহার আপনার মতো কার্য্য করিতেছেন—মহতের মতো কার্য্য করিতেছেন—পৃথিবীস্থ বিভিন্ন আর্য্যজাতির অন্তর্নিহিত ভ্রাতৃবিচ্ছেদের মূলে কুঠার আঘাত করিয়া সকলের মধ্যস্থলে একতা সমতা এবং সভ্যতার জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন ; তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যেরাও তাঁহাদের আপনাদের মতো কার্য্য করিতেছেন—কাণ্ডজ্ঞান রহিত ইতরের মতো কার্য্য করিতেছেন—অনৈক্য বৈষম্য এবং কপট ব্যবহারের জিলিপির পাক ক্রমাগতই অধিকাধিক পেঁচাও করিয়া পাকাইয়া তুলিতেছেন—ভ্রাতৃবিচ্ছেদের জ্বলন্ত হুতাশনে ক্রমাগতই অধিকাধিক আহুতি প্রদান করিতেছেন ; — এখন কে আর্য্য কে অনার্য্য, শ্রোতৃ-মহোদয়েরা তাহা মনে মনে নিস্তব্ধে ঠাহরিয়া দেখুন্। এই পুরাতন ঋষি-বাক্যটি যদি সত্য হয় যে, "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতাচ" ব্রহ্মাণের এমত বিত্ত আর নাই যেমন একতা সমতা এবং সত্যতা, তবে অগত্যা এইরূপ স্বীকার করিতে হয় যে, গোস্বামীর আর্য্যই প্রকৃষ্টরূপে ব্রাহ্মণলক্ষণাক্রান্ত এবং তাঁহার বঙ্গীয় শিষ্যদিগের আর্য্য চণ্ডালেরও অধম লক্ষণাক্রান্ত! অতঃপর অনুসন্ধান করা যাইতেছে—প্রথমতঃ আর্য্যামি রোগ কি? দ্বিতীয়তঃ সে রোগের গোড়ার সূত্রটা কি? তৃতীয়তঃ সে রোগের চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ?

প্রথম আর্য্যামি রোগটা কি? রোগটা আর কিছু না—বাতুলের প্রলাপ। আর্য্যামি করা স্বতন্ত্র এবং আর্য্যোচিত কার্য্য করা স্বতন্ত্র! যাঁহারা পৃথিবীতে একতা সমতা এবং সত্যতার-জ্যোতি বিকীর্ণ করেন তাঁহারাই আর্য্যোচিত কার্য্য করেন। পৃথিবী-মাতার মুখ-উজ্জ্বলকারী বঙ্গের শিরোভূষণ রামমোহন রায় আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন ; কঠোর অধ্যবসায়ী পরহিতপরায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরজীবন আর্য্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন এবং অদ্যাপি আর্য্যোচিত কার্য্য করিতেছেন ; অকূল পুরাতত্ত্ব সাগরের অদ্বিতীয় রত্ন-ধীবর ম্যাক্‌স্ মূলার আর্য্যোচিত কার্য্য করিতেছেন ; ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য ; আর, যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত—না কিছু করিয়া বেরাক্লিস কর্ম্মী, যাঁহারা হাসির জায়গায় কাঁদেন কান্নার জায়গায় হাসেন এমনি যাঁহাদের কবিত্ব-রসবোধ, তাঁহারা যখন-তখন বুক ফুলাইয়া বলেন "আমরাই আর্য্য—ইংরাজ ফরাসীস্ জর্ম্মান প্রভৃতি আর আর যাবতীয় সভ্য জাতি ম্লেচ্ছ নরাধম ; আমাদের পুষ্পক বিমান ছিল—ইউরোপের রেলগাড়িই সার ; আমাদের অগ্নি-অস্ত্র বরুণ-অস্ত্র ছিল—ইউরোপের কামান বন্দুকই সার ; আমাদের স্বর্গমর্ত্ত্য-রসাতলভেদী ধ্যানবার্ত্তাবহ ছিল—ইউরোপের তাড়িত বার্ত্তাবহই সার ;" এই যে সব শূন্যগর্ভ আস্ফালন এবং গগনভেদী স্পর্দ্ধাবাণী—চলতি ভাষায় যাহাকে বলে ছোটো মুখে বড় কথা—ইহারই নাম আর্য্যামি!

দ্বিতীয়, আর্য্যামি-রোগের গোড়া'র সূত্রটা কি? গোড়ার সূত্রটা আর কিছু না— ইংরাজদিগের "ওঠ্ বোস্" মন্ত্র! ইংরাজেরা যখন আমাদিগকে "বোস্" বলিয়াছিল তখন আমরা এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া তদ্দণ্ডেই বসিয়া পড়িয়াছিলাম ; ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী আমাদিগকে মুখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "তোমরা আফ্রিকাবাসী কালো নিগর" আর অমনি আমরা করযোড়ে বলিলাম "আমরা দীন হীন অধম বাঙ্গালী, আমাদের কোনো সঙ্গতি নাই, তোমরাই আমাদের মা-বাপ, তোমরাই আমাদের হর্ত্তা-কর্ত্তা!" ইংরাজেরা "বোস" বলিতেই যেমন আমরা বসিয়া পড়িয়াছিলাম—"ওঠ্" বলিতেই তেমনি আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উক্তত্রণ-চতুষ্পাটির অধ্যাপকেরা আদর করিয়া আমাদিগকে বলিলেন "তোমরা আর্য্য!" আর আমাদের আর্য্যতেজ দেখে কে? তদ্দণ্ডেই আমরা উঠিয়া-দাঁড়াইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বুক ফুলাইয়া সিংহনাদে বলিয়া উঠিলাম "তোমরা ম্লেচ্ছ—আমরা আর্য্য। তোমাদের আছে কি—আমাদের নাই কি? তোমাদের একমাত্র সম্বল বিজ্ঞানের গোটাকত কপোলকল্পিত সিদ্ধান্ত বই না— আমাদের বেদ আছে, স্মৃতি আছে, তন্ত্র আছে মন্ত্র আছে— নাই কি? আমাদের জাতির সঙ্গে কি তোমাদের জাতির ঘুণাক্ষরেও তুলনা হইতে পারে।" কি আশ্চর্য। ওঠ্ মন্ত্রের চোটে এক নিমেষের মধ্যেই আমাদের বুলি ফিরিয়া গিয়া—পূর্ব্বে যেমন আমরা নেঙ্গুঠে ইঁদুর হইয়া তলে গুঁড়ি মারিয়াছিলাম, এক্ষণে তেমনি আমরা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হইয়া গর্জ্জন করিতে সুরু করিলাম। ঈশ্বর করুন যেন এ-হেন সুখ-স্বপ্ন হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই "পুনর্মূষিকো ভব" শুনিয়া হঠাৎ আমাদের চক্ষুস্থির না হয়!

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা গোস্বামীর নিকট হইতে আর্য্য-মন্ত্রটি চুপি চুপি আদায় করিয়াছেন ইহা দেশ-শুদ্ধ সকল লোকেই জানে অথচ সে বৃত্তান্তটি চাপিয়া রাখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দীক্ষা-গুরুকে ভাবে গতিকে নূতন এক প্রকার গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিলেন— সে গুরু-দক্ষিণা রজতের পূর্ণচন্দ্র নহে— তাহা হস্তের অর্দ্ধচন্দ্র! অর্থাৎ তাঁহারা এইরূপ ভাণ করিলেন—যেন জাতিবাচক আর্য্য শব্দের আবিষ্কর্ত্তাও তাঁহারা, আর, আর্য্যও তাঁহারা ; তা বই— ম্যাক্সমূলার যেন কেহই নহে—জাতিবাচক আর্য্য শব্দের আবিষ্কর্ত্তাও তিনি নহেন, আর্য্যও তিনি নহেন ; প্রত্যুত তিনি ম্লেচ্ছ নরাধম! ইহারই নাম "তোমার শীল তোমার নোড়া, ভাঙব তোমার দাঁতের গোড়া!" আর কিছু না—একটি দুগ্ধ পোষা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার হস্তে একখানি শাণিত ছুরি প্রদান করিলে প্রদাতা এবং গৃহীতা উভয়েরই তাহাতে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা ; প্রদাতার শক্ত হাড়ে শিশুর হস্তের ছুরির এক আধ আঁচড়ে বেশী কি আর হইবে— তাহা মহিষ-শৃঙ্গে মশক দংশন বই আর কিছুই নহে! কিন্তু দুগ্ধ-পোষা বালকের কচি হাড়ে তাহা একটা না-একটা কাণ্ড না বাধাইয়া সহজে ছাড়ে না। মূষিক যদি সিংহকে গোখাদক ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করে, তবে সিংহের তাহাতে কিছুই হয় না— তাহার লাঙ্গুলের একগাছি লোমও স্খলিত হয় না ; কিন্তু তাহাতে ক্ষান্ত না থাকিয়া মূষিকের-পো যদি আপনাকে সিংহ অপেক্ষাও বড় মনে করিয়া বিড়ালকে তাড়া করে, তবে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় ; তাহাই এক্ষণে ঘটিয়াছে! বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি আচার্য্যগণকে ম্লেচ্ছই বলুন আর বর্ব্বরই বলুন তাহাতে সেই সকল প্রবীণ সমরাগ্নি-পরীক্ষিত মহারথীগণের কিছুই আসিবে না যাইবে না ; কিন্তু তাহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া—এক বীর ডন্ কুইক্সোট যেমন রঙ্গিনাণ্টিতে আরোহণ করিয়া—অস্ত্রে শস্ত্রে

সুসজ্জিত হইয়া—প্রিয়তমা ডল্‌সিনিয়ার অমোঘ প্রসাদ-বলে বলী হইয়া—পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যে তেমনি উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা উল্টাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে—কেহ বা টিকি রাখিয়া, কেহ বা ফোঁটা কাটিয়া, কেহ বা গেরুয়া পরিয়া কেহ বা পৈতার গোচ্ছা দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত করিয়া, এক এক জন এক এক মহামহোপাধ্যায় আর্য্য সাজিয়া আসরে নাবিয়া তাল ঠুকিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতেছেন— এটা তাঁহারা ভাল করিতেছেন না! তাঁহাদের কি স্মরণ নাই যে, লামাঞ্চা নগরের বীরকেশরী ডন্‌কুইক্‌সোট্ যতবার কোমর বাঁধিয়া পৃথিবী উল্টাইয়া দিতে গিয়াছে, ততবার উল্টাইয়া পড়িবার মধ্যে তিনিই স্বয়ং হইতে উল্টাইয়া পড়িয়াছেন—তা বই পৃথিবী এক তিলও উল্টায় নাই! এইরূপ করিয়া যখন তাঁহার সমুদয় দন্তগুলি একে একে অন্তর্ধান করিল তখন তিনি দর্পণে আপনার ভগ্নদন্ত চপেটিতকপোল মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া আপনিই আপনার নাম দিলেন "বিষণ্ণ মুখাকৃতি বীর" "knight of the srrowful figure!" রোগ তো আর গাছে ফলে না! এই উন্নত শতাব্দীর পরিস্ফুট দিবালোকে মান্ধাতার আমলের অপরিস্ফুট বিধান সকল প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ানো—হাতের লেখা পুঁথি ছাড়া গ্রন্থ পাঠ না করা—গেরুয়া বস্ত্র ছাড়া বস্ত্র পরিধান না করা—খড়ম ছাড়া পাদুকা পরিধান না করা—শুদ্ধ কেবল পুরাণের রূপক এবং হেঁয়ালি ভাঙিয়া সেই উপকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানের মহোচ্চ শিখর-পর্য্যন্ত একটা প্রশস্ত রাজমার্গ চালাইয়া দিয়া স্বর্গের সোপান নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া—এইরূপ যাহার অশেষ বিশেষ উপসর্গ—তাহা যদি রোগ না হয়, তবে রোগ কি আর গাছে ফলে?

তৃতীয়, রোগের চিকিৎসা। আর্য্যামি রোগের চিকিৎসা সামাপন্থী মতে হইলেই ভাল হয়; সে মতের মূল-মন্ত্র এই যে "সমে সাম্যং প্রযোজয়েৎ"—সমানে সমান প্রয়োগ করিবেক। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, "কে বলে আর্য্যামি একটা রোগ, বরং তাহা একটা গুরুতর রোগের মহৌষধ—তাহা সাহেবি-আনা রোগের মহৌষধ!" বটে—কিন্তু সে কিরূপ ঔষধ? সে ঔষধ নিজেই একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি!— তাহার বাতাসে জ্ঞানের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং কর্ম্মের হস্তপদ অসাড় হইয়া যায়! তবে আরতাহা সাহেবিআনাকে দমন করিবে কি প্রকারে! বরং আরো তাহা সাহেবিআনাকে খোঁচা দিয়া উস্কাইয়া তোলে। সাহেবি আনার ঔষধ স্বতন্ত্র ; —ইংরাজদিগের বাহ্য আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণই সাহেবিআনা, আর, ইংরাজদিগের বিজ্ঞান, শিল্প, কার্য্য-নৈপুণ্য, কর্ম্মিষ্ঠতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, তেজস্বিতা, এই গুলির নাম উনবিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা ; এই উনবিংশ শতাব্দীয় সভ্যতাই সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ ; তা ভিন্ন আর্য্যামিও সাহেবিআনা রোগের ঔষধ নহে, সাহেবিআনাও আর্য্যামি-রোগের ঔষধ নহে ; আর্য্যামি রোগের ঔষধ তবে কি? না "সমে সাম্যং প্রযোজয়েৎ"—প্রযোজয়েৎ"—আর্য্যোচিত কার্য্যই আর্য্যামি-রোগের একমাত্র ঔষধ।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আকাশ হইতে পড়িয়াই আর্য্য হইয়াছিলেন ; তবে কি? না পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্যজাতি যেরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছে তাঁহারাও সেইরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছিলেন ; দুই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আর্য্য-পদবীতে সমুত্থান করিয়াছিলেন ; — কী দুইনিয়ম? না, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন সন্ততির নিয়ম Law of heredity এবং সঙ্গতির নিয়ম Law of adaptation। সন্ততি বা সন্তান শব্দের অর্থ সং তান—তান কি না ধারাবাহিক প্রবাহ, একটানা প্রবাহ, জীব-জন্তু-সকলের আনুপূর্ব্বিক

একটানা প্রবাহ যে-একটি সার্ব্বভৌমিক মৌলিক নিয়মে নিয়মিত হয়, তাহারই নাম সঙ্গতির নিয়ম ; সে নিয়ম এই যে, সন্তান-সন্ততিরা কোনো-না-কোনো অংশে পিতৃপুরুষদিগের অনুধর্ম্মী হইতে চায়ই চায় ; এ নিয়মের মূল-মন্ত্র—"বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছ নেই হোয় তো থোড়া থোড়া"। সঙ্গতির নিয়ম কি? না চতুর্দ্দিকের অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে না পারিলে কোন জীবই পৃথিবীতে টেঁকিয়া থাকিতে পারে না—ইহাই সঙ্গতির নিয়ম। চারিদিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে গেলেই জীবের পৈতৃক গুণ-সকল অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে থাকে। এই জন্য সঙ্গতির নিয়মকে পরিবর্ত্তনের নিয়ম বা গতির নিয়ম বা উন্নতির নিয়ম বলিলে তাহার ভাবার্থের কোনো প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। সঙ্গতির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব পারিবর্ত্তিক নিয়ম এবং সন্ততির নিয়মকে সংক্ষেপে বলিব কৌলিক নিয়ম। কৌলিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে "যেমন পিতা মাতা তেমনি সন্তান-সন্ততি ;" পারিবর্ত্তিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে "যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা," এক্ষণে ইহা বলাবাহুল্য যে কৌলিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের জন্ম-স্থিতি নিয়মিত হয়, এবং পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের গতি নিয়মিত হয়।

বঙ্গীয় নব্য-আর্য্যেরা কেবল কৌলিক নিয়মই জানেন—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা এইটিই জানেন, তা বই এটা জানেন না যে মহাজন যিনি—তিনি মহাজনই হইতেন না যদি পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে তাঁহার নিজের সময়ের নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না করিতেন। দুই হাত নহিলে তালি বাজে না , এই জন্য জীব-রাজ্যে স্থিতির নিয়ম, এবং গতির নিয়ম দুইই সমান আবশ্যক। কৌলিক নিয়মটিই স্থিতির নিয়ম, আর, স্থিতির নিয়ম বলিয়াই—কি পশুর মধ্যে— কি বর্ব্বর জাতির মধ্যে—কি আর্য্যজাতির মধ্যে—সর্ব্বত্রই তাহা সমান-ভাবে কার্য্য করে ; পায়রা'র বাচ্ছা পায়রা হয়, কাকের বাচ্ছা কাক হয়, কাফ্রীর পুত্র কাফ্রী হয়, বাঙ্গালির পুত্র বাঙ্গালি হয়, ইংরাজের পুত্র ইংরাজ হয় ; জাতির ইতর-বিশেষে কৌলিক নিয়মের কার্য্যকারিতার ইতর-বিশেষ হয় না— কৌলিক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান-ভাবে কার্য্য করে। পক্ষান্তরে, পারিবর্ত্তিক নিয়মটি গতির নিয়ম—তাই তাহা গতিশীল, আর, গতিশীল বলিয়াই—তাহা সকল জাতির মধ্যে সমান-ভাবে কার্য্য করে না, প্রত্যুত যে যেমন জাতি তাহার অভ্যন্তরে তেমনি ভাবে কার্য্য করে ; জাগ্রত জাতির মধ্যে জাগ্রতভাবে কার্য্য করে, প্রসুপ্ত জাতির মধ্যে প্রসুপ্তভাবে কার্য্য করে। ফলেও তাই দেখা যায় যে "যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা।" এ নিয়মটি মনুষ্যের মধ্যে যেমন চক্ষুষ্মান্‌ভাবে কার্য্য করে—পশুদিগের মধ্যে তাহার সিকির সিকিও না। গ্রীষ্মদেশের হস্তী শীতদেশে সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে "নৈসর্গিক দম্পতি নির্ব্বাচন" (Natural selection) এবং "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (Survival of the fittest) এই দুই জৈবিক নিয়মে পরিগঠিত হইতে থাকিলেও তাহার পৃষ্ঠদেশে ঘনলোমরাজি আবির্ভূত হয় কি না সন্দেহ ; কিন্তু এক জন বাঙ্গালি ইংলণ্ডে যাইতে না যাইতেই তাঁহার পৃষ্ঠ দেশ হইতে ফিন্‌ফিনে উড়ানি খসিয়া পড়িয়া চারি আঙ্গুল পুরু শীতবস্ত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা এ নিয়মটি পশু অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যে বেশী প্রবল; তেমনি তাহা বর্ব্বর-জাতি অপেক্ষা সভ্য-জাতির মধ্যে বেশী প্রবল। সুয়েজের নৈসর্গিক সেতুবন্ধ জাহাজের পথ-রোধ করে বলিয়া সেই অপরাধে সেই শত-যোজন-ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে রসাতলে পাঠাইয়া দেওয়া যে-

সে জাতির কর্ম্ম নহে। কৌলিক নিয়ম এবং পারিবর্ত্তিক নিয়ম উভয়ে যদিচ পরস্পরের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, উভয়ে পরস্পরের বিরোধী; বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক—পতি-পত্নীর ন্যায় দোঁহে দোঁহার প্রাণপবিপোষক। পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে বাঙ্গালিরা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইংরাজদিগের সহিত সম্ভব মতো বিদ্যাবুদ্ধিতে টক্কর দিতে পারিতেছেন ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কৌলিক নিয়ম রীতিমত কার্য্য করিতেছে ; প্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই আর্য্য-সন্তান। নচেৎ বাঙ্গালিরা যদি কৌলিক নিয়মের গোঁড়া পক্ষপাতী হইয়া পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরে ঢুকিতে না দিতেন, তবে তাহাতে প্রমাণ হইত যে, তাঁহারা নামে আর্য্য—কাজে নীগ্রো। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কৌলিক নিয়মের অনুচিত পক্ষপাতী হইলে কৌলিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় , যে ডালে উপবেশন করা হইতেছে সেই ডালের মূলোচ্ছেদন করা হয়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গের্দা ঠেসান্ দিয়া পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এবং শুধু পূর্ব্বপুরুষদিগের নামের দোহাই দিয়া কোনো আর্য্যজাতিই আর্য্য হ'ন নাই ; প্রত্যুত অন্তরের এবং বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াই আর্য্যেরা আর্য্য-পদবীতে সমুত্থান করিয়াছেন। দুই অস্ত্রে মনুষ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করে বিজ্ঞান অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম অস্ত্রে ; বিজ্ঞানঅস্ত্রে ভৌতিক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে। আমাদের দেশে পূর্ব্বতন আর্য্যেরা উভয় অস্ত্রেরই পরিচালনা দ্বারা প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়-লাভ করিয়া আর্য্য-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন , নচেৎ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই ঘুমপাড়ানী মাসিপিসি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শুদ্ধ কেবল কৌলিক নিয়মের লাঙ্গুল ধরিয়া চলিয়া, এযাবৎকাল পর্য্যন্ত কোন আর্য্যজাতিকেই আর্য্য হইতে দেখা যায় নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই মনে করেন যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা শুদ্ধ কেবল এক হাতে তালি বাজাইতেন, শুধু কেবল কৌলিক নিয়মেই চলিতেন—পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরের চৌকাট মাড়াইতে দিতেন না, তবে তাঁহাদের সে ভ্রমটি ঘুচাইবার জন্য কয়েকটি উদাহরণ পরে পরে প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথম উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিজ্ঞান-অস্ত্রে কুসংস্কারের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিতেন। বহু পূর্ব্বে যে সময়ে আপামর-সাধারণ সকল লোকেরই এইরূপ ধ্রুব-জ্ঞান ছিল যে, পৃথিবী সমতল, এবং তাহার প্রধান প্রমাণ ছিল পুরাণের এই একটা অলীক সিদ্ধান্ত যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেই সময়ে জ্যোতির্বিৎ ভাস্করাচার্য্য ঐ প্রচলিত লৌকিক এবং পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে বলিলেন যে,

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং
মন্যন্তে খে যতো গোল স্তস্য ক্বোর্দ্ধং ক্বচাপ্যধঃ।।"

ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্রই লোকে স্বস্থানকে উপরিস্থিত মনে করে, যেহেতু পৃথিবী গোল, তাহার উর্দ্ধই বা কি আর অধোই বা কি?

পুনশ্চ
"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীংতলস্থাং
আত্মানমস্যা উপরিস্থিতং চ
স মন্যতেহতঃ কুচতুর্থ সংস্থো
মিথশ্চতে তির্য্যগিবা মনন্তি।

(এখানে "কু" শব্দের অর্থ পৃথিবী)
অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থা*
শ্ছায়া মনুষ্যা ইব নীর তীরে
অনাকুলা স্তির্যাগধঃস্থিতাশ্চ
তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র।।"

"যিনি যেস্থানে থাকেন, তিনি পৃথিবীকে তলস্থ এবং আপনাকে তাহার উপরিস্থ মনে করেন ; যাঁহারা পরস্পর হইতে পৃথিবীর চতুর্থাংশ দূরে অবস্থান করেন, তাঁহারা পরস্পরকে আড়চাভাবে (অর্থাৎ কাত-হইয়া-পড়া ভাবে) অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। পৃথিবীর উল্টাপিঠে জলাশয়ের তীরস্থ ব্যক্তির জলস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় মনুষ্যেরা অধোমস্তক, কিন্তু আমরা যেরূপ ভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, উপরি-উক্ত অধঃস্থিত এবং তির্যাক্-স্থিত ব্যক্তিরা ঠিক সেইরূপ অনাকুল ভাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।" ভাস্করাচার্য্যের স্বহস্ত-রচিত এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কিরূপ মনে হয়? এইরূপ কি মনে হয় যে, তিনি লৌকিক এবং পৌরাণিক মত শিরোধার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন? না উল্টা আরো এইরূপ মনে হয় যে, তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন? পৃথিবীশুদ্ধ লোক যেখানে একবাক্যে বলিতেছে যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেখানে তিনি একাকী শুদ্ধ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে—কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই কর্ণে শোনে নাই এইরূপ একটা নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া অসংকুচিত চিত্তে— অম্লানবদনে— বলিলেন যে, "পৃথিবী গোল"—ইহা কি যে সে লোকের কাজ? ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য। এইরূপ আর্য্যোচিত কার্য্যের পরিবর্ত্তে তিনি যদি আর্য্যামি করিতেন, তিনি যদি বলিতেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" পূর্ব্ব-পুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্— পুরাণ যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক্— সকলে যাহা একবাক্যে বলে তাহাই ঠিক্—পৃথিবী ত্রিকোণ ইহাই ঠিক্, তবে আমাদের দেশের পুরাতন জ্যোতিষের আর্য্যত্বই বা কোথায় থাকিত, প্রামাণিকত্বই বা কোথায় থাকিত? তাহা হইলে আজিকের এই উনবিংশ শতাব্দীতে সে জ্যোতিষকে কে-ই বা পুছিত আর কে-ই বা তাহাতে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত?

দ্বিতীয় উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ধর্ম্ম-অস্ত্রে লোকাচারের অনুমোদিত কুরীতির সহিত সংগ্রাম করিতেন। অতীব পুরাকালে—বেণরাজার আমলে—আমাদের দেশে রাক্ষস বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলা অসভ্য বিবাহ-পদ্ধতি লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সেই সকল পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া—উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া সেগুলিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া— তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মবিবাহের সুসভ্য পদ্ধতি জনসমাজে চালাইয়া দিলেন। ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য ; তাহা না করিয়া তাঁহারা যদি আর্য্যামি করিতেন—লোকাচারের জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিয়া বলিতেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" আর্য্য পূর্ব্ব-পুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই ঠিক— রাক্ষস বিবাহই ঠিক্" তবে আজিকের এই হিন্দু-সমাজের আর্য্যত্বই বা কোথায়

* "কুদলান্তরস্থা"—কু শব্দে পৃথিবী—পৃথিবীর দলান্তরস্থ" অর্থাৎ দোলার যেমন দুইটি দল আছে, তেমনি ভূগোল দুইটি দলে বিভক্ত—একটি দল তাহার উপরিস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড, আর-একটি দল তাহার নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড ; নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ডের ভূপৃষ্ঠে যাহারা বাস করে তাহারাই "কুদলান্তরস্থ"।

থাকিত—ভদ্রত্বই বা কোথায় থাকিত! এই দুই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ইহাতেই এক-আঁচড়ে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা লৌকিক কুসংস্কার এবং কুরীতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে সংগ্রাম করিয়া—সত্য এবং মঙ্গলের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া—নিক্তির ওজনে উচিত মূল্য প্রদান করিয়া—আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য আর্য্যেরা কি করিয়াছেন? তাঁহারা কি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটিও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন? দেশের কোনো প্রকার লোক-প্রচলিত কুরীতির বিরুদ্ধে আলস্য-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটিবারও উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক—আদুরে ছেলেরা যেমন অষ্টপ্রহর যার-তার নিকট হইতে আদর ভিক্ষা করে, তাঁহারা তেমনি ভদ্রাভদ্র সকল প্রকার প্রচলিত লোকাচারের স্বপক্ষে অলীক বাচালতা করিয়া ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীস্থ বঙ্গজনেরই আদর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই ভিক্ষার ধনে আপনাদের আর্য্য-গরিমার ভাণ্ডার দিন দিন স্ফীত করিয়া তুলিতেছেন। এইরূপে যাঁহারা সিকি পয়সা দিয়া লাখ টাকা মূল্যের আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করেন, তাঁহাদিগকে আমরা শুধু এই কথাটি বলিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতে চাই যে, সত্তার তিন অবস্থা। এই সকল নব্য আর্য্যদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য ইহার অধিক যদিচ আর কিছুই নাই কিন্তু উঁহাদের প্রতি মনু, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পুরাতন আর্য্যদিগের বাৎসল্যপূর্ণ উপদেশ এখনো পর্য্যন্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহা এই যে, "সত্যসত্যই যদি তোমরা আর্য্য হইতে চাও, তবে পূর্ব্বে আমরা যাহা করিতাম তাহাই কর। লৌকিক এবং পৌরাণিক ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে জ্ঞান-ধর্ম্মের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত কর; তোমাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রকৃত আর্য্যদিগের জন্মগ্রহণ যেন নিষ্ফল না হয়। আর্য্যামি করিলে কিছুই হইবে না। নিশ্চিত জানিও যে আর্য্যামি একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি, আর, তাহার একমাত্র ঔষধ আর্য্যোচিত কার্য্য।" আর্য্যামি এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট—অতঃপর সাহেবিআনা কিরূপ তাহার প্রতি একবার মনঃ সমাধান করা যাক্।

আর্য্যামিও যেমন, সাহেবিআনাও তেমনি—দুই-ই সমান। দুই-ই নারিকেলের শাঁস ফেলিয়া ছোবড়া ভক্ষণ। আমাদের দেশের জ্ঞান ধর্ম্ম ধৈর্য্য বীর্য্য দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসা ক্ষমা ঋজুতা এইগুলিই শাঁস, আর, টিকিরাখা, ফোঁটা কাটা, ভিতরে পদার্থ নাই মুখে বামনাই, দলাদলির মোড়লগিরি, এইগুলিই ছোবড়া; এই ছোবড়া-গুলিই আর্য্যামির প্রধান সম্বল। তেমনি আবার, উন্নত বিজ্ঞান, উন্নত শিল্প, অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কর্ম্মিষ্ঠতা, কার্য্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা এইগুলিই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা'র মূল উপাদান—এইগুলিই শাঁস, আর, ইংরাজদিগের ন্যায় চটুল-ধরণের চাল্ চোল্, ইংরাজদিগের ন্যায় জড়ানে-জড়ানে বুলি, ইংরাজদিগের ন্যায় রক্ত চলাচলের ব্যাঘাতজনক আঁটা সাঁটা অশোভন পরিচ্ছদ, এইগুলিই ছোবড়া; এই ছোবড়াগুলিই সাহেবিআনার প্রধান সম্বল। তাই আমরা বলি যে আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা দুইই এপিট্-ওপিট্—এ বলে আমায় দ্যাখ্ ও বলে আমায় দ্যাখ্।

কেহ মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজেরা যে কোনো প্রণালীতে যে কোনো কার্য্য করে, বাঙ্গালিরা সেই প্রণালীতে সেই কার্য্য করিলে তাহাতেই তাঁহাদের সাহেবিআনা হয়; তাহা যদি কেহ মনে করেন—সেটি তাঁহার বড়ই ভুল। কেননা তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়ায় যে, ইংরাজেরা যেহেতু ইংরাজি লিখিবার সময় বামদিক্ হইতে ডাহিনদিকে লেখনী চালনা করে

এই জন্য বাঙালিদের উচিত যে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবার সময় ডাহিনদিক হইতে বামদিকে পারসীক ধরণে লেখনী চালনা করেন ; নহিলে যেন তাঁহাদিগকে সাহেবিআনা-দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইবে। ফলে এ কথা কোনো কাজের কথা নহে যে, ইংরাজদিগের যে কোনো রীতিনীতি বা যে-কোনো আচার ব্যবহার বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই সাহেবিআনার লক্ষণ। ম্যাকস্ মূলার ভট্টের এ কথা যদি সত্য হয় যে ইংরাজ বাঙালি ফরাসীস্ প্রভৃতি সকল আর্য্য জাতিই গোড়ায় একজাতি ছিল, তবে ইংরাজ-বাঙালি জাতি-দ্বয়ের মৌলিক আচার-পদ্ধতি যে একই ধাঁচা'র হইবে—তাহা তো হইবারই কথা বরং তাহা না হওয়াই বিচিত্র ; তবুও যদি এ বিষয়ে কাহারো মনে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকে— তবে বক্ষ্যমান দুইটি উদাহরণ শুনিলে, সে সন্দেহ তাঁহার মন হইতে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যাইবে।

প্রথম উদাহরণ. — বন্ধুগণের সম্মিলন-কালে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেরূপ কর-নিপীড়নের (Shakehand-এর) প্রথা প্রচলিত আছে আমাদের মধ্যে যে, সেরূপ নাই, বা ছিল না, তাহা নহে . কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশীর প্রথম ঘটনাটিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুরবা ইন্দ্রপুরী হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথিমধ্যে যখন চিত্ররথ-গন্ধর্ব্বের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল, তখন উভয়ে স্ব স্ব রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পরস্পরের হস্ত নিপীড়ন করিলেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ— বিবাহোদ্যত বর-কন্যার বয়সের ব্যবস্থা ইউরোপে যেরূপ আমাদের দেশেও পূর্ব্বে সেইরূপ ছিল . তাহার সাক্ষী—মনুর বিধানে পুরুষের ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম এবং কন্যার বারো বৎসর বয়ঃক্রম বিবাহের উপযুক্ত বয়স। এখানে ইহা বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের বারো বৎসর ইংলণ্ডের ষোলেরো বৎসর অপেক্ষা বেশী বই কম নহে।

ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপ এবং ভারতবর্ষ উভয়েরই মধ্যে এরূপ কতকগুলি মৌলিক আচার ব্যবহার রীতি-নীতি প্রচলিত আছে যাহা আর্য্যজাতি মাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি—একা কেবল ইংরাজদের নিজস্ব সম্পত্তি নহে ; সে গুলিতে—কি ইংরাজ—কি বাঙালি—কি ফরাসিস্— সকলেরই তুল্য অধিকার . কাজেই সেগুলি সাহেবিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তা ছাড়া, তদপেক্ষা ব্যাপকতর এরূপ কতক-গুলি বিষয় আছে যাহাতে আর্য্যানার্য্য সকল জাতিরই সমান অধিকার—যেমন মনুষ্যত্ব, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি; কাজেই এ-গুলিও সাহেবিআনার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। একজন অতিবৃদ্ধ টোলের ভট্টাচার্য্য হয় তো মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিক্ষা সাহেবিআনারই সামিল . কিন্তু তাঁহার সে কথা কোনো কাজের কথা নহে ; এটা অন্ততঃ তাঁহার জানা উচিত যে, সকল-প্রকার জ্ঞান-চর্চাতেই সকল জাতিরই সমান অধিকার ; —জ্ঞান এবং ধর্ম্ম জাতীয়-পৃথকের বন্ধন হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিতি করে। পূর্ব্বতন গ্রীকজাতি যে, মিসরীয়জাতির নিকটে জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল, —তাহা বলিয়া তাহারা কি মিসরী হইয়া গিয়াছিল? পাদরীজনেরা যে বাঙ্গালা শিক্ষা করেন —তাহা বলিয়া তাঁহারা কি বাঙালি হইয়া যা'ন? স্যর্ উইলিয়ম জোনস্ যে, কোনো দেশের কোনো ভাষাই শিক্ষা করিতে বাকী রাখেন নাই—তাহা বলিয়া তিনি কি স্বজাতির পদবী হইতে তিলমাত্রও বিচ্যুত হইয়াছিলেন। বর্ণ বাহ্য—তাহা সকল দেশেই সমান—কেবল বর্ণের আকার দেশ-ভেদে ভিন্ন,

তেমনি জ্ঞানের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সকল দেশেই সমান , কেবল জ্ঞানের বিকাশের তারতম্য প্রযুক্ত তাহার ভাববাঞ্জক ভাষা দেশ-ভেদে বিভিন্ন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা-জ্ঞানের বিভিন্ন পরিচ্ছদ বই আর কিছুই নহে। জ্ঞান ইংরাজীও নহে—বাঙ্গালিও নহে—সংস্কৃতও নহে, জ্ঞান জ্ঞানই। যাহার ভাণ্ডারে রৌপ্য আছে তাহাকেই আমি বলিব—ধনী ; তা সে সিলিঙ্ বেশেই থাক্, আর আদুলি বেশেই থাক্, যে-কোনো বেশেই থাক্, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। সিলিঙ্ অপেক্ষা আদুলি আমাদের দেশে সমধিক ব্যবহারোপযোগী— ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু তাহা বলিয়া আমাকে যদি কেহ এক রাশ সিলিঙ্ দেয়—তাহা কি আমি লইব না? অবশ্যই লইব—দুই হাত পাতিয়া লইব—লইতে ছাড়িব না ; কিন্তু লইয়াই টাকশালে দৌড়িব , — ও সেখানে সেই শিলিঙগুলি দিয়া মনের সাধে টাকা আদুলি সিকি গড়াইয়া লইব ; তাহার বাট্টা যত লাগে লাগুক্ সে জন্য কাতর হইব না। ইংরাজেরা কি করে? আমাদের দেশের কাঁচামাল ধূলিরাশির ন্যায় ঝাঁটাইয়া লইয়া যায়, এবং তাহা দিয়া স্বদেশের ব্যবহারোপযোগী কত কি নূতন নূতন অপূর্ব্ব সামগ্রী রচনা করে, আমরা যদি তেমনি তাহাদের পুঁথি হইতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সংগ্রহ করিয়া সেই উপাদানগুলিকে স্বদেশীয় ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া দেশোপযোগী করিয়া লইতে জো পাই তবে সে সুবিধাটি আমরা ছাড়িব কেন?* ফল কথা এই যে, জ্ঞান কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, কার্য্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা, এই সকল মনুষ্যোচিত গুণ জাতি-বিশেষের বা ব্যক্তি-বিশেষের একচেটিয়া পণ্যদ্রব্য হইতে পারে না ; এ গুলির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিবার অধিকার সকল জাতীয় সকল মনুষ্যেরই সমান , জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা কোনো গতিকেই সাহেবিআনা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র, আর বাবাকে পাপা বলিবার জন্য অথবা দাদাকে ডিয়ার বলিবার জন্য ইংরাজি শিক্ষা করা স্বতন্ত্র। জ্ঞান-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে মানুষের মতো মানুষ হয়, ; ঢঙ-উপার্জ্জনের জন্য ইংরাজি শিক্ষা করিলে লোকে বনমানুষের মতো মানুষ হয় , — দুয়ের মধ্যে এইরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যে সকল রীতিনীতি আচার-ব্যবহার সমস্ত আর্য্যজাতির সাধারণ-সম্পত্তি—সাহেবিআনার উপকরণ-গুলি তাহার ভিতরে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না , এক্ষণে দেখিলাম যে, জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি মনুষ্যত্বের সার উপাদান যাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি, তাহার ভিতরেও সাহেবিআনার কোনো প্রকার উপকরণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। তবেই দাঁড়াইতেছে যে, ইংরাজদিগের এরূপ-কতকগুলি বিশেষ রকমের হাব-ভাব আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী, চাল-চোল্ যাহা আর্য্যগণেরও সাধারণ সম্পত্তি নহে, আর, মনুষ্য-জাতিরও সাধারণ সম্পত্তি নহে—সেই গুলিই সাহেবিআনার উপকরণ। এই তো গেল উপকরণ, সাহেবিআনার প্রকরণ কী যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এক কথায় বলা যাইতে পারে ; কী? না অনুকরণ। পূর্ব্বোক্ত উপকরণগুলি শেষোক্ত প্রকরণের মধ্য দিয়া সাজিয়া-গুজিয়া

* এই সুযোগে ফাঁকতালে একটী কথা বলিয়া লই ; — ইংরাজী ভাষার বাঙ্গালা অনুবাদ-কালে অনেক লেখক কিম্ভূত-কিমাকার নূতন এক তরো ভাষা গড়িয়া তোলেন— এইটি বড় দোষের কথা। আমরা তাই "Letter Killeth spirit giveth life" এই বচনটির অনুবাদ করিতে হইলে এইরূপ অনুবাদ করি যে, মৌখিক শব্দ বাক্যের প্রাণ বধ করে, আন্তরিক ভাব বাক্যে প্রাণদান করে ; নচেৎ এরূপ অনুবাদ করি না যে, "অক্ষর বধ করে ও আত্মা জীবন-দান করে!" "স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট" এরূপ ধরণের অনুবাদ শুনিলে আমাদের গায়ে জ্বর আইসে!

বাহির হইলে তাহাকেই আমরা বলি—সাহেবিয়ানা। এমতে দাঁড়াইতেছে যে, অনুকরণই সাহেবিয়ানা-রোগের মূল-সূত্র।

অনুকরণ কেবল একটা দিক্-বিদিক্-শূন্য অন্ধ চপলতা—তাহার ভিতরে কোনো পদার্থ নাই। অনেক সময় অনুকরণের এটা মনে থাকে না যে, "যার যা তারে সাজে, অন্যে তাহা লাঠি বাজে" তাই সে প্রায়ই বিস্‌মোল্লায় গলদ্ করিয়া বসে ; প্রায়ই সে ভাল মনে করিয়া একটা কাজ করিতে যায়—করিয়া বসে একটা বেতালা বেসুরো বেমানান কিম্ভূত কিমাকার কাণ্ড!* হিন্দু সন্তানের (Esquire) ইস্কোএআর পদবী ইহার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ, —ইউরোপের মধ্যম-অব্দের শাস্ত্রঅনুসারে ইস্কোএআর পদবী সাধারণ লোক-জনের পদবী অপেক্ষা এক ধাপ উচ্চে অবস্থিত। ব্রাহ্মণের নীচেই যেমন কায়স্থ—নাইটের নীচেই তেমনি স্কোএআর। ইউরোপের মধ্যম-অব্দে নাইট্ যখন ঘোড়ায় চড়িবার উপক্রম করিতেই—ইস্কোএআর তখন রেকাব ধরিতেন ; নাইট্ যখন দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যাত্রা করিতেন—ইস্কোএআর তখন তাঁহার সাজ-সজ্জা বহন করিতেন , ইহাতেই ইস্কোএআর পদবীর এত মান-মর্যাদা! শুধু যে কেবল ইংরাজদের মধ্যেই এরূপ তাহা নহে, আমাদের দেশের মান্যগণ্য শ্রেণী-বিশেষের

* এই প্রসঙ্গে মহামান্য সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটী অতি সরস গল্প বলিলেন—সেটী এই , —একজন পল্লীগ্রামের কবিরাজ তাঁহার একটী ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার হাতের একজন রোগীকে দেখিতে গেলেন। রোগীর হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন "নাড়ীতে কিঞ্চিৎ রসাধিক্য দেখিতেছি—পথ্যবিষয়ে আমি তোমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার তো কোনো অন্যথাচরণ কর নাই?" রোগী বলিল "আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন আমি সেই রূপই করিয়াছি—তাহার একচুলও এদিক্ ওদিক্ হয় নাই," কবিরাজ বলিলেন "তোমার হাতটা দেও-দেখি—আর একবার দেখি"—হাত দেখিয়া বলিলেন "সত্য বল দেখি তুমি ইক্ষুরস ভক্ষণ করিয়াছ কি না?" রোগী বলিল "আপনি ঠিক আঁচিয়াছেন—আমি যথার্থই ইক্ষুরস ভক্ষণ করিয়াছি," কবিরাজ বলিলেন "তোমার নাড়ী দেখিয়াই তাহা আমি বুঝিয়াছি—ওরূপ কার্য্য আর যেন না হয়"। কবিরাজের এইরূপ অসাধারণ নাড়ী-জ্ঞান দেখিয়া বাড়ি-শুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল এবং সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কবিরাজ ছাত্র-সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহার ছাত্রটী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "কবিরাজ মহাশয়, পুঁথিতে কোথাও তো এরূপ লেখে না যে, নাড়ী দেখিয়া কে কি খাইয়াছে না-খাইয়াছে তাহার উপলব্ধি সম্ভবে , আপনি তবে নাড়ী দেখিয়া কেমন করিয়া ইক্ষু ভক্ষণের ব্যাপারটা অনুমান করিলেন—সেইটী আমাকে বুঝাইয়া বলুন?" কবিরাজ বলিল "বাপু! এটা আর বুঝিলে না! রোগীর ঘরের চারিদিকে আকের ছিব্‌ড়া পড়িয়া আছে দেখিলাম—দেখিয়া ভাবিলাম যে, সে ঘরে আর কে আক খাইতে যাইবে—রোগীরই এ কাজ। এখন বুঝিলে?" ছাত্র বলিল "এই বই না? এতে আমিও পারি। কবিরাজ মহাশয়—এবারে যখন আপনি রোগী দেখিতে যাইবেন তখন রোগ নির্ণয়ের ভারটা আমার উপর সমর্পণ করিবেন।" কবিরাজ তাহাতে সম্মত হইলেন। ছাত্রটি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, সেখানে এক ঘর লোক বসিয়া আছে—ইহা দেখিয়া তাহার উৎসাহানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল , সে রোগীর নাড়ী দেখিতেছে আর ঘরের চারিদিকে নেত্রপাত করিতেছে—আকের ছিবড়া বা আর কোনো খাদ্য-সামগ্রীর কোনো নিদর্শনই খুঁজিয়া পাইতেছে না। অবশেষে চৌকাঠের কাছে কতকগুলা পাদুকা পড়িয়া আছে দেখিয়া মনে ভাবিল "এতক্ষণে ঠিক্ পাইলাম।" আর তৎক্ষণাৎ রোগীকে বলিল "তোমার নাড়ীর গতি যেরূপ দেখিতেছি—নিশ্চয়ই তুমি পাদুকা ভক্ষণ করিয়াছ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।" ইহা শুনিয়া রোগীর বাড়ির লোকেরা তাহাকে উত্তম-মধ্যম-রূপে পাদুকা ভক্ষণ করাইয়া বিদায় করিল। অনুকরণের এইরূপই বিপরীত গতি।

মধ্যেও নাইটের সেবক ইস্কোএআর পদবীর ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবক দাস পদবী বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে সজ্জন কায়স্থেরা আপনাদের পদবীর সংশ্রব হইতে দাস শব্দটি উঠাইয়া দিয়াছেন—খুবই ভাল করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই ; কিন্তু তা'ও বলি—একটা উপসর্গকে তাঁহারা এক দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়া তদপেক্ষা গুরুতর আর-একটা উপসর্গকে কোন্ যুক্তিতে তাঁহারা আর এক দ্বার দিয়া ঘরে ঢোকা'ন্—এইটিই আমার জিজ্ঞাস্য। ব্রাহ্মণের খালি চরণের পদধূলিতে যাঁহারা ডরা'ন, নাইটের বুটমণ্ডিত চরণের পদধূলি দিয়া কোন লজ্জায় তাঁহারা ললাটে তিলক কাটেন—এইটিই আমি বুঝিতে চাই। শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের গাড়ু গামছা বহন করা যদি এতই নীচ কার্য্য হইল, তবে ম্লেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরা এবং বুট্ পরিষ্কার করা বড় যে একটা ভদ্রজনোচিত কার্য্য তাহার প্রমাণ কি? ফল কথা এই যে, "যার যা তারে সাজে"—ইস্কোএআর পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরাজকেই সাজে, দাস পদবী দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দু সন্তানকেই সাজে ; কিন্তু অন্যে তাহা লাঠি বাজে—ম্লেচ্ছ নাইটের রেকাব ধরণ কার্য্য হিন্দু সন্তানকে লাঠি বাজে, হীদেন ব্রাহ্মণের পদধূলি ললাটে লেপন ইংরাজ সন্তানকে লাঠি বাজে।* এইটি না বুঝিবার দরুণ অনুকরণ-স্রাণী চঞ্চল হরিণ দন্তহীন নখহীন বিমস্ত দেশী নেকড়েবাঘের হস্ত এড়াইবার জন্য প্রত্যহই নূতন নূতন ফন্দি বাহির হইতেছে অথচ দন্ত-নখ বিশিষ্ট জলজ্যান্ত বিলাতি

* Esquire উপাধিতে যাঁহারা স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পা'ন—বাবু উপাধি তাঁহাদের দু'চক্ষের বিষ। ইংরাজ কেরাণীপতি বাঙ্গালি কেরাণীদিগকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করে—এই খেদে তাঁহারা বাবু শব্দের প্রতি এত বীতরাগ! তাহারা এতই যদি সূক্ষ্মচর্ম্মী যে সাহেবেরা বাবু-শব্দের অপব্যবহার করে বলিয়া সেই খেদে তাঁহারা বাবু-শব্দকে আপনাদের নামের কাছ ঘেঁসিতে দিতে নারাজ, তবে দেশশুদ্ধ লোক যে বাঙ্গালির গায়ের হ্যাট্ কোটকে ফিরিঙ্গি পোষাক্ বলিয়া খোঁটা দ্যায়, তাহার বেলায় তাঁহাদের সে সূক্ষ্ম চর্ম্ম কোথায় থাকে? তা'র বেলা—দেশশুদ্ধ লোকের লাঞ্ছনা তাঁহারা গায়ে পাতিয়া লইবেন তাহাও স্বীকার তবুও বিলাতি পরিচ্ছদের মায়া প্রাণ থাকিতে ছাড়িতে পাড়িবেন না—এ যা তাঁহারা বলেন এটা কিরূপ কথা? এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় কেন? ইংরাজ কেরাণী-পতিদিগের মত-ই কি তাঁহাদের সর্ব্বারাধ্য লোকমত public opinion ? দেশ শুদ্ধ লোকের মত কি লোক-মত নহে? দিশী সাহেবেরা যাহাই বুঝুন্ না কেন— বিলাতি সাহেবেরা public opinion বলিতে আপনাদের দেশের লোক-মতই বোঝেন ; তা ছাড়া, ভিন্ন দেশীয় লোকের মত (বিশেষতঃ ভিন্ন দেশীয় কেরাণীপতিদিগের মত) ইউরোপীয় কোনো সভ্যজাতির মধ্যে লোক মত বলিয়া সমাদৃত হওয়া না—হইবেও না। ইংরাজদিগের মধ্যে এমনও তো দেখিতে পাওয়া যায় যে, বচসা-কালে উচ্চ পদবীস্থ লোক নীচের লোককে কঠোরভাবে Sir বলিয়া সম্বোধন করে, যথা ; — "You hold your tongue sir," Sir Richards Temple যদি বলেন যে, খান্সামাকে ধমক দিবার সময়েও লোকে Sir শব্দ উচ্চারণ করে—অতএব Sir উপাধি অতীব লজ্জাস্পদ উপাধি—কেহ যদি আমাকে কেহ Sir উপাধি-যুক্ত শিরোনামার পত্র লেখে তবে তাহার নামে আমি লাইবেলের মোকদ্দমা আনিব"—তবে লোকে তাঁহাকে কি বলিবে? আসল্ কথা এই যে, খান্সামাকে Sir বলাতেও Sir উপাধি কাঁচিয়া যায় না, আর, কেরাণীকে বাবু বলাতেও বাবু উপাধি কাঁচিয়া যায় না। বাবু শব্দের মূল বৃত্তান্ত আর কিছু না — Sire শব্দ হইতে যেমন Sir হইয়াছে—বাবা শব্দ হইতে তেমনি বাবু হইয়াছে। তা'র সাক্ষী—হিন্দুস্থানীরা যখন তখন বাবা অর্থে বাবু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। Sire শব্দের অর্থ বাবা বই আর কিছুই না, আর, Sir শব্দ Sire শব্দেরই অপভ্রংশ। এইরূপ, Sir শব্দ এবং বাবু শব্দ উভয়েরই

রাজ-বাবটা'কে ঘরে ঢোকাবার জন্য লালায়িত। বঙ্গীয় নব্য আর্যোরাও আবার তেমনি— যার যা তারে সাজে এ বোধ তাঁহাদের মূলেই নাই , এ বোধ তাঁহাদের নাই যে, গেরুয়া বসন উদাসীনকেই সাজে—গৃহীকে সাজে না ; মাথায় টিকি ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেই সাজে—বিষয়ী ব্যক্তিকে সাজে না , রুদ্রাক্ষমালা শাক্ত বা শৈব'কেই সাজে আর কাহাকেও সাজে না ; তাঁহারা দেশসুদ্ধ সকল সম্প্রদায়ের সকল বেশ নির্বিশেষে অনুকরণ করিতে প্রস্তুত— যেহেতু তাঁহারা সার্বভৌমিক আর্য্য!!! এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুকরণ—আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই একটি সাধারণ উপসর্গ।

অনুকরণ কী? না দেখাদেখি কার্য্য করা। সাহেবদের দেখাদেখি কার্য্য করা'র নাম সাহেবিআনা। সাহেবদের দেখাদেখি বাঙ্গালিরা কী করেন? যাহা করেন তাহা বুঝাই যাইতেছে;—বাহ্য আকার প্রকার ভাবভঙ্গী চাল্‌চোল্ কথাবার্তার ঢঙ্ এইগুলিই চক্ষে দেখিবার সামগ্রী—তাই, এইগুলিই একজনের দেখাদেখি আর একজন চট্ আদায় করিতে পারে— বাঙ্গালিরা তাহাই করেন। কিন্তু মনুষ্যের আভ্যন্তরিক ভাব এবং চরিত্র একজনের দেখাদেখি আর একজন আদায় করিতে পারে না—কেমন করিয়াই বা পারিবে? যাহা চক্ষে দেখা যায় না তাহা একজনের দেখিয়া আর একজন কেমন করিয়া শিখিবে? সেক্‌স্‌পিয়রের হাতের লেখা সকলেই অনুকরণ করিতে পারে কিন্তু সেক্‌স্‌পিয়রের কবিত্ব রসের অনুকরণ ইংরাজি সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান M A চূড়ামণিরও অসাধ্য। সেক্‌স্‌পিয়রের হাতের লেখা প্রত্যক্ষের গোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্তাধীন , আর, সেক্‌স্‌পিয়রের অন্তর্নিহিত কবিত্বরস প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়াই তাহা অনুকরণের আয়ত্ত-বহির্ভূত। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, কালিদাসও সেক্‌স্‌পিয়রকে অনুকরণ করিয়া দেশী সেক্‌স্‌পিয়র হ'ন নাই, সেক্‌স্‌পিয়রও কালিদাসকে অনুকরণ করিয়া বিলাতি কালিদাস হ'ন নাই ; নেল্‌সন্‌ও নেপোলিয়নকে অনুকরণ করিয়া জলপথের নেপোলিয়ন হ'ন নাই, নেপোলিয়ন্‌ও নেল্‌সনকে অনুকরণ করিয়া স্থলপথের নেল্‌সন্ হ'ন নাই , রামমোহন রায়ও লিউথরকে অনুকরণ করিয়া দেশী লিউথর হ'ন নাই—লিউথরও রামমোহন রায়কে অনুকরণ করিয়া বিলাতি রামমোহন রায় হ'ন নাই। যা'র যা তারে সাজে—সেক্‌স্‌পিয়রের কবিত্ব সেক্‌স্‌পিয়রকেই সাজে, কালিদাসের কবিত্ব কালিদাসকেই সাজে (সুবিখ্যাত Emerson তাই বলিয়াছেন, 'Shakespeare never will be made by the study of Shakespeare' সেক্‌স্‌পিয়র পড়িয়া কোনো জন্মেই কেহ সেক্‌স্‌পিয়র হইতে পারিবেন না) , নেপোলিয়নের যুদ্ধ-কৌশল নেপোলিয়নকেই সাজে, নেল্‌সনের যুদ্ধ কৌশল নেল্‌সন্‌কেই সাজে ; একজনের অনুকরণ আর একজনকে সাজে না—একজাতির অনুকরণ আর এক জাতিকে সাজে না। Muse কে সাড়ী পরা সাজে না; (কোনো বঙ্গ কবি যদি মহারাজ-হংসের (Swan-এর) কণ্ঠের সহিত রূপসীর কণ্ঠের তুলনা

---

মূল অর্থ যখন একই প্রকার, তখন বাঙ্গালি সাহেবেরা কোন্ যুক্তিতে Sir উপাধিকে স্বর্গের সোপান এবং বাবু উপাধিকে পাতালের সোপান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন— বুঝিতে পারি না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয় যে, মাণ্ডারীন্ উপাধি চীন্‌কেই সাজে আর কোনোজাতিকেই সাজে না, সেখ্ উপাধি মুসল্‌মানকেই সাজে—ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেও সাজে না—পাদ্‌রি সাহেবকেও সাজে না; বাবু উপাধি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিকেই সাজে—ইংরাজকে সাজে না ; Sir উপাধি ইংরাজকেই সাজে বাঙ্গালিকে সাজে না।

যেন, তবে তাহারই নাম সরস্বতীকে গৌন পরানো) ; পদ্ম-মৃণালের আগায় গোলাপ ফুল সাজে না, গোলাপের ডালে পদ্ম-ফুল সাজে না,—যাহা সাজে না তাহা আপনার গাত্রে বলপূর্ব্বক সাজাইতে যাওয়ার নামই অনুকরণ।

অনুকরণ যে কাহাকে বলে সে বিষয়ে এক্ষণে আর অধিক বাকব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না, কিন্তু অনুকরণ যে, কাহাকে বলে না, সে বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ একটি কথা এখনো আমাদের বলিবার আছে—সেটি এই যে, আদর্শের প্রতিকৃতি অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে। মনে কর দুই জন চিত্রকর এক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন, আর মনে কর যে, প্রথম চিত্রকর সুন্দর একটি ছবি চিত্রপটে উদ্ভাবন করিয়াছেন ; সেই অঙ্কিত চিত্রটি দেখিয়া দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদ্বোধন হইল ; তাহার পরে সেই দ্বিতীয় চিত্রকর উদ্বোধিত ভাবটিকে পটে অভিব্যক্ত করিতে গিয়া প্রথম চিত্রটির অবিকল অনুরূপ দ্বিতীয় একটি চিত্র তাঁহার হস্ত দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। এরূপস্থলে প্রথম চিত্রটিকে আমরা বলিতে পরি—আদর্শ, এবং দ্বিতীয় চিত্রটিকে আমরা বলিতে পারি— তাহার প্রতিকৃতি ; এ ভিন্ন দ্বিতীয় চিত্রটিকে প্রথম চিত্রের অনুকৃতি বলিতে পারি না : তাহা না বলিতে পারিবার কারণ এই যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি চিত্র দুই জনের সমান মনের ভাব হইতে উৎপন্ন হওয়াতেই সমান আকার ধারণ করিয়াছে, তা বই—একটার দেখা-দেখি আর একটা তাহার সমান হইয়া ওঠে নাই ; একটার দেখাদেখি যখন আর একটা জন্মগ্রহণ করে নাই তখন কাজেই একটা আর একটার অনুকৃতি বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারেন যে, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র-হইতে ভাব লইয়া তবে তো দ্বিতীয় চিত্রটি উৎপাদন করিয়াছেন—তবে আর কেমন করিয়া বলিব যে, দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্রের অনুকৃতি নহে? ইহার উত্তর এই যে, লোকে যেমন জলাশয় হইতে জল তুলিয়া কলস পূরণ করে সেরূপ করিয়া কেহ কোনো একটি ভাবকে বাহির হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্তরে পুরিতে পারে না— কেমন করিয়াই বা পারিবে? ভাব তো আর আকাশব্যাপী ভৌতিক পদার্থ নহে যে, তাহাকে একস্থান হইতে উঠাইয়া আনিয়া আরেক স্থানে রাখিতে পারা যাইবে : ভাব মানসিক পদার্থ— আকাশের মধ্য দিয়া মূলেই তাহার চলাচলি সম্ভবে না। অতএব, দ্বিতীয় চিত্রকর প্রথম চিত্র হইতে ভাব লইয়াছেন, ইহার অর্থ এরূপ না যে, প্রথম চিত্রটির গায়ে একটি ভাব আটা দিয়া জোড়া ছিল, সেখান হইতে তিনি তাহা উঠাইয়া লইয়া আপনার মনের ভিতরে পুরিয়াছেন; উহার অর্থ শুদ্ধ কেবল এই যে, প্রথম চিত্রটি দেখিবা-মাত্র দ্বিতীয় চিত্রকরের মনে একটি ভাবের উদ্বোধন হইল—বাহির হইতে ভাবের আগমন হইল না কিন্তু অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধন হইল ; —তাঁহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত ছিল তাহাই উদ্বোধিত হইল; যাহা মুকুলিত ছিল তাহাই বিকসিত হইল, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহাই অভিব্যক্ত হইল, কাজেই ভাব-গ্রহণ বলিতে বাস্তবিকই কিছু-আর বাহির হইতে ভাব-গ্রহণ বুঝায় না, প্রত্যুত অন্তর হইতে ভাবের উদ্বোধনই বুঝায়। এই জন্য, উদ্বোধিত ভাব হইতে যদি দৃষ্টপূর্ব্ব আদর্শের অবিকল অনুরূপও একটা প্রতিকৃতি উদ্ভাবিত হয়, তথাপি তাহা প্রতিকৃতি ভিন্ন অনুকৃতি-শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। এক নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে যখন শত সহস্র ফরাসীস্ সেনা তোপের মুখে জরাজীর্ণ সেতু অতিবাহন করিয়া শত্রুদের উপরে জয়লাভ করিল, তখন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হইল যে, যেমন নেপোলিয়ন—তেমনি তাঁহার ফরাসীস্ সৈন্য ; সে সৈন্য সম্বন্ধে

এরূপ বলা যাইতে পারে না যে, তাহারা নেপোলিয়নের দেখাদেখি সেই মুহূর্তেরই ভুঁই-ফোঁড় বীর ; এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, তাহারা গোড়া হইতেই বীর ; যে বীরভাব গোড়া হইতেই তাহাদের অন্তঃকরণে পুঁজি করা ছিল, নেপোলিয়নের দৃষ্টান্তে তাহাই উদ্বোধিত হইয়া উঠিল—এই বই আর কিছুই নহে। যেরূপ বীর-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নেপোলিয়ন স্বয়ং তোপের মুখে একপদ অগ্রসর হইলেন, সেইরূপ অন্তর্নিহিত বীরভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহার সৈন্যেরা তোপের মুখ শত পদ অগ্রসর হইল ; নেপোলিয়নের দেখাদেখি তাহারা তাহা করেও নাই—করিতে পারিতও না ; কেন না, তাহারা যখন তোপের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তখন নেপোলিয়নের আকার-প্রকার ভাব-ভঙ্গী নকল করিবার অবকাশ তাহাদের কোথায়? নেপোলিয়নের সৈন্যেরা যদি নেপোলিয়নের ধরণে ওয়েষ্ট্-কোটের পকেটে হাত দিয়া সমাহিত-ভাবে দাঁড়াইত, নেপোলিয়নের ধরণে চাপ-চাপ নস্য লইত, নেপোলিয়নী ঢঙের কোর্ত্তা পরিত, তাহা হইলেই প্রকাশ পাইত যে, তাহারা নিজের কোনো আন্তরিক ভাবের আবেগে না—খালি কেবল নেপোলিয়নের দেখাদেখি কার্য্য করিতেছে ; এইরূপ কার্যই অনুকৃতি শব্দের বাচ্য। এরূপ অনুকৃতি পরায়ণ সৈনাদিগের কোনো কার্য্যের মধ্যেই বীরত্বের প্রতিকৃতি সহস্র খুঁজিলেও পাওয়া যাইতে পারে না। ফল কথা এই যে, আন্তরিক ভাবের পুঁজি হইতে যে কার্য্য উৎসারিত হয়, তাহা দৃষ্ট-আদর্শের অবিকল অনুরূপ হইলেও তাহা অনুকৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারে না—তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচ্য। অন্তরে ভাবের খাঁকতি এবং বাহিরে চটক এই পিতা মাতা হইতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম অনুকৃতি। মোটামুটি সংক্ষেপে বলিতে হইলে—ভাব-মূলক কার্য্য যদি আদর্শের অনুরূপ হয়, তবে তাহা প্রতিকৃতি শব্দের বাচ্য, আর, ভাব-শূন্য কার্য্য যদি যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ভাবে কৃত হয় তবে তাহাই অনুকৃতি শব্দের বাচ্য। অনুকৃতির ললাটে এই বাক্যটি ছাপ দেওয়া আছে যে, Letter killeth, মৌখিক শব্দ—বিনাশের পথ ; এবং প্রতিকৃতির ললাটে এইরূপ ছাপ দেওয়া আছে যে Spirit giveth life, আন্তরিক ভাব জীবনের উৎস। মূলেই যাঁহার সুরবোধ নাই তিনি যত বড়ই ওস্তাদের নিকটে গান শিখুন্ না কেন—শিখিবার মধ্যে তিনি কেবল ওস্তাদের মুদ্রাদোষটিই শেখেন—যেহেতু তাহা তাঁহার চক্ষের প্রত্যক্ষ বিষয় ; সুর-বোধ যদি চক্ষে দেখিবার বস্তু হইত তবে ওস্তাদের দেখাদেখি যেমন করিয়া তাঁহার মুদ্রা-দোষ জন্মিয়াছে তেমনি করিয়া তাঁহার সুরবোধ জন্মিতে পারিত। একজন উদ্যানের মালী দিবা-রাত্রি ফুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে অথচ ফুলের সৌন্দর্য্য যে, কাহাকে বলে, তাহার বিন্দু বিসর্গও সে হয় তো জানে না ; একজন কবি কোনো একটি ফুলের হয় তো নামধাম কিছুই জানেন না—অথচ ফুলটি দেখিবামাত্র তিনি হয় তো তাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যা'ন ; মালী[illegible] কবির সেই বিমোহিত অবস্থার ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিলেই কবির সৌন্দর্য্য-রস-বোধ[illegible] স্বীয় মনোমধ্যে আঁকড়িয়া পাইত—তবে পৃথিবীতে আর কবি ধরিত না। অতএব বীরত্বই হউক, রসবোধই হউক্, প্রীতিই হউক্ ভক্তিই হউক, নয়নের অপ্রত্যক্ষ অন্তঃকরণের যে কোনো ভাবই হউক, তাহারই সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, যাহার অন্তরে যাহা নাই তাহা তাহাকে অনুকরণের ঝিনুকে করিয়া কোনো মতেই গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। তবে কি? না সহবাস, দৃষ্টান্ত এবং শিক্ষার গুণে যাহার অন্তরে যাহা প্রসুপ্ত আছে তাহাই উদ্বোধিত হয়, যাহা মুকুলিত আছে তাহাই বিকসিত হয়, যাহা প্রচ্ছন্ন আছে তাহাই অঙ্কুরিত হয়। ভস্মে

আহুতি দিলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে না—অগ্নিতে আহুতি দিলেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

এ সম্বন্ধে কিন্তু অতীব একটি সারবান্ বাক্য উদীরণ করিয়াছেন সেটি এই ; — "Unto every one that hath shall be given and he shall have abundance ; but from his that hath not shall be taken away even that which he hath"—যাহার আছে সে আরো পাইবে—একগুণের জায়গায় শতগুণ পাইবে ; কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে তাহাও তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইবে" ; এ কথাটির মূল্য লক্ষ টাকা। তাহার সাক্ষী—যৎকিঞ্চিৎ যাহার সুরবোধ আছে সে ওস্তাদের সাক্রেতি করিলে আরো অধিক পরিমাণে সুরবোধ উপার্জ্জন করিবে ; কিন্তু যাহার মূলেই সুরবোধ নাই সে ওস্তাদের সাক্রেতি করিলে উপার্জ্জন করিবার মধ্যে কেবল মুদ্রা-দোষ উপার্জ্জন করিবে—গুণ উপার্জ্জন না করিয়া দোষ উপার্জ্জন করিবে। যাহার ঘটে নাই পুঁজি—সে যদি ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যায়, তবে সে—ধন উপার্জ্জন না করিয়া ঋণ উপার্জ্জন করিবে ; পূর্ব্বে তাহার টাকা না থাকার দুঃখ যেমন ছিল—আর এক দিকে—ঋণ না থাকার সুখ তেমনি ছিল, সে-সুখটিও তাহার ঘুচিয়া যাইবে। অতএব, বাহির হইতে ভাবের পুঁজি সংগ্রহ করিতে হইলে, অন্তরে ভাবের পুঁজি পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত থাকা আবশ্যক , বিদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি উপার্জ্জন করিতে হইলে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতিই তাহার একমাত্র গোড়ার বনিয়াদ ; কেন না, জল যেমন জল আকর্ষণ করে, টাকা যেমন টাকা আকর্ষণ করে, ভাবের পুঁজি তেমনি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করে, তা ভিন্ন, ভাবের খাঁক্তি ভাবের পুঁজিকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

কি ইউরোপ কি ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যে, মাতার স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার শৈশবকাল হইতে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তির প্রাণের অভ্যন্তরে দিন দিন ক্রমশঃই গাঢ় হইতে গাঢ়তর-রূপে বদ্ধমূল হইয়া আসিতে থাকে। এইরূপ করিয়া সকল দেশেরই ভদ্রসমাজে সদ্ভাব এবং সদাচারের একটানা স্রোত ক্রমাগতই প্রবাহিত হইয়া আসিতে থাকে। বাঙ্গালী-সন্তান যেমন বাঙ্গালা ব্যাকরণ না পড়িয়াও অনর্গল বাঙ্গালা কহিতে শেখেন, তেমনি বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াও স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার চতুর্দ্দিক হইতে আত্মসাৎ করিতে থাকেন। স্বদেশীয় ভাষার ব্যাকরণ এবং সমাজের ব্যবস্থা-প্রণালী যদি প্রতি ব্যক্তিকেই নিজের প্রযত্নে গড়িয়া লইতে হইত, তবে মাতৃভাষাও কোনো দেশে ভূমিষ্ঠ হইতে পারিত না, আর, ভদ্র সমাজও কোনো দেশে মস্তক তুলিতে পারিত না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, বঙ্গ সন্তানের শৈশবকাল হইতে অন্যূন আঠারো বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত শিক্ষা উপার্জ্জনের কাল , সেই মুখ্য সময়টির মধ্যে স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার যাঁহাদের মনের অভ্যন্তরে রীতিমত আড্ডা গাড়িতে না পায়,—সেই মুখ্য সময়টিতে যাঁহারা স্বদেশে থাকিয়াও স্বদেশীয় ভালো কোনো কিছুরই মর্ম্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষার বয়সটি চলিয়া গেলে, তাঁহারা যে, কিরূপে বিদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করিবেন—তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। অতএব ক্রাইষ্টের এ কথাটি অতীব সত্য যে, যাহার আছে সে আরো পায়, কিন্তু যাহার নাই তাহার যাহা আছে তাহাও যায় , তা'র সাক্ষী—স্বদেশের ভাষা-জ্ঞান এবং ভদ্র রীতি-নীতির সংস্কার গোড়া হইতেই যাঁহাদের অন্তঃকরণের মধ্যে পুঞ্জীভূত আছে তাঁহারা

বিদেশে গেলে সেখানকার সার সার বস্তু-গুলি আকর্ষণ করিয়া আত্মসাৎ করেন—বিজ্ঞান শিল্প কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা কার্য্য-নৈপুণ্য তেজস্বিতা মহত্ত্ব পরানুকরণে বিরাগ এইগুলি আত্মসাৎ করেন; পূর্ব্ব হইতেই যাঁহাদের আছে তাঁহারা আরো পা'ন , কিন্তু যাঁহাদের গোড়া ফাঁক্‌ড়ি—স্বদেশীয় ভদ্র রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের মর্ম্মরসের আস্বাদ যাঁহারা জানেনও না জানিতে চাহেনও না, তাঁহারা শিক্ষার্থে বিদেশে গেলে হিতে-বিপরীত করিয়া বসেন , যাঁহাদের নাই তাঁহাদের যাহা আছে তাহাও যায়। তাঁহাদের আপনাদের দেশের ভদ্রাভদ্রের তুলাদণ্ড যদি তাঁহাদের মনের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিত, তবে তাহা দিয়া তাঁহারা অন্য দেশের ভদ্রাভদ্র তৌল করিয়া দেখিয়া—তাঁহাদের পক্ষে যাহা ভাল তাহাই কেবল তাঁহারা গ্রহণ করিতেন , কিন্তু সে তুলাদণ্ড যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে নাই, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশীয় রীতি-নীতির ভালমন্দ যে তাঁহারা কিরূপে বোধায়ত্ত করিবেন, তাহা বুঝিয়া ওঠা ভার। ফলেও তাই দেখা যায় যে, অপক্কবুদ্ধি লঘুচিত্ত বঙ্গীয় যুবক ইংলণ্ডে গেলে সেখানকার সু, কু এবং চলন-সই, এই তিনপ্রকার বিরোধী সামগ্রীকে তিনি একাসনে বসাইয়া সু'য়ের অপমান করেন, কু'য়ের স্পর্দ্ধা বাড়াইয়া তোলেন, এবং অজ্ঞানের প্রবর্দ্ধককাচের মধ্য দিয়া তিল-প্রমাণ ক্ষুদ্র বিষয়কে তাল-প্রমাণ বড় দেখেন।* জ্ঞান-শিক্ষার জন্য তাঁহারা বঙ্গভূমি হইতে ইঙ্গভূমিতে প্রয়াণ করেন—ঢঙ শিক্ষা করিয়া তাঁহারা ইঙ্গ হইতে বঙ্গে ফিরিয়া আসেন। এইরূপ করিয়াই আমাদের দেশে সাহেবিআনার সূত্রপাত হইয়াছে এবং এখনো তাহার জের চলিতেছে। অতঃপর সাহেবিআনা রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া অচিরাৎ তাহার একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আনুপূর্ব্বিক নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগের যন্ত্রণা হইতে আপনাদিগকে শীঘ্রই অব্যাহতি প্রদান করিতেছি—আপনারা সুস্থির হউন্।

ইতিপূর্ব্বে বারবার বলিয়াছি যে আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই পক্ষে সাম্য-পন্থী চিকিৎসাই সবিশেষ ফলপ্রদ। "সর্ব্বে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"—সাহেবিয়ানার ভিতরেই সাহেবিআনার ঔষধ জাগিতেছে, এখন তাহাকে নারিকেলের শাঁসের মতো চাঁচিয়া বাহির করিয়া লইতে জানিলে হয়! সাহেবদিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী প্রভৃতি বাহ্য আবরণের ভিতরে

---

* বাঙ্গালি সাহেবেরা যে, বাস্তবিকই ইংরাজী তিলকে তাল দেখেন এবং বাঙ্গালি তালকে তিল দেখেন, তাহার প্রমাণ সেদিনকার সভাস্থলে হাতে হাতে পাওয়া গেল। একজন বক্তা উঠিয়া বলিলেন "মেষের চামড়া মেষকে সাজে—বৃকের চামড়া বৃককে সাজে , বাঙ্গালিরা আগে বৃক হো'ন্ তবেই বৃকের চামড়া তাঁহাদের গায়ে মানাইবে আগে তাঁহারা সাহেবদের মতো তেজী পুরুষ হো'ন তবেই তাঁহাদের গায়ে সাহেবি ঢঙের কোর্ত্তা মানাইবে"—যেন হ্যাটকোট তেজস্বিতার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। পুরাণের ভীমসেন তো আর মেষ ছিলেন না—বৃকোদর তিনি বৃকই ছিলেন , তিনি কি ইংরাজি ঢঙের কোট পরিতেন? হ্যানিবাল্ কি রোমান ঢঙের পরিচ্ছদ পরিতেন? পরানুকরণ তো আর তেজিয়ান বীরপুরুষের লক্ষণ নহে—তাহা লেজিয়ান্ বীর হনুমানেরই লক্ষণ। তাহার সাক্ষী—ইংরাজিতে Aping (হনুকরণ) বলিয়া যে একটি শব্দ আছে তাহা আপনিই আপনার বীর-বংশের পরিচয় দিতেছে। ইংরাজি তিল'কে যাঁরা তাল দেখেন আর বাঙ্গালি তালকে যাঁহারা তিল দেখেন তাঁহারাই ইংরাজি ঢঙের কোর্ত্তাকে সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করেন, আর, দোদুল্যমান সহজশোভন ধুতিচাদরের যেমন একতরো অকৃত্রিম শোভা তাহার প্রতি তাঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ।"

বিজ্ঞান তেজস্বিতা আত্মনির্ভর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা কার্য্যনৈপুণ্য কর্ম্মিষ্ঠতা এই সার পদার্থগুলি জাগিতেছে ; সেগুলিকে এক কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে, তাহার নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ; এইটিই হ'চ্চে সাহেবি উপকরণ-গুলির মাতৃক সত্ত্ব কিনা mother tincture ; এই মাতৃক সত্ত্বটি জলে গুলিয়া গুলিয়া তাহার তেজ কমানো চাই—নহিলে তাহা বাঙ্গালিদিগের সেবনোপযোগী হওয়া দুষ্কর। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যেরূপ মহত্ত্ব এবং তেজস্বিতা তাহাতে পরানুকরণের নীচত্ব তাহার ত্রিসীমার মধ্যে পা বাড়াইতে সাহসী হয় না ; তাহার সাক্ষী—ইংরাজেরা জর্ম্মানদিগের নিকট হইতে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান আদায় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবে না, কিন্তু জর্ম্মানদিগের কথাবার্ত্তার ভাবভঙ্গী, রকম-সকম, আপনাদের মধ্যে চালাইতে কিছুতেই সম্মত হইবে না ; জর্ম্মানেরা ইংরাজদিগের নিকট হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের রীতি পদ্ধতি আদায় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, কিন্তু ইংরাজদিগের আকার-প্রকার ভাবভঙ্গী কখনই আপনাদের মধ্যে প্রচলিত করিতে প্রাণান্তেও চাহিবে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই এইরূপ* বাঙ্গালিরা যদি ইউরোপীয়দিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শুদ্ধ কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আপনাদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মতো করিয়া গড়িয়া ল'ন, তবে তাঁহারা সাহেবিআনা রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একটা জাতির মতো জাতি হ'ন। তাই আমরা বলি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই সাহেবিআনা-রোগের মহৌষধ।

উপসংহার কালে "মধুরেন সমাপয়েৎ" এই বচনটি আমার মনের সম্মুখে আসিয়া দুই

---

* নিতান্ত কাছাকাছি-দেশস্থ ব্যক্তিদিগের মনের ভাব যেহেতু অনেক অংশে সমান, এই জন্য তাহাদের মধ্যে বেশ-ভূষাদির অনুকরণ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত পক্ষে অনুকরণ নহে , কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমান মনের ভাব হইতে সমান কার্য্য অভিব্যক্ত হইলে তাহা অনুকৃতি শব্দের বাচ্য নহে—তাহা প্রতিকৃতি শব্দেরই বাচ্য। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি , তাহা হইলেই এখানকার এই কথাটির মর্ম্ম বুঝিবার পক্ষে আর কোনো গোল থাকিল না। "নাচের উপযোগিতা" এই ভাব হইতে ইংরাজ এবং ফরাসীস্ উভয় জাতিরই মজলীষী ঘাগ্‌রা এবং কোর্ত্তাদির আঁটা সাঁটা সাজ উদ্ভূত হইয়াছে , উভয় জাতির মনের ভাব এইরূপ সমান হওয়াতে ইংরেজেরা পারিস্ ঢঙ্ অনুকরণ করিলে তাহাদের স্বপক্ষে এইরূপ একটি কথা। বলিবার থাকে যে, সেরূপ ঢঙ্ তাহাদের নিজের মনের ভাবেরই প্রতিকৃতি। পক্ষান্তরে "নাচের উপযোগিতা" এ ভাবটি বাঙ্গালিদের মনে কোনো পুরুষেই নাই—এ অবস্থায় বাঙ্গালিরা যদি উহাদের দেখাদেখি ঐরূপ ঢঙের অনুকরণ করেন, তবে তাঁহাদের স্বপক্ষে কাহারো এরূপ কথা বলিবার জো থাকে না যে সে ঢঙ্ তাঁহাদের মনের ভাবের প্রতিকৃতি , যেহেতু তাহা অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তেমনি বাঙ্গালিদের সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন—"জল খাবার" এই ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (কেননা মিষ্ট দ্রব্য জল পিপাসার উদ্দীপক) , পক্ষান্তরে—ইংরাজদের শুক্‌না বিস্কুট আদি ভক্ষ্য সামগ্রী "মদ খাবার" এই ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (কেননা সেইরূপ সামগ্রীই মদের চাটের উপযোগী)। এ অবস্থায়—বাঙ্গালিরা যদি সন্দেশ আদির পরিবর্ত্তে বিস্কুট-আদির ব্যবহার আপনাদের মধ্যে চালা'ন্—তাহা হইলে তাহা অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তবে, এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে দ্বিতীয় উদাহরণটা অনেক স্থলে না খাটিবারই কথা।

হাত দুইদিকে প্রসারণপূর্ব্বক পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান— ইহাকে আমি লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ। আর্য্যামি এবং সাহেবিআনার বিপক্ষে আমি অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু দোহাব সপক্ষে একটা কথা যাহা আমার বলিবার আছে তাহাতেই উভয়ের সাত-খুন-মাপ! সেই কথাটি বলিয়াই আমি প্রস্তাব সাঙ্গ করিতেছি। আর্য্যামিকে আমি এই জন্য ভাল বলি যেহেতু তার গর্ভে আর্য্যোচিত কার্য্য ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় জাগিতেছে ; আর সাহেবিআনাকে আমি এইজন্য ভাল বলি যেহেতু তাহার গৃহ্যভ্যন্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা গোকুলে বাড়িতেছে। আর্য্যামির গর্ভ হইতে যখন আর্য্যোচিত কার্য্য ভূমিষ্ঠ হইয়া কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিবে তখন সে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পাণিগ্রহণ করিবে , তাহার পরে আর্য্যোচিত কার্য্যের ঔরসে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার গর্ভে তিলোত্তমার ন্যায় একটি পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিবে , তাঁহার নাম পঞ্চবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা, এ সভ্যতার পাত্রে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং ইউরোপীয় আর্য্যদিগের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ দুইই একাধারে সম্মিলিত হইবে—এইটি যে দিন হইবে সেইদিন ভারতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দিনের অবসান হইবে। এইখানেই শান্তিঃ শান্তিঃ।

# সোনার কাটি রূপার কাটি *

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্য এখানে আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাঁহার মুখ-মণ্ডলের আদিম নিষ্কলঙ্ক অবস্থায়, শীত কালের রাত্রে হিহি করিয়া লেপ মুড়ি-সুড়ি দিয়া বা বর্ষা-রাত্রের সুধীর ধারায় যখন ভেকের কোলাহল মুহুর্মুহু জাগিয়া উঠে তখন ঘরের এক নিভৃত কোনে জড়-সড় হইয়া, অথবা বৈশাখের ফুর্‌ফুরে সন্ধ্যা-সমীরণের সহিত ফিন্‌ফিনে উড়ানীর সখ্য-বেগ সম্বরণ-পূর্ব্বক ছাদে মাদুরের উপরে অর্দ্ধ-উপবিষ্ট বা অর্দ্ধ-শয়ান হইয়া, দিদিমা মা কাকীমা জেঠাইমা পিসিমা বা মানুষকারিণী ধাত্রীর মুখের পানে নয়ন-মন ঘণ্টা-দুয়ের মত গচ্ছিত রাখিয়া, সোণার কাটি রূপার কাটির গল্পের মাঝে মাঝে হুঁ না-দিয়াছেন, কিম্বা সেই উপন্যাসের পৃষ্টে "তা'র পর তা'র পর" শব্দের চাবুক কখনো বা মৃদু-ভাবে কখনো বা সজোরে প্রয়োগ না করিয়াছেন।

সাহসে ভর করিয়া তো অতগুলা কথা বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু তবুও আমার মনোমধ্যে নানা প্রকার কিন্তু হইতেছে। বর্ত্তমন শতাব্দী যেরূপ দ্রুত পদক্ষেপে ইংরাজী সভ্যতার লৌহবর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছে (ধন্য বলি তোমাদের দুই ভাইকে—বাষ্পীয় জলযান এবং স্থলজান।) তাহাতে এত দিনে বোধ করি রাক্ষসদিগের "হাঁউ মাঁউ খাঁউ" গর্জ্জন-ধ্বনি জম্বুদ্বীপ হইতে শ্বেতদ্বীপে (ইংলণ্ডে) চম্পট প্রদান পূর্ব্বক "ভারতবর্ষের ছেলে-ভুলানো উপকথা" নামক কোন একটি ইংরাজি পুস্তকের পরিশিষ্ট মহলের নোট x, y, বা z কোটার অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিতেছেন; এবং দৈবযোগে তাহা আমাদের দেশের কোনো কুমারী লীলাবতী (সংক্ষেপে Lilly) তর্কালঙ্কার M. A'র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে তিনি ঈষৎ মুখ মুচ্‌কিয়া তাঁহার সহাধ্যায়িনীকে বলিতেছেন, "প্রিয় সখি! এই বইখানি প'ড়ে আমি অবাক হ'য়েছি! আমাদের দেশের আগেকার লোকেরা রাক্ষস বিশ্বাস ক'রতো! ছেলেবেলা-থেকে মা'য়ের দুধের সঙ্গে কুসংস্কার গিলে গিলে না জানি বড় হ'লে তারা কি ভয়ানক অদ্ভুত জানোয়ার হ'য়ে দাঁড়া'ত! আমার এই বিশ্বাস যে, এখনো যদি আমরা আমাদের একরত্তি হাড় মেডিকেল্ কালেজে পরীক্ষার জন্য পাঠাই, তবে নিশ্চয়ই তাহার মধ্য হইতে অর্দ্ধেকের বেশী কুসংস্কারের গাদ বাহির হইয়া পড়িবে। তাই বলি, প্রিয়সখি! আমি আমার নক্ষত্রকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি ইংরাজি ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" কুমারী Lilly তর্কালঙ্কার M. A. বিদুষী বটেন—কিন্তু তিনি জানেন না যে, ইংরাজি শিশু-ভুলানিয়া উপন্যাসমুলুকেও রাক্ষসের অভাব নাই। তা'ছাড়া ইঙ্গল্যাণ্ড এবং বঙ্গল্যাণ্ডের রাক্ষসীদের হাঁকডাকের মধ্যে খাপে খাপে মিল রহিয়াছে এম্নি চমৎকার যে, তাহা তাঁহার শিক্ষাদাত্রী ইংরাজ-কুমারীদিগের স্বপ্নেরও অগোচর। তার সাক্ষী :—

| বাঙ্গালী রাক্ষসীর হাঁকডাক | ইংরাজ রাক্ষসের হাঁকডাক |
|---|---|
| হাঁউ মাঁউ খাঁউ।<br>মানুষের গন্ধ পাঁউ! | Fi! Fo! Fum!<br>I smell the blood of and Englishman. |

* কলকাতায় সাবিত্রী লাইব্রেরীর ১২৯১ সালের ২৭শে মাঘের অধিবেশনে পঠিত।

যেরূপ এখন সুসভ্য প্রণালীতে আমাদের বালকদিগের কুসংস্কারের মূলে কুঠারঘাত করা হইতেছে, তাহাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ের ভিত্তিমূল পর্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে, ও তাহার সমস্ত গাঁথনি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। বালকের পিতা যখন বালককে কোনো খাদ্য সামগ্রী দে'ন তখন পাঠশালার বালক বলে "ধন্যবাদ বাবা"—ইস্কুলের বালক বলে "Thank you বাবা;" বালক যখন যুবা হইবেন, তখন পিতাকে বলিবেন "Governor." যুবা যখন প্রৌঢ় হইবেন—যখন হ্যাট্‌কোটের তা' লাগিয়া লাগিয়া তাঁহার হাড় পাকিয়া উঠিবে—তখন পিতাকে বলিবেন "Old fool" বুড়া মূর্খ,—এইরূপ করিয়া যখন আমাদের দেশের সমস্ত কুসংস্কার একে একে তিরোহিত হইয়া যাইবে, তখন নবতম যুগের নবতম বিধানের নবতম জ্যোতিতে, সুবিখ্যাত রেম্ব্রান্টের চিত্রকর্মের ন্যায়, আমাদের দেশীয় কালো মুখের অর্দ্ধভাগ সাদা হইয়া উঠিবে—মুখমণ্ডলের যে পার্শ্বটা পূর্ব্বপুরুষ ঘেঁসা সে পার্শ্বটা চিরকালই কালো থাকিবে, আর, যে পার্শ্বটা ইংরেজ ঘেঁসা সে পার্শ্বটা সাদা হইবে। এইরূপ আমাদের দেশের মুখ অতি এক পরমাশ্চর্য্য দোরঙ্গা শ্রী ধারণ করিয়া জগৎশুদ্ধ লোকের বাহবা-ধ্বনি এবং করতালি আকর্ষণ করিবে।

আমি যেন চক্ষে দেখিতেছি যে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কেহ অধীর হইয়া আমাকে একই কথাটি বলিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছেন যে "তোমার যদি এতই মনে ভয়—যে, কৃতবিদ্য লোকেরা তোমার অদ্ভুত শিরোনামাটির অর্থ বুঝিবেন না (সত্য বলিতে কি—উহার অর্থ না-জানা দলের মধ্যে আমিও একজন, ও আমার বিশ্বাস এই যে, ও-সকল অলীক গল্প শৈশব কর্ণ হইতে যত দূরে থাকে ততই ভাল) তবে তুমি একটা কাজ কর না কেন—উহার একটা শক্ত সংজ্ঞা দেও—rigid definition দেও—তাহা হইলেই সমস্ত বিবাদ মিটিয়া যাইবে!" ইঁহার এই সৎ পরামর্শটি আমি মাথায় করিয়া গ্রহণ করিলাম। অতএব বলি শুন—

(১) যে কাটি ছোঁয়াইবা মাত্র মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার হয়, তাহার নাম সোনার কাটি।

(২) যে কাটি ছোঁয়াইবা মাত্র জীবন্ত দেহ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার নাম রূপার কাটি।

ইহার উপর তো আর কোন কথা নাই?

আমাদের দেশের কোনো কোনো মহাপুরুষ ধরা'কে এক পাক, আধ পাক বা সিকি পাক প্রদক্ষিণ করিয়াই তাহাকে সরার মত দেখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া যখন মাতাঠাকুরাণীর মুখে বা গৃহিণীর মুখে মাছের ঝোল রন্ধনের কথা শোনেন, তখন তাহার অর্থ কিছুতেই তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম না হওয়াতে—তাঁহারা চট্‌পট্ অভিধান খুলিয়া সতেজে পাত উল্‌টাইতে থাকেন। কিন্তু আমাদের শিরোনামাটির অর্থ আমি যখন ইউক্লিডের শক্ত নিয়মে আট-ঘাট বাঁধিয়া প্রদর্শন করিয়াছি, তখন কেহ যে পাশ্চাত্য কলাইয়া বলিবেন যে, "ওঃ বুঝিলাম! মেম্‌সাহেবরা যে-রকমের দুইটা কাটি গোঁজাগুঁজি করিয়া মোজা নির্ম্মাণ করেন—সেই রকমের দুইটা কাটি;—একটা সোনার, একটা রূপা'র!" এরূপ যে বলিলেন, সে স্বর্গীয় সুখে এ যাত্রার মত তাঁহাকে অগত্যা বঞ্চিত হইতে হইল।

সমাজ-সম্মার্জ্জক বক্তারা যখন বক্তৃতা-কালে মুখ ব্যাদান করেন, তখন যদি সেই মুখদ্বারে অনুবীক্ষণ ধরা যায় তাহা হইলে এক জিহ্বার পরিবর্ত্তে দুই জিহ্বা স্পষ্ট দেখা দিয়া উঠে,—তাহাই সোনার কাটি, রূপার কাটি। তেমনি আবার প্রত্যেক সংবাদ পত্র সম্পাদকের কলম

দানে দুইটি করিয়া কলম থাকে—তাহাও সোনার কাটি, রূপার কাটি। একটি লেখনী বা রসনা জ্যান্ত মানুষকে বা সমাজকে মারিয়া রাখিবার গুণ জানে—সেইটি রূপার কাটি, আর একটি লেখনী বা রসনা মৃত মনুষ্যকে বা সমাজকে বাঁচাইয়া তুলিবার গুণ জানে—সেইটি সোনার কাটি।

আমাকে আপনারা কি ঠাওরান বলিতে পারি না, কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি সোনার কাটি রূপার কাটি ঝুলির ভিতর করিয়া আনিয়াছি। মা ভৈঃ, আপনারা ভয় পাইবেন না—আমি কোনো মনুষ্যের গায়ে রূপার কাটি ছোঁয়াইব না। নীচত্ব বলিয়া একটা কদর্য্য পিশাচ আছে, সেই মায়াবী পিশাচ কখনো বা উদারতার ছদ্মবেশে, কখনো বা সুবিধার ছদ্মবেশে, আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার উপর বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারই গাত্রে আমি রূপার কাটি ছোঁয়াইব। আবার, মহত্ত্ব বলিয়া একজন দিব্য মহাপুরুষ আছেন, তিনি হুজুকের ছাই এর গাদায় চাপা পড়িয়া সমাধিস্থ হইবার যোগাড় হইয়াছেন, তাঁহারই গাত্রে আমি সোনার কাটি ছোঁয়াইব। আমার অভিপ্রায় এই রূপ—সু বই কু নহে; অতএব আপনাদের কাহারো কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

কেহ বলিতে পারেন যে, "আহা বেচারা নীচত্বকে সকলেই লাঞ্ছনা দ্যায় ধিক্কার দ্যায়—গলা ধাক্কা দ্যায়—উহার মা বাপ উহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না—উহার ঘরেও স্থান নাই বাহিরেও স্থান নাই;—উহার উপরে আর কেন। মড়া'র উপরে খাঁড়ার ঘা কেন? উহাকে কৃপাকটাক্ষে ক্ষমা করাই উচিত।" এ কথাটি পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বে উক্ত হইলে তাহার উপর আমি দ্বিরুক্তি করিতাম না। কথাটা কিছু হাস্যজনক হইল—ক্ষমা করিবেন। দ্বিরুক্তি করিব কি—উক্তিই তখন আমার ছিল না, শুধু তাহা নয় যিনি উক্তি করিবেন তিনিও তখন অনুপস্থিত; অতএব ও কথাটা চাপা দেওয়া যাক্। ও কথা বলিবার আমার এইমাত্র তাৎপর্য্য যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাই হো'ক না কেন—এখন আর নীচত্বকে লাথি-ঝাঁটা বা গলাধাক্কার ভয়ে অজ্ঞাতবাসের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না,—এখন নীচত্ব দিব্য রথারোহণ করিয়া রাজপথে বিচরণ করে—অবিতর্কিত-ভাবে রাজসভার চূড়া স্থানে বসিতে আসন পায়—এখন সে মনে করিলেই হাতে মাথা কাটিতে পারে এমনি তাহার প্রখর বীর্য্য—এমনি তাহার দোর্দণ্ড প্রতাপ। নীচত্বকে গরিব দীন হীন কৃপাপাত্র বলা এখন আর সাজে না। এখন নীচত্ব আমাদের কাছে ক্ষমতাশালী বড় লোক; আমরা তাহার কাছে দীন হীন ক্ষুদ্র লোক। বরং তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিলে তাহাতে তাঁহার পৌরুষ আছে—আমরা যে তাঁহাকে ক্ষমা করি সে অধিকারই আমাদের নাই। দুর্ব্বলের ক্ষমা কাপুরুষতার আর এক নাম; বলবানের ক্ষমাই প্রকৃত ক্ষমা। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি ভুয়ের তাড়নায় বলবানের অত্যাচার ক্ষমা করে, সে ব্যক্তির যেমন ক্ষমা, আর যে ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বলবান্ শত্রু-পক্ষের সহিত বন্ধুতা পাতায়, তাহারো সেইরূপ বন্ধুতা। ওরূপ ক্ষমা—দেখিতে সুকোমল পুষ্পরাশি, কিন্তু উহার তলে তলে প্রতিহিংসা-রূপী কাল সর্প দংশনের অবসর খুঁজিয়া ছট্‌ফট করিয়া বেড়ায়। প্রজাপীড়ক রাজা যখন দুর্ব্বলের লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করেন ও বলবান্ শত্রুর গুরুপাপ স্বীয় উদারতা গুণে ক্ষমা করেন—সে ক্ষমা ঐরূপ বিষাক্ত ক্ষমা। সে বন্ধুতাও—সকল বড় ভাল নহে—তাহা শত্রুতার গুপ্তচর। পরম সাধু শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা দয়ার্দ্র হৃদয়ের বেগ সামলাইতে না পারিয়া যখন দেশবিদেশে বন্ধুতা ছড়ান—সে বন্ধুতা ঐ ধরণের বন্ধুতা।

পৃথিবীর সমস্ত রাজনীতি মহলে রূপার কাটির সংস্পর্শে বন্ধুতা অনেক কাল-যাবৎ মৃত হইয়া পড়িয়া আছে ও স্বার্থ-সিদ্ধি তাহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া—অতিশয় সুবিজ্ঞ পাকাচালে পরের বসত-বাটীতে পদ-প্রসারণ ও ঘটী-বাটীতে হস্ত প্রসারণ এই দুই কার্য্য অতিরিক্ত মাত্রায় আরম্ভ করিয়াছেন! স্বার্থ-মহাপুরুষ যখন উদারভাবে ক্রোড় প্রসারিত করিয়া ভিন্ন জাতিকে আলিঙ্গন করেন, তখন সে আলিঙ্গন ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গন,—লোহার ভীম হইলেও আলিঙ্গিত ব্যক্তি সে আলিঙ্গনের যাঁতায় পরিপিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ময়দা বনিয়া যায়। সকল-অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, সেই ময়দার পুতুলেরা উদারতা ও সমদর্শিতা ফলাইয়া ঐ প্রকার ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক প্রেম ও সদ্ভাব বিস্তার করিতে যা'ন—প্রেম বিস্তারের তাঁহার আর স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না!

প্রেম বিস্তারের একটি বিহিত পদ্ধতি আছে। আগে প্রেম পরিপুষ্ট হয়, তাহার পরে তাহা বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম গৃহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয় তাহার পরে তাহা দেশে বিস্তৃত হয়। প্রথমে প্রেম স্বদেশে পরিপুষ্ট হয়, তাহার পরে তাহা বিদেশে বিস্তৃত হয়। অগ্নির ন্যায় প্রেমের স্বভাবই প্রসারিত হওয়া। তাহা ক-হইতে খ'য়ে ও খ-হইতে গ'য়ে প্রসারিত হয়; কিন্তু খ ডিঙাইয়া গ'য়ে প্রসারিত হয় না—গ ডিঙাইয়া খ'য়ে প্রসারিত হয় না। আপনার দেশের প্রতি তোমার প্রেম যথোচিত পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই যদি তাহা চকিতের মধ্যে সাত সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া আসর জমকিয়া বসে, তবে সে প্রেমের ভিতর কোন পদার্থ নাই—কোন রসকস নাই—তাহা অন্তঃসারশূন্য অলীক আড়ম্বর মাত্র। এইতর অকালপক্ক প্রেম হৃদয় জননীর গর্ভে আড়াই মাস বাস করিয়াই রসনার বক্তৃতায় বা লেখনীর প্রবন্ধে ভূমিষ্ঠ হয়। এ সকল ইচড়ে পাকা প্রেম হাঁটিতে শিখিবার পূর্ব্বেই দৌড়িতে ও লম্ফ দিতে আরম্ভ করে। কথা কহিতে শিখিবার পূর্ব্বেই লেনিস্ গ্রামার পড়িতে আরম্ভ করে। আপনার মা-বাপের পরিচয় পাইতে না পাইতেই অপর লোককে মা বাপ বলিতে শেখে। এ প্রেম একটি মহাবীর,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ইনি স্বীয় জন্মভূমির ভাল মন্দ সমস্ত বস্তুকে পুড়াইয়া ছারখার করিতে পারেন ও সাত সমুদ্র চকিতের মধ্যে লঙ্ঘন করিয়া তাহার পারস্থিত অজ্ঞাত অপরিচিত ভূমিতে নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠার পণ্ডশ্রমে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ব্যাপৃত হইতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহাকে ধৈর্য্যের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখাই দুষ্কর। এইরূপ ভূতগত প্রেমকে কেহ বলেন সার্ব্বভৌমিক উদারতা, কেহ বলেন বিশ্বব্যাপী সমদর্শিতা—আমরা বলি গাছে-না-উঠিতেই-এক-কাঁদি! এরূপ উদারতা ও সমদর্শিতার গাত্রে রূপার কাটি ছোঁয়ানো অতীব কর্ত্তব্য।

প্রকৃত সমদর্শিতা কাহাকে বলে? না "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"—যিনি সর্ব্বভূতকে আপনার মত করিয়া দেখেন তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে দেখেন। এ সমদর্শিতা পূর্ব্বকালে যোগী-ঋষি শ্রেণীর মহাত্মাদিগের মধ্যে কচিৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহা মৌখিক সভ্যতার সাত হাত জলের নীচে চাপা পড়িয়া নিতান্ত মরণাপন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কাহারো গাত্রে সোনার কাটি ছোঁয়াইতে হয় তবে উহারই গাত্রে তাহা আগে ছোঁয়ানো কর্ত্তব্য। কিন্তু এখনকার যাঁহারা সমদর্শী তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ যে, পরকে আপনার মত দেখা যদি সমদর্শিতা হয়, তবে আপনাকে পরের মত দেখা সমদর্শিতা না হইবে কেন? "ডাইন্ হস্ত বাম হস্তের সমান" ইহা বলাও যা, আর, "বাম হস্ত ডাইন হস্তের সমান" ইহা বলাও তা'—একই কথা! কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, ডাইন্ হস্তকে বাম

হস্তের সমান বলিলে ডাইন হস্তের অপমান করা হয় ও বাম হস্তকে ডাইন্ হস্তের সমান বলিলে বাম হস্তের মান বাড়ানো হয়, তখন তাহাকে "একই কথা" বলিব কেমন করিয়া? মান বর্দ্ধন করা এবং মান খর্ব্ব করা কিছু তো আর একই কথা নহে। তেমনি আবার, "পর'কে আত্ম-তুল্য দেখিবে" বলিলে বুঝায় যে পর'কে এখন যত ভালবাসো তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে। "আপনাকে পরের মত দেখিবে" বলিলে বুঝায় যে, আপনাকে এখন যত ভালবাসো তাহা অপেক্ষা কম ভালবাসিবে;—কম ভালবাসা এবং বেশী ভালবাসা তো আর একই কথা নহে! যদি আপনাকে কম ভালবাসাই শ্রেয় হয়, তবে পরকে আত্ম-তুল্য ভালবাসিতে গেলে পরকেও কম ভালবাসিতে হয়,—ইহাতে ভালবাসার মাত্রা লাঘব ভিন্ন আর কোনো ফলই দর্শে না। এই কথাটির মর্ম্ম বিধিমত হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা যদি স্বজাতিকে আপনার নিকটতম জানিয়া তাহাকে রীতিমত ভালবাসার চক্ষে দেখি, স্বজাতির পৈতৃক কোনো কিছুই দু'চক্ষের দেখিতে পারিনা! আমাদের স্বজাতির পৈতৃক সৎকীর্ত্তি, সদাচার, সদ্ভাব, সম্মান সমস্তই যদি আমরা অতি যত্নের সহিত রক্ষণ ও বর্দ্ধন করি, তবেই আমরা অন্য জাতির প্রতি ভালবাসা বিস্তার করিবার অধিকারী হই, আর, অন্য জাতিও আমাদের স্বজাতিকে একটা জাতির মত জাতি জানিয়া আমাদের সহিত বন্ধুতা করিয়া সুখী হয়। কিন্তু আমরা ইংরাজী পড়িয়া এরূপ এক অধম জন্তু বনিয়া গিয়াছি যে, আমরা স্বজাতির পৈতৃক কোনো কিছুই দু'চক্ষে দেখিতে পারিনা! আমাদের স্বজাতির শত্রুবর্গেরা যেমন আমাদের জাতির মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পায় না, আমরা নিজে আমাদের নিজের জাতিকে তাহা অপেক্ষাও বিষ-দৃষ্টিতে দেখি! আমরা আপনারা যাচিয়া আপনাদের শত্রুপক্ষের দলে মিশি, আপনারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদের পর হই! পর'কে আপনার করিতে পারা যেমন একটি মহৎ গুণ, আপনাকে পর করিয়া ফেলা তেমনি একটি মহৎ দোষ। এ দুটি বিরোধী বস্তুকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখা কিছু আর সমদর্শিতা নহে—তাহা যার পর নাই স্থূল-দর্শিতা। আমরা যদি ইংরাজদিগকে বাঙ্গালী করিতে পারি তবে তাহাতে আমাদের যেমন অসাধারণ ক্ষমতা ও পৌরুষ প্রকাশ পায়, তেমনি ইংরাজি যাত্রার দলের অধিকারীরা তুড়ি দিবামাত্র আমরা যদি যাত্রার সঙের ন্যায় ইংরাজি নাচ নাচিতে আরম্ভ করি, তবে তাহাতে তেমনি আমাদের অসাধারণ কাপুরুষত্ব প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের নাই বলিয়া কি শেষোক্ত অসাধারণ কাপুরুষত্ব'কে মাথায় করিয়া পূজা করিতে হইবে? ইহা তো কোনো শাস্ত্রেই লেখে না!

কিন্তু আমাদের দেশে আজ কাল নূতনত্বের ভান উল্টা-ডিগ্‌বাজি খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে এম্নি প্রবল বেগে যে, বক্তা-মহোদয়েরা এ কথা বলিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন না যে, "লোকে বলে বেল পাক্‌লে কাকের কি—আমি বলি যে, কাক পাক্‌লে বেলের কি! শাস্ত্রে বলে যে, পর'কে আপনার মতো দেখিবে, আমি বলি যে, আপনাকে পরের মতো দেখিবে—এবং ইহাকেই আমি বলি প্রকৃত সমদর্শিতা। ইঁহাদের হিত পরামর্শ যদি শোনো—তবে আপনাকে একজন সাতপুরুষে গোরা লোকের মতো ধবলাঙ্গ, দেখিবে, আপনার গৃহিণীকে মেম্ সাহেবের মতো দেখিবে; আমাদের এ দেশ যদিও উষ্ণপ্রধান তথাপি ইহাকে শীতপ্রধান ইংলণ্ড দেশের মতো দিবাকরের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জিত দেখিবে; আর মনে করিবে যে তুমি কাল প্রত্যূষে সবে মাত্র জাহাজ হইতে নামিয়াছ—ইহার পূর্ব্বে তুমি কিম্বা তোমার কোনো পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষের ত্রিসীমা মাড়ায় নাই; মনে করিবে যে বাঙ্গালী ভদ্রলোক বলিয়া যে একটা শব্দ

আছে, ইহার তুমি বাষ্পও জান না—সুতরাং বাঙ্গালীকে নিগর্ ভিন্ন আর যে কি বলিবে তাহা তুমি খুঁজিয়া পাইতেছ না! কাচ-পোকার আলিঙ্গনে গা ঢালিয়া দিয়া আর্সুলা যেমন কাচ-পোকা বনিয়া যায়, সেইরূপ পরের স্বাধীনতায় ঘাড় পাতিয়া দিয়া আপনি পর্য্যন্ত আপনার পর হইয়া মনুষ্য জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবে।"

এরূপ সমদর্শিতার একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহা অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, নূতন কিছুই গড়িবার প্রয়োজন হয় না—আপনাদের ভাল যাহা কিছু আছে তাহা ভাঙিয়া ফেলিলেই অভীষ্ট কার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পরিপাটীরূপে সমাধা হইতে পারে। ইউরোপীয় বিজ্ঞান-মহলে বহু কাল ধরিয়া এই একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে প্রকৃতি শূন্য স্থানের প্রতি আত্যন্তিক বীতরাগ (Nature abhors vacuum)। এ প্রবাদটি ফলিয়াছে যেমন আমাদের দেশে—এমন আর কোথাও না। ভিতর হইতে বাঙ্গালীরা হিন্দুত্বকে যতই দূর করিয়া দিতেছে—উপর হইতে ততই ইংরাজিত্বের গুরু ভার অবতীর্ণ হইয়া তাহার স্থানে জুড়িয়া বসিতেছে। অতএব বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা পরিচ্ছদ, বাঙ্গলা জাতি-কুল-মান—সমস্তকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া বক্তৃতার অ্যাক্-তোপে উড়াইয়া দেও এ পথের ইংবাজদিগকে করযোড়ে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলো যে, "দেখ আমরা কি মহৎ কার্য্য সমাধা করিলাম! কে বলে যে আমরা নির্বীর্য্য বাঙ্গালি; আর কি তোমরা আমাদিগকে নিগব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারো? আর আমরা হিন্দু নহি—আমরা এক এক জন এক এক উন্নতিশীল দেশহিতৈষী মহাবীর!" যে-কোনো জাতি হউক না কেন, সেই জাতিই এইরূপ সুলভ মূল্যে সমদর্শিতা ক্রয় করিতে পারে। ইংরাজেরা যদি ইচ্ছা করে তবে তাহারা স্বজাতির স্বজাতিত্বকে রসাতলে দিয়া রাতারাতি ফরাসীস হইয়া দাঁড়াইতে পারে;—তখন যদি কোনো বড়-লোক ইংরাজকে তাঁহার ভৃত্য মোসিও বলিয়া সম্বোধন করিতে তিলমাত্রও বিলম্ব করে, প্রভু অমনি তাহাকে ঘুসার চোটে আদব কায়দা শিখাইতে উদ্যত হইবেন, তখন সম্ভ্রান্ত ইংরাজদের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা পরস্পরকে গুড় মর্নিঙ্ না করিয়া বোঁজিওর মোসিও বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন, কিন্তু সে দিনের এখনো অনেক বিলম্ব আছে। বাঙ্গালীর সহবাসের বাতাস লাগিতে লাগিতে যদি কোনো সুদূর ভবিষ্যৎ কালে তাঁহাদের কঠিন অস্থিতে নোনা ধরিয়া তাহা মোমের মত পরহস্তে নম্র হইয়া উঠে—তবেই যাহা হউক, কিন্তু কলিযুগের এদিকে তাহার বিশেষ কোনো সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে আমি কেমন যদি'র কথা বলিতেছি,—যদি ইংরাজেরা কখনো সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের ন্যায় পরম দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, তবে তাঁহারা স্বজাতির স্বজাতিত্ব লোপ করিয়া অন্য জাতির স্বদেশকে আপনাদের হোম্ বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিবেন, ও দূর হইতে দূরবীণ কসিয়া, কোকিলের ন্যায় সেই পর-গৃহের গার্হস্থ্য সুধামৃত আস্বাদন করিয়া কার্দিজের মূল্যে "সমদর্শী" নাম ক্রয় করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তত দেশহিতৈষী হন'ও নাই, তাহার কথাও নাই। আমার মতো অকর্ম্মণ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ় ব্যক্তিরা বলিতে পারে যে, "উহা তো আর সমদর্শিতা নহে—উহা ভিন্ন-জাতিকে আপনার জাতির মাথায় চড়ানো।" কিন্তু লোকের কথায় কি আসে যায়—বিশেষত নিগর্ বাঙ্গালিদের কথায়! যদি সমদর্শী হইতে চাও তবে বাঙ্গালী লোকে কী বলিবে না-বলিবে—সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া—ফিরিঙ্গী লোকের অমোঘ মহাবাক্য গুলিকে মাথা'র হ্যাট্ এবং গলার কলর্ করিবে।

অন্যান্য সভ্য জাতিরা স্বজাতির স্বাজাতিত্ব রীতিমত রক্ষা করিয়া ভিন্ন জাতির সহিত

ভ্রাতৃসৌহার্দ্যে মিলিত হয়; কিন্তু আমরা নাকি সকল অপেক্ষা অধিক সভ্য,—মুসলমান জাতি বলো—ফরাসিস জাতি বলো—ইংরেজ জাতি বলো—পূর্ব্বতন হিন্দু জাতি বলো—সকলকার অপেক্ষা আমরা নাকি অধিক উন্নত, অধিক বিদ্বান্, অধিক বুজদার, তাই আজিও কেহ যাহা পারে নাই আমরা তাহা অম্লান বদনে করিতে যাইতেছি! আমরা স্বজাতির স্বজাতিত্ব একেবারেই লোপ করিয়া পরজাতির আলিঙ্গনের জটিল নাগ-পাশে ইচ্ছা করিয়া আপনাকে ধরাবাঁধা দিতেছি। মাকড়সার পা-গুলা বড় বড়, ইহা দেখিয়া মাছি মনে করিতেছে, যে মাকড়সার কাছে কিছুদিন সাকরেতি করিলেই তাহারও ঐরূপ অসাধারণ পদ-বৃদ্ধি হইতে পারে, এই ভাবিয়া মাছিটি মাকড়সার জাল-প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে!

ভেক এবং সারসের ইতিহাস কাহারো অবিদিত নাই। একদল ভেক সারস-পক্ষীর সমীপে গিয়া তাহাকে জোড় করে নিবেদন করিল যে, "হে উচ্চ পদারূঢ় শুভ্রবর্ণ শুভ্রান্তঃকরণ সারসপক্ষী, আমাদের রাজা এই একটা নির্জীব কাষ্ঠ-খণ্ড বই না—ইহার রাজত্বে আমাদের কোনো শুভ নাই। তুমি যদি আমাদের প্রতি সদয় হইয়া আমাদের রাজ-সিংহাসন অধিকার কর, তবে আমরা সকলে মিলিয়া যাবজ্জীবন তোমার জয়-জয়কার করিব। তা শুধু না—বক্রগতি নৃশংস সর্পেরা ঝোপঝাপের আড়ালে মাথা গুঁজিয়া যেখানে সুনির্ভয়ে বাস করে সেই সকল গহন বনে প্রতিদিন দলবল-সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিবে।" ভেকদিগের এরূপ শাঁসালো এবং রসালো আহ্বানে সারসের কর্ণ কখনও বধির থাকিতে পারে না; তিনি আড়চক্ষে ভেক-রাজ্যের চতুঃসীমায় একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই সিংহাসনের উপর ধীরে ধীরে এক চরণের পর আর এক চরণ বাড়াইলেন, আর দুই চরণ যখন সে ভিত্তিমূলের উপর দৃঢ়রূপে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি প্রজাগণের ক্রন্দন জন্মের মতো ঘুচাইবার জন্য টুপ্‌টাপ করিয়া রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই প্রজাদিগের আনন্দের গগনভেদী উচ্ছ্বাস শোকাশ্রুধারায় পরিণত হইতে লাগিল; ও ঘরে ঘরে মড়াকান্না পড়িয়া গেল। আমাদের দেশের বক্‌বক্‌কারী ভেকের দল চাহেন যে শুভ্র সারসবৃন্দ একবার কৃপাকটাক্ষ দেখুন যে, আমাদের নিজের জাতি নাই, গৌরব নাই পরিচ্ছদ নাই, আমরা অতি-ই অসভ্য, অতি-ই বর্ব্বর,—তাঁহাদের কৃপা-ই আমাদের অকূলের কূল। আইস আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে "আমরা যখন এত উদার হইতে পারিলাম যে, আমাদের জাতিকুলমান সমস্তই আমরা তোমাদের সভ্যতা সলিলে ধৌত করিয়া ফেলিতে একটু কুণ্ঠিত লজ্জিত বা সন্তপ্ত নহি তখন তোমরা কি আমাদের প্রতি এ টুকুও উদারতা প্রদর্শন করিতে পারিবে না যে, তোমাদের বাম চরণের সুমার্জ্জিত উপানতের অর্থাৎ বুটের সোণার কাটি ছোঁয়াইয়া কাঙ্গালী বাঙ্গালী-জনের মৃত শরীরে জীবনসঞ্চার করিবে। বাবু উপাধি আর তো আমাদের সহ্য হয় না! ধুতি চাদর আমাদের গাত্রে রাই সোর্শের বেলেস্তারা ঠ্যাকে! জঘন্য বাঙালী নাম বাঙ্গালা ভাষা, হিন্দু নাম, হিন্দু ভাষা, আমাদের কর্ণকুহরে বিষ বর্ষণ করে! অতএব হে শুভ্রবর্ণ শুভ্রহৃদয় সারস পক্ষী সকল! তোমরা এ অধীন ভেক মণ্ডলীকে সমূহ দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর! তোমরা আমাদিগকে তোমাদের স্বজাতি বলিয়া—নিদেন পক্ষে উইরেসিয়ান (অর্থাৎ ভেক-সারস) বলিয়া—তোমাদের বুট মণ্ডিত পাদপদ্মের আশ্রয়ে টানিয়া লও—তোমাদের শ্রীচরণের পাদুকা-ই আমাদের ভবার্ণবের ভেলা—তোমরাই আমাদের বিপদ্-সাগরের একমাত্র কাণ্ডারী!" চুপকান করা শুভ্রান্তঃকরণ সারস-পক্ষী যে অভিপ্রায়ে ভেকদিগের

মধ্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন, তাহা সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে ভেকদিগের অত বেশী অনুনয়-বিনয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই;—ভেকেরা যে কি উপাদেয় বস্তু সারসের তাহা বিলক্ষণই জানা আছে। ভেকেরা কাকুতি মিনতি করিয়া অধিক কি আর জানাইবেন? বরং সারস পক্ষী ভেকদিগের বকবক বকুনি এবং থপ্‌থপ্ লাফানি'তে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে চরণের আশ্রয় না দিয়া চরণের ঠোকর দিবেন কি না তাহাই ভাবিতে থাকেন; পরে অনেক বিবেচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন যে, আপাতত একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া চরণ সম্বরণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সারস ভাবেন যে, "সকল পক্ষিজাতির মধ্যে বকজাতি পরম ধার্ম্মিক বলিয়া চির প্রসিদ্ধ,—আমরা সেই বক-জাতির বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কুল শ্রেষ্ঠ সারস পক্ষী। সকল জীবেরাই জানে যে, আমরা যেমন প্রজাবৎসল এমন আর কেহই না। অতএব এই ভেকগুলোকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারা-ই কর্ত্তব্য!" এই ভাবিয়া সারসপক্ষী যখনই চঞ্চুচালনা করেন, তখনই শ্বেত পক্ষ দিয়া চক্ষু আচ্ছাদনপূর্ব্বক সে কার্য্যে সতর্কতা'র সহিত প্রবৃত্ত হ'ন। এইরূপে সারসপক্ষী স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিধিমতে অনুষ্ঠান করিতেছেন ও জন্ম জন্ম অনুষ্ঠান করিবেন , কী? না সুধীর পাকা চা'লে ছুঁচ্ হইয়া প্রবেশ করিয়া ফাল্ হইয়া বাহির হওয়া। ভেকেরাও স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিধিমতে অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং জন্ম জন্ম অনুষ্ঠান করিবেন; কী? না সকলে মিলিয়া সমস্বরে বক্ বক্ ধ্বনি করা। এইরূপে রাজা প্রজা উভয়ে মিলিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে এমনি প্রচণ্ড বেগে যে, দেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে বলিবে শেষে "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।"

ভেকেরা যদি স্বজাতিত্বের কোন প্রকার বাঁধ বাঁধিয়া তাহার ভিতরে আপনাদিগকে কোন-মত প্রকারে সাম্‌লাইয়া রাখিতে পারেন, তাহা হইলে কালক্রমে তাঁহারা আপনাদের জাতিসুলভ উপায় অবলম্বন করিয়া বড় বড় সোণা ব্যাঙ্ হইয়া উঠিতে পারেন। তাহা যদি তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটে, তবে তখন মণ্ডূক গলাধঃকরণ সারসের পক্ষে বিষম কষ্টকর হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু ভেকেরা আপনাদের জাতিসুলভ উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারসের পরিচ্ছদ পরিয়া সারস হইবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন—এই এক নূতন রহস্য!

আমাদের নামের শিরোভাগে বাবুশব্দ প্রয়োগ না করিয়া তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে ইস্কোএয়ার শব্দের লাঙ্গুল জুড়িয়া দেওয়া অতি সহজে হইতে পারে—যে কেহ মনে করিলেই তাহা করিতে পারে; কিন্তু তত সহজে আপনার বা স্বদেশের উন্নতিসাধন কাহারো কর্ত্তৃক ঘটনীয় নহে। আমরা মনে করিলেই এক লম্ফে গাছে উঠিতে পারি, কিন্তু সেরূপ করিয়া উন্নতির সিঁড়ি ভাঙিয়া ব্যোমোমঞ্চে উত্থান করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমরা এরূপ লঘুচিত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছি যে, যে কার্য্য আমরা জগঝম্প বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া, বীরত্ব ফলাইয়া একলম্ফে সাধন করিতে পারি তাহা অতি যৎসামান্য হইলেও আমাদের চক্ষে তাহা অতি বড় মহৎ কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ও ধীর গম্ভীর ভাবে যথাবিহিত সদুপায় অবলম্বন না করিলে যে-কার্য্য সাধন করা যায় না তাহা অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য হইলেও—অতি মহৎ-কার্য্য হইলেও—আমাদের চক্ষে তাহা অতি যৎসামান্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। আমরা ভাবি যে, আপনার দেশের গৌরব বাঁচাইয়া—মহত্ত্ব বাঁচাইয়া—রীতিমতো স্বদেশের উন্নতি-সাধন করা ভূতগত পরিশ্রমের কার্য্য—তাহা করিবার জন্য কাহার কী এত গরজ পড়িয়াছে। পৃথিবী-যোড়া উদারতা—জগৎ-

যোড়া সমদর্শিতা—ইংলণ্ড-যোড়া অনুকরণ ক্ষেত্র—এ সকল তো আমাদের হাতের কাছে রহিয়াছে,—উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেই অনায়াসে আমরা তাহা করায়ত্ত করিতে পারি—অতি সুলভ মূল্যে মহাবীর উপাধি ক্রয় করিতে পারি। তাহার উপায় হ'চ্ছে এই—আপনাদের যাহা কিছু ভাল বলিয়া জানো—ভদ্র রীতি বলিয়া জানো—দেশের গৌরব বলিয়া জানো—পিতৃপুরুষদের মহামূল্য দান বলিয়া জানো—তাহা সুগন্ধ পঙ্কজ-কানন হইলেও—উন্মত্ত হস্তিযূথের ন্যায় তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফ্যালো। স্বদেশের যে কোনো চিরপ্রথিত কীর্ত্তিস্তম্ভের শিখর-প্রদেশে যে-কোনো আলোক দেখিতে পাও—জ্ঞানের আলোকই হউক—প্রেমের আলোকই হউক—ধর্ম্মের আলোকই হউক—বক্তৃতার ঝড়ে সমস্তই নির্ব্বাণ করিয়া ফ্যালো। তাহার পর এরূপ একটা বৃহদাকার প্রদাহক ও প্রবর্দ্ধক কাঁচ প্রস্তুত কর যে, তাহা ইংলণ্ডের তিল-প্রমাণ বস্তুকে তাল প্রমাণ করিয়া বাড়াইয়া তুলিতে পারে, ও তাহার মধ্য দিয়া ইংলণ্ডের সমস্ত প্রতাপের আলোক আমাদের দেশের মস্তকের উপর কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। সেই প্রতাপানলের উত্তাপে যখন আমাদের দেশে' সমস্ত মস্তিষ্ক দ্রবীভূত হইয়া রাস্তা ঘাটে গড়াইয়া যাইতে থাকিবে, তখন উদারতা-প্রভৃতি ধেড়ে ধেড়ে কতকগুলি শব্দের প্রকাণ্ড ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া সেই জ্বলন্ত মস্তিষ্করাশিকে সেই সকল ছাঁচে ঢালিয়া স্বদেশের উন্নতির নানা প্রকার উপকরণ গড়িয়া তুলিতে থাকিবে, তাহা হইলে আপনার সার্ব্বভৌমিক উদারতা প্রকাশেরও অবশিষ্ট থাকিবে না, স্বদেশের উন্নতি সাধনেও অবশিষ্ট থাকিবে না।

আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশের মধ্যে এখনো এরূপ অনেক সদাচার আছে—সাধুতা আছে ভদ্রতা আছে—বিনয় আছে—মনুষ্যত্ব আছে—যাহা অন্যত্র কোথাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না; কিন্তু আমরা মনে ভাবি যে, ও সকল তো আমরা চিরকালই দেখিতেছি—দেখিয়া দেখিয়া আমাদের চক্ষুতে মেড়ো পড়িয়া গিয়াছে! আবশ্যক হইলেই যখন আমরা অন্যের ধন ভিক্ষা করিতে পারি তখন স্বীয় পৈতৃক ধন রক্ষক ও বর্দ্ধন করিবার কষ্টের বোঝা শুধু শুধু কেন স্কন্ধে বহন করিব? অতএব পৈতৃক সদাচার জলে নিক্ষেপ কর, পৈতৃক সুরীতি, সৌজন্য, সুপরিচ্ছদ, সমস্তই জলে নিক্ষেপ কর,—এইরূপে ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া আম্রবৃক্ষের পরিবর্ত্তে ফল রাণী ষ্ট্রবেরি (কিনা টেপারির বড়দিদি) রোপন কর, শতদল শ্বেতপদ্মের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দল ইউরোপীয় লিলি রোপন কর; বীণাপাণি সরস্বতীকে মিউসের মিউ মিউ ছন্দে আহ্বান কর, মাল্যচন্দনে ভূষিত বেদীকে কালো ঘ্যাটাটোপে ঢাকা পুল্‌পিটের মতো করিয়া গঠন কর ও বক্তাকে শুভ্র পট্টবস্ত্রের পরিবর্ত্তে কালো গাউন পরাইয়া বিলাতি মুর্দাফরাস সাজাও। যাহা কিছু প্রবল জাতির তাহার সাত খুন ক্ষমা কর—শত্রুর গোলাম হও! আর যাহা কিছু স্বজাতির চিরারাধ্য গৌরবের বস্তু তাহার গাত্রে রূপার কাটি ছোঁয়াও—দুর্ব্বলের যম হও। এই সমস্ত উপায় অবলম্বনপুরঃসর এক যৎসামান্য কাণাকড়ির মূল্যে জগদ্ব্যাপী উদারতা ও সমদর্শিতা ক্রয় করিয়া পুত্র পৌত্রানুক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে থাকে।

আমরা এককালে বলবান্ জাতি ছিলাম—এখন দুর্ব্বল হইয়াছি। কিন্তু সূর্য্য যখন অস্ত যায় তখন তাহা সূর্য্যই থাকে—জোনাকি পোকা হয় না। পুরুরাজ আপনার অস্তগমনের সময় বীরকেশরী আলেকজাণ্ডারকে মহত্ত্ব যে বলে কাহাকে তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছিলেন—দেখাইয়াছিলেন যে, পিঞ্জরস্থ সিংহও সিংহ! আলেকজাণ্ডার যখন বন্দীকৃত পুরুরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার নিকট হইতে তুমি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, পুরুরাজ বলিলেন—

"যেরূপ ব্যবহার রাজার প্রতি রাজার কর্তব্য।" পুরুরাজ যদি আমাদের ন্যায় উন্নতমনা হইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে "তোমাকে আমাকে তোমাদের একজন জাতি ভাই বলিয়া গ্রহণ করিলেই আমি পরম কৃত-কৃতার্থ হইব।" আমাদের আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিতে যদি এতই আমাদের লজ্জা বোধ হয়—আপনার পিতাকে যদি পিতা বলিতে লজ্জা বোধ হয়, তবে যাঁহাদের আমরা রাশি রাশি পুস্তক কণ্ঠস্থ করিতেছি, তাঁহাদের নিকট হইতেও তো তাঁহাদের মহত্ত্বটুকু আমরা শিক্ষা করিতে পারি—তাহাই বা করি কই? ইংরাজেরা তাঁহাদের দেশের বিদ্যার্থী জন সাধারণের উপকারার্থে স্বদেশীয় ভাষাতেই গ্রন্থাদি রচনা করেন, তা' বই—বিশেষ কোনো গুরুতর কারণ উপস্থিত না হইলে অন্য দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন না;—এইটি কেন আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে না শিখি? আমরা তাঁহাদের এত এত বিদ্যা শিখিতেছি, কেবল ঐটি শিখিলেই কি আমাদের জাতি যাইবে। ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা বিদ্যা শিখিতেছি বলিয়াই যে, তাঁহাদের ভাষার জোয়াল আমাদের ঘাড় পাতিয়া দিতে হইবে—ইহার যে কি বাধ্য-বাধকতা তাহা তো দেখিতে পাই না। ইংরাজেরা তো আমাদের নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না হউক পরোক্ষ সম্বন্ধে বীজগণিত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, তা বলিয়া তাহারা কি আমাদের ভাষায় তাহার অনুশীলন করে? ইউরোপীয় জাতি উক্ত বিদ্যা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আরবদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে—তা বলিয়া কোন ইউরোপীয় জাতি আরবী ভাষায় তাহার অনুশীলন করে? কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত Science Association আমাদের না ইংরাজদের? যদি তাহা আমাদেরই হয়, তবে সেখানে অন্ততঃ— কেন আমরা আমাদের নিজের ভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন না করি?* ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার ব্যবহার আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিলে—তো কোনো কথাই ছিল না, তাহা হইলে এতদিনে আমরা জাতির মতো জাতি হইতাম—মানুষের মতো মানুষ হইতাম। কিন্তু অপারগমানে আমরা বিদেশী ইংরাজদের নিকট হইতে মহত্ত্ব শিক্ষা করিলেও কতকটা আমাদের দাঁড়াইবার স্থান হয়। যে পর্যন্ত আমরা ইংরাজদের বাহ্যঃপরিচ্ছদ ভেদ করিয়া তাহাদের দেশের মহত্ত্বটুকুর মর্ম্মে তলাইতে না পারিতেছি, সে পর্যন্ত তাহাদের বিদ্যা শিখিলেই বা কি আর শিল্প শিখিলেই বা কি— কিছুতেই কিছু হইবে না—তাহাতে ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে। জঠরা নল না থাকিলে যেমন অন্ন পরিপাক পায় না—মহত্ত্ব না থাকিলে সেইরূপ বিদ্যা পরিপাক পায় না—নীচান্তের উপর যতই বিদ্যার জ্যোতি নিপতিত হয় ততই—কোথায় তাহার আলোক বৃদ্ধি পাইবে—না কেবল তমো-ই বৃদ্ধি পাইতে থাকে,—হিতে বিপরীত হয়। ইংরাজী পুঁথি-গত বিদ্যাটি ইংরাজদের নিকট হইতে আদায় করা খুব সুবিধা বটে, কিন্তু ইংরাজদের দেখাদেখি আমরা যদি স্বদেশীয় ভাষায় আমাদের শিক্ষিত বিদ্যার অনুশীলন করি, তবে তাহাতে আমাদের দেশে সুবিধার একটা বালির বাঁধ শুধু না—পরন্তু মহত্ত্বের শৈলদুর্গ—স্বাধীনতার ভিত্তিমূল—প্রতিষ্ঠিত করা হয়;—এই সোজা কথাটা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। হায়! আমরা কি কেবল আপাত-সুলভ সুবিধাই খুঁজিয়া বেড়াইব? ভাবী-মঙ্গলের নিদান যে মহত্ত্ব, তাহার

* এখানে লেখকের মানস অভিলাষ ব্যক্ত করা হইল মাত্র,—উক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি দোষারোপ করা এখনকার তাৎপর্য নহে,—ব্যাপারটি অতি কঠিন—প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় যত দূর করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্বদেশস্থ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র ইহাতে আর কাহারো দ্বিমত হইতে পারে না।

প্রতি কোনো কালেই কি আমাদের চক্ষু ফুটিবে না? ইংরাজেরা তো সুবিধা-হস্তীর পদতলে স্বজাতির স্বজাতিত্বকে দলিত বিদলিত করিয়া বধ করেন না! আমাদের দেশের লোক যেমন সুবিধার কারণ দর্শাইয়া বিদেশীয় গলবস্ত্রকে স্বদেশীয় কণ্ঠের হার, বিদেশীয় কালো চোঙার টুপিকে স্বদেশের মাথার মুকুট করিতে তিলমাত্রও লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করেন না, কোন্ ইংরাজ সেরূপ স্বজাতিত্বের অবমাননা আপনার গাত্রে এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করিতে পারে? তাহা যদি পারিত, তবে আমাদের এই উষ্ণ দেশে উত্তাপের কারণ দর্শাইয়া স্বচ্ছন্দে তাহার ধুতি-চাদর পরিয়া শরীরের অর্দ্ধেক ভার লাঘব করিত—তাহাদের হাড়ে বাতাস লাগিত—এ যাত্রার মতো তাহারা বর্ত্তিয়া যাইত!

ইংরাজদের এই যে একটি—রসনাগত নয়—কিন্তু—অস্থিগত—মজ্জাগত—মর্ম্মগত স্বদেশানুরাগ, এটি যদি আমরা তাহাদের নিকট হইতে শিখিতাম—তবে আর আমাদের ভাবনা ছিল না! তাহা হইলে এতদিনে আমাদের জাতির শ্রী ফিরিয়া যাইত—কিন্তু তাহা আমরা শিক্ষা করিব না,—ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা পরিবার সাজ শিক্ষা করিব, চলিবার ঢঙ্ শিক্ষা করিব, কথা কহিবার ধরণ শিক্ষা করিব, টুপি হেলাইবার কেতা শিক্ষা করিব, পা নাচাইয়া শিশ্ দিবার ভঙ্গী শিক্ষা করিব, খঞ্জন পক্ষীর মতো কোর্ত্তার ল্যাজ নাচাইয়া হাত নাড়িয়া বক্তৃতা করিবার হাব-ভাব শিক্ষা করিব, এইরূপ যত কিছু শিখিবার আছে সমস্তই নখিদ্ধ জাৎ কবিয়া ডারউইন সাহেবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের আগামী সংস্করণের নূতন এক অধ্যায়ের উপকরণ সংগ্রহ করিতে থাকিব।

সুবিধা স্বতন্ত্র এবং মহত্ত্ব স্বতন্ত্র। আমার নিজের যথেষ্ট অর্থ থাকিতেও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে আমি খুব সুবিধা মনে করিতে পারি, কিন্তু আমি সেরূপ কার্য্য করিলে আমার নীচত্ব আর কাহারো নিকটে অপ্রকাশ থাকিবে না।—যাঁহারা আপনাদের জাতিকুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া পরেদেব পদতলে মস্তক অবনত করিয়া তাহাদের জাতিকুল মানের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভিক্ষা করিতে আদবেই লজ্জা বোধ করেন না, তাঁহাদের নীচত্বের চিহ্ন তাঁহাদের ললাটময় ফুটিয়া বাহির হয়। তাঁহারা আপনারা তাহা দেখিতে পান না বটে কিন্তু দেশশুদ্ধ আর সকল লোকেই তাহা দেখিতে পায়;—দেখিয়া ভদ্রলোকেরা সত্য সত্যই মনোমধ্যে মর্ম্মান্তিক বেদনা অনুভব করেন। সে দিন লর্ড ডফরিন্ যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা তিনি কম দুঃখে বলেন নাই; Lord Dufirin কয়েকজন কোর্ত্তা-ধারী বিলাত ফের্ত্তা Mr অমুক'কে পষ্টাপষ্টি বলিয়াছিলেন—"তোমাদের এ-দুর্ব্বুদ্ধি কেন। তোমাদের আপনাদের দিব্য সুন্দর পরিধান বস্ত্র থাকিতে—পরজাতির নিকট হইতে বেমানান্ পরিচ্ছদ ধার করিতে যাও কেন?" ইহা-শ্রবণে লেখকের একজন আত্মবৎ প্রাণবন্ধুর মুখ হইতে নিম্নলিখিত দোহাটি (অর্থাৎ coupletটি) সহসা বাহির হইয়াছিল; যথা,—

এ'লেন বিলাত-ফের্তা গায়ে কোর্ত্তাকুর্ত্তি।
অর্দ্ধ গোরা, অর্দ্ধ কালা, বর্ণচোরা মূর্ত্তি॥

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, লোকদিগকে এইরূপ বুঝানো হইতেছে যে, "ডফরিনের মত অতবড় একজন তুখোড় গূঢ়াভিবন্ধি নয়-পণ্ডিত আমাদের এদেশে কখন পদার্পন করিয়াছেন কি না সন্দেহ! তিনি যাই-ই বলুন আর যাই ই করুন্—স্বীয় অন্তঃকরণ-মধ্যে তিনি এটি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে বাঙ্গালীরা একবার যদি হ্যাট-কোট পরিতে শেখে তবে আর রক্ষা থাকিবে

না। বাঙ্গালীরা হ্যাট-কোট পরিলেই তাহাদের বক্তৃতাশক্তি আকাশ ছাপাইয়া উঠিবে—ইংরেজি সরস্বতী উপর্যাচিকা হইয়া তাহাদের রসনায় আড্ডা গাড়িবেন—ও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেও তিনি সেখান হইতে নড়িবেন না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নিশ্চয়ই ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিনের মধ্যে একবার করিয়া প্রভাহই হ্যাট কোট পরিতেন, নহিলে তিনি কখনই অত বড় একজন দেশবিখ্যাত লোক হইতে পারিতেন না। এখনো যে এদেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ইউরোপে বিখ্যাত হইয়াছেন, তাহার নিগূঢ় কারণ অন্বেষণ করিলে নিশ্চয়ই বাহির হইয়া পড়িবে যে, তিনি প্রত্যহ দ্বিপ্রহর রজনীতে অতি সংগোপনে অন্তত একবার করিয়া হ্যাট কোট পরিধান পূর্ব্বক মস্তিষ্ক শানাইয়া ল'ন। বাঙ্গালীরা গোপনে হ্যাট-কোট পরিয়াই এই—প্রকাশ্যে হ্যাট-কোট পরিলে কি আর রক্ষা রাখিবে। তখন তাহাদের আর এক ভীষণ মূর্ত্তি হইয়া উঠিবে। সিক জাতি তখন তাঁহাদের কাছে কোথায় লাগে। তখন তাঁহাদের মুখের সাপটে ও পদের দাপটে হাইলাণ্ডরের রেজিমেন্ট-কে-রেজিমেন্ট্ ভয়ে কম্পমান হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের এইরূপ আসন্ন বিপদ দেখিয়া লর্ড ডফ্‌রিণের মতো অত বড় একজন দূরদর্শী বিচক্ষণ-ব্যক্তির আর-কি চুপ করিয়া থাকা শোভায়?—কাজেই তিনি চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া গোটাকতক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু যাঁহারা লর্ড ডফ্‌রিণের মাথার ভিতর অত-টা তলাইতে পারেন নাই, তাহারা আমাদের ন্যায় সাদাসিধা বুঝিয়াই ক্ষান্ত—তাঁহারা বলেন যে, লর্ড্ ডফ্‌রিন্ আপনি যেমন অন্য জাতির পরিচ্ছদ পরিয়া সঙ্ সাজিতে লজ্জা বোধ করেন—তাঁহার আপনার সেই মহত্ত্বটি তিনি আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতেও প্রত্যাশা করেন। মহৎ লোক মাত্রেই ভদ্রবংশীয় লোকের নীচত্ব চক্ষে দেখিতে পারেন না। লর্ড্ ডফ্‌রিণের অপরাধ এই যে তিনি অরুচির কর্ণে সুরুচির গোটা-দুই সৎপরামর্শ গিলাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। তাহা জীর্ণ হইবে কেন। তাহা যেমন কর্ণে-যাওয়া—আর-অগ্নি কালো কালো পিত্তের সহিত শ্রোতার মুখ-কন্দর এবং লেখনী-চঞ্চু হইতে উদবান্ত হইয়া রাজ্য-শুদ্ধ সংবাদ-পত্র ভাসাইয়া একাকার করিয়া দি'ল।

ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে যাঁহাদের সাধ যায়, তাঁহাদের অনেকে আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য পূর্ব্ব-হইতেই অনেকগুলি যুক্তি মুখস্থ করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হ'ন। কিন্তু সে যে তাঁহাদের যুক্তির ধারা, তাহা এরূপ উপহাসাস্পদ ও জঘন্য যে, তাহা উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। তাঁহাদের একটি প্রধান যুক্তি এই যে, রেলওয়ে-রক্ষক হ্যাট-কোটের ভেল্‌কি-বাজির চোটে বাঙ্গালীদিগকে ইংরাজ মনে করিয়া তদুপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে। ইংরাজী, বাঙ্গালী, সংস্কৃত, আরবি পারসি,—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, যে ব্যক্তি যাহা নয়—সে ব্যক্তি যদি তাহার মতো সাজ সাজে, তবে তাহার সেরূপ কার্য্য চৌর্য্যের পরাকাষ্ঠা—তাহা আত্ম-চৌর্য্য। আপনাকে চুরি করিবার ন্যায় অধম কাপুরুষত্ব জগতে নাই—তাহা অতি গর্হিত নীচ কার্য্য। কোন্ ভদ্রলোক (অথবা বাবু শব্দের ন্যায় ভদ্রলোক শব্দের প্রতি কাহারো যদি কোন আপত্তি থাকে—তবে) কোন্ gentleman সুবিধার জুতা করিয়া আপনার নাম ভাঁড়াইতে—বংশ ভাঁড়াইতে—জাতি ভাঁড়াইতে—বাপ পিতামহ ভাঁড়াইতে লজ্জিত না হ'ন। রেলওয়ে-রক্ষকের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহার নিকট হইতে বন্ধুতা আদায় করিবলে, কিম্বা উপর-ওয়ালাদের পায়ে রীতিমত তৈল দান করিয়া এমন কি আবশ্যক হইলে আপনার যথাসর্ব্বস্ব ধন-সম্পত্তি

প্রকারান্তরে চালিয়া দিয়া—ভদ্রতার একটি নিদর্শন-পত্র বা certificate ভিক্ষা করিয়া আনিয়া,. তাহা আপনার ললাটে আটা দিয়া আঁটিয়া রাখিলে, রেল-যাত্রীর পক্ষে কতকটা সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সে সুবিধা এমন কোনো অসাধারণ সুবিধা নহে যে, তাহার পদতলে হৃদয়ের মহত্ত্ব বিক্রয় না করিলে আর শ্রেয় নাই। বিজেতা-জাতির নিকট বিজিত জাতিকে অনেক সময় অনেক প্রকার দৌরাত্ম্য ভোগ করিতে হয়—ইহা খুবই সত্য, কিন্তু বিজিত জাতি আপনার মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টায় প্রাণপণে নিযুক্ত হউন না কেন—তাহাই তো মনুষ্যোচিত কার্য্য! সেদিন বই না কোনো হিন্দুস্থানী খোট্টাকে রেলগাড়ি রক্ষকেরা কোন-প্রকার অসম্মান করাতে অনেক হিন্দুস্থানী এক-যোট হইয়া রেলগাড়ীতে দ্রব্যাদি সংক্রামণ বন্ধ করিল যেই—তাহার পরদিন যাইতে না-যাইতে রেলওয়ে কোম্পানি শশব্যস্ত হইয়া হিন্দুস্থানী-জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আর পথ পাইল না। সে-দিন ইটালীতে যখন বিদেশীয় রাজপুরুষেরা তামাকের উপর মাশুল চড়াইল তখন ইটালীর লোকেরা কি করিল? আবেদনও করিল না ও তাহার বিনিময়ে গলাধাক্কাও খাইল না। তাহারা অতী এক সহজ উপায় অবলম্বন করিল,—দেশশুদ্ধ লোক একাত্ম হইয়া ইউরোপীয় সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ ছেদন করিয়া ফেলিল—চুরট্ খাওয়া বন্ধ করিল,—সুবিধাকে পদে দলন করিয়া মহত্ত্বকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু আমরা সুবিধার ঘরের একজন অধম কিঙ্করকে দেখিয়াছি কি অমনি তাহাকে আপনার মাথার উপরে চড়াইয়া সহরময় নৃত্য করিয়া বেড়াইতে থাকি। সত্য বলিতে কি—এইটিই হ'চ্চে আমাদের ইংরাজি পড়া'র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। যিনি রেলওয়ে-রক্ষকের সৌহার্দ্দের কাঙ্গালি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, "তুমি যদি জাতি-ভাঁড়ানোর নীচত্ব অষ্ট-প্রহর অঙ্গে ধারণ করিতে পারিলে, তবে দুই মিনিটের জন্য রেলগাড়িরক্ষকের কটু-কাটব্য কর্ণাভ্যন্তরে স্থানদান করিতে তোমার এত ভয়ই বা কিসের, লজ্জাই বা কিসের, গ্লানিই বা কিসের।

ইংরাজী কোর্ত্তানুরাগীর আর একটি যুক্তি এই যে, "আমাদের নিজের কখন কিছু ছিলও না—এখনো কিছু নাই,—আমাদের পরিচ্ছদ অতীব যৎসামান্য—বড় জোর ধুতি চাদর। মান্ধাতার আমল-হইতে আমরা পরজাতির পরিচ্ছদ পরিয়া পরিয়া আমাদের হাড় পাকাইয়া তুলিয়াছি, আজ তুমি আমাদিগকে তাহা হইতে বিরত করিতে চাও? অনুকরণই আমাদের এক মাত্র পাথেয় সম্বল—তাহা আমাদের চিরকেলে পেসা, তাহার সুবিধা হইতে আজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে চাও?" Prince Henry যখন Falstaff-কে বলিয়াছিলেন যে, 'তুমি এই বলিলে— চুরি করিবে না, আর, এখন যেই চুরির নাম শুনিয়াছ আর অমনি নাচিয়া উঠিয়াছ, তোমার তো খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখ্‌ছি!" Falstaff বলিল "Tis my vocation Hal" চুরি হ'চ্চে আমার পেসা—আমার ব্রত "Tis no sin to labour in one's vocation" ব্রত পালন করা তো আর পাপ-কার্য্য নহে? "অনুকরণ যে আমাদের ব্রত—তাহা কিরূপে আমরা লঙ্ঘন করিব? অনেকে অনেক স্থানে প্রবঞ্চনা বলে ছুঁচ হইয়া প্রবেশ করে ও তোপের বলে ফাল হইয়া বাহির হয়, আমরা নীচত্বের বলে মাছি হইয়া ইংলণ্ডের অধম শুঁড়িকালয়ে প্রবেশ করি ও অনুকরণের বলে এক এক জন এক এক ধিঙ্গী হইয়া বাহির হই;—ইহা দেখিয়া নিশ্চয়ই তোমার ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, নচেৎ তুমি কখনই আমাদের সৎ-সংকল্পে ঠাণ্ডা জল নিক্ষেপ করিবার মানসে (cold water throw করিবার মানসে) আমাদের পথরোধ করিয়া এখানে আজ দণ্ডায়মান হইতে না।"

"আমরা চিরকালই পরজাতির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিতেছি"—এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, আমরা মুসলমানদিগের দেখাদেখি সভ্র পরিচ্ছদ পরিতে শিখিয়াছি—তবে ও-কথাটির মূল যে কোথায়, তাহা তো আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। চক্ষে আমরা যাহা দেখিতেছি তাহা উহার অবিকল বিপরীত। আমাদিগকে যদি কেহ বলে যে, "সূর্য্য যেহেতু পশ্চিম দিকে উদয় হয় এই জন্য আমি গঙ্গার পূর্ব্ব-ধারে বাড়ী করিয়াছি", তবে আমরা তাঁহাকে বলিব যে, তোমার কথার বিস্‌মোল্লায় গলদ; আমরা যাহা প্রত্যহ দেখি তাহা উহার অবিকল বিপরীত। তুমি বলিতেছ যে, হিন্দুরা মুসলমানের অনুকরণ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে—আমি দেখিতেছি মুসলমানেরা হিন্দু-দিগের অনুকরণ করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে।।

হিন্দুস্থানী মুসলমান ছাড়া আর যে-কোন দেশীয় মুসলমানকে দেখ না কেন,—ইরাণী মুসলমান, তুরাণী মুসলমান, আরবি মুসলমান, কাবুলি মুসলমান, যাহাকেই দেখ না কেন—দেখিবে যে, হিন্দুস্থানী মুসলমানদের পরিচ্ছদের সঙ্গে তাহাদের পরিচ্ছদের কোনো সাদৃশ্য নাই; ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে, এ দেশীয় মুসলমানেরা যেমন আমাদের বীণ ভাঙিয়া সেতার করিয়াছে, মল্লার রাগিণী ভাঙিয়া মিঞা মল্লার করিয়াছে, আমাদের দেশীয় ভাষা ভাঙিয়া উর্দু সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ ভাঙিয়া চাপ্‌কান পায়জামা প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছে। যে-জাতি একশত বিষয়ে আমাদের জাতির নিকটে ঋণী, সে জাতি যে, এক-শ এক বিষয়ে আমাদের জাতির নিকটে ঋণী হইবে—ইহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। প্রথম প্রথম হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পর কেবল মারামারি কাটাকাটি সম্বন্ধেরই প্রাদুর্ভাব ছিল; অবশেষে রাজনীতিজ্ঞ আক্‌বর শা হিন্দুদিগকে ঠাণ্ডা করিবার মানসে হিন্দু-সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন—ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। আবার আক্‌বরের সময় হইতে মুসলমান রাজারা যেরূপ জামা-জোড়া এ খিড়্‌কিদার পাগ্‌ড়ি ব্যবহার করিতেন সেরূপ পরিচ্ছদ ভারতবর্ষ-ছাড়া পৃথিবীস্থ আর কোনো দেশেই প্রচলিত নাই—ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, সে পরিচ্ছদ-গুলি নিতান্ত-পক্ষেই ভারতবর্ষীয়, সে গুলি যদি মুসল্‌মানী হইত তবে তাহা ইরানে, তুরাণে, আরবে বা অন্য কোন মুসলমানী দেশে অবশ্যই প্রচলিত থাকিত। আমাদের দেশের সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ব-বিৎ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জামাজোড়া ও খিড়্‌কিদার পাগড়ি আমরা মুসল্‌মানদিগের নিকট হইতে পাই নাই, মুসল্‌মানেরাই আমাদের নিকট হইতে পাইয়াছে। মুসল্‌মানেরা যখন হিন্দুদের শত শত বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছে, তখন আমরা যদি এখন তাহাদের কোন কিছুর অনুকরণ করি তবে তাহাতে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সৌজন্যের বিনিময় হয় মাত্র, কাহারো তাহাতে জাতির অগৌরব হয় না। পূর্ব্বে মুসলমানেরা আমাদের ধর্ম্মের প্রতিই খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু আমাদের জাতিকে তাঁহারা মাথায় তুলিয়াছিলেন, মুসলমান সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মানসিংহ, প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন তোদরমল, প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বীরবল, প্রধান গায়ক ছিলেন তান সেন। ইঁহারা সকলেই জাতিতে হিন্দু। যে জাতি আমাদের জাতির ভাষা ভাঙিয়া আপনাদের উর্দু-ভাষা প্রস্তুত করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইল না, এমন কি, যে জাতি আপনাদের জন্ম-ভূমি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া ভারতবর্ষকে স্বদেশ রূপে বরণ করিল, সে জাতিকে কি আমরা আর পর বলিয়া উপেক্ষা

করিতে পারি? তাহা যদি করি তবে তাহাতে আমাদের নিতান্তই অসৌজন্য প্রকাশ পায়—তাহা অত্যন্ত অভদ্রোচিত কার্য্য। বাঙ্গালি মুসলমানেরা ধুতি পর্য্যন্ত পরে, মুসলমানীরা সাড়ি পর্য্যন্ত পরে, তাহাতে তাহাদের জাতি যায় না। হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা ধর্ম্মেই কেবল মুসলমান—কিন্তু জাতিতে ভারতবর্ষীয়। এখন আবার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে জিত-জেতা সম্বন্ধ নাই, সুতরাং এখন মুসলমানেরা কোনো হিসাবেই আমাদের পর নহে। তাহাদের দেশ হিন্দুস্থান—ভাষা এবং পরিচ্ছদ হিন্দুস্থানী,—এবং উভয়েই আমরা জিত জাতি। হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা পূর্ব্বে আমাদের অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া এখন যদি আমরা তাঁহাদের কোনো কিছুর অনুকরণ করি, তবে আমরা আপনাদের লোকেরই অনুকরণ করি—পরানুকরণ করি না। পরানুকরণ বলে কাহাকে? না যে-জাতি আমাদিগকে তাহার চরণের এক রেণু বলিয়াও গণ্য করে না—সেই জাতির অনুকরণই পরানুকরণ। সময়ে সময়ে আমরা মুসলমানদের বাহুবলে মর্দ্দিত হইতাম, ও সময়ে সময়ে আমরাও তাহাদিগকে তাহার প্রতিফল দিতাম; এখন আমরা কাহারো বাহুবলে মর্দ্দিত হই না বটে—কিন্তু পদমর্দ্দিত যত দূর হইবার তাহা হইতেছি; বাহুবলের পীড়নে লোকের প্রাণহত্যা পর্য্যন্তই হইতে পারে। পদমর্দ্দনে লোকের প্রাণহত্যা না হয় এমন নহে কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর একটি হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, সেটি হ'চ্চে মানহত্যা! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, মান, কনিষ্ঠ ভ্রাতা— প্রাণ; জ্যেষ্ঠ-টি চলিয়া গেলে কনিষ্ঠ-টির থাকা বিড়ম্বনা-মাত্র। যাঁহারা আমাদের কেবল প্রাণটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ধন এবং মানের প্রতি মর্ম্মভেদী কোপ-দৃষ্টির তোপ দাগিতেছেন, আমরা যদি তাঁহাদের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহাদের জাতি-মর্য্যাদার ভিখারী হই ও আপনাদের নিজের জাতিমর্য্যাদাকে চরণে দলিয়া ফেলি, তবে আমরা শুধু যে নীচ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করি তাহা নহে কিন্তু নীচত্বকে আমরা আমাদের কণ্ঠের হার করি, মস্তকের মুকুট করি—অঙ্গের আভরণ করি,—নীচত্বের আমরা মূল্য বাড়াইয়া তুলি, দর্প বাড়াইয়া তুলি! আমাদের দেখাদেখি লোকে সহসা মনে করিতে পারে যে, ইঁহারা এত পদমর্দ্দিত হইয়াও যখন এত পদ-লেহন করিতেছেন, তখন পদ-লেহন বোধ করি বা কোন অসাধারণ শ্রেয়স্কর মহৎকার্য্য হইবে—আমাদের বুদ্ধি অতী না কি স্থূল—তাই আমরা উহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের কি নীচত্বের সীমাপরিসীমা আছে? ইংরাজেরা আমাদিগকে নিগর বলে, তাহার দেখাদেখি আমরা আপনাদের জাতিকে নিগর বলি! ইংরাজেরা বাবু-উপাধিকে হেয়-জ্ঞান করে! ইংরাজেরা আপনাদের দেশকে হোম্ বলে, আমরা তাহার দেখাদেখি তাহাদের দেশকে আমাদের হোম্ বলি! আমরা এমনি গড্ডলিকা-প্রবাহ! আমরা তো এইরূপ ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া ইংরাজের উচ্ছিষ্ট লেহন করিতেছি ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেছি। ইংরাজেরা ভিতরে ভিতরে আমাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখেন তাহার একটা সত্য-ঘটনা-মূলক গল্প বলি, শ্রবণ করুন।—

একজন আফিসের সাহেবের নিকট দুইজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক জনের পিপাসার উদ্রেক হওয়াতে তিনি সাহেবের নিকট জল চাহিলেন, সাহেব তখন কাচ-পাত্রের একপাত্র জল তাঁহাকে দিতে অনুমতি করিল। অনন্তর পিপাসু কর্ম্মচারীটি জলপান করিয়া যখন বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল, সাহেব তৎক্ষণাৎ সেই কাচপাত্রটিকে ভূমিতে আছাড় মারিয়া চূর্ণ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। আর একজন কর্ম্মচারী যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি তাহা দেখিয়া অবাক্, তাঁহারই মুখে আমি ঐ গল্পটি শুনিয়াছি। আমাদের প্রতি যাঁহাদের

এইরূপ মনে সম্ভাব—আমাদের এই উষ্ণদেশে যাঁহারা লোধূয়মান শোভন ধুতি চাদর বা ইজার চাপকান পরিধান করিতে মৃত্যুকে তাহা অপেক্ষা শ্রেয় বিবেচনা করেন,—এখানকার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপে আমরা কিনা সেই জাতির আঁটা-সাঁটা ঘোড়ার সাজ ও উত্তাপ-গ্রাসী কালো রঙের-শীত বস্ত্রের বোঝা নিকৃষ্ট জন্তুর মত বহন করিব—অথচ এক নিমিষের জন্যও লজ্জা বা ঘৃণা কাহাকে বলে তাহা জানিব না। ধিক্! কাপুরুষত্ব আর গাছে ফলে না! ছিদ্র-দর্শী তার্কিকেরা বলিতে পারেন যে, তবে মোজা পরিও না—ইংরাজী জুতা পরিও না, কিন্তু এ সকল তর্ক হৃদয়শূন্য বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কাশ্মীরের লোকেরা শীত-দেশে কি জুতা-মোজা পরে না? ইউরোপীয় লোকেরাই কেবল যে জুতা-মোজা পরিতে জানে, আমাদের দেশের লোকেরা কস্মিন্ কালেও জানিত না ইহা তো আর নহে। মোজার গঠন সকল-দেশেই সমান, সুতরাং হাইলাণ্ডরের মোজার ন্যায় নিতান্ত চিত্র-বিচিত্রিত মোজা না হইলে তাহাতে জাতিত্বের পরিচয়জ্ঞাপক কোন চিহ্নই বর্তিতে পারে না; আবার, মাথার ও গায়ের পরিচ্ছদে যতটা জাতি-পরিচয় পরিস্ফুট হয়, পায়ের পরিচ্ছদে তাহার সিকির সিকিও হয় না।

নরমান এবং সাক্সন-দিগের মধ্যে যেরূপ জিত জেতা সম্বন্ধ ছিল, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেও সেইরূপ ছিল। নর্মানদের সহস্র দৌরাত্ম্যের মধ্যেও ইংরাজদের সাক্সান্ বনিয়াদ অটুট ছিল—মুসলমানদের সহস্র দৌরাত্ম্যের মধ্যেও ভারতবর্ষের হিন্দু বনিয়াদ অভগ্ন ছিল। নরম্যানেরা যেমন ইংলণ্ডকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে ইংরেজ হইয়াছিল, এদেশীয় মুসলমানেরা সেইরূপ হিন্দুস্থানকে স্বদেশ করিয়া জাতিতে ভারতবর্ষীয় হইয়াছিল—ধর্মেই কেবল মুসলমান ছিল,—এইজন্য মুসলমানেরা আমাদের দেশের পরিচ্ছদ প্রভৃতি আত্মসাৎ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই।

মুসলমানেরা যদিও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগেব নিকট হইতে এদেশীয় চাপ্‌কান বা চাপ্‌কানের আদি-পুরুষ (কিনা জামা-জোড়া) আদায় করিয়াছিলেন, তথাপি তাহারা তাহাদের স্বজাতিত্ব-রক্ষার অনুরোধে বোতামের বা বন্ধনের দিক্ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এইরূপ আবার, ইংরাজ ফরাসীদেব মধ্যে যদিও উইলিএম-দি-কঙ্করের আমল হইত আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে, তথাপি ইংরাজি-ফরাসিস পরিচ্ছদের মধ্যে এখনো এমন একটু প্রভেদ রক্ষিত হইয়া থাকে যে, ইউরোপীয় জাতিদিগের নিকটে কে ইংরাজ কে ফরাসিস তাহার পরিচয় পরিচ্ছদ গুণেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ—কি ইংরাজ—কি ফরাসিস্—সকল জাতিই স্ব স্ব পরিচ্ছদ দ্বারা স্ব স্ব জাতির পরিচয় প্রদান করে; আমরাই কি কেবল এত নীচ হইব যে, চোর যেমন আপনার মুখে কালি মাখিয়া, মাথা কামাইয়া, কিম্বা পরচুলার দাড়ি-গোঁপ করিয়া আপনার নামধাম গোপন করে, সেইরূপ আমরা এক-জাতি হইয়া আর-এক জাতির পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক জাতি-ভাঁড়ানো ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব? আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ বৈদ্য-সন্তানদিগের শরীরে যদি একবিন্দুও ব্রহ্মতেজ থাকে—কায়স্থ ক্ষত্রিয়-সন্তানদিগেব শরীরে একবিন্দুও ক্ষত্র তেজ থাকে, বৈশ্য-সদ্গোপের শরীরে যদি পুরুষপরম্পরাগত সৎক্রিয়ার একবিন্দুও পুণ্যফল অবশিষ্ট থাকে, শূদ্র-সন্তানদিগের শরীরে যদি একবিন্দুও মহৎ-সেবার মহত্ত্ব অবশিষ্ট থাকে, (ইহা কখনই নহে যে, শূদ্রেরা কোন কালে স্পার্টাদেশীয় হেলট্ ছিল বা আমেরিকা দেশীয় নিগ্রো ছিল;—পুত্রেরা যেমন পিতার আজ্ঞা

পালন করিয়া মহত্ত্ব লাভ করে, লক্ষ্মণ যেমন রামচন্দ্রের সেবা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন—শূদ্রেরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সেবা করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই) আমি বলিতেছি যে ব্রাহ্মণ-হইতে শূদ্র-পর্য্যন্ত সমগ্র হিন্দুজাতির শরীরে যদি একবিন্দুও পুণ্য-তেজ—মহত্ত্বের স্ফুলিঙ্গ—শৌর্য্যবীর্য্যের এক কণা—ভদ্রতার সূচ্যগ্র পরিমাণ অংশ—ইহার কোনো একটা-কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাঁহারা আপনাকে ওরূপ নীচত্বের বেশে সঙ সাজাইবার অভিলাষ এইদণ্ডে মন হইতে চিরকালের মতো বিদায় করিয়া দি'ন! হিমালয়কে সাক্ষী করিয়া বলুন যে, তুমি যত দিন মর্ত্তে বিরাজ করিতেছ, পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে সাক্ষী করিয়া বলুন যে, তোমরা যত দিন স্বর্গে বিরাজ করিতেছ, ততদিন আমরা বিপদের দারুণ মহাপ্রলয়ের মধ্যেও আমাদের স্বজাতিকে ওরূপ আত্মাপহারী চৌর্য্য-ব্যবসায় দ্বারা কলঙ্কিত করিব না; তাহার অগ্রে সমুদয় ভারতভূমির সহিত আমরা গঙ্গা-সাগরে ঝম্প প্রদান করিব—তবু আমাদের স্বজাতির জাতি-মাহাত্ম্যকে ওরূপ জঘন্য নীচত্বে—কদর্য্য কাপুরুষত্বে—পর্য্যবসিত করিব না।

যাঁহাদের কণামাত্রও চক্ষু আছে, তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ে অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। যাঁহাদের চক্ষু আনুকরণিক ধূলি-মুষ্টিতে নিতান্তই অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সোনার কাটি যদি তাঁহাদের একজনের চক্ষেও অঞ্জন-শলাকার কাজ করে, তবে তাহার জন্ম সার্থক! কিন্তু সে সৌভাগ্য যে তাহার ঘটিবে এরূপ আশা করা অতিশয় দূরে হাত বাড়ানো; তবে কি? না যাঁহাদের চক্ষুতে সবেমাত্র একটু ছানির দাগ দেখা দিয়াছে—ভরসা করি সোনার কাটির সংস্পর্শে তাঁহাদের চক্ষু একটু না-আধটু ফুটিয়া উঠিবে; তাহাও যদি হয় তবু জানিব যে, সোনার কাটি রূপার কাটির মূল্যবান্ ধাতু-জন্ম নিতান্ত নিরর্থক নহে।

শ্রোতৃবর্গের প্রতি আমার শেষ নিবেদন এই যে, অস্ত্র-চিকিৎসা-দ্বারা দেশের চক্ষু-রোগ ভাল করিতে গিয়া অনেকের হয় তো আমি মর্ম্মে আঘাত দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারি নাই। এখানে উপস্থিত বা অনুপস্থিত এমন অনেক মান্য গণ্য এবং সর্ব্বাংশে উপযুক্ত লোক আছেন—তা ছাড়া আমার এমন অনেক প্রিয়-বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন আছেন—যাঁহাদের হৃদয়ে একবিন্দু আঘাত দিতে আমার আপনার হৃদয়ে তদপেক্ষা শতগুণ আঘাত লাগে;—ইহা দেখিয়া শুনিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এরূপ কার্য্যে হাত না দেওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল। আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, উল্লিখিত রোগ-টি যদি কেবল বর্ত্তমান রোগীর দলেই বদ্ধ থাকিত তাহা হইলে আমি এ কার্য্যে হাত না দেওয়া-ই শ্রেয় বিবেচনা করিতাম; কিন্তু রোগটি যখন সংক্রামক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, তখন তাহার প্রতীকারের কোনো একটা উপায় অবলম্বন না করিয়া—ব্যথার ব্যথী কোন ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ সুস্থির থাকিতে পারে না। যদি আপনারা আমার মনের প্রকৃত অভিপ্রায়টি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি অকৃত্রিম সরল ভাবে বলিতেছি যে, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের উপর দোষারোপ করা আমার অভিপ্রায় নহে। আপাত-সুবিধার অনুরোধে স্বজাতিত্বের অবমাননা একটি মহৎ দোষ,—সেই দোষটিই আমার একমাত্র লক্ষ্য,—যেখানে যে কোনো বাক্য-বাণ প্রয়োগ করিয়াছি তাহা তাহারই উপরে করিয়াছি। যদি কোন মহৎ লোকের ঐ দোষটি থাকে, তাহা হইলেই যে তিনি মহৎ শ্রেণী হইতে পতিত হইলেন—তাহার কোন অর্থ নাই,—কেননা "একো হি দোষো গুণ-সন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ" চন্দ্রের বহুসহস্র কিরণে

যেমন তাহার কলঙ্ক ঢাকা পড়িয়া যায়, সেইরূপ অনেক মহৎ গুণের আবরণে এক-টি আধ-টি দোষ ঢাকা পড়িয়া যায়,—কিন্তু তা বলিয়া গুণের সংসর্গ-গুণে দোষ কিছু আর গুণ হয় না—দোষ দোষই থাকে। দোষের প্রতীকারই আমার উদ্দেশ্য—দোষাক্রান্ত ব্যক্তির গুণলাঘব আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের বিকারের পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে ক্রন্দন করিয়াছি—আজ প্রকাশ্যে ভ্রাতৃগণের সমক্ষে ক্রন্দন করিয়া হৃদয়ের চির-সঞ্চিত বেদনার ভার-লাঘব করিলাম মাত্র। যাঁহারা আজ আমার হাস্যের ভিতর কিছু-মাত্র তলাইতে পারিয়াছেন—তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হাস্য একটা কেবল উপলক্ষ মাত্র—গভীর হৃদয় বেদনার উচ্ছ্বাস তাহার হাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে। তাহারই উত্তেজনায় আজ আমি অনেক প্রিয়-বন্ধুর মনে আঘাত দিলাম,—কিন্তু তাঁহারা এটি জানিবেন সুনিশ্চিত যে, তাঁহাদের মনে আঘাত দেওয়াতে আমি আপন হস্তে আপনার মনে ততোধিক আঘাত দিয়াছি;—বহুকাল-বর্দ্ধিত হৃদয়ের বেদনা-লতাকে হৃদয় হইতে টানিয়া বাহির করা যে কি যন্ত্রণা, তাহা যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র অবগত আছেন, তাঁহারা আজ আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিবেন—এ বিষয়ে আর সংশয় মাত্র নাই।

# বাবুর গঙ্গাযাত্রা

হাতে কাজ না থাকিলে, আমি তো জানি, লোকে গঙ্গাযাত্রা করে দুজনা'র একজনকে—হয় জ্যাঠাকে—নয় খুড়াকে ; কিন্তু তুমি গঙ্গাযাত্রা করিবার দোস্‌রা লোক খুঁজিয়া না পাইয়া বাবু বেচারীটিকে উচ্চপদারূঢ় জ্যাঠা এবং খুড়া'র মাঝখান হইতে টানিয়া হেঁচড়িয়া ভূতলে নাবাইয়া, ধরিয়া বাঁধিয়া নিমতলা মুখো খাটে চড়াইয়াছ? ভাল! ভাল!

বলিলাম তো "ভাল! ভাল!"— দেখি, মনটাকে একবার জিজ্ঞাস করিয়া! পাগ্‌লা মন চক্ষু ঠারিয়া বলিল,—"উনি কলি'র বীর মহারথী! C.S.I (অর্থাৎ ছি-এ ছাই) রহিয়াছে মস্ত এক উপাধি উহার স্পৃহনীয় মৃগতৃষ্ণিকা ; —তা ছাড়া G.C S I. রহিয়াছে—রাজা মহারাজা — Sir রহিয়াছে,— Gentleman রহিয়াছে, —সবই গিল্টি-করা সোনার গয়নার ন্যায় অধম-তোবা, অর্থ-শোষা শাঁস-বর্জ্জিত খোসা—ও গুলার একটা-কাহকে বয়্‌কট্ করুন্ দেখি কেমন উনি বীর মহারথী! তা'তে খুব শ্যায়না! উঁহার যত চোট্ নিরপরাধ 'বাবু' উপাধির উপরে! 'বাবু' উপাধির অপরাধ শুধু এই যে, ঢাকাই মল্‌মলের ন্যায় তাহা ডাহা দেশী জিনিষ।" মন এ যাহা বলিতেছে, তাহা নেহাত ফ্যালনা সামগ্রী নহে—তাহার ভিতরে শাঁস আছে। কিন্তু ওটা পাগলা-মিয়া—ও'র কথা আমি বড় একটা ধরি না। এমনও হইতে পারে যে, বাবুর গঙ্গাযাত্রার ছল করিয়া বীর মহারথীরা মস্ত একটা রাজনৈতিক খেলা খেলিতেছেন,—মহামন্ত্রী বিস্‌মার্কের ন্যায় মনের অগাধ নিম্নস্তরে একটা দুরূহ মৎলব আঁটিয়া তুখোড় ওস্তাদী ঢঙের পাকা চাল চালিতেছেন! তাহা যদি হয়, তবে আমার ঘাট হইয়াছে! ঘট-কলসের ভিতরে কি আছে না আছে, তাহা আমি একটু মনোনিবেশ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইতে পারি, কিন্তু এট্‌না বা বিসুবিয়স পর্ব্বতের পেটে কি আছে, তাহার অস্থি-সন্ধি তলাইয়া পাওয়া আমার ন্যায় স্থূলদর্শী লোকের কর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ যখন আমি রাজনৈতিক পাকা চালের নূতন নূতন নমুনার একটার পর একটা ক্রমাগত দেখিয়া দেখিয়া এক দিকে দুঃখে খেদে এবং আর এক দিকে বিস্ময়ে কৌতুকে এমনি আষ্টে-পৃষ্টে জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, হাসিব কি কাঁদিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। বেশী না—দুইটা নমুনা দেখাই; তাহা হইলেই আমি তৃতীয় নমুনা দেখাইবার নাম করিবামাত্র তুমি কাণে হাত দিয়া বলিবে

"আর কাজ নাই!
বস্ কর ভাই"!

## (১) বিলাতী পাকা চালের নমুনা।

কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় Congress-এর মহা ধূম পড়িয়া গিয়াছিল, তখন তদুপলক্ষে দেশের অনেকগুলি নব্য শ্রেণীর যুবকবৃন্দ দলে দলে যুটিয়া বল্লম হস্তে করিয়া

ভীষণ রণমত্ত ভাবে মহাবীর সাজিয়াছিলেন। যেন ইংরাজ রাজপুরুষরা এমনই দুগ্ধপোষ্য বালক যে, পুৎলাবাজির পুতুলের বন্দুকের আওয়াজে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া ব্রিটানিয়া মায়ের ক্রোড় দুই হস্তে আঁকড়িয়া ধরিবেন, —এমনিই চোকে-ছানি-পড়া বৃদ্ধা অবলা যে, সোলার সাপকে জ্যান্ত সাপ মনে করিয়া "মা গো" "বাবা গো" বলিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবেন! এটা হচ্চে কন্‌গ্রেস্ মহাসভার বঙ্গীয় অভিভাবক বা অভিনায়কর্দিগের একটা প্রবীণ গোচের পাকা চাল।

## (২) দেশী পাকা চালের নমুনা।

কন্‌সেন্ট্ বিলের মহামারী ব্যাপারের সময় নব্য শিক্ষিত মহারথীরা রাতারাতি এমনি অসামান্য কালী-ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে কালীঘাটে পূজা দিবার ছলে তাঁহাদের মধ্যস্থিত দুই একজন ভক্ত-বীর ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া অবলীলাক্রমে হাড়িকাঠে গলা সঁপিয়া দিলেন ; —তাঁহাদের ভক্তির আতিশয্য-বলে হাঁড়িকাঠ ফুলের মালা হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবে, এ যেন হইয়া বসিয়া আছে! আর, যেন তাঁহাদের হুকুমে লাট্ সাহেবের পিঙ্গল-কুন্তল-শোভিত ধব্‌ধ'বে শ্বেত মুণ্ড সীমলা পর্ব্বতের বিনোদভবন হইতে তারযোগে ছুটিয়া আসিয়া মুণ্ডমালিনী দেবীর চরণকমল অনুতাপাশ্রুতে প্লাবিত করিতে চায় পত্রপাঠ, —না যদি করে তবে বেদ মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা, তন্ত্র মিথ্যা! এটা হ'চ্চে দেশীয় সর্ব্বরোগ-পোষণী মহাসভার অধিনায়ক বা অভিনায়কর্দিগের বড্ড একটা সরেস পাকা চাল!

বাবু'র গঙ্গাযাত্রা কি ঐ রকমের একটা রাজনৈতিক পাকা চাল? তা যদি হয়, তবে তুমি বোঝো-গে নিয়ে তোমার রাজনৈতিক পাকা চাল—আমাকে দাও অব্যাহতি। কেন না, আমার মতন গরীব আদার ব্যাপারীদের জাহাজের খবরে প্রয়োজনাভাব। তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ বাবু'র গঙ্গাযাত্রা যদি মস্ত একটা রাজনৈতিক পাকা চাল না হয়, তবে শুধু শুধু নিরপরাধ 'বাবু' উপাধিটির উপরে অমনতর একটা মায়া-মমতা-বিহীন জল্লাদি কাণ্ড করিয়া হস্তকে কলুষিত করিবার কী এত তোমার গরজ্ পড়িয়াছে, সেইটি আমাকে ভাঙ্গিয়া বলো! 'বাবু' শব্দ 'বাবা' শব্দের পাঠান্তর তা জানো? "না" বলিতেছ কোন্ লজ্জায়? হরি হরি! তবে কি ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার ক অক্ষর তোমার নিকটে গোমাংস? তবে কি, তোমার ন্যায় অত বড় এক জন গণিত-বিদ্যার M.A. চূড়ামণিকে—"বাবা ও বাবুর মধ্যে শুধু-যে কেবল আকার উকারের প্রভেদ" এই যৎসামান্য সোজা কথাটা'র একটা কড়াক্কড় গোচের জ্যামিতিক প্রমাণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে? মশা মারিতে কামান পাতিতে হইবে? বল যদি কামান পাতিতে, তবে "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া অগত্যা আমাকে তাহা করিতে হয়; কেন না, তাহা আমি না করিলে তুমি মনে করিবে, তোমার কথা হেলন করিলাম; আর, কৌতুক-দর্শনোৎসুক সভাসদ্‌বর্গ মনে করিবেন,—ভয়ে পিছাইলাম ; দুইই আমার পক্ষে অনিষ্টজনক। অতএব, বিধিমত-প্রকারে কামান পাতিতেছি,—অবধান হো'ক :—

# নূতন জ্যামিতি

## প্রথম অধ্যায়

### প্রথম সিদ্ধান্ত

প্রতিজ্ঞা (enunciation)।

বাপা = বাপ

প্রমাণ

মালিনীর প্রতি বিদ্যার উক্তি।

বুক বাড়িয়াছে কা'র সোহাগে।
কালি দেখাইব বাপা'র আগে।।—ভারতচন্দ্র।

অতএব প্রমাণ হইল যে, বাপা = বাপ।

### দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

বাপা = বাপু

প্রমাণ

গৃহিণী মাতা আদর করিয়া ডাকিবার সময় ঘরের ছেলেদিগকে ডাকেন, — "বাপধন বাছাধন" বলিয়া। আর, গ্রামের ছেলেদিগকে (অর্থাৎ চাষাভূসা লোকদিগকে) ডাকেন "বাপু বাছা" বলিয়া। তবেই হইতেছে যে,

বাপ-বাছা = বাপুবাছা।

অতএব বাপ = বাপু ..... ক।

পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, বাপা = বাপ [ প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ ]।

এক্ষণে প্রমাণ করা হইল যে, বাপ = বাপু [ ক দেখ ]।

অতএব এটা স্থির যে, বাপা = বাপু।

### তৃতীয় সিদ্ধান্ত

বাবা = বাবু

প্রমাণ

প্রশ্ন

বাপা : বাপু : বাবা : X = কী?

অর্থাৎ, যে প্রকার ratio-তে, বা Reason-এ বা যুক্তিতে বাপা শব্দ হইতে বাপু শব্দ উৎপন্ন হয়, ঠিক্ সেই প্রকার যুক্তিতে বাবা শব্দ হইতে কোন্ শব্দ উৎপন্ন হয়?

উত্তর

X = বাবু

অর্থাৎ,

বাপ : বাপু : = বাবা : বাবু

কিন্তু

বাপা = বাপু [ দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দেখ ] ইহা হইতেই আসিতেছে যে,

বাবা = বাবু

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### প্রথম সিদ্ধান্ত

### পারিভাষিক সংজ্ঞা

#### প্রথম সংজ্ঞা

(Skeat's Etymological Dictionary হইতে উদ্ধৃত)। "Papa, father. Derived from Latin papa." অতএব papa শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ।

#### দ্বিতীয় সংজ্ঞা

( Dictionary হইতে উদ্ধৃত)।

"Pope, the father of a church Derivel from Latin papa " তবেই হইতেছে যে, বাবু যেমন বাবা শব্দের পাঠান্তর Pope তেমনি Papa শব্দের পাঠান্তর।

#### প্রথম সিদ্ধান্ত।

প্রতিজ্ঞা (enunciation)

আর্য্য ভাষা'র বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাখায় 'পএ' 'বএ' পরিবর্ত্তন চলে।

প্রমাণ।

Latin Bibat—সংস্কৃত পিবতি।

তবেই হইতেছে যে,

পিব্ = বিব্

∴ পি = বি

প = ব

পুনশ্চ

সংস্কৃত পিপাসা = প্রাকৃত পিবাসা।

সংস্কৃত কপিল = প্রাকৃত কবিল।

সংস্কৃত কপথ = প্রাকৃত কবথ।

সংস্কৃত পূপক = প্রাকৃত পূবক।

অতএব প্রমাণ হইল যে, আর্য্য-ভাষার বহুধাবিচিত্র শাখাপ্রশাখায় 'পএ' 'বএ' পরিবর্ত্তন চলে।

#### দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত।

প্রতিজ্ঞা

'বাবু' আর্য্য-ভাষার শব্দ।

প্রমাণ।

আর্য্য-ভাষা'র বহুধাবিচিত্র শাখা প্রশাখায় যেহেতু প স্থানে ব হইতে পারে,

[ বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ ]

অতএব

Latin Papa = বাবা

পুনশ্চ Latin Pater = সংস্কৃত পিতৃ

এই দুয়ের যোগে পাইতেছি—papa pater = বাবা পিতা।

অতএব, বাবা শব্দ Latin পাপা-শব্দের দেশী মূর্ত্তি।

কিন্তু papa শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ | বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সংজ্ঞা দেখ | ইহা হইতেই আসিতেছে যে, বাবা-শব্দ আর্য্য-ভাষার শব্দ।

## তৃতীয় সিদ্ধান্ত।

বাবা বা-বাবুর ন্যায় পিতৃবাচক শব্দ আর্য্যজাতির বহুধাবিচিত্র শাখা-প্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্য-গণ্য লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের এবং পূজার্হ সাধু সন্ন্যাসীদিগের সম্মানসূচক উপাধি।

প্রমাণ

১। Sir = Sire = বাবা

২। Lord = hla-ward =breadkeeper = রুটির বিতরণ-কর্ত্তা = অন্নদাতা পিতা = বাবা।

৩। ফরাসী Monsciur = my Sire = বাবা

৪। ইটালীয় Scignior = Senior = গুরুজনশ্রেষ্ঠ = বাবা

৫। দেশী লোকের নিকটে পূজ্য শ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসী = বাবাজী। মঠধারী মোহন্ত = বাবা।

৬। Roman Catholic রাজ্যে Rome-এর মোহন্ত = pope = papa | বর্ত্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় সংজ্ঞা দেখ | = বাবা | বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম সিদ্ধান্ত দেখ। |

অতএব প্রমাণ হইল যে, বাবা-বা-বাবু'র ন্যায় পিতৃবাচক শব্দ আর্য্যজাতির বহুধাবিচিত্র শাখাপ্রশাখার অন্তর্গত বিশিষ্ট শ্রেণীর মান্য গণ্য লোকদিগের, সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের, এবং পূজার্হ সাধু সন্ন্যাসীদিগের সম্মানসূচক উপাধি। ইতি জ্যামিতি সমাপ্ত।

বাবু এবং শ্রীযুতের কাহার কি মূল্য, তাহা যাচাই করিয়া দেখা যা'ক।

১। 'শ্রীযুত'-বোল্ পণ্ডিতদিগের কাছে শুনিয়া শেখা সংস্কৃত গৎ। 'বাবা'-বুলি অনুতং বালভাষিতং' অর্থাৎ বালকের মুখের অমৃত ভাষা।

২। শ্রীযুত' উপাধি জমকালো রঙের পোষাকী উপাধি। 'বাবু' উপাধি সহজ-শোভন আটপৌরে উপাধি।

৩। 'শ্রীযুত' উপাধি ঐশ্বর্য্য-ব্যঞ্জক। বাবা-উপাধি মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক।

৪। ইঙ্গভূমিতে' Anglo-বা-আঙ্গালী বাবুকে (কি না Sir-কে) আবশ্যক মতে my dear বিশেষণের মাধুর্য্য-রসে গলাইয়া ঘরের লোক করিয়া লওয়া হয়।

বঙ্গভূমিতে বাঙ্গালী বাবুকে শ্রীযুত বিশেষণের ঐশ্বর্য্যমহিমায় ফাঁপাইয়া তুলিয়া মজলিসী লোক করিয়া দাঁড় করানো হয়। ইঙ্গ এবং বঙ্গের মধ্যে এইরূপ এপিঠ-ওপিঠের প্রভেদ-মাত্র।

৫। শ্রীযুত-উপাধি মৌকিকওয়া-বাজারের দ্যাখন্‌সই সামগ্রী। বাবা উপাধি হৃদয় খনির মর্ম্ম-ছাঁসা সামগ্রী।

৬। জাঁক-জমক-ভক্ত অরসিক লোকদিগের কাছে শ্রীযুত উপাধির মূল্য বেশী।
সুরসিক জহরী লোকদিগের কাছে বাবু-উপাধির মূল্য বেশী।

যাচাই কার্য্য তো একপ্রকার করিয়া চুকিলাম। কিন্তু যাচাই করা সামগ্রী মূল্য দিয়া লইবে যে কে, তাহা তো দেখিতে পাই না ; তাহা দেখিতে না পাইবারই কথা— যেহেতু বাঙ্গালীর আর এক নাম কাঙ্গালী।

Squire উপাধির মূল্য নিরূপণ।

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর পরাক্রম-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী-ইংবাজি-আনা' ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি না পাইয়া বরং ক্রমশই যে কম পড়িয়া আসিতেছে, এটা আমাদের দেশের একটা শুভ লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গের এই সৃষ্টিছাড়া নূতন সৃষ্টি অষ্ট্রেলিয়া দেশীয় ডোডো পক্ষীর পদানুসরণ করিয়া অতীতের দুঃস্বপ্ন হইয়া চুকিলেই দেশের হাড়ে বাতাস লাগে। বাঙ্গালী-ইংরাজ, সংক্ষেপে ব্যাঙ্‌রাজ, এক প্রকার উভচর জীব , ইংবাজীতে যাহাকে বলে amphibious creature। ইহারা চৌরঙ্গীব অন্তঃপাতী আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুঁসড়িয়া থাকিয়া ঘুমের ঘোরে মনে করেন—"স্বর্গে আছি", কিন্তু সে যে স্বর্গ তাহা এক প্রকাব ত্রিশঙ্কু'র স্বর্গ—না দেশী, না বিলাতি। ব্যাংরাজের আর এক নাম—'বাঙ্গালীসাহেব'। বাঙ্গালী-সাহেব একপ্রকার কাঙ্গালী-সাহেব, যে হেতু তিনি সাহেবত্বের কাঙ্গাল। এই উভচব সাহেবেরা এক দিকে যেমন বাঙ্‌লা বাবু-উপাধির প্রতি খড়্‌গহস্ত—আর এক দিকে তেমনি Angla বাবু উপাধির ক্যাঙলা। Angla বাবু, কিনা Angla বাবা, — কি না Sire, সংক্ষেপে Sir। কিন্তু Sir উপাধি বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে না , তাহা পাইতে হইলে গুণগরীয়ান্ Knight হওয়া চাই। Squire উপাধি কিন্তু অমনি পাওয়া যায়, হাত মেলিবামাত্রেই—তাহাতে পয়সা লাগে না। যাহাই হো'ক Squire কম্‌লোক ন'ন্—তিনি হচ্চেন knight এর Shield bearer কি না ঢাল-বরদার [ Skeat's Etymological Dictionary দেখ ]। উভচর ব্যাংরাজ-সাহেবরা বাঙ্গলা বাবুকে অত্যন্ত ঘৃণাচক্ষে দেখেন ; — তা দেখুন, তাহাতে খেদ নাই। খেদের বিষয় শুধু এই যে, তাঁহাদের ব্যাংরাজি শাস্ত্র কাহকে Anglo Babu হইতে তো মানা করে না। Sir হইতে তো মানা করে না। তাহা তাঁহারা না হ'ন কেন? কিন্তু তা'ও বলি, ক্যাঙ্‌লা সাহেবেরা যে Angla বাবু হইবেন—তাহার মতন তাঁহাদের যোগ্যতা থাকিলে তবে তো তাহা হইবেন? যোগ্যতার মধ্যে তাঁহাদের শিক্ষার কাঁদুনিগীত— কেবল কতকগুলা কেতাদুরস্ত ইংরাজি চাল-চোল্, হাত-নাড়া এবং ঘাড়নাড়া'র ঢঙ্, ব্যাঙ্‌রাজি ক্যাঁ কোঁ ভাষা, এই সকল ছাইভস্মে আপাদমস্তক ভরা। এরূপ যাঁহাদের ভিতর ভুও, তাঁহারা Anglo বাবু উপাধি'র প্রতি অর্থাৎ Sir উপাধির প্রতি হাত বাড়াইবেন কোন্ সাহসে? কাজেই তাঁহারা Anglo বাবুর (অর্থাৎ Knight-এর ঢালবরদার সাজিয়া) Squire সাজিয়া, দুধের সাধ ঘোলে মেটা'ন, আর, তাহাতেই তাঁহারা আকাশের চাঁদ হাত বাড়াইয়া পা'ন।

আমার সাধ্যানুযায়ী এইরূপ অযথার্থসন্ধান-পতিকের শ্রেণীবদ্ধ কামান পাতা দেখিয়া পশু-পীড়ন (cruelty to animals) নিবারণী সভা'র সভাশ্রেণী-ভুক্ত আমার একটি পুরাতন বন্ধু হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, "মশা-বেচারীদিগের উপব কেন এ দৌরাত্ম্য?"

ইহার উত্তরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "ভাইরে! চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে আমার যদি তুমি দুর্দশা দেখিতে, তবে আমাকে ওরূপ কথা বলিতে না , উল্টা বরং ভদ্রতনকারী খুসে রাক্ষসদিগকে হাত জোড় করিয়া বলিতে, "মুমূর্ষু বেচারীর উপরে কেন এ দৌরাত্ম্য?" দুঃখের কথাটি তবে তোমায় আজ ব্যক্ত করিয়া বলি :—

অল্পদিন হইল, আমার নামীয় একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিলাম, ইংরাজী অক্ষরে লিখিত "Sreejut অমুক"। তাহার অনতিপূর্ব্বে ঐরূপ আর একখানি পত্রের শিরোনামায় দেখিয়াছিলাম, "অমুক Esq"। আমার চিরকেলে স্বদেশী নামের উপান্তে বিদেশী লেজুড় লম্বমান দেখিয়া আমার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল। ভাবিলাম, "কি সর্ব্বনাশ। না জানি আমি আজ কাহার মুখ দেখিয়া প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছিলাম।" ইংরাজী অক্ষরে Sreejut দেখিয়া আমার মনে আর কিছু হইল না— কেবল ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, উভচর ব্যাংরাজ সাহেবরা 'বাবু'র প্রতি কেন যে খড়্গহস্ত, তাহার অর্থ আমি বুঝিতে পারি। তাঁহাদের ব্যাংরাজি শাস্ত্রে বাবু শব্দ নিগরেরই পাঠান্তর, এবং Squire লেজুড় gentleman-এর অপরিহার্য্য পশ্চিমাঙ্গ। কিন্তু স্বদেশীয় বাবু উপাধি কি দোষে যে স্বদেশী ভাণ্ডারীদিগের কোপদৃষ্টিতে পড়িল, তাহা আমি বুঝিতে পরাভব মানিলাম। আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কি ব্যাংরাজি সং ঢং রং মন্ত্রে দীক্ষিত?

মস্ত এক জন নামজাদা ব্যাংরাজ আমাকে একবার নাক মুখ সিঁট্‌কিয়া বলিয়াছিলেন যে, "বাবু-উপাধিটাকে আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "অপরাধ।" তিনি বলিলেন যে, "আফিসের সাহেবরা যখন অধীন কেরাণীদিগকে "ব্যাবু" "ব্যাবু" বলিয়া সম্বোধন করে, তখন তাঁহাদের ঐরূপ আহ্বানধ্বনি আমার কর্ণে শূল বিদ্ধ করে।" চমৎকার Logic! যাহাই হো'ক্— তিনি নকল সাহেব বৈ ত না। তাঁহার গুরুবংশীয় আসল সাহেবদিগের Logic আর-এক রূপ। ইংরাজি আফিস অঞ্চলে বাঙ্গালী কেরাণীরা যেমন ব্যাবু-নামে বিখ্যাত, ফরাসী দেশের হোটেল্ অঞ্চলে তেমনি যে-সে শ্রেণীর ইংরাজ "Milord" নামে বিখ্যাত। ইংরাজী Lord সাহেবেরা যদি ব্যাংরাজি মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা বলিতেন, "Lord উপাধিটা অতি জঘন্য। রাজ্যশুদ্ধ continental লোকেরা 'Milord' 'Milord' বলিয়া সম্বোধন করে কাহাদিগকে তাহা বলিব শুনিবে? যত যেখানকার ভবঘুরে ইংরাজ—যাহাদের বাড়ী নাই, ঘর নাই, বাপ-মা'র ঠিকানা নাই—ব্রিটানিয়া মাতা'র সেই সকল হতভাগ্য কুলাঙ্গারদিগকে। আজ্ হইতে আমি কদর্য্য Lord উপাধিটাকে টেম্‌সের জলে বিসর্জ্জন দিয়া Monsieur উপাধি পরিগ্রহ করিলাম।" কিন্তু ইংরাজ সাহেবরা তো আর ব্যাংরাজ সাহেবদিগের চেলা নহে। উল্টা আরো তাঁহারা মনে মনে হাস্য করিয়া বলেন এই যে, "ইংরাজী বুলি কপ্‌চাইতে গিয়া Foreigner এরা যে কোনো ইংরাজিশব্দ যেরূপ ভঙ্গিতেই উচ্চারণ করুক্ না কেন, আর তাহা যে-কোনও অর্থেই ব্যবহার করুক্ না কেন— তাহাদের মুখে তাহা শোভা পায়।" আরো বলেন এই যে, "আমাদের দেশের লোক যখন কোনও ফরাসী গৃহস্থের বাড়ীতে ফরাসী ভাষায় গৃহপতির সহিত মিষ্টালাপ করে, তখন ফরাসী চাকর চাক্‌রাণীরা কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া বেজায় রকমের হাস্য বিদ্রূপ করে, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি! তাহাদের হাস্য বিদ্রূপ থোড়া-ই কেয়ার করি।" ব্যাঙ্‌রাজ সাহেবদিগের এ বোধ নাই যে, কোনো এক জন গোরাখালাসী—যাহার কাণ্ডজ্ঞান এত্নি কম যে, সে নারিকেলের

ছোবড়াকে শাঁস মনে করিয়া দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করিতে সুরু করে, সে মানুষ নারিকেল ফলকে তিক্ত বলিবে না তো আর কি বলিবে? কিন্তু তা বলিয়া দিশী লোকে নারিকেল ফলকে হেয়জ্ঞান করিবে কেন? যাহারা বাবু-শব্দের না জানে মর্য্যাদা—না জানে উচ্চারণ, তাহারা আফিসের কেরাণীদিগকে "ব্যাবু" বলিবে না তো আর কি বলিবে? আমরা ইংরাজকে বলি sir, ইংরাজেরা আমাদিগকে বলে "বাবু", অর্থাৎ বাঙ্গালি sir, ইহাতে ··· টাই বা কি—তাহা তো আমি বুঝিতে পারি না।

ব্যাংরাজি Logic-এর এই তো শ্রী—ব্যাংরাজি Ethics-এর শ্রী আবার তাহা চাহিতেও আর এক কাটি সরেস।

ব্যাংরাজি Ethics-এর নমুনা!

বাবুগিরি, বিলাসিতা'র আর এক নাম।

অতএব বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করা দেশহিতৈষী লোকের কর্ত্তব্য।

উত্তম Ethics, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহাদের হাতে কাজ নাই, তাহারা ঐ নূতন Ethics-এর দোহাই দিয়া স্বচ্ছন্দে বলিতে পারে যে জ্যাঠামি ইচড়েপক্কতা'র আর এক নাম।

অতএব জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা করা ভাইপোদের কর্ত্তব্য।

গঙ্গাযাত্রা-করনেওয়ালাদের জানা উচিত যে, যাহারা জ্যাঠামি করে (অর্থাৎ জ্যাঠার অভিনয় করে, বা সঙ সাজে) তাহারাও জ্যাঠা ; আর, যিনি বাপের ভাই, তিনিও জ্যাঠা ; নকল-জ্যাঠা'র দোষে আসল জ্যাঠা'কে হাত পা বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রই বলে না। তেমনি, যাঁহারা বাবুগিরি করেন, (অর্থাৎ বাবুর অভিনয় করেন, বা সঙ্ সাজেন) তাঁহারাও বাবু ; আর, যাঁহারা দেশের পিতৃস্থানীয় উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক, বা মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক, তাঁহারাও বাবু ; ও-বাবু'র দোষে এ-বাবুকে গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, এরূপ ধর্ম্মনীতি বেদেও নাই, কোরাণেও নাই।

## যুক্তির বদলে গায়ের জোর

গায়ের জোর বলে কাহাকে? যে মহাবীর না-মানেন বেদ, না-মানেন কোরাণ, আর, ইংরাজিতে যাহাকে বলে *"Rhyme or reason"* তাহার না-ধারেন ধার—যাঁহার আপনার কথাই পাঁচ কাহন, তাঁহারই নাম গায়ের জোর। গায়ের জোর বলে এই যে, "বাবু" উপাধি মুসলমানদিগের প্রসাদি উপহার। বাবা পারসীক ভাষার শব্দ, তাহা না জানে কে? আপামর সাধারণ সবাই তাহা জানে ; —অতএব এ কথা মুখে উচ্চারণ করিও না যে, বাবা শব্দ দেশী শব্দ।"

যুক্তি বলে এই যে, বাবা বা papa-ধাঁচা'র পিতৃবাচক শব্দ যখন সাধারণতঃ সকল আর্য্যভাষাতেই আছে, তখন তাহা পারসীক ভাষাতেও থাকিবারই কথা ; কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না, দেশী বাবা শব্দ পারসীক বাবা শব্দ হইতে ধার করিয়া পাওয়া। Door ইংরাজি শব্দ, আর, দুয়ার (সংক্ষেপে দোর্) বাঙ্গলা শব্দ ; কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণ হয় না যে, বাঙ্গলা দোর্ নকল door, ইংরাজি door-ই আসল দোর্। তেমনি, Brother শব্দ ইংরাজি শব্দ, আর ব্রাদার শব্দ পারসী শব্দ ; তাহাতেও এরূপ প্রমাণ হয় না যে, ইংরাজি Brother শব্দ নকল ব্রাদার, পারসীক ব্রাদর শব্দই আসল Brother। tu লাটিন্

শব্দ, আর, তু (বাঙ্গলা্ তুই) হিন্দুস্থানী শব্দ ; তাহাতেও এরূপ প্রমাণ হয় না যে, দেশী তু নকল-tu, Latin tu আসল তু। তা ছাড়া আরেকটি কথা এই যে, ইংরাজেরা যেমন ফরাসীস্দিগকেই Monsieur বলে, তা বই আপনাদের দেশের লোককে Monsieur বলে না, মুসলমানেরা তেমনি সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগকেই "বাবু সাহেব" বলে, আপনাদের জাতভাইদিগের কাহ'কে "বাবু সাহেব" বলে না। আবার ইংরাজেরা Smith সাহেবকে যেমন বলে Mr. Smith বোস্জা মহাশয়কে তেমনি বলে Mr. Bose ; তথৈব, মুসলমানেরা যেমন আপনাদের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর জাতভাইদিগকে মিঞা সাহেব বলিয়া সম্বোধন করে, তেমনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হিন্দুলোকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিবার সময় সাহেবের সঙ্গে "বাবু" জুড়িয়া দিয়া তাহাদিগকে বাবু সাহেব বলিয়া সম্বোধন করে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সব দেশেই করা হয়।

## (১) দুয়ের এক।

হয় আপনাদের দেশের প্রচলিত উপাধি অন্য দেশীয় নামের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয়— যেমন "Mr" Bose, বাবু "সাহেব" ; নয় দেশী নামের গাত্রে দেশী উপাধি জুড়িয়া দেওয়া হয় যেমন "Monsieur" Renan, "বাবু"-সাহেব। এই গেল দুয়ের এক। দুয়ের বার কি—তাহাও বলি ;—

## (২) দুয়ের বা'র।

যাহা আপনাদের দেশেরও প্রচলিত উপাধি নহে ; আর যে দেশের লোকের নাম উচ্চারণ করা হইতেছে সে দেশেরও প্রচলিত উপাধি নহে ; এইরূপ দুয়ের বা'র গোচের উপাধি দেশী নামের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া'র রীতি সসাগরা পৃথিবীর কোনো স্থানেই আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। বাবু উপাধি মুসলমানদের স্বদেশীয় উপাধি নহে, তা তো জানই ; আর তুমি বলিতেছ যে, তাহা কোনো কালেই আমাদের দেশেরও স্বদেশীয় উপাধি ছিল না ; তবে কি বাবু উপাধি দুয়ের বা'র? তবে কি বাবু উপাধি— কোথাও কিছু নাই হুড়ুং করিয়া— আকাশ হইতে পড়িয়াছে? এরূপ একটা সৃষ্টিছাড়া সিদ্ধান্ত বেদেও লেখে না—কোরাণেও লেখে না। অবশ্যই, বাবু উপাধি কোনো না কোনো আকারে দেশের মধ্যে প্রচলিত ছিল— তা নহিলে দেশী নামের স্কন্ধে বাবু শব্দ চাপাইয়া দিবার কোনো প্রয়োজনই হইত না।

## এক যাত্রায় পৃথক ফল।

সকল আর্য্যভাষাতেই পিতৃবাচক শব্দের ন্যায় মাতৃবাচক শব্দও জোড়া জোড়া। তাহার নমুনা :—

Mother Mamma

মাতৃ মা

এরূপ স্থলে, যদি দেশী আর্য্যভাষায় বাবা শব্দের স্থান খালি থাকে তবে একযাত্রায়

পৃথক ফল অনিবার্য্য। এইরূপ সার্ব্বদেশিক প্রচলিতপ্রথার বিরুদ্ধে, "এক যাত্রায় পৃথক ফল" দোষ ঘাড় পাতিয়া লইয়া, গায়ের জোরে আপনার কথাকেই পাঁচকাহন করিতে হইবে—এ সর্ব্বনেশে পণ।

কৈফিয়ত তলব।

তুমি চাও জানিতে যে, বাবার বদলে বাবু হইল কেন? বাবা বাবাই থাকিল না কেন? ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, দেশী শব্দের সময়োচিত ভাঙন-গড়ন এমন কোনো নূতন কার্য্য নহে যে, তাহার জন্য সেকালের সহজ প্রকৃতি ভাঙন-গড়ন-কর্ত্তাদিগকে একালের অর্দ্ধশিক্ষিত বিদ্যাবৃহস্পতিদিগের নিকটে কড়াকড় কৈফিয়ত দিতে হইবে—রীতিমত কারণ দর্শাইতে হইবে। দেশীয় শব্দের দেশোচিত এবং কালোচিত ভাঙন-গড়নও নূতন নহে, আর, তাহার কারণও নূতন নহে—কারণ জিজ্ঞাসাই নূতন ; কারণ জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কোন্ দিন হয় তো বলিবেন যে, লোকে রাঁধা-চাউলকে রাঁধা-চাউল না বলিয়া রাঁধা-ভাত বলে কেন? কারণ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি তাঁহার চক্ষু হইতে সঙ্কীর্ণতার ঠুলি খুলিয়া ফ্যালেন, তাহা হইলেই স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, যে কারণে ইংলণ্ড দেশে Master শব্দের জায়গায় Mister (অর্থাৎ Mr.) শব্দের চলন হইয়াছে, Sire শব্দের জায়গায় Sir শব্দের চলন হইয়াছে; সারা ইউরোপ আমেরিকার papa শব্দের জায়গায় pope শব্দের চলন হইয়াছে ; সেই কারণেই আমাদের দেশে বাবা-শব্দের জায়গায় বাবু শব্দের চলন হইয়াছে—দোস্‌রা কোনো কারণে নহে। তুমি কিন্তু ওরূপ একটা সাধারণ কারণে সন্তুষ্ট নহ, তুমি চাও বিশেষ কারণ জানিতে। তুমি চাও জানিতে— বাবা শব্দের আকারের জায়গায় আর-কিছু না হইয়া (ইকার বা একার বা ওকার না হইয়া) উকার হইল কেন? তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—পাঁচালী-কর্ত্তা দাশরথি রায়কে তুমি দাশি রায় বা দাশো রায় না বলিয়া দাশু রায় বলো কেন? ক্ষেত্র বাবুকে ক্ষেতি বাবু বা ক্ষেতো বাবু বা ক্ষেতে বাবু না বলিয় ক্ষেতুবাবু বলো কেন? দাশরথি রায়কে তুমি যদি আদর করিয়া "দাশু রায়" বলিতে পারো, তবে দেশের বাবাস্থানীয় লোকদিগকে লোকে আদর করিয়া বাবু বলিতে না পারিবে কেন? কৈফিয়ত তলবে অপর লোকেরও অধিকার আছে। তবে তুমি এ কথা বলিতে পারো যে, আজিকের বাজারে দিশী আদরের পসার নাই মূলে , আজিকের কালে দেশীয় উচ্চপদও তুচ্ছ সামগ্রী, আর, বিদেশীয় মস্‌মস্‌কারী পদ (যাহা নামে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নধারী না হইলেও কাজে-ধ্বজও বটে, বজ্রও বটে, অঙ্কুশও বটে) তাহাই সেরা পূজার সামগ্রী। শক্ত কাল পড়িয়াছে! আজিকের কালের রাজা-রাজড়াদিগের রাজসংসারে দিশী রাণী অপেক্ষা বিদেশী চাকরাণীর মর্য্যাদা-মাহাত্ম্য শতগুণ বেশী ; বঙ্গের রঙ্গভূমিতে দেশের বাবাদিগের বাবু উপাধি অপেক্ষা বিদেশের বাবাদিগের Sir উপাধির মর্য্যাদা-মাহাত্ম্য শতগুণ বেশী। তবে, শ্রীযুতের কথা স্বতন্ত্র! শ্রীযুত যে খাস সংস্কৃত বুলি! সারা ইউরোপ-আমেরিকায় বেদ বেদান্ত স্মৃতি পুরাণের পণ্ডিত ভূমির চাষ আরম্ভ হইয়াছে কেমন প্রবল উদ্যমে, তাহা কি দেখিতেছ না? অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এদেশের নব্য শিক্ষিতেরা সংস্কৃত বিদ্যাকে হুট করিয়া উড়াইয়া দিতেন তাহাও তো জানি—তখনকার কালে তাহা শোভা পাইয়াছিল , কেন না তখনকার কালে মোক্ষমূলার ভট্টের নবাবিষ্কৃত "আর্য্য"—সবে মাত্র উড়িতে শিখিতেছে তাই তাহা মৃদুভাবের চিঁ-চিঁ-কারী আর্য্য ছিল,—তখন আর্য্যের ডানায় সমুচিত বলাধান হয় নাই। কিন্তু এখন কি আর সংস্কৃতকে হুট্ করা

সাজে? এই যুগবিপর্য্যয়ের উপক্রমে গৌরাঙ্গ-বরাহ-অবতারেরা বেদোদ্ধার কার্য্যে যেরূপ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে এখনকার কালে সংস্কৃতকে হট্ করিতে গেলে হট্ করেনওয়ালা নিজেই হট্ হইয়া যা'ন। ভাগ্যে সংস্কৃত ভাষা ইউরোপ আমেরিকার আসান নজরে পড়িয়াছে—তাই রক্ষে। তা নহিলে শিখাধারী শ্রীযুত উপাধিটি বাবু-উপাধির শনিবারের দোসর হইতে বাকি থাকিত না তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। ফলে, গঙ্গাযাত্রার অধিনায়কেরা যে, কোন্ মহাজনের নিকট হইতে চক্ষের চসমা এবং হাতপায়ের কল ধার করিয়া আনিয়া কাজ চালাইতেছেন তাহা কাহারো জানিতে বাকি নাই , আর এরূপ কৃত্রিম ধরণের কাজ যে, বেশী দিন চলিতে পারিবার মতো কাজ নহে, তাহারও কতক কতক আভাস লোক সমাজে অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে এবং ক্রমে আরো অধিকাধিক পরিমাণে দেখা দিতে থাকিবে।

উচ্চ আদালতের বিচার নিষ্পত্তি।

সকল দেশের লোকেরাই উপরের শ্রেণীর লোকদিগকে যেমন বাপ মা সম্ভাষণ করিয়া থাকে, বঙ্গদেশের লোকেরাও এযাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাই করিয়া আসিতেছে। যে হেতু, সকল দেশেই যেমন গৃহের ছাঁচে কুল গঠিত, কুলের ছাঁচে সমাজ গঠিত, সমাজর ছাঁচে রাজ্য গঠিত, আর, সেই কারণে, রাজ্যের বাপ মা প্রধানতঃ রাজা, তাহার নীচে রাজপুরুষ, তাহার নীচে উচ্চ শ্রেণীর মান্য গণ্য লোক, তাহার নীচে মধ্যম শ্রেণীর ভদ্রলোক ; তদ্ব্যতীত, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ছেলেপিলের দল , বঙ্গদেশেও অবিকল সেইরূপ। এই সহজ সত্যটি বিস্মৃত হইয়া নিম্ন আদালতের বিচারপতি জোবজবরদস্তি করিয়া নিরপরাধ বাবু'র প্রতি নির্ব্বাসন দণ্ডের এই যে বিধান জারি করিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে তিনি বিচারপতিপদের নিতান্তই অনুপযুক্ত। অতএব, হুকুম হইল,—বাবুকে বেকসুর খালাস দেওয়া যায়।

# সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা

আমি অদ্য একটি অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-খানি হস্তে করিয়া এখানে আমি আজ আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি তাহার নাম "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা।" একে তো চিকিৎসা মাত্রই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ; তাহাতে আবার কবিরাজ চিকিৎসা—যাহার সহিত উনবিংশশতাব্দীয় বিজ্ঞান-রশ্মির জন্মেও দেখাসাক্ষাৎ নাই। আবার সামাজিক রোগের চিকিৎসা—যাহার গহন অরণ্যে মহা মহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া যা'ন! একে চিকিৎসা—তাহাতে কবিরাজি চিকিৎসা—তাহাতে আবার সামাজিক চিকিৎসা! একে রজনী দ্বিপ্রহর—তিথি তায় অমাবস্যা—ঋতু তায় মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা! কিন্তু হইলে হইবে কি—আমি এখন মাঝ-গঙ্গায় উপস্থিত! আমা হইতে এ-পারও যত দূর, ও-পারও তত দূর! এখন আমার পক্ষে এগোনও যা—পিছোনোও তা; বিপদ দুয়েতেই সমান। এসময়ে পিছোনা লাভে-হইতে কেবল কলঙ্কের ভাগী হওয়া! এখন কর্ত্তব্য কি? ঢেউ দেখিয়া না ডুবানো কর্ত্তব্য—না শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া থাকিয়া গন্তব্য কূলের দিকে প্রাণপণে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য? এগোনোই কর্ত্তব্য—তাহাতে আর সন্দেহ নাই! অতএব তাহাই করা যা'ক্—এগোনো যা'ক্।

কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা আমার বলিবার আছে; তাহা এই যে, ডাক্তারি বিদ্যা স্বতন্ত্র, আর, কবিরাজি বিদ্যা স্বতন্ত্র! ডাক্তারি বিদ্যার গোড়াতেই শবদেহ-পরীক্ষা; কবিরাজ বিদ্যার গোড়াতেই শরীরমনের সম্বন্ধ-পর্য্যালোচনা। ডাক্তারি মতে—আগে শরীর, পরে মন; কবিরাজ মতে—আগে মন, পরে শরীর। কবিরাজি-শাস্ত্রের অন্তরের কথা এই যে সহস্র মৃত শরীর পরীক্ষা করিলেও জ্যান্ত শরীরের প্রাণ-প্রধান নিগূঢ় তত্ত্বগুলির অন্বেষণ পাওয়া যাইতে পারে না; কেননা, শরীরের সহিত যেখানে মনের সংশ্লেষ, সেইখানেই প্রাণের বসতি; কাজেই—প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইলে প্রাণের সেই বসতি স্থানে—শরীর মনের সন্ধি স্থানে—মনোনিবেশ করা অন্বেষু ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কবিরাজি শাস্ত্রের গোড়াতেই তাই ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্য্যালোচিত হইয়াছে। ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ—কথাটা কিছু ঘোরালো রকমের। তাহা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়—যেন, শামুকের নস্যকোষের মধ্য হইতে এই মাত্র তাহা গা ঝাড়া দিয়া উঠিল! কিন্তু তাহার স্থূল তাৎপর্য্য যার পর নাই সহজ; তাহা আর কিছু না—মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ। অনতিপরেই আপনারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সে-যে ত্রিগুণ, যাহাকে আপনারা এত ভয় পাইতেছেন, তাহা আর কিছু না—কেবল মনের তিনটি মুখ্যতম বৃত্তি; ত্রিদোষ আর কিছু না—সেই তিনটি মুখ্যতম মনোবৃত্তির সহানুপাতী (Parallel running) তিনটি শারীরিক মূলধাতু। এই দুয়ের সম্বন্ধ নিরূপণই কবিরাজ শাস্ত্রের গোড়া'র কাহিনী। গোড়াতেই আমি এই গোড়া'র কাহিনীটি আপনাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি; কেননা, সুর না বাঁধিয়া যন্ত্র-বাদন করা, আর, প্রবন্ধের গোড়া না বাঁধিয়া ডালপালা বিস্তার

করা—দুইই সমান! তাহা একপ্রকার হত্যাকার্য্য—তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা ক্ষান্ত হওয়াই ভাল। আর একটা কথা এই যে, গোড়া'র কথা গোড়ায় না বলিয়া আমি যদি মাঝখানকার কোনো-একটি কথার উপরে প্রবন্ধের গোড়া-পত্তন করি, তাহা হইলে হইবে এই যে, আমি একভাবে এক কথা বলিব—আপনারা পাঁচজনে তাহা পাঁচ-ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার পাঁচ রকম অর্থ করিবেন; লাভে লইতে আমার প্রকৃত মন্তব্যটি মাঠে মারা যাইবে।

কিন্তু এটা আপনারা স্থির জানিবেন যে, গোড়া'র কাহিনীটি এক প্রকার Rubicon নদী! একবার জো-শো করিয়া আপনারা আমার সঙ্গে তাহার ওপারে পৌঁছিতে পারিলেই—আর আপনাদের কোনো ভাবনা চিন্তা থাকিবে না! সেখান হইতে আপনারা তর্-তর্ করিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন—মনের আনন্দে।

কবিরাজ চিকিৎসা'র গোড়া'র কাহিনী যে, কী, তাহা আমি গোড়াতেই ইঙ্গিত করিয়াছি, কী? না ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা। ত্রিগুণ কী? না সত্ত্বরজস্তমো; ত্রিদোষ কী? না বাত পিত্ত কফ।

প্রস্তাবিত গোড়া-বন্ধন কার্য্যের দুইটি স্তর; প্রথম স্তর—ত্রিগুণের গুণপরিচয়; দ্বিতীয় স্তর—ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ নিরূপণ; এই দুইটি স্তরের গঠন-কার্য্য কোনো মতে আমি আমার হস্ত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেই গোড়া-বন্ধনের দায় হইতে এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাই, এবং সেই দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপরে ভর করিয়া—বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের রোগই বা কিরূপ, আর, তাহার কবিরাজি চিকিৎসা-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার আলোচনা কার্য্যে নিশ্চিন্ত মনে প্রবৃত্ত হই।

প্রথম; ত্রিগুণের গুণ পরিচয়। ত্রিগুণের নাম শুনিয়া আপনারা হয় তো মনে করিতেছেন—"না জানি কি একটা ত্রিশূলধারী দার্শনিক বিকট মূর্ত্তি আসিতেছে—তাহার সে বিরূপাক্ষ-দৃষ্টিতে একবার সে আমাদের মুখের পানে থট্মট্ করিয়া তাকাইলেই আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি উড়িয়া যাইবে!" কিন্তু ত্রিগুণ বেচারীকে আপনারা একবার চক্ষে দেখিলেই, আপনাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়া—উল্টা তখন আপনারা আমাকে এরূপ না বলিলে বাঁচি যে, "এই তোমার সত্ত্বরজস্তমোগুণ—এ'র জন্য এত তুমুল কাণ্ড! আমাদের স্তনাপানের বয়স হইতেই এর সঙ্গে তো আমরা একত্রে বাস করিয়া আসিতেছি; এমন কি—এ'র সঙ্গে মাতৃগর্ভ হইতে একত্রে শুভ-বেশে আপনাদের সমক্ষে দেখা দিতেছে,—তমোগুণ কী? না বহির্জগতে রাত্রি এবং অন্তর্জগতে নিদ্রা, রজোগুণ কী; না বহির্জগতে দিবা এবং অন্তর্জগতে কর্ম্ম চেষ্টা; সত্ত্ব-গুণ কী? না বহির্জগতে সন্ধ্যা এবং অন্তর্জগতে চিন্তা, তাহার মধ্যে প্রাতঃসন্ধ্যার সহিত তত্ত্বচিন্তা এবং ঈশ্বরারাধনা আর সায়ংসন্ধ্যার সহিত আরাম-চিন্তা এবং ক্রীড়া কৌতুক সবিশেষ উপযোগী। চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা এই তিনটিই ত্রিগুণ চক্র; সংক্ষেপে—গুণ বৃত্ত;—কি না চক্র। এতো সকলেরই দেখা কথা যে চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা এই তিনটিই ত্রিগুণ চক্র; সংক্ষেপে—গুণ বৃত্ত, বৃত্ত—কি না চক্র। এতো সকলেরই দেখা কথা যে চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা অন্তর্জগতে বৃত্তের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়; আর, বৃত্তের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় বলিয়াই উহারা প্রধানতঃ বৃত্তি শব্দের বাচ্য। বাহিরে যেমন দিন রাত্রি—অন্তরে তেমনি মনোবৃত্তি—উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লয় তান মিলাইয়া পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। বহির্জগতে যখন রাত্রি আগমন করে, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা আগমন করে; বহির্জগতে যখন চন্দ্রমা অন্তর্হিত হইয়া অরুণ সারথি আবির্ভূত হয়, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া

ধ্যান আবির্ভূত হয়; বাহির্জগতে যখন প্রভাত অস্তমিত হইয়া মধ্যাহ্ন-দিবা আবির্ভূত হয়, অন্তর্জগতে তখন ধ্যান ভাঙিয়া গিয়া কর্ম্ম চেষ্টা আবির্ভূত হয়; এইরূপে নিদ্রা চিন্তা এবং চেষ্টা বৃত্তের ন্যায় একে একে আবর্ত্তিত হয়; আর, বৃত্তের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় বলিয়াই উহারা প্রধানতঃ বৃত্তি শব্দের বাচ্য; মনুষ্যের আর আর যত প্রকার মনোবৃত্তি আছে, সমস্তই ঐ তিনটি মূল-বৃত্তির ডালপালা; যেমন চিন্তার ডালপালা—কল্পনা স্মৃতি যুক্তি ইত্যাদি; চেষ্টার ডালপালা—প্রযত্ন উদ্যম অধ্যবসায় ইত্যাদি; নিদ্রার ডালপালা—আলস্য অবসাদ বিলাস ইত্যাদি—গুণ বৃত্তই—ত্রিগুণ চক্রই—মনের তিনটি মূলতম বৃত্তি; আর, সে তিনটি বৃত্তি পরস্পরের সহিত সহস্র জড়াজড়ি করিয়া থাকিলেও তিনের এ'র ও'র তা'র মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে আমরা কিছুমাত্র বাধা অনুভব করি না। চেষ্টার সঙ্গে যদিচ কখনো বা চিন্তা জড়ানো থাকে [যেমন কর্ম্ম চেষ্টার সঙ্গে অন্ন চিন্তা] কখনো নিদ্রা জড়ানো থাকে [যেমন পরিশ্রান্ত পাখা বেহারার পাখাটানার সঙ্গে নিদ্রা।], নিদ্রার সঙ্গে যদিচ কখনো বা চিন্তা জড়ানো থাকে [যেমন চিন্তানুরূপ স্বপ্ন] কখনো বা চেষ্টা জড়ানো থাকে [যেমন ঘুমের ঘোরে কথাকওয়া অথবা যাহা তদপেক্ষা আরো আশ্চর্য্য—ঘুমের ঘোরে চলা ফেরা], চিন্তার সঙ্গে যদিচ কখনো বা চেষ্টা জড়ানো থাকে [যেমন অন্যমনস্কভাবের দিবা-স্বপ্ন], বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে যদিচ এইরূপ ঘনিষ্ট মাখামাখি-ভাব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা তিনের ইতরেতর প্রভেদ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি, আর, সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি বলিয়াই তিনকে পৃথক্ নামে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই। এই গেল ত্রিগুণের গুণ পরিচয়।

দ্বিতীয়, ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ নিরূপণ। চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা, এই তিনটি মূল মনোবৃত্তির সহিত ক্রমান্বয়ে বাত পিত্ত এবং কফ এই তিনটি দৈহিক মূল উপকরণের সবিশেষ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার সাক্ষী—দেশশুদ্ধ সকল লোকেই জানে যে, শ্লেষ্মা বাড়িলেই নিদ্রা বাড়ে, আলস্য বাড়ে এবং গা মাটি-মাটি করে, পিত্ত বাড়িলেই গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং ছটফটানি বাড়ে—চেষ্টা বাড়ে, বায়ু বৃদ্ধি হইলেই চিন্তা বাড়ে—কল্পনা বাড়ে।

এখন কথা হ'চ্চে এই যে, শরীরের যেমন তিনটি প্রধান উপকরণ—বাত পিত্ত কফ, সমাজেরও তেমনি বাত পিত্ত কফ আছে, কী? না সৃষ্টির দল, গতির দল, এবং স্থিতির দল। স্থিতির দল সমাজের শ্লেষ্মা;—শ্লেষ্মা বলো, জল বলো, রস বলো, মেদ বলো, সবই বলিতে পারো কেবল ভাবটা মনে রাখিলেই হইল, ভাবটা আর কিছু না—নরম ঠাণ্ডা স্থূল এবং ভারভার। বৈদ্য শাস্ত্রে শ্লেষ্মা তমোগুণ প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—"শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছলঃ শীতলস্তথা তমোগুণাধিকঃ।" গতির দল সমাজের পিত্ত; পিত্তই বলো আর অগ্নিই বলো—একই কথা; ভাব আর কিছু না-গরম উদ্ধত এবং চঞ্চল। বৈদ্য-শাস্ত্র মতে পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর; যথা,—

"নখলু পিত্তব্যতিরেকেনান্যোঽগ্নিরুপলভ্যতে আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তস্য।"

গতির দল সমাজের পিত্ত—সৃষ্টির দল সমাজের বায়ু; সৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে ঐশ্বরিক সৃষ্টি নহে কিন্তু মানসিক সৃষ্টি—ভাবের প্রবর্ত্তনা, যেমন কবির কাব্য রচনা একতরো সৃষ্টি; শিল্পীর শিল্প রচনা আরেক-তরো সৃষ্টি, যদি তাহা শিল্পীর অন্তরের ভাব হইতে উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নূতন নূতন মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত তৃতীয় আর এক-তরো সৃষ্টি এ সৃষ্টি ঐশ্বরিক সৃষ্টির উপরে একপ্রকার দাগা বুলানো। সর্ব্বাপেক্ষা খাঁটি সৃষ্টি বাতুলের প্রলাপ-দর্শন, কেননা তাহার সহিত বাহ্য জগতের সম্পর্ক অতীব অল্প, তাহার বারো আনা

অংশ স্রষ্টার মনঃসম্ভূত। জগৎ সৃষ্টি ঐশ্বরিক ব্যাপার,—তাহার কথা এখানে হইতেছে না; এখানে কেবল মানসিক সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে যে, সৃষ্টির দল সমাজের বায়ু। সৃষ্টি কি না ভাবের প্রবর্ত্তনা। বায়ু যেহেতু দেহাশ্রিত সমস্ত ব্যাপারেরই মূল প্রবর্ত্তক, এই জন্য আমি বলি যে, বায়ু সৃষ্টিশীল, সৃষ্টিশীল কিনা প্রবর্ত্তনা-শীল।

বৈদ্য-শাস্ত্রের মতে বায়ু প্রবর্ত্তনাশীলও বটে, গতিশীলও বটে, তাহার সাক্ষী—"দোষধাতু মলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ" "নেতা" কিনা প্রবর্ত্তনা শীল, "শীঘ্রঃ" কি না গতিশীল। এই স্থানটিতে বৈদ্যশাস্ত্রের সহিত আমার মতের বারো আনা ঐক্য, চারি আনা অনৈক্য,— বৈদ্য শাস্ত্রে বলে "বায়ু প্রবর্ত্তনা শীল এবং গতিশীল, দুইই"; আমি বলি যে, বায়ু প্রবর্ত্তনা-শীল, পিত্ত গতিশীল। বায়ুকে এখানে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্ত্তনা-শীল বলিবার প্রধান একটি কারণ এই যে, এখানে ধাতবিক বায়ুর কথা হইতেছে— ভৌতিক বায়ুর কথা হইতেছে না, ধাতবিক বায়ু কি? না ইংরাজিতে যাহাকে বলে Nervous fluid। এটা আপনারা বোধ করি সকলেই জানেন যে, দেশীয় ভাষায় যাহাকে বলে "বায়ু-প্রধান ধাতু" ইংরাজি ভাষায় তাহারই নাম Nevous temperament। ধাতবিক বায়ুর নানা প্রকার গুণ আছে—ইহা আমি অস্বীকার করিতেছি না, আর, তাহার সেই নানাবিধ গুণের মধ্যে একটি গুণ যে, গতি অর্থাৎ চলা ফেরা, ইহাও আমি অস্বীকাব করিতেছি না—আমি বলিতেছি কেবল এই যে, চলা-ফেবা গুণটি ধাতবিক বায়ুব এমন কোনো একটা অনন্য-সাধাবণ গুণ নহে যাহা তাহার স্বজাতির মধ্যে আর কাহারো নাই, রক্তও তো চলে ফেরে, ধাতবিক বায়ুর, অর্থাৎ Nervous fluid-এর, বিশেষত্বেব পবিচয় লক্ষণ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আপনি চলা-ফেরা নহে কিন্তু অন্যকে চলানো ফেবানো। শরীরাভ্যন্তরে যেখানে যতপ্রকাব গতি আছে (যেমন হৃৎপিণ্ডেব সংকোচ-বিকোচ, নাড়ীস্পন্দন, হস্তপদ পরিচালন ইত্যাদি), সমস্তেরই মূলপ্রবর্ত্তক ধাতবিক বায়ু (কি না Nervous fluid)। এইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে গতি স্বতন্ত্র এবং গতির প্রবর্ত্তনা স্বতন্ত্র, গতি অশ্বের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনা সার্বাথিব ধর্ম্ম, অতএব এটা যখন স্থির যে, ধাতবিক বায়ুর ভেদপরিচায়ক গুণ গতি নহে কিন্তু গতির প্রবর্ত্তনা, তখন বায়ুকে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্ত্তনা-শীল বলাই যুক্তিসিদ্ধ।

বায়ুকে আমি বলি প্রবর্ত্তনা-শীল, পিত্তকে আমি বলি গতিশীল। কেন? না যেহেতু বৈদ্য শাস্ত্রের মতে 'পিত্তব্যতিরেকেনান্যোঽগ্নিরুপলভ্যতে' পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর; পিত্ত রূপী অগ্নিকে কে উত্তেজিত করে? না বায়ু; যেহেতু বৈদ্য শাস্ত্রমতে বায়ু দেহাশ্রিত যাবতীয় ব্যাপারেরই মূল প্রবর্ত্তক। তবেই হইতেছে যে, বায়ু উত্তেজক—অগ্নি উত্তেজিত, বায়ু প্রবর্ত্তক— অগ্নি প্রবর্ত্তিত, বায়ু চালক—অগ্নি চালিত। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, গতিশীল কে? যে চালায় সে গতিশীল? বায়ু প্রবর্ত্তক সুতরাং সারথি স্থানীয়—পিত্ত প্রবর্ত্তিত সুতরাং অশ্ব স্থানীয়, কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, পিত্ত গতিশীল, বায়ু সৃষ্টিশীল—কিনা প্রবর্ত্তনা-শীল।

বায়ুকে আমি যে কারণে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্ত্তনা শীল বলি, সেই কারণেই আমি তাহাকে রজো-গুণ প্রধান না বলিয়া সত্ত্বগুণ-প্রধান বলি। পাতঞ্জলি দর্শনে, "জগৎ ত্রিগুণাত্মক" এই সহজ কথাটিকে একটু আড় করিয়া এইরূপ ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে যে, জগৎ "প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতিশীলং" অর্থাৎ প্রকাশ শীল ক্রিয়াশীল এবং স্থিতি শীল। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশ-শীল, রজোগুণ ক্রিয়াশীল বা গতিশীল এবং তমোগুণ স্থিতিশীল। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রকাশ শীল কে? না চক্ষু; সুতরাং চক্ষু সত্ত্বগুণ প্রধান; গতি

শীল কে? না পদ, সুতরাং পদ রজোগুণ প্রধান। ঘোড়া কাণা হইলে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার পা চারিটা সু পটু থাকা চাই-ই চাই; সারথির কিন্তু ঠিক্ তাহার বিপরীত।—সারথীর পা খোঁড়া হইলে ক্ষতি নাই কিন্তু তাহার চক্ষু দুটা সতেজ থাকা চাই-ই চাই। এই সহজ দৃষ্টান্তটি আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে যে, চক্ষু-ব্যতিরেকে—প্রকাশ ব্যতিরেকে—প্রবর্ত্তনাকার্য্য কোনো মতেই চলিতে পারে না; আর এটা যখন স্থির যে, প্রকাশ ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তনা কার্য্য চলিতে পারে না, তখন বায়ুকে প্রবর্ত্তনা শীল বলিলে তাহাকে যে প্রকারান্তরে প্রকাশাত্মক অথবা যাহা একই কথা—সত্ত্বগুণ প্রধান বলা হয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। বায়ুর (অর্থাৎ Nervous fluid এর) প্রকাশকতা গুণটি পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশে মূলেই যে জানা ছিল না, এতটা আমি বলিতে সাহসী নহি; তবে—এটা স্থির যে পূর্ব্বতন কালে তাহা এখনকার মতো এরূপ সবিস্তরে এবং সুপরিষ্কৃত ভাবে জানা ছিল না, তাই শাস্ত্রকারেরা বায়ুকে রজোগুণ প্রধান বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান অব্দের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ধাতবিক বায়ু (Nervous fluid) সমস্ত ঐন্দ্রিয়ক চেতনা কার্য্যের নির্ব্বাহ কর্ত্তা—সুতরাং প্রকাশাত্মক, অথবা যাহা একই কথা—সত্ত্বগুণ-প্রধান। বলিতেছি বটে ধাতবিক বায়ু প্রবর্ত্তনা শীল এবং প্রকাশাত্মক, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, ধাতবিক বায়ু চেতন ধর্ম্মী। শাস্ত্রে আছে যে, সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক হইলেও তাহা জড় পদার্থ বই আর কিছুই নহে--চেতন পদার্থ নহে। চন্দ্রের কিরণ যেমন চন্দ্রের নিজের কিরণ নহে কিন্তু সূর্য্যকিরণেরই প্রতিবিম্ব, তেমনি শাস্ত্র এবং যুক্তি উভয়েরই সিদ্ধান্ত এই যে, সত্ত্বগুণের প্রকাশ তাহার নিজের স্বাধীন প্রকাশ নহে—তাহা আত্মার অনুপ্রকাশ মাত্র। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, বায়ু প্রবর্ত্তনা শীল বা সৃষ্টিশীল এবং তাহা সত্ত্বগুণ প্রধান।

পিত্তকে আমি যে অর্থে গতিশীল বলি, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়া চুকিয়াছি; আমি বলিয়াছি যে বায়ু প্রবর্ত্তক, অগ্নি প্রবর্ত্তিত; আর, বৈদ্য শাস্ত্রের মতে পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর। আমি দেখাইয়াছি যে, বায়ু সারথি স্থানীয়, পিত্ত অশ্ব স্থানীয়। পিত্ত অশ্ব স্থানীয় কাজেই গতিশীল; গতিশীল যখন—তখন কাজেই তাহা রজোগুণ প্রধান; কেননা শাস্ত্রের মতানুসারে গতিশীলতা রজোগুণেরই ধর্ম্ম। তা ছাড়া—পিত্তের প্রকোপ হইলে নাড়ীর যেমন প্রচণ্ড বেগাতিশয্য হয়, এমন আর কিছুতেই নহে; অতএব "ফলেন পরিচীয়তে" এ কথা যদি সত্য হয় তবে পিত্তাবিষ্ট নাড়ীর দ্রুত-বেগ আমারই কথা'র পোষকতা করিয়া মুখে না বলুক—কাজে দেখাইতেছে যে, পিত্ত গতি-শীল এবং রজোগুণ প্রধান।

পিত্ত শ্লেষ্মা যে তমোগুণ প্রধান এবং স্থিতি-শীল এ বিষয়ে সকল শাস্ত্রই একবাক্য। বৈদ্যশাস্ত্রের মতানুসারে—শ্লেষ্মা জলেরই প্রতিরূপ, পিত্ত অগ্নিরই প্রতিরূপ, আর বায়ু তো বায়ু আছেই। জল বায়ু এবং অগ্নি এই তিন ভূতের মধ্যে প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে—বায়ু, তাহার পরে অগ্নি, তাহার পরে জল; সুতরাং তিনের মধ্যে বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ, অগ্নি মধ্যম পদবীস্থ, এবং জল নিম্ন পদবীস্থ। এখন বক্তব্য এই যে নিম্নতম পদবীস্থ জল বা শ্লেষ্মা যখন শাস্ত্রে তমোগুণ প্রধান বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমি মধ্যস্থ পদবীস্থ পিত্তকে রজোগুণ প্রধান বলিতেছি এবং উচ্চতম পদবীস্থ বায়ুকে সত্ত্বগুণ প্রধান বলিতেছি, ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে তবে সে দোষ—আমার

তত নয়, যত শাস্ত্রের! যেহেতু শাস্ত্রে আছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা!"

উপরে যাহা বলা হইল—সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে যে, বায়ু সৃষ্টিশীল, এবং সত্ত্বগুণ প্রধান, পিত্ত গতিশীল এবং রজোগুণ-প্রধান শ্লেষ্মা স্থিতিশীল এবং তমোগুণ প্রধান।

আপনারা আমাকে বলিতে পারেন যে, রোগ চিকিৎসার কথা হইতেছে তাহাই হউক্—সত্ত্বরজস্তমো লইয়া এত মারামারি লাঠালাঠি কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, মৃদঙ্গের সুর-বাঁধা উপলক্ষে তাহারা প্রত্যেক গাঁটে যখন মারামারি লাঠালাঠি হয়, তাহার বিরুদ্ধে আপনারা একটি কথাও তো মুখে উচ্চারণ করেন না—অথচ তাহার উপদ্রবে আপনাদের কর্ণে তালা ধরিয়া যায়! ইহার বেলায় আপনারা যেমন ভবিষ্যতের অনুরোধে বর্ত্তমানে সাত খুন মাপ করেন, আমার প্রতিও আপনারা সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে ভাল হয়, কেননা ইহার পরে যাহাতে বেসুরা ধ্বনির জ্বালায় আপনাদের কাণ ঝালাফালা না হয়, সেই উদ্দেশেই আমি এতক্ষণ ধরিয়া বহুযত্নে আমার এই ভাঙা বীণা যন্ত্রটির পাঁচটা তারের পাঁচ রকম সুর একত্রে মিলাইয়া সকলকেই ঠিক্‌মাত্রায় বাগাইয়া আনিলাম। এক্ষণে আপনারা দেখিবেন যে, তারগুলি যদি পৃথক পৃথক ধ্বনিত করা হয় তবে পাঁচটি তার হইতে পাঁচটি বিভিন্ন সুর পরে পরে বিনির্গত হইবে; আর, সকলগুলি যদি এক সঙ্গে ধ্বনিত করা হয়, তবে সকলের মধ্য হইতে একই সুমধুর তান ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া জাগরণের নবোদ্যম হইতে স্বপ্ন মাধুর্য্যে এবং স্বপ্ন মাধুর্যে হইতে প্রসুপ্তির সুকোমল শয্যায় ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।

বীণার প্রথম তার—গুণ ত্রয়, কিঃ না সত্ত্বরজস্তমো। দ্বিতীয় তার—দোষ-ত্রয়; কিঃ না বাত পিত্ত কফ। তৃতীয় তার—বৃত্তি ত্রয়, কিঃ না চিন্তা চেষ্টা নিদ্রা। চতুর্থ তার—ভূতত্রয়; কিঃ না বায়ু অগ্নি জল। পঞ্চম তার—সমাজের দলত্রয়; কিঃ না সৃষ্টির দল, গতির দল স্থিতির দল।

প্রবন্ধের গোড় বাঁধা শেষ হইল, এখন প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যা'ক্—সমাজের রোগই বা কিরূপ, আর, তাহার কবিরাজি চিকিৎসা প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

রোগ কিঃ না ধাতু বৈষম্য। ধাতুশব্দে সপ্ত ধাতুও বুঝায় ত্রিধাতুও বুঝায়। সপ্ত-ধাতু কিঃ না রস রক্ত মাংস মেদ মজ্জা অস্থি শুক্র। ত্রিধাতু কি? না ত্রিদোষ—বাত পিত্ত কফ; তাহার সাক্ষী—শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে "কুণপে ত্রিধাতুকে"। বাত পিত্ত কফ কি অর্থে ত্রিদোষ এবং কি অর্থে ত্রিগুণ তাহা বৈদ্য শাস্ত্রে সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; যথা,—

"ধাতবশ্চ মলাশ্চাপি দুষ্যন্ত্যেভির্যতস্ততঃ বাত পিত্ত কফা এতে ত্রয়ো দোষা ইতি স্মৃতাঃ। তে ধাতবোঽপি বিজ্ঞেয়া ধরিতা দেহ ধারণাৎ।"

অর্থাৎ বাত পিত্ত কফ—সপ্ত ধাতু এবং মল সমূহকে দূষিত করে—এই অর্থে দোষ; আর, দেহের ধারণকর্ত্তা—এই অর্থে ধাতু। এখন বক্তব্য এই যে, ধাতুত্রয়ের উদ্যমস্ফূর্ত্তির একটি মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে—তাহাই তাহাদের সাম্যাবস্থা এবং তাহাই শরীরের স্বাস্থ্য; সেই সাম্যের মাত্রা ছাড়াইয়া উপরে ওঠাও যেমন, আর সেই সাম্যের মাত্রা হইতে নীচে নাবিয়া পড়াও তেমনি, দুইই ধাতুবৈষম্য; আর, সেই ধাতু বৈষম্যের নামই রোগ বা ব্যাধি।

ধাতুত্রয়ের উদ্যম স্ফূর্ত্তি যখন সাম্যের মাত্রা ছাড়াইয়া উপরে উত্থান করে, তখনই তাহাদের

নিজ-মূর্ত্তি গুলি প্রকাশ পাইয়া উঠে; এইজন্য বিভিন্ন ধাতুর বিভিন্ন গুণের পরিচয় লাভ করিতে হইলে, তাহাদের বৃদ্ধির অবস্থায় তাহারা কে কিরূপ ধারণ করে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য; তাহাই এক্ষণে করা যাইতেছে:—

সৃষ্টির দলই সমাজের বায়ু, এই দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে চিন্তা এবং কল্পনার সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সামাজিক বায়ু-বৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ—উদ্‌ভ্রান্ত কবিত্বের অসম্বদ্ধ প্রলাপ; দ্বিতীয় উপসর্গ—ন্যায় শাস্ত্রীয় কূতর্কজালের ঢেঁকির কচকচি; তৃতীয় উপসর্গ—বিজ্ঞান মহলে আনুমানিক সিদ্ধান্তের ছড়াছড়ি।

সমাজের পিত্ত কি? না গতির দল; এ এক-প্রকার গুণ্ডার দল। এ দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে গাত্র-দাহ এবং ছট্‌ফটানি'র প্রাদুর্ভাব হয়। সামাজিক পিত্তবৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ—উচ্চ শ্রেণীর প্রতি বিষ-দৃষ্টি; দ্বিতীয় উপসর্গ রাষ্ট্র-বিপ্লব, দলাদলি, ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, এবং স্থিতিভঙ্গ; তৃতীয় উপসর্গ প্রবলের আধিপত্য।

সমাজের শ্লেষ্মা কি? না স্থিতির দল। এ দলের বৃদ্ধি হইলে সমাজে আলস্য অকর্ম্মণ্যতা এবং বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব হয়। সামাজিক শ্লেষ্মা বৃদ্ধির প্রথম উপসর্গ বিলাসী রাজ-সভা এবং তাহার বাহ্য চাকচিক্য, দ্বিতীয় উপসর্গ—জোঁকের ন্যায় রুধির-শোষক অমাত্যবর্গ এবং তাহাদের স্ফীত উদর, তৃতীয় উপসর্গ—নিরন্ন প্রজাবর্গ এবং তাহাদের রুগ্ন দেহ।

ফরাসীস্ রাষ্ট্রবিপ্লব ত্রিদোষের প্রকোপাবস্থার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ। ফরাসীস্ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগকে বলিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, Rousseau, Voltaire প্রভৃতি বায়ু-প্রধান মহাত্মারাই ফরাসীস্ বিপ্লবের সৃষ্টিকর্ত্তা কিনা মূল প্রবর্ত্তক; আর, Robbespere, Danton প্রভৃতি পিত্তপ্রধান মহাত্মারা ফরাসীস্ বিপ্লবের গতিকর্ত্তা কিনা নির্ব্বাহ-কর্ত্তা। Rousseau Voltaire প্রভৃতি সৃষ্টি-শীল বায়ু-প্রধান ভট্টাচার্য্যেরাই Robbespere প্রভৃতি ভুঁইফোঁড় গতিশীল ব্যক্তিদিগের পিত্তানল ফুঁ দিয়া উস্কাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারা অনতি পরেই সে অনলের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া ফরাসীস্ দেশের মস্তকস্থানীয় ঊর্দ্ধ-শ্লেষ্মা (অর্থাৎ রাজ-পরিবার এবং আর আর স্থিতির দল) দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার কিয়ংকাল পরেই সমস্ত-ইউরোপময়—একদিকে পিত্তের প্রকোপ নেপোলিয়ানের তোপাগ্নি; আর একদিকে শ্লেষ্মার প্রকোপ—ইউরোপীয় রাজন্য সম্প্রদায়ের নাকের জল চোকের জল; এবং মাঝখানে বায়ুর প্রকোপ—ইংলণ্ডের ভেদ-পটুতা;—এযে ভেদপটুতা—ইহা সামান্য ভেদপটুতা নহে! কীরূপ ভেদপটুতা যদি জিজ্ঞাসা করেন—তবে চুপি চুপি বলি শ্রবণ করুন্ :—বিরোধী পক্ষদ্বয়ের বিরোধানল ফুঁ দিয়া উস্কাইয়া তুলিয়া আড়ালে সরিয়া দাঁড়ানো এবং সুবিধামতে অগ্রসর হইয়া উপর-চাল চালা। এইরূপ বর্ত্তমান শতাব্দীর কৈশোর বয়সে ত্রিদোষের প্রকোপ-সূত্রে ইউরোপে সন্নিপাতের লক্ষণগুলি স্পষ্টাকারে দেখা দিয়াছিল; এমন কি—এখনো পর্য্যন্ত ইউরোপকে তাহার ধাক্কা সামলাইতে হইতেছে।

এইরূপ, বাত-পিত্ত-কফের বৃদ্ধির অবস্থায় তাহাদের প্রতি স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিলে তাহাদের কাহার কিরূপ প্রকৃতি এবং ভাব-গতি তাহার এক-একটি আদর্শ-লিপি হস্তে পাওয়া যাইতে পারে; তাহার পরে সেই তিনটি আদর্শ-লিপির সহিত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিলেই, সমাজের কোন্ স্থানে কোন্ ধাতুর কিরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহা অনুসন্ধাতার চক্ষে সহজেই ধরা পড়িতে পারে।

আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গ-সমাজের চক্রসীমার অভ্যন্তরেই আমরা তিনদলের তিন রকম চাল্-চোল্ দেখিতে পাই; শ্লেষ্মার দলের চাল্-চোল্ বাঁধা-সাঁধা রকমের; পিত্তের দলের চাল্ চোল্ আঁকা-বাঁকা রকমের; বায়ুর দলের চাল্ চোল্ উড়ো-উড়ো রকমের!

শ্লেষ্মার দল কাঁহারা? না যাঁহারা নূতন উদ্যমকে বাঘের মতো ডরা'ন এবং গতানুগতিকতাকেই জীবনের সর্ব্বপ্রধান পুরুষার্থ মনে করেন। ইঁহাদের আছে সকলই—বিদ্যা বুদ্ধি আছে, ভদ্রতা বিনয় আছে, বারো মাসে তেরো পার্ব্বন আছে;—সবই কিন্তু মুখস্থ রকমের! ইঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধি মুখস্থ-রকমের, ভদ্রতা-বিনয় মুখস্থ-রকমের, এমন কি—দান ধ্যানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানও মুখস্থ-রকমের। মুখস্থ-রকমের—অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে "mere conventional." পুৎলো-বাজিরকল যেমন বাজিকরের হস্তে, ইঁহাদিগকে চালাইবার কল তেমনি অতীতের হস্তে। ইঁহাদের মতে অতীতের মতো কাল আর জগতে নাই; বর্ত্তমান অতিশয় কদর্য্য এবং জঘন্য; আর, ভবিষ্যৎ যার পর নাই অধম পাপিষ্ঠ; ভবিষ্যৎটা যদি আদবেই না থাকিত তো ভাল হইত! ধারাবাহিক লৌকিক প্রথা যাহা মান্ধাতার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই ইঁহাদের একমাত্র আশ্রয়-দুর্গ! তাহার ঘুনধরা চৌকাটের এবং নোনা-ধরা প্রাচীরের এক পা বাহিরে পদার্পণ করিতে হইলেই ইঁহাদের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে।

শ্লেষ্মা স্থিতিশীল এবং ঠাণ্ডা, পিত্ত গতি-শীল এবং গরম! যাঁহারা স্থিতিশীলদিগের কুলপরম্পরাগত অযত্ন-সুলভ ভদ্রতা বিনয় মান-সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি দেখিয়া গাত্র-দাহে ছট্ ফট্ করিতে থাকেন, তাঁহারাই পিত্তের দল। ইঁহাদের প্রধান একটি গুণ এই যে, যত কেন ভাল সামগ্রী হউক্ না তাহার কু-টিই কেবল ইঁহাদের চক্ষে পড়ে, তাহার সু-য়ের প্রতি ইঁহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। যদি এমন কোনো একটি বস্তু ইঁহাদের সম্মুখে দৈবযোগে উপস্থিত হয়, যাহার গুণ পোনেরো আনা গুণকে ষোলো আনা গুণ মনে করিলে, ইঁহারা সেইখানে তাহার এক আনা দোষকে ষোল আনা দোষ মনে করিবেন! শ্লেষ্মার দল বলেন "পুরানো চা'ল ভাতে বাড়ে", পিত্তের দল বলেন "পুরাণো চা'ল রোগীর পথ্য!" শ্লেষ্মার দল বলেন "যাহা আছে তাহাই থা'ক, যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক," পিত্তের দল বলেন "সমস্তই উল্টাইয়া যা'ক্—মাথা পায়ের নীচে যা'ক্, পা মাথা'র উপরে।" লোকালয়ে মড়ক উপস্থিত হইলে শকুনি বর্গের যেমন আনন্দ হয়, লোক-সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে পৈত্তিক দলের তেমনি আহ্লাদ আর ধরে না!

শ্লেষ্মা স্থিতিশীল, পিত্ত গতিশীল; বায়ু সৃষ্টিশীল। বায়ুর দল পক্ষীর দল! বিগত শতাব্দীতে একদল গাঁজাখোর হরেক রকমের পাখী সাজিয়া ধনাঢ্য বাবুদিগের বৈঠক খানায় মজলিস্ জমাইত; যাহাদের নাম ছিল পক্ষীর দল। ইঁহারা মনোরাজ্যে বাস করেন, এবং কল্পনা লইয়া দিনাতিপাত করেন! কখনো বা ইঁহারা স্থির-বায়ু হইয়া ভূলোক এবং দ্যুলোকের সন্ধি-স্থলে অবস্থিতি করেন; কখনো বা সেখান হইতে নীচে নামিয়া মুখের এক এক ফুঁয়ে পিত্তের অনল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়া এবং শ্লেষ্মার সাগরে তরঙ্গ উঠাইয়া দিয়া দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দে'ন; কখনো বা মলয় মারুত বেশে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া সমাজের গ্রন্থি-সকল সরসও করেন—সতেজও করেন; এইরূপে রস এবং তেজের—শ্লেষ্মা এবং পিত্তের—বিরোধ ভঞ্জন করিয়া সমাজের শ্রী ফিরাইয়া দে'ন। অতঃপর তিন ধাতুর মধ্যে

বিরোধই বা কিরূপ, আর, বিরোধের ভঞ্জনই বা কিরূপ, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তিন ধাতু যখন আপনাকে বিস্মৃত হইয়া সমগ্র শরীরের হিত-সাধনে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহারা গণনায় তিন হইলেও কার্য্যে এক। তিন ধাতুর মধ্যে যখনই এইরূপ একাত্ম-ভাব দেখিবে, তখনই জানিবে যে, তাহাদের প্রত্যেকেরই উদ্যমের মাত্রা ঠিক্ আছে, তাহার এক চুলও উপরে ওঠে নাই—একচুলও নীচে নাবে নাই। পক্ষান্তরে যখন দেখিবে যে, তিন ধাতুর উদ্দেশ্য তিন প্রকার—এ চায় ভাবের প্রাধান্য, ও চায় কাজের প্রাধান্য, সে চায় ভোগের প্রাধান্য, সকলেই স্ব স্ব প্রধান—সমগ্র শরীর কেহই নহে, যখন দেখিবে যে শ্লেষ্মা শরীরকে ডুবাইয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, পিত্ত দগ্ধিয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, এবং বায়ু শুখাইয়া মারিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখনই জানিবে যে, ধাতুর অসংযত উদাম-স্ফূর্ত্তি সাম্যের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ধাতু ত্রয়ের এইরূপ স্ব স্ব-প্রধান বিশৃঙ্খল ভাবই তাহাদের প্রকোপাবস্থা। প্রকোপই বিরোধের জন্মদাতা,—ধাতুত্রয়ের প্রকোপ হইলেই তাহাদের মধ্যে বিরোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

কোনো-একটি ধাতুর প্রকোপ হইলে, অপর দুইটি ধাতু তাহার সহিত বিরোধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। একপ বিরোধ খুবই ভাল যদি তাহা সাম্য-মুখী হয়, অর্থাৎ যদি তাহার গতি সাম্যের দিকে হয়। পৃথিবী যদি চিরকালই সমুদ্র-রূপিণী শ্লেষ্মার গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া রসাতলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত, তাহার উদরস্থিত আগ্নেয় পিত্ত যদি যথা সময়ে উত্তেজিত না হইত, সমুদ্রের সঙ্গে বিরোধ করিয়া যদি পর্ব্বত বাজি আকাশে মস্তক উত্তোলন না করিত, তবে পৃথিবীর দশা আজ কি হইত? এরূপ বিরোধের উদ্দেশ্য টক্‌বাটক্কিও নহে, আড়াআড়িও নহে, বৈরনির্য্যাতনও নহে,—ইহার উদ্দেশ্য কেবল সাম্য-সংস্থাপন, তাহার সাক্ষী—একদিকে যেমন পর্ব্বতরাজি সমুদ্রের সঙ্গে বিরোধ করিয়া আকাশে মস্তক উত্তোলন করে, আর একদিকে তেমনি পর্ব্বত হইতে নদনদী প্রসূত হইয়া পর্ব্বত এবং সমুদ্রের মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ়-রূপে আঁটিয়া দেয়, সমুদ্র পর্ব্বতকে তুষারের বাষ্পীয় উপাদান প্রণামি দেয়—পর্ব্বত সমুদ্রকে গৈরিকারক্ত জলরাশি আশীর্ব্বাদি প্রদান করে, এইরূপে উভয়ের মধ্যে স্নেহ-ভক্তির আদান-প্রদান অহর্নিশি চলিতে থাকে। বিরোধের গতি যখন, এইরূপ সাম্যের দিকে হয়, তখন বিরোধ হইতেই বিরোধের ভঞ্জন প্রসূত হইয়া বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থলে পরম আরোগ্য এবং পরমাশান্তি আনিয়া উপস্থিত করে। এইরূপ সাম্যমুখী বিরোধ—যাহার কথা আমি এক্ষণে বলিতেছি, তাহা একটি নৈসর্গিক কাণ্ড। তাহা প্রকৃতি-মাতার স্বহস্তের চিকিৎসা-কার্য্য। তাঁহার হস্তের কার্য্যে তাঁহার প্রাণ রহিয়াছে—সে কার্য্য তিনি যেমন পরিপাটী-রূপে নির্ব্বাহ করেন—অপর কাহারো তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে—স্বয়ং ধন্বন্তরীরও নহে। প্রকৃতি মাতার স্বহস্তের এই যে চিকিৎসাপ্রণালী, ইহা সকল চিকিৎসারই মূল আদর্শ। প্রকৃতি-মার নিকটে হাইড্রোপাথিও নূতন নহে—হোমিওপাথিও নূতন নহে। মেদিনী যখন প্রখর গ্রীষ্মতাপে উত্তপ্ত হয়, তখন তিনি তাহার মস্তকের উপরে হড়হড় করিয়া বর্ষার বারিধারা ঢালিয়া দে'ন — ইহার তুল্য সূক্ষ্ম হোমিওপাথিই বা কে কোথায় দেখিয়াছে! প্রকৃতি-মাতার এই যে স্বহস্তের চিকিৎসা প্রণালী, ইহার নাম আমি কিয়ৎপূর্ব্বেই আপনাদের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছি, কী? না সাম্যমুখী বিরোধ অর্থাৎ যে বিরোধের লক্ষ্য এবং গতি সাম্যের দিকে। আর এক প্রকার

বিরোধ আছে—সেইটিই সর্ব্বনাশের মূল:—কী? না বৈষম্যমুখী বিরোধ। ইহার লক্ষ্য সাম্য সংস্থাপন নহে, কিন্তু ঠিক্ তাহার বিপরীত: ইহার লক্ষ্য আপনার আপনার প্রাধান্য-সংস্থাপন। সাম্য-মুখী বিরোধ যেমন বিরোধী পক্ষদ্বয়'কে বৈষম্য হইতে সাম্যে উপনীত করিয়া দিবার সোপান, বৈষম্য-মুখী বিরোধ তেমনি বিরোধী পক্ষদ্বয়কে তীব্র হইতে তীব্রতর বৈষম্যে উপনীত করিয়া দিবার সোপান। সাম্যমুখী বিরোধ আরোগ্যের সোপান, বৈষম্য-মুখী বিরোধ বিনাশের সোপান! ইহার একটি শরীর ঘটিত উদাহরণ দিতেছি;—শ্লেষ্মার প্রকোপ একপ্রকার ধাতু-বৈষম্য, পিত্তের প্রকোপ আর এক প্রকার ধাতু-বৈষম্য; একদিকে শ্লেষ্মার প্রকোপ হইলেই তাহার পাল্টা দিবার জন্য আর এক দিকে পিত্তের প্রকোপ হয়; এরূপ অবস্থায়—দুই পক্ষের বিরোধ যদি সাম্য-মুখী হয়, তবে উভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়েরই ক্রমে ক্রমে সাম্যের দিকে গতি হইতে থাকে ; আজ এ-বেলা পিত্তের দাহ তাপ-মানযন্ত্রের পারদ-রেখা'কে ১০৩-এর দাগে উঠাইয়া দিল, ও-বেলা শ্লেষ্মার গুরুভার তাহাকে ৯৭-এর দাগে নাবাইয়া দিল; দ্বিতীয় দিন পিত্তের দাহ পারদরেখা'কে তত উচ্চে না উঠাইয়া ১০১-এর দাগে উঠাইল, এবং শ্লেষ্মার গুরুভার পারদরেখা'কে তত নীচে না নাবাইয়া ৯৭৷৷০ এর দাগে নাবাইল; তৃতীয় দিন পারদ-রেখা ৯৮ এর দাগে উঠিয়া সেইখানেই স্থির রহিল। ইহারই নাম শ্লেষ্মার এবং পিত্তের (অথবা যাহা একই কথা—নয়ন এবং গরমের) সাম্যমুখী বিরোধ; আর, এইরূপ সাম্যমুখী বিরোধই আরোগ্যের মূল। ইহার পরিবর্ত্তে যদি বিরোধের গতি হয় দুই পক্ষেরই উত্তরোত্তর অধিকাধিক প্রকোপের দিকে, যদি এরূপ হয় যে, প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিনে গাত্র উষ্ণ হইবার সময়েও বেশী উষ্ণ—শীতল হইবার সময়েও বেশী শীতল; তৃতীয় দিনে আবার ততোধিক; এইরূপ করিয়া বিরোধ যদি বিরোধী পক্ষদ্বয়কে উত্তরোত্তর ক্রমশই বৈষম্য হইতে বৈষম্যের দিকে লইয়া যাইতে থাকে; তবে-আর কিছুতেই রক্ষা নাই! দুর্ভাগ্য-ক্রমে বঙ্গসমাজে শেষোক্ত প্রকার বিপত্তি-ঘটনার পূর্ব্ব লক্ষণ কতক কতক দেখা দিয়াছে। তাহার সাক্ষী—শ্লেষ্মার গলা ঘড়্-ঘড়ানি নিষ্কর্মা বিলাসীদিগের সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা আল্‌বোলা গুড়গুড়ির ঘড়্-ঘড়ানি-সহকৃত গাল-গল্পে পরিণত হইতেছে; পিত্তের গাত্রদাহ উকিল মোক্তার দালাল প্রভৃতির নানা-প্রকার পাকচক্রময় ফন্দি-বাজিতে এবং কলিকাতার জনতারণ্যে দিশাহারা নিঃসহায় নিরুপায় ক্ষীণজীবি B. A. M. A. দিগের বিফল দন্ত আস্ফালনে পরিণত হইতেছে; আর, বায়ুর হাত-পা খিঁচুনি পত্র-সম্পাদকের লেখনীর আঁচড়া-আঁচড়ি ঠোক্‌রা-ঠুক্‌রি এবং খোঁচা-খুঁচিতে পরিণত হইতেছে। তিন ধাতুর এইরূপ প্রকোপের অবস্থা—গতিক বড় ভাল নহে; ইহা সন্নিপাতেরই পূর্ব্ব লক্ষণ। এরূপ অবস্থার বাড়াবাড়ি হইলে শ্লেষ্মার প্রতিবিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য—রোগীকে বিষ-বড়ি খাওয়ানো কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশে তিন ধাতুর প্রকোপ এখনো ততদূর চরম অবস্থায় পৌঁছে নাই; তাই বলি যে, এত শীঘ্র বিষ-বড়ি খাওয়াইয়া বঙ্গসমাজের রক্ত গরম করিয়া তুলিয়া তাহাকে হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার—এরূপ একটা সঙ্কট স্থানে অবস্থাপিত করা কোনো সুচিকিৎসকেরই পরামর্শসিদ্ধ হইতে পারে না। বঙ্গ-সমাজে ত্রিদোষ এখনো এতদূর দিগ্বিদিক্ শূন্য হয় নাই যে, তাহাকে কৌশলে সাম্যের পথে ধীরে ধীরে বাগাইয়া আনা যাইতে না পারে। সুচিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই বেলা ভালো'য় ভালো'য় তিন ধাতুর মধ্যে একাত্মভাব সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। তিন ধাতু যাহাতে আপনার আপনার প্রাধান্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সমগ্র সমাজের হিতসাধনে নিযুক্ত

হইতে পারে, সেইরূপ একটি সদুপায় অবলম্বন করা কর্তব্য;—কেননা এখনও সময় আছে; সময় হাত ছাড়া হইয়া গেলে মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি করিলেও কিছুতেই কিছু হইবে না!

সামাজিক রোগের চিকিৎসা দুইরূপ—আসুরিক চিকিৎসা এবং সুচিকিৎসা।

আসুরিক চিকিৎসা কী? না বিরোধী ধাতু-ত্রয়ের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রবল, তাহার মূলোচ্ছেদ করা। সুচিকিৎসা কী? না বিরোধী পক্ষত্রয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা। আসুরিক চিকিৎসা খুব সহজ; তাহা আর কিছু না—যদি বায়ুর প্রকোপ বশতঃ সমাজের গতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া থাকে, তবে গদাঘাতে তাহার হাত পা খোঁড়া করিয়া দেও, তাহা হইলেই তাহার গতিশীলতা জন্মের মত প্রশান্ত হইয়া যাইবে; যদি বুকে শ্লেষ্মা আটকাইয়া শয্যাগত হইয়া থাকে, তবে বুকে শেল বিঁধাইয়া দেও, তাহা হইলেই শ্লেষ্মা পালাইতে পথ পাইবে না! আসুরিক চিকিৎসা একে তো এই, তাহাতে আবার যদি চিকিৎসক-টি হাতুড়ে শ্রেণীভুক্ত হ'ন, তবে-আর রক্ষা নাই! অতএব তাহাতে কাজ নাই—বৈদ্য-শাস্ত্রের মতানুযায়ী সুচিকিৎসার পন্থা অন্বেষণ করা যাক। সুচিকিৎসা অপেক্ষাকৃত কঠিন; তাহা এই যে, ধাতুত্রয়ের মধ্যে কোনো একটির যদি সমধিক প্রকোপ হইয়া থাকে, তবে অপর দুইটির সহিত তাহার সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে সাম্যাবস্থায় বাগাইয়া আনা। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে শেষোক্ত চিকিৎসা-প্রণালীই বঙ্গসমাজের বর্তমান ধাতবিক অবস্থায় সবিশেষ উপযোগী; সে ধাতবিক অবস্থা কিরূপ তাহা যদি আপনারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে ধৈর্য্য-যষ্টি অবলম্বন করিয়া আমার সঙ্গে আসুন—আমি আপনাদিগকে তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই খুলিয়া-খালিয়া দেখাইতেছি।

এক্ষণে বঙ্গ-সমাজে, তিন ধাতু তিন বিরোধী পক্ষে পরিণত হইয়াছে;—কী? না এ পক্ষ, ওপক্ষ এবং অনুভয় পক্ষ; "অনুভয় পক্ষ" অর্থাৎ না এপক্ষ, না ওপক্ষ। শ্লেষ্মা'র দল এপক্ষ, পিত্তের দল ওপক্ষ; আর, বায়ুর দল অনুভয় পক্ষ। অনুভয় পক্ষ কখনো বা এ পক্ষের হইয়া ও পক্ষের সহিত বিবাদ করেন; কখনো বা ও-পক্ষের হইয়া এ-পক্ষের সহিত বিবাদ করেন, যেহেতু বায়ুর বিচিত্র গতি! বায়ু কখনো বা পূর্ব্ব-মুখো হয়, কখনো বা পশ্চিম-মুখো হয়; তাহাকে বাঁধাবাঁধির মধ্যে ধরিয়া রাখা দেবতারও অসাধ্য!

বৈদ্য-শাস্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্যের শৈশবাবস্থা শ্লেষ্মা-প্রধান। কচিবয়সে লোকে পিতা-মাতার নিকট হইতে যেরূপ শিক্ষা লাভ করে, তাহারা প্রথমে সেই পক্ষ অবলম্বন করে, ইহাকেই আমি বলি—এ পক্ষ। তাহার পরে কতক বা বুদ্ধির গতিকে, কতক বা ভাবের গতিতে, কতক বা সঙ্গের গতিকে, লোকে যখন পক্ষান্তর অবলম্বন করে, তখন তাহাকেই আমি বলি—ওপক্ষ। তাহার পরে যখন ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা দুই পক্ষ হইতেই ঊর্দ্ধে উত্থান করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে ভাল মন্দ বিচার করে; সাদা কথায়—একবারকার রোগী যখন আরবারকার রোজা হয়; তখন তাহাকেই আমি বলি—অনুভয় পক্ষ। অনুভয় পক্ষ যখন কেবল শূন্যে ভর করিয়া অবস্থিতি করে, তখন তাহাকেই আমি বলি—উদাসীন পক্ষ। অনুভয় পক্ষ যখন (জ্ঞাতসারেই হউক্ আর অজ্ঞাতসারেই হউক্) উভয় পক্ষের বিরোধানলে আহুতি প্রদান করে তখন তাহাকেই আমি বলি—বিভেদী পক্ষ। অনুভয় পক্ষ যখন উভয়-পক্ষের সন্ধিস্থলে অবতীর্ণ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তাহাকেই আমি বলি—মধ্যস্থ পক্ষ! যদি আপনারা তিন পক্ষ চা'ন তাহাও আছে, আর, যদি পাঁচ পক্ষ

চা'ন তাহাও আছে; তিন পক্ষ কী? না এ পক্ষ, ও পক্ষ, অনুভয় পক্ষ; পাঁচ পক্ষ কী? না এপক্ষ, ওপক্ষ, উদাসীন পক্ষ, বিভেদী পক্ষ, মধ্যস্থ পক্ষ। এই সব পক্ষাপক্ষি এবং দলাদলির গোড়া'র কাহিনীটি এইখানে আমি আপনাদের নিকটে ভাঙিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি, তাহা এই,—

আমাদের দেশে প্রথম অর্থোপার্জ্জনই ইংরাজি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং প্রবর্ত্তক ছিল। ইংরাজি শিক্ষাতে অর্থোপার্জ্জন ছাড়া আর যে, কোনো ফল দর্শিতে পারে, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে দুই একজন অসাধারণ মহাত্মা ব্যতিরেকে আর কেহই তাহা বিশ্বাস করিতেন না। ক্রমে ইংরাজি-শিক্ষার সুফলের প্রতি লোকের চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিল। হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। হিন্দু কালেজে ডিরোজেরিও নামক একজন উঁচু দরের বায়ু প্রধান শিক্ষক ছিলেন—তাঁহারই মুখের ফুঁয়ে ছাত্রদিগের পিত্তানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই ক্ষুদ্র বীজ হইতে ইয়ঙ্ বেঙ্গালের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিল। এই অঙ্কুর যখন কালক্রমে সতেজ হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহা ইংরাজি ভাষায় "ইয়ঙ্ বেঙ্গালের দল" এবং বাঙ্গালি ভাষায় "ছোঁড়ার দল" উপাধি প্রাপ্ত হইল। অন্যকে উপাধি প্রদান করিতে গেলে আপনাকেও উপাধির ভার স্কন্ধে বহিতে হয়—এই গতিকে উপাধি-প্রদাতারাও একটি পাল্টা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন;—কী? না গোঁড়া'র দল। বঙ্গ সমাজে, এইরূপে, দুই পক্ষের সৃষ্টি হইল—গোঁড়া'র দল এবং ছোঁড়ার দল; গোঁড়া'র দল এ-পক্ষ, এবং ছোঁড়ার দল ও-পক্ষ। এই দুই পক্ষ তাড়িত-পদার্থের দুই বিপরীত পক্ষের সহিত উপমেয়। তাড়িত-পদার্থের আধার-বস্তু দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—রোধক এবং সঞ্চারক। রোধক কী? না যাহা তাড়িত-পদার্থের গতিরোধ করে; ইংরাজি ভাষায় ইহাকে বলে Non-conductor। এখানে রোধক পদার্থ কে? না ইংরাজ-শাসন। ইহার নিকটে দুই পক্ষের কোন পক্ষেরই জারি-জুরি খাটে না। রোধক-পদার্থটি—চক্ষে দেখা যায় না এইরূপ পাৎলা একখানি কাচ-ফলক—কিন্তু তাহা বজ্র অপেক্ষাও সু-কঠিন। সঞ্চারক পদার্থ কি? না যাহা তাড়িত-পদার্থকে আপনার মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পথ ছাড়িয়া দেয়; ইংরাজি ভাষায় ইহাকে বলে conductor। এখানে সঞ্চারক পদার্থ কে? না আমাদের স্বজাতি—বাঙ্গালি। এখন, কাণ্ডখানা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা এই;—মাঝখানটিতে রহিয়াছে একখানি অদৃশ্য অথচ বজ্র-কঠিন পাৎলা কাচ—ইংরাজের শাসন, আর সেই কাচের দুই পৃষ্ঠে দুইখানি নরম তাঁবা'র পাত—এমনি নরম যে, দুইটির যাহাকে যে দিকে নোয়াও তাহা সেই দিকে নোয়; অর্থাৎ দুইদল বাঙ্গালি। তাহার মধ্যে একটি তাঁবার পাত ভারত ভূমির তাম্র-খনির সঙ্গে তার-যোগে সংযুক্ত, আরেকটি তাঁবার পাত তাড়িত-যন্ত্রের সহিত (অর্থাৎ নব-প্রতিষ্ঠিত কালেজের সহিত) তার-যোগে সংযুক্ত। এইরূপ পরিপাটী রকমে কল পাতা হইলে পর, অনতিপরেই তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইল, ব্যাপারটি যাহা ঘটিল—তাহা এই;—কাচ-ফলকের ও পৃষ্ঠের তাঁবার পাতে ওপক্ষীয় তাড়িত পদার্থ এক এক দমকে এক এক ক্ষেপ করিয়া কালেজ হইতে যেমন যেমন উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহার পাল্টা দিবার জন্য কাচ-ফলকের এপৃষ্ঠে এ পক্ষীয় তাড়িত পদার্থ তেমনি তেমনি গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। রাজধানীতে যেই কালেজ মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইল, গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সেই-অমনি চতুষ্পাঠীবৃন্দ তাহার বিরুদ্ধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিল। ও পক্ষে ইয়ঙ্ বেঙ্গল এক এক অভিমন্যু, এ পক্ষে গোঁড়া'র

দলের সাত সাত মহারথী—দুইপক্ষের মধ্যে তুমুল কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। গোঁড়াদিগের পক্ষ হইতে অভিসম্পাত এবং ধোপা-নাপিত-বন্ধের ব্যবস্থা, আর, ইয়ং বেঙ্গালের পক্ষ হইতে কোনতের প্রতি স্বর্ণ রজতের সুদর্শন চক্র—অপরের প্রতি অর্দ্ধ-চন্দ্র বাণ, এইরূপ দুই পক্ষ হইতে দুইরূপ বাণ-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কিন্তু "স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্ কামারের একঘা!" ইংরাজি বিদ্যার প্রখর আলোকে এবং প্রচণ্ড উত্তাপে গোঁড়ামি ক্রমশই সহর নগর হইতে দূর-দূরস্থিত পল্লিগ্রামে নির্ব্বাসিত হইতে লাগিল ;—আলোক ইস্কুল-মাষ্টারদিগের মধ্য হইতে এবং উত্তাপ দারোগা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্য হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ইয়ং বেঙ্গালের বিষ দাঁত গজাইয়া উঠিল এবং গোঁড়া সম্প্রদায়ের বিষ দাঁত ভাঙিয়া গেল। এইরূপে এক প্রস্থ জয়-পরাজয় হইয়া চুকিয়া বঙ্গ-সমাজ কিছুকালের মতো নির্বিবাদের শান্তি সম্ভোগ করিতে লাগিল। এই সময়কার থম্‌থোমে অবস্থায় আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথমে সোমপ্রকাশ এবং তাহার গণ্ডা গণ্ডার অনুপ্রকাশ কালোচিত সভ্যভব্য বেশে বাহির হইতে আরম্ভ করিল। আমাদের দেশে সাঁচা সংবাদপত্রের এই নূতন গোড়াপত্তন। ইহার অনতি-পরে বঙ্গ-দর্শনের জ্যোৎস্না-বিকাশ পূর্ণিমা-শিখরে আরোহন করিয়া শুক্লপক্ষ হইতে ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণপক্ষে ঢলিয়া পড়িতে চলিল, আর, তাহার পিছনে পিছনে—দল কে দল সাহিত্য সমালোচক মাসিক-পত্রিকা মুদ্রা যন্ত্র হইতে ঘন ঘন প্রসূত হইতে লাগিল। সেই সব নানা রঙের নানা ঢঙের নানা পত্রিকায় নানা বিরোধী পক্ষের ঢুসা-ঢুসি-গতিকে, আমাদের দেশে অনুভয় পক্ষের সৃষ্টি হইল। অনুভয় পক্ষের গোড়া'র বৃত্তান্তটি আপনাদিগকে তবে আমি বলি—যেহেতু রোগ যত শীঘ্র হয় বাহির করিয়া ফেলাই ভাল, তাহাকে চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে; তাহা এই;—

পৃথিবী চুপ করিয়া বসিয়া নাই—পৃথিবী ক্রমাগতই ঘুরিতেছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের জীবন-চক্রও ঘুরিতেছে; বাল্য যৌবন এবং জরা জনসমাজে উল্টিয়া-পাল্টিয়া ক্রমাগতই আসিতেছে যাইতেছে। লোকেব মতিও সেই অনুসারে ক্রমাগতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইংলণ্ড-দেশীয় সুবিখ্যাত কবিবর সেলি যদিচ প্রত্যূষেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন তথাপি তিনি মানব-জীবনের পরিণত অবস্থার একটি নিগূঢ় রহস্য (কি জানি কেমন করিয়া) বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তিনি বলেন যে, জীবনের প্রথমার্দ্ধে আমরা যাহা শিক্ষা করি—জীবনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ কাটিয়া যায় মন হইতে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিতে। ঘটিকা যন্ত্রের দোলকের ন্যায় পৃথিবী যেমন গ্রীষ্ম হইতে শীতে এবং শীত হইতে গ্রীষ্মে দোলায়মান হইতেছে, সমাজের লোকও তেমনি এ-পক্ষ হইতে ও-পক্ষ এবং ও-পক্ষ হইতে এ-পক্ষে জোয়ার ভাঁটার ন্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছে। আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতারা অনেক কাল ধরিয়া শাস্ত্রীয় শাসনের পেষণ-যন্ত্রে প্রপীড়িত হইয়া-আসিয়া হঠাৎ যখন একদিন দেখিতে পাইলেন যে, সে সমস্তই মিথ্যা বিভীষিকা, তখন তাঁহারা গর্জ্জন-কারী কোটালের বাণের ন্যায় হুহুংশব্দে এপক্ষ হইতে ওপক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন, তাহার কিয়ৎ-কাল পরে শাস্ত্রীয় পেষণ-যন্ত্রের পরিবর্ত্তে তাঁহারা যখন রাক্ষসী-মায়ার রুধির-শোষক বশীকরণ মন্ত্রে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা সভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ওপক্ষ হইতে এ-পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গ্রীক দেশীয় বিকুশপন্থা ঈসপের হিতোপদেশে এইরূপ একটি উপন্যাস লিখিত আছে যে, একদা একদল ভেক জুটিয়া একটা কাষ্ঠখণ্ডকে আপনাদের রাজ্যের রাজসিংহাসনে বসাইয়াছিল; ক্রমে যখন তাহাদের জ্ঞান

জন্মিল যে, এ রাজা কোনো কর্ম্মের নয়; তখন তাহারা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটা সারস-পক্ষীকে রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। সারস-পক্ষী এমনি অপরাজিত অধ্যবসায়ের সহিত টপাটপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, দুই দিনেই ভেক বেচারীদিগের গাঁ উজাড় হইয়া গেল। এখন বক্তব্য এই যে, দিশী শাস্ত্র এখানে কাষ্ঠ-খণ্ড, বিলাতী শাস্ত্র সারস-পক্ষী; আর মণ্ডুক-দল আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালি ভায়ারা। বঙ্গ সমাজে এক্ষণে একটি অতীব কৌতুকাবহ নাট্য আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইতেছে, তাহা এই;—এ দিকে তৃক্তভোগী বৃদ্ধ ব্যাঙের দল সারসপক্ষীর আড়-দৃষ্টির সম্মুখ হইতে কায়ক্লেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার শৈবালাঙ্কিত জরাজীর্ণ কাষ্ঠ-খণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন; ওদিকে আপাতদর্শী নবীন ব্যাঙাচির দল সারস পক্ষীর কৃপা কটাক্ষের ভিখারী হইয়া সারসীয় ঢঙের পক্ষ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। এ হায় আড়াআড়ির কারণ কী? কারণ কী। কারণ যে কি তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। আড়াআড়ির কারণ বাড়াবাড়ি। কাষ্ঠাশ্রিত বৃদ্ধ ভেকের দলের ঘুমন্ত স্ফীত ভাবের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ সে কালের দোহাই দিয়া "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" পণ্ডিতের অকর্ম্মণ্যতা, আর, সারসাশ্রিত ব্যাঙাচির দলের বেয়াড়িস কর্ম্মতা, অর্থাৎ সারসের মুখোস মুখে দিয়া স্বজাতীয় ভেক মণ্ডলীর সম্মুখে খটস্ খটস্ করিয়া বেড়াইয়া পৃথিবীকে নির্ভেক করিবার চেষ্টা; দুই দলের এই রূপ দুই প্রকার অসঙ্গত বাড়াবাড়ি হইতে দোঁহার মধ্যে মর্ম্মান্তিক আড়াআড়ি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কাষ্ঠাশ্রিত ব্যাঙের দল মহা আড়ম্বরের সহিত শঙ্খ ঘন্টা তুরী ভেরী বাজাইয়া এ কালের স্কন্ধে সে কালের বোঝা চাপাইতে চেষ্টা করিতেছেন; সারসাশ্রিত ভেকের দল ততোধিক আড়ম্বরের সহিত রণ-বাদ্য বাজাইয়া এ দেশের স্কন্ধে ও-দেশের বোঝা চাপাইতে যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না। কেন এ বৃথা পণ্ডশ্রম। কেনই বা একালের স্কন্ধে সে কালের বোঝা চাপানো আর, কেনই বা এ দেশের স্কন্ধে ও-দেশের বোঝা চাপানো। এ কালের স্কন্ধে এ কালের বোঝা যথেষ্ট আছে—এ দেশের স্কন্ধে এ দেশের বোঝা যথেষ্ট আছে—তাহা সে আগে সাম্‌লা'ক্; তাহার পরে না হয় তুমি সে কালের, অথবা ও-দেশের, দুটা উপরি বোঝা তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিলে—সে তো খুব ভাল কথা! কিন্তু তাহা তুমি করিবে না। তুমি চাও এ কালকে গলা টিপিয়া বধ করিতে—উনি চা'ন এ-দেশকে গলা টিপিয়া যমালয়ে পাঠাইতে! যাহা হইতেও পারে না, আর, যাহা, হইলেও তাহাতে দেশের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই, এইরূপ একটা অলীক আড়ম্বরের পদতলে তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম সমস্তই তোমরা মাটি করিতেছ! বুঝিয়াছি তোমাদের মনের ভাব—তাহা এই যে, নিশান উড়াইয়া জগঝম্প বাজাইয়া একটা অভূত-পূর্ব্ব সঙ্ তো পথের মাঝখানে খাড়া করি—রাস্তার দুই ধারে লক্ষ লোকের দুই-লক্ষ চক্ষু তো আমার উপরে ঝাঁকিয়া পড়ুক, সেই সঙ্গে দুই লক্ষ আরো কোনো সামগ্রী পড়িলে আরো ভাল হয়—তাহার পরে তাহার ভাল মন্দ ফলাফল ধীরে সুস্থে বিচার করিতে বসা যাইবে; সে—পরের কথা। এখন তাহার জন্য বেশী কি এত মাথা ব্যথা!" এ যাহা বলিলাম—এটা দুই পক্ষের মন্দের দিক্; তা ছাড়া দোঁহার ভালো'র দিক্‌ও আছে। কিন্তু ভালো'র দিক্‌টা স্বাস্থ্যেরই অঙ্গ—রোগের অঙ্গ নহে। এখানে এখন কেবল রোগের কথা হইতেছে—স্বাস্থ্যের কথা হইতেছে না। পরে যখন রোগের চিকিৎসা উপলক্ষে আরোগ্যের উপায় নিরূপণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে তখন দুয়ের ভালো'র দিক্ বিচার স্থলে আসিবে ; এখন কেবল উভয়ের দোষাংশের প্রতিই—রোগের প্রতিই লক্ষ্য

নিবন্ধ করা পরামর্শ সিদ্ধ। ইংরাজি ভাষায় এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে আর, বোধকরি তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন—তাহা এই যে রোগ জানিতে পারা অর্দ্ধেক আরোগ্য 'To know the disease is half the cure; এ যখন আপনারা জানেন, তখন রোগীর ক্ষতস্থানে এষণী [অর্থাৎ probe] চালনা করিতে যে, চিকিৎসকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে ইহা আপনারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

এখন কোম্পানির আমলের এপক্ষ এবং ওপক্ষের সহিত একালকার এই মহারাণীর আমলের এ পক্ষ এবং ও পক্ষ মিলাইয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, বর্ত্তমান আমলের দুই পক্ষের কোনো পক্ষই—না এ-পক্ষ—না ও পক্ষ। বর্ত্তমানকালের উভয় পক্ষই অনুভব পক্ষ—তবে কিনা ছদ্মবেশী অনুভয় পক্ষ। কোম্পানীর আমলে দুই পক্ষের মধ্যে যত কিছু দলাদলি এবং আড়া-আড়ি চলিত সমস্তই মত ও বিশ্বাস লইয়া। ইয়ঙ্ বেঙ্গালের দল গোঁড়ার দলকে সত্যসত্যই অন্ধতমসাচ্ছন্ন অজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন গোঁড়া'র দলও তেমনি বিপক্ষ দলকে সত্যসত্যই ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট কুলাঙ্গার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের কাহারো অন্তঃকরণে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। তখনকার ইয়ঙ্ বেঙ্গলের দল সহস্র আচার ভ্রষ্ট হইলেও ও দেশী সঙ্ সাজিতেন না; আর তখনকার কালের অতি বড় গোঁড়া হিন্দুও সে কালের একটা স্বকপোলকল্পিত মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তাহার পদতলে গড়াগড়ি যাইতেন না। তখনকার সাঁচা হিন্দুরা কাল ভাঁড়াইতেন না—একালের হইয়া সেকালের ভান করিতেন না; আর, তখনকার সাঁচা কর্ত্তাবদা সম্প্রদায় দেশ ভাঁড়াইতেন না—এদেশের হইয়া ওদেশের ভান করিতেন না; তাহার সাক্ষী, ওপক্ষের—খ্যাতনামা রামগোপাল ঘোষ, পাদরি কৃষ্ণবন্দ এবং তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত আর আর সম্ভ্রান্ত মহোদয়বর্গ; এপক্ষের—রাজা রাধাকান্ত দেব, এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নপদবীস্থ শ্যামাচরণ সরকার প্রভৃতি মহোদয়বর্গ। রামগোপাল ঘোষ ইয়ঙ্ বেঙ্গালদিগের সর্দ্দার ছিলেন বলিলেই হয়, অথচ তিনি আচারে-ব্যবহারে লোক-লৌকিকতায় এদেশী যতদূর হইতে হয় তাহাই ছিলেন; তবে, শাস্ত্রের শাসন তিনি আদবেই গ্রাহ্য করিতেন না। তখনকার ইয়ঙ্‌বেঙ্গালেরা যখন শাস্ত্রীয় শাসন উল্লঙ্ঘন করিতেন তখন মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, "আমরা জ্ঞানের ফৌজ হইয়া অজ্ঞানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছি!" তেমনি আবার গোঁড়া হিন্দুরা যখন ইঙ্‌বেঙ্গালের বিপক্ষে ঘোঁট করিতেন তখন তাঁহারা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, "আমরা ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া অধর্ম্ম দমন করিতেছি।" তখনকার ইয়ঙ্‌বেঙ্গালেরা ওদেশের তত পক্ষপাতী ছিলেন না যত ওদেশীয় বিজ্ঞানের এবং ওদেশীয় কর্ম্মনৈপুণ্যের, তথৈব, তখনকার গোঁড়া হিন্দুরা সেকালের তত পক্ষপাতী ছিলেন না যত সে কালের শাস্ত্রানুযায়ী আচার ব্যবহারের। কিন্তু এখন যাঁহারা একবারকার রোগী আরবারকার রোজা—জোয়ারের সময়ে যাঁহারা ইয়ঙ্‌বেঙ্গাল ছিলেন এবং ভাঁটার সময়ে যাঁহারা সুড়সুড় করিয়া গোঁড়ার দলে ঢুকিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মনকে সহস্র গড়িয়া পিটিয়া গোঁড়া করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের মন কিছুতেই বাগ মানিবে না; কেননা, যেমন চক্ষু বুজিয়া কাণা হওয়া অসম্ভব, তেমনি গোঁড়া হইব মনে করিয়া গোঁড়া হওয়া অসম্ভব। তেমনি আবার যাঁহারা ওদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ওদেশীয়দিগের দলে মিশিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সে চেষ্টা বৃথা চেষ্টা; কেননা, যেমন বরফে গড়াগড়ি দিয়া গৌরাঙ্গ হওয়া অসম্ভব, তেমনি ওদেশের বুলি মুখস্থ করিয়া ওদেশী হওয়া অসম্ভব।

বৈদ্য শাস্ত্রে বলে যে, বৃদ্ধ বয়স বায়ু-প্রধান। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, চিন্তার সঙ্গে বায়ুর হরিহরাত্মা সম্বন্ধ; প্রসিদ্ধও আছে যে, "বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্নঃ"; এরূপ যখন—তখন বৃদ্ধ ব্যাঙের দল যে, সমূলে চিন্তার জলাঞ্জলি দিয়া সত্যসত্যই কাচিয়া গৌড়া'র দলে মিশিবেন—এ তো কোনো শাস্ত্রেই বলে না! আমার তাই বিশ্বাস যে, ভাঁটার সময়ে যখন গতি-শীলেরা স্থিতিশীলদিগের শরণাপন্ন হ'ন, তখন তাঁহারা প্রকাশ্যে যদিচ শ্লেষ্মা-প্রধান এপক্ষ, কিন্তু তলে তলে তাঁহারা বায়ু-প্রধান অনুভয়পক্ষ। গৌড়া'র আর কোনো গুণ তাঁহাদের থাক্ বা না থাক্, তাহার প্রথম অক্ষরটি তাঁহাদের খুবই আছে—গোঁড়ামির গোঁ-টি তাঁহাদের খুবই আছে। কিন্তু বলিতে কি—জাত গৌড়াদের গণ্ডির ভিতরে তাঁহাদের সে গোঁ'য়ের কোনো জারিজুরিই খাটে না—সেখানে তাঁহারা কোনো গতিকে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের গোঁ একেবারেই ধোঁ হইয়া গিয়া তাঁহারা নিতান্তই ধোঁড়া বনিয়া যা'ন। ভিতরে ভিতরে ইহারা বায়ু তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই; তবে কি না—ইহাঁরা জো'লো বায়ু; গ্রীষ্মের দমনার্থে (অর্থাৎ পিত্তপ্রধান গতিশীলদিগের দমনার্থে) ইহারা শ্লেষ্মার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন! যাঁহারা গৌড়া হিন্দু তাঁহারা সত্যসত্যই গৌড়া হিন্দু; কিন্তু ইহাঁরা তাহার দিক্‌দিয়াও যা'ন না : ইহাঁদিগকে গৌড়া হিন্দু বলিলে ইহাঁদেরও মান লাঘব করা হয়, আর, গৌড়া হিন্দুদিগেরও মানলাঘব করা হয়;—অনেক কাল হইতে ইহাঁদের হিঁদুয়ানির বিষ দাঁত ভাঙিয়া গিয়াছে, এই জন্য ইহাঁদিগকে আমি বলি "ধোঁড়া হিন্দু"। ধোঁড়া হিন্দু, সারসটা'র সহিত ইতিপূর্ব্বে যেরূপ মাখামাখিভাবের সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা একেবারেই গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চা'ন, কিন্তু হইলে হইবে কি— কম্‌লি ছোড়্‌তা নেই! ভালুককে তিনি ছাড়িতে চা'ন কিন্তু ভালুক তাঁহাকে ছাড়ে না! ধোঁড়া হিন্দু তো এই—ধোঁড়া সাহেব আবার তাঁহা অপেক্ষা আর এক কাটি সরেস! ধোঁড়া-সাহেব জাত-সাহেবের ধামা ধরিয়া চলেন, এবং স্বজাতীয় বৃদ্ধ ভেক দেখিলে ফণা ধরিয়া ওঠেন; কিন্তু সে ফণার ভিতরে বিষ কোথায়? ধামা ধরা'র সঙ্গে ফণা ধরা'র মিল খায় কই? বাহিরে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া ঘরে বড় মানুষি করা সারসের ঠোকরে মাথা হেঁট করিয়া বৃদ্ধ ভেকের উপরে তেজ প্রকাশ করা—বড় তো আর তেজের লক্ষণ নহে! পর জাতির ভাব-ভঙ্গী চাল্-চোল্ বসন পরিচ্ছদ আত্মসাৎ করিবার অর্থ যদি কিছু থাকে তবে তাহা এই যে, "আমাদের স্বজাতি আমাদিগকে যেভাবেই দেখুক্ না কেন তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই! তোমরা যদি একবার আমাদের পানে কটা কটাক্ষে চাও, আর, সেইসূত্রে যদি একবার তোমাদের শ্রীমুখ হইতে এইরূপ একটি অর্দ্ধস্ফুট আশ্বাস বাণী উথলিয়া উঠে যে 'হাঁ! এই ঠিক! perfect gentleman!' তাহা হইলে আমাদের মনের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা সেইদণ্ডেই বরফ জল হইয়া যাইবে!" ইহাঁদের এই সব ভাব-গতি দেখিয়া আমি অগত্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ইহাঁরা পিত্তের দল তত নয়—অগ্নির দল তত নয়—যত বায়ুর দল! কেননা অগ্নির তেজ থাকা চাই—ইহাঁদের তেজ কোথায়? ইহাঁরা বুক ফুলাইয়া যতটা তেজের ভান করেন তাহার সিকির সিকি তেজ যদি ইহাঁদের মনের এক কোণেও থাকিত, তবে কি এঁরা পরজাতির পদধূলি বক্ষে লেপন করিবার জন্য এতদূর আগ্রহান্বিত হইতেন? সত্য-সত্যই যদি ইহাঁদের তেজ থাকিত তবে ইহাঁরা, উল্টা আরো, এইরূপ বলিতেন—"কি! জন্ বুবুড আমাদের দেশকে বার্বভ চক্ষে দেখে বলিয়া আমরাও কি আমাদের দেশকে বার্বভ চক্ষে দেখিব? আপনাদের পৈতৃক ভূমিকে আমরা মাতৃ-সম্বোধন

না করিয়া বাঁদি সম্বোধন করিব?" *

কিন্তু এরূপ পুরুষোচিত তেজ ইঁহাদের কোথায়? গলাসী (collar) গলায় বাঁধিবার সময় এবং টানিয়া টুনিয়া আঙ্গরাখার (shirt এর) বুক ফুলাইয়া তুলিবার সময় ইঁহাদের কত কিছু তেজ। ইঁহাদের তেজের সহিত আর আর জাতির তেজের প্রভেদ বিলক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায়; দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জাতির তেজঃপ্রভাবে তাহাদের স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল হয়, কিন্তু ইঁহাদের তেজপ্রভাবে স্বজাতির মাথা হেঁট হয়। এ তেজকে তেজ বলা, আর, কেঁচো'কে কেউটে বলা দুইই সমান। এই জন্য আমি বলি যে, গোঁড়া হিন্দুরাও শ্লেষ্মার দল নহে,—গোঁড়া সাহেবেরাও পিত্তের দল নহে; উভয়েই বায়ুর দল—উভয়েই না এদিক্ না ওদিক্; না এপক্ষ না ওপক্ষ; উভয় পক্ষই অনুভয়পক্ষ। দোঁহার মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, যাঁহারা চক্ষু বুজিয়া কাণা হ'ন কাঁচিয়া গোড়ার দলে মিশিয়া গোঁড়ামি করেন—যাঁহারা একালকে গলা টিপিয়া বধ করিয়া সেকালকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে প্রয়াস পা'ন—তাঁহারা শ্লেষ্মাতুর স্যাঁতসেঁতে জোলো বায়ু; আর যাঁহারা জাত-সাহেবের থামা ধরিয়া চলিয়া ভেক বর্গের নিকটে গোঁড়ামি করেন—এ দেশকে গলাটিপিয়া বধ করিয়া ওদেশকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে সচেষ্ট হ'ন তাঁহারা পিত্তানুসারী প্রতপ্ত বায়ু। এই দুই প্রকার বায়ুর মধ্যে তুমুল আড়াআড়ি চলিতেছে। দুই পক্ষই অনুভয় পক্ষ—দুই পক্ষই কাজের বা'র। কেননা মনোরথে ভর করিয়া একাল হইতে সেকালে উড়িয়া গিয়া সেখান-হইতে একালের উপরে মান্ধাতার আমলের আইন জারি করিলে তাহাতেও কোনো ফল দর্শিতে পারে না, আর, এ দেশ হইতে ও দেশে উড়িয়া গিয়া সেখান হইতে এ দেশের উপরে বিলাতি আইন জারি করিলে তাহাতেও কোনো ফল দর্শিতে পারে না, লাভের মধ্যে কেবল ফুঁয়ে ফুঁয়ে টক্করাটক্করি লাগাইয়া দিয়া—গরম বায়ু এবং ঠাণ্ডা বায়ুর মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিয়া—বঙ্গসমাজে গৃহবিচ্ছেদের Cyclone ডাকিয়া আনা হয়। এইরূপ স্থলেই অনুভয়পক্ষ বিভেদীপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। বিভেদীপক্ষের প্রাবল্যই বায়ুর প্রকোপাবস্থা—এবং তাহাই সমাজের বায়ুরোগ। কিন্তু অনুভয় পক্ষের কোটায় বিভেদীপক্ষ যেমন একটি, তেমনি আর দুইটি অবান্তর পক্ষ আছে, কী? না উদাসীন পক্ষ এবং মধ্যস্থ পক্ষ। বিভেদী পক্ষ ঝোড়ো বায়ু—তাহা একদিকে শ্লেষ্মার নদীতে তুফান উঠায়, আর একদিকে তীরোপান্তবর্ত্তী পিত্তের দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া তোলে—এইরূপে জলে অনলে বিবাদ বাধাইয়া দেয়; জলকে চাপাইয়া দেয় অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে—অগ্নিকে উস্কাইয়া দেয় জলকে শোষণ করিতে। এই গেল বিভেদী-পক্ষ!

উদাসীন পক্ষ কি? না স্থির বায়ু—তাহা ভূলোক এবং দ্যুলোকের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে।

মধ্যস্থ পক্ষ কি? না ধীর বায়ু—মলয় সমীরণ। এ বায়ু—রস এবং তেজ উভয়ের মধ্যে

---

* মার্কিন দেশীয় লোকেরা England-কে Mother country বলে, আপনাদের দেশকে Mother country বলে না, জর্মানেরা আপনাদের দেশকে Father land বলে, Mother land বলে না; আমরা আমাদের আদিম বাসস্থানকে পৈতৃক ভিটা বলি, মাতৃক ভিটা বলি না। ইহার অবশ্য একটা নিগূঢ় কারণ আছে। যে কারণে পৈতৃক ভিটাকে মাতৃক ভিটা বলা অবিধি, সেই কারণে পৈতৃক ভূমিকে মাতৃভূমি বলা অবিধি, কেন না, তাহাতে ভাবার্থটিকে এইরূপ বুঝায় যে, পিতারা যে কোন কার্য্যের ছিলেন না—তাই আমাদের জন্মভূমি বিশেষণ হইতে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতে আমরা লজ্জিত। জন্মভূমিকে মাতা বলিয়া সম্বোধন সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া সম্বোধন করিয়া পিতৃপুরুষদিগকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত হতভাগ্য বঙ্গদেশের একটি নূতন সৃষ্টি।

সৌহার্দ্দ বাঁধিয়া দিয়া সমাজকে সরস এবং সতেজ করিয়া তোলে, এইরূপে সমাজে নব-জীবনের সঞ্চার করে; এইটি যখন হয়, তখন তাহারই নাম সামাজিক রোগের আরোগ্য।

ফল কথা এই যে, যেখানে উৎপত্তি সেইখানেই নিবৃত্তি; বায়ুই রোগের জন্মদাতা, এবং বায়ুই রোগের প্রশামক। শরীরে এমন রোগ নাই যাহা বায়ুর (Nervous fluid) প্রকোপ হইতে জন্মিতে না পারে; আর, এমনো রোগ নাই বায়ু সমতা প্রাপ্ত হইলে প্রশমিত না হয়।

রোগের মূল একপে দেখিতে পাওয়া গেল; কি? না বায়ুর প্রকোপ। অতঃপর তাহার কবিরাজ চিকিৎসা প্রণালী কিরূপ তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা হইতেছে।

কবিরাজি চিকিৎসা প্রণালী কিরূপ, তাহা সাঁটে-সোঁটে এক কথায় বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে; তাহা আর কিছু না—উদাসীনপক্ষ হইতে মধ্যস্থপক্ষে অবতীর্ণ হইয়া দুই পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া।

প্রথমে এপক্ষ এবং ওপক্ষ দুইপক্ষ হইতেই ঊর্দ্ধে উঠিয়া উদাসীন পক্ষের শূন্যে ভর করিয়া থাকিয়া—দুই পক্ষের কাহার কিরূপ ভাল মন্দ তাহা স্থির-চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা; তাহার পরে, সেই শূন্য প্রদেশ হইতে দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়া দুয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া।

বিরোধ ভঞ্জনের প্রকৃষ্ট উপায় যাহা, তাহা এই;—প্রথমে বিরেচক (purgative) ঔষধি দ্বারা দুই পক্ষের দুইরূপ বিভিন্ন জাতীয় দোষাংশ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া; তাহার পরে সৌহার্দ্দের প্রলেপ দিয়া দুই পক্ষের দুইরূপ বিভিন্ন জাতীয় গুণাংশ একত্রে জোড়া লাগাইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃঢ় করা।

ও-পক্ষের প্রধান দোষ তিনটি—স্বেচ্ছাচার ঔদ্ধত্য এবং স্বদেশের রসানভিজ্ঞতা।

এ পক্ষের প্রধান দোষ তিনটি—নির্বিচার গতানুগতিকতা এক কথায় জড়তা, অকর্ম্মণ্য কৌলিক দাম্ভিকতা, আর, ঊনবিংশ শতাব্দীয় বিজ্ঞান এবং শিল্পের রসানভিজ্ঞতা এক কথায়—একালের রসানভিজ্ঞতা); দুই পক্ষের এইরূপ দুই প্রকার দোষাংশ সমাজ হইতে অপসারণ করা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

তেমনি আবার ওপক্ষের প্রধান গুণ তিনটি; প্রথম, স্বাধীন চিন্তা (ইহা কৃত্রিম ধর্ম্মশাস্ত্র, গুরুগিরি, এবং ভণ্ডামির বিরোধী); দ্বিতীয়, স্বাধীন চেষ্টা (ইহা পরাধীন বৃত্তিতার বিরোধী;—পরাধীন বৃত্তিতা অর্থাৎ জীবিকার জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকা—আত্মীয় স্বজনের গলগ্রাহিতা ইত্যাদি); তৃতীয়, ঊনবিংশ শতাব্দীয় বিজ্ঞান এবং শিল্পের রসগ্রাহিতা।

এ পক্ষের প্রধান গুণ তিনটি, প্রথম, হিতৈষী গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, দ্বিতীয় স্বজন-প্রিয়তা; তৃতীয়, স্বদেশীয় সদাচার এবং ভদ্র রীতিনীতির রসগ্রাহিতা।

দুই পক্ষের এইরূপ তিন তিন প্রকার গুণাংশ সমাজের তিন তিন স্থানের তিন তিনটি বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি; সদ্ভাবের প্রলেপ দিয়া সেই সব স্থানের সেই সব বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি একত্রে জোড়া লাগাইয়া সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা সাধন করা চিকিৎসকের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য।

এইরূপ, প্রথমে বিরেচক ঔষধি দ্বারা একালের দোষ এবং এদেশের দোষ দুইই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হউক, তাহার পরে এদেশের গুণের সহিত একালের গুণ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হউক; তাহা হইলেই সোনায় সোহাগা হইবে, এবং বঙ্গ-সমাজের সমস্ত আধিব্যাধি নির্ব্যাধা হইবে।

# সোনায় সোহাগা*

সমাজ-সংস্কারকদিগের, এই একটি সহজ সত্যের প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, সভ্য সমাজ মাত্রই ভাল মন্দে জড়িত। পৃথিবীতে এমন কোনো সভ্য সমাজ নাই যাহার ষোলো আনাই মন্দ কিম্বা যাহার ষোলো আনাই ভাল। কোনো সভ্য মনুষ্যেরই এমন কোনো দায় পড়িতে পারে না যে, তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, ও অপর কোনো জাতীয় সভ্যতার ষোলো আনা ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এককালে ইংলণ্ডে নর্ম্মান জাতির কত বড় প্রতাপ ছিল। নর্ম্মানেরা মনে করিত তাহাদের আপনাদের রীতি-নীতি ষোলো আনাই ভাল ও সাক্সন্ রীতি নীতি ষোলো আনাই মন্দ। কিন্তু ফলে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে ইংরাজদের জাতিত্বের উপাদন অধিকাংশই সাক্সন্—তাহার উপর কিছু কিছু করিয়া ফরাসিস্ রঞ্জনের প্রলেপ দেওয়া আছে মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রে "পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ" বলিয়া একটা মিশ্রণ-পদ্ধতি আছে ; — যে কোন ভূত হউক্ না কেন (যেমন জল কিম্বা বায়ু) তাহার নিজের আট আনা এবং অবশিষ্ট চারি-চারি ভূতের দুই আনা—একুনে চারি-দুগুণে আট আনা— এই দুই আট আনার সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা পঞ্চীকৃত ভূত বলিয়া উক্ত হয় (যেমন পঞ্চীকৃত জল পঞ্চীকৃত বায়ু ইত্যাদি)। তেমনি ইংরাজি সভ্যতাকে বলা যাইতে পারে যে তাহা পঞ্চীকৃত সাক্সন্ সভ্যতা। ইংরাজি সভ্যতার আট আনা সাক্সন্, এবং অবশিষ্ট আট আনার দুই আনা ল্যাটিন, দুই আনা গ্রীক্ দুই আনা ফরাসিস্ ও দুই আনা কেল্ট। সাক্সন্ মূল উপাদান, ইংরাজি সভ্যতার ভিত্তি-ভূমিকে এমনি বলপূর্ব্বক কামড়িয়া ধরিয়া আছে যে, তাহাকে রাজবংশের দিক দিয়া ফরাসিস্ টানাটানি করিয়াছে, ধর্ম্ম যাজকের দিক্ দিয়া ল্যাটিন গ্রীক্ টানাটানি করিয়াছে, আদিম নিবাসির দিক্ দিয়া কেল্ট্ টানাটানি করিয়াছে এত যে প্রাণপণ বলে— কেহই তাহাকে একচুলও স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। নর্মান্ কঙ্কেস্টের গ্রন্থকার শ্রীমান্ বলেন—'ইংলণ্ড-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্মানেরা এমনি এক মারাত্মক রকমের বৈদেশিক অনুপান সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল যে, কি আমাদের শোণিত, কি আমাদের ভাষা, কি আমাদের রাজ-নিয়ম, কি আমাদের শিল্প, কিছুরই উপর তাহা স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে ত্রুটি করে নাই ; কিন্তু তবুও তাহা অনুপান বই আর কিছুই নহে ; পূর্ব্বতন দৃঢ়তর মূল উপাদানগুলি, তবুও, অব্যাহত-রূপে টেঁকিয়া ছিল এবং অনেক প্রকার ধাক্কা সামলাইয়া চরমে সেগুলি আবার আপনাদের প্রাধান্য বলবৎ করিল।*" অর্থাৎ সাক্সন্ মূল উপাদান কিয়ৎকাল দমনে থাকিয়া আবার

---

* ১৮০০ শক, ১২৮৫ সাল আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত।

* The Norman conquest brought with it a most extensive foreign infusion, an infusion which affected our blood, our language, our laws, our arts, still it was only an infusion, the older and stronger elements still survived, and in the long run they again made good their supremacy.

তাহা স্বকীয় মহিমায় প্রাদুর্ভূত হইল। ইংরাজেরা যেমন স্বজাতীয় সভ্যতার মূল উপাদানগুলি অব্যাহত রাখিয়া তাহার অঙ্গে কিছু কিছু করিয়া অপর-জাতীয় সভ্যতা অনুপান স্বরূপে মিশাইয়াছে, আমরা যদি সেইরূপ পক্কীকরণ পদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহা হইলে খুবই ভাল হয়,— তাহা হইলে আমাদের স্বজাতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রের উপর ইউরোপীয় সভ্যতার রাসায়নিক সার পতিত হইয়া তাহাকে শতগুণ উর্ব্বরা করিয়া তোলে ; তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয় ; নচেৎ, যদি স্বজাতীয় সভ্যতার সমস্তই উড়াইয়া দিয়া অপর কোনো জাতীয় সভ্যতাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিতে যাই, তবে আমাদের দেশের শস্য-শালিনী উর্ব্বরা ভূমিকে রসাতলে দিয়া তাহার স্থান-টি অন্য দেশের কঠিন মৃত্তিকার দ্বারা ভরাট্ করিবার জন্য বৃথা আয়াস পাই মাত্র ; তাহাতে— হিতে বিপরীত হয়। এড্ওয়ার্ড-দি-কন্‌ফেসর একজন সাক্সন্ রাজা ছিলেন কিন্তু তাঁহার মন ছিল—সম্পূর্ণ ফরাসিস্। গ্রীমান্ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলেন—"এডওয়ার্ড, সজ্ঞানেই হউক আর অজ্ঞানেই হউক, নর্মাণদিগের বিজয়ের পথ আরো নিষ্কণ্টক করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বদেশে গৌরবের বা লাভের যেখানে যত কিছু বরণীয় স্থান সমস্তই বিদেশীয় লোকের দ্বারা ক্রমাগত ভরাট্ হইতে দেখা ইংরাজদের চক্ষে অভ্যাস পাওয়াইয়া ঐ বিপত্তিটি তিনি যাচিয়া আনিয়াছিলেন। নর্ম্মাণদিগের কর্ত্তৃক ইংলণ্ড-বিজয়ের সূত্রপাত এড্ওয়ার্ড হইতেই হইয়াছিল।"* এইরূপ দেখা যাইতেছে যে এড্ওয়ার্ড-দি কন্‌ফেসর ইংলণ্ডের বিভীষণ ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গডওয়াইন আর এক ধাঁচার লোক ছিলেন বলিয়া—তাই-যা একটু রক্ষা! গ্রীমান্ বলেন,—"গডওয়াইন্ যে, সমস্ত ইংরাজি ভাবের প্রমাণ-স্থল ছিলেন, তিনি যে, সমস্ত আরম্ভোদ্যমের নেতা ছিলেন, তিনি যে, আপনার অসাধারণ গুণ-গৌরবে অন্ততঃ তাঁহার নিজস্ব ভূমির প্রজাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, ইহা যার পর নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।"* এখানে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটি উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য কেবল এইটি দেখানো যে, আমরা, এডওআর্ডের ন্যায় বিদেশের টানে পড়িয়া স্বজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইলে আমাদের দেশের কোনো উপকারেই আসিতে পারিব না,— লাভের মধ্যে তাহার পতনের পথ আরো পেশল ও প্রশস্ত করিয়া দিব। গড্ওয়াইনের ন্যায়, স্বজাতীয়সভ্যতার পত্তন ভূমি দৃঢ়রূপে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ; তাহার উপরে অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী নানাজাতীয় সভ্যতা মাধুর্য্যের সহিত যথাকালে যথাদেশে যথা পরিমাণে ধীরে-সুস্থে সন্নিবেশিত করিতে পারিলে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা আমাদের দেশে আবির্ভূত হইতে পারে,— তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে সোণায় সোহাগা হয়।

এক ব্যক্তির হৃদয় খুব প্রশস্ত, কিন্তু তাঁহার কোনো কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, আর-এক ব্যক্তির হৃদয় অতীব সংকীর্ণ কিন্তু তাঁহার ক্ষমতার দৌড় অনেক দূর পর্য্যন্ত ; — যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তির ক্ষমতা পান, কিম্বা যদি শেষোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির

---

* That Godwine was the representative of all English, feelings the he was the leader of every national movement, that he was the object of the deepest admiration of the men at least of his own earldom, is proved b the clearest of evidence

* Edward did his best willingly or un willingly, to make the path of the Norman still easier This he did by accustoming Englishmen to the sight of stranger enjoying every available place of honour or profit in the country. * * * * With Edward the Norman conquest really begins"

হৃদয় পা'ন, তবেই সোনায় সোহাগা হয়। আমাদের দেশের শক্তি ইংরাজি রাজপুরুষদিগের পদতলে এবং আমাদের দেশের হৃদয় আমাদের স্বজাতীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের পদতলে বাঁধা রহিয়াছে। আমরা যদি স্বদেশের হৃদয়, স্বজাতির স্বজাতিত্ব, অব্যাহত রাখিয়া ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোনায় সোহাগা করিয়া তোলে। কিন্তু যদি আমরা আমাদের দেশের হৃদয়ের মূলোৎপাটন করিয়া ইংরাজ-শক্তিকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করি, তবে যে শাখায় উপবিষ্ট আছি সেই শাখা আমরা স্বহস্তে কর্ত্তন করি। আমরা আমাদের মূল আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে যদি বা ঝঞ্ঝা বায়ুর তাড়না হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম, — আপনাদের মূল আপনারা উচ্ছেদ করিয়া আমরা তাহার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলি।

এক্ষণকার নব্য মহলে "চাই নূতন—চাই নূতন" "কই নূতন—কই নূতন" "এই নূতন— এই নূতন" বলিয়া এক তুমুল রব উঠিয়াছে, — জানেন না যে, পুরাতনে ঠেস্ না দিলে নূতন এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? ইতিহাসে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূমি সমূলে উন্মূলন করিয়া "নূতন" যখনই ভুস্ করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা টুস্ করিয়া জলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন ও ফরাসিস্ দেশে সাধারণ-তন্ত্রের পতন ঐ কারণেই ঘটিয়াছিল। হৃদয়কে ছাঁটিয়া ফেলিয়া বুদ্ধিকে অতিমাত্র মার্জ্জিত করিতে গেলেই ঐরূপ হিতে বিপরীত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর অনেক ভাল ভাল বস্তু আছে, ফরাসীস্ বিদ্রোহীদিগের মধ্যেও অনেক ভাল ভাল বস্তু ছিল, — কেবল একটি বস্তুর অভাব ছিল, সেটি — হৃদয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মে, আত্ম-সংযম তপস্যা কঠোরতা প্রভৃতি ধর্ম্মের জন্য যাহা যাহা চাই, সমস্তই আছে— কেবল একটির অভাবে সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া গেল— সেটি ভগবদ্ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেম। ফরাসীস্ বিদ্রোহীদিগেরও ঐ দশা হইয়াছিল। ধর্ম্মের গোড়া কাটিয়া আগায় জল-সিঞ্চন করিলে তাহা হইতে কি-ই-আর অধিক প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? হৃদয় যদি গেল তবে শুধু শক্তিতে কি হইতে পারে? এক্ষণকার নব্য সমাজ হৃদয়-শূন্য শক্তির এমনি ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, সামান্য সামান্য গার্হস্থ্য বিষয়েও তাঁহাদের রুচি-বিকার ধরা পড়ে। যদি এক্ষণকার কোনো একটি সুসভ্য নব্য উদ্যানে প্রবেশ কর, তবে হৃদয়-স্নিগ্ধকারী মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে মস্তিষ্ক-মন্থনকারী উদ্ভিদ তত্ত্বেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইবে। সেখানে কিয়ৎকাল বিচরণ করিলে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের জন্য তোমার মন দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে— বড় বড় লাটিন্ নামধারী গন্ধহীন রঙচোঙে ফুল তোমার চক্ষুশূল হইবে ও তাহাদের বড় বড় নাম তোমার কর্ণশূল হইবে। তখন তুমি ক্রোটন্ বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিবে "হায়!" ক্রোটন্ বৃক্ষ! তুমি পূর্ব্ব জন্মে কত না তপস্যা করিয়াছিলে! এই উদ্যানে, গ্রীষ্মকালে জুঁই বেল গন্ধরাজ প্রভৃতি কত ফুলই প্রস্ফুটিত হইত—তাহারা উদ্যানের শ্রী সমুজ্জ্বল করিত ও দশ দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শীতল সুগন্ধ উপঢৌকন দিত, — তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! বর্ষাকালে কদম্ব কেতকী শেফালিকা নব-বারিধারার প্রাণ পাইয়া সৌরভের মাধুর্য্যে দিক্ আমোদিত করিত, তাহাদিগকে তুমি তাড়াইয়াছ! শরৎকালে প্রস্ফুটিত কামিনী ফুলে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক ভরিয়া উঠিত, ও তাহার মধুর সুগন্ধ জ্যোৎস্না-ধৌত প্রাসাদ-বাতায়ন ছাড়াইয়া উঠিয়া ছাদ পর্য্যন্ত মাতাইয়া তুলিত, তাহাকে তুমি

তাড়াইয়াছ,— ধন্য তোমার ইংরাজি পরাক্রম! বিদেশী বৃক্ষ দ্বারা উদ্যানের বৈচিত্র সাধন কর— তাহার বিরুদ্ধে আমরা একটি কথাও বলিব না, — কিন্তু পোনেরো আনা গন্ধহীন বিদেশী ফুল-গাছের একধারে পড়িয়া এক আনা সুগন্ধী দেশী ফুল যে, এই বলিয়া দুঃখের গীত শুরু করিবে যে, "এবার মো'লে ক্রোটন্ হ'ব" ইহা আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না! আমাদের মন্তব্য কথাটি এই যে, উদ্যানে, জুঁই, বেল, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি পুষ্প-বৃক্ষ রীতিমত সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে যথাস্থানে যথাপরিমাণে ইংরাজি পুষ্প-বৃক্ষ সাজাও, কিম্বা আম্র কাঁটাল বট অশ্বত্থ তাল নারিকেল প্রভৃতি ফল-পুষ্প-ছায়া-প্রদ বৃক্ষ-সকল যথারীতি সংস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে (এদেশে যাহা আজিও হয় নাই) ওক্ অলিব্ সাইপ্রেস্ প্রভৃতি নানা-দেশীয় নানা বৃক্ষ, উপায় আবিষ্কার-পূর্ব্বক, যথাস্থানে যথা পরিমাণে বসাও—তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হইবে ; কিন্তু যদি ওকের খাতিরে বট-অশ্বত্থকে দূর করিয়া দেও, অথবা ষ্ট্রাবেরি, পিয়ার এবং আপেলের খাতিরে আম্র কাঁটাল আতা প্রভৃতিকে দূর করিয়া দেও, তবে তাহতে হিতে বিপরীত হইবে, একূল-ওকূল-দুকূল নষ্ট হইবে।

পুরাতনের ভিত্তি ভূমির উপর কিরূপে নূতনের মূল-পত্তন করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের আপনাদের দেশেরই স্বর্গীয় মহাত্মা-রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারকেরা—আমাদিগকে তাহার প্রকৃত পদ্ধতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের সংস্কারক ছিলেন, পরম-হিতৈষী ছিলেন, উচ্ছেদক ছিলেন না। তাঁহারা স্বজাতির হীনতা-সূচক কুসংস্কারগুলিই কেবল মানিতেন না, তদ্ভিন্ন, কেমন করিয়া স্বজাতির-গৌরব রক্ষা করিতে হয়, তাহা তাঁহারা উত্তমরূপে বুঝিতেন। উঁহাদের একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তিকে যখন ইংরেজরা বড় বড় টাইটেল্ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—"যে টাইটেল্ আমার আছে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর টাইটেল্ তোমরা আমাকে দিতে পারিবে না। এই যে উপবীত দেখিতেছ— ইহার সমক্ষে রাজারা পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করে।" ব্রাহ্মণ্য ফলাইবার জন্য তিনি যে ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে—তাঁহার ও কথার অর্থ এই যে, আমরা আপনাদের দেশের পিতৃপুরুষদের নিকট হইতে যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই আমাদের নিকট পূজ্য, — তোমরা আমাদের কে যে, তোমাদের নিকট হইতে উপাধি পাইয়া আমরা আপনাদিগকে শ্লাঘান্বিত মনে করিব?

এক্ষণে আমাদের দেশে ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য-রক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে, কিন্তু কিরূপে সাম্য-রক্ষা করিতে হয়—আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই তাহা জানেন। সাম্য দুইরূপ, (১) ভাব-সাদৃশ্য, (২) আকার-সাদৃশ্য ; আকার-সাদৃশ্য এক তো অসম্ভব, তায় আবার, তাহাতে কাহারো কোন পুরুষার্থ নাই ; অথচ আমাদের দেশের সাম্যভক্তেরা প্রায়ই বাহ্য আকার-সাদৃশ্যের প্রেমে মজিয়া আর্য্যজাতি-সুলভ আন্তরিক ভাব-সাদৃশ্যটি হেলায় হারাইয়া ফেলেন। ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বাহ্য-আকার-সাদৃশ্য দুইরূপে ঘটিতে পারে, — (১) ইংরাজেরা ধুতিচাদর পরিলে তাহা ঘটিতে পারে, (২) বাঙ্গালিরা হ্যাট কোট পরিলে তাহা ঘটিতে পারে ; এরূপ যখন, — তখন উভয়-জাতির মধ্যে কোন-এক জাতি যদি পর-পরিচ্ছদের কাঙ্গালী হয়, তবে নিশ্চয়ই দাঁড়ায় যে, এক জাতি পরের সাজ সাজিতে লজ্জিত— আর এক জাতি পরের সাজ সাজিতে একটুও লজ্জিত নহে! এইরূপ হাতে হাতে

পাওয়া যাইতেছে যে, ইংরাজি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাঁহারা ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে সাম্য সংস্থাপন করিতে যা'ন, তাঁহারা ফলে ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসেন, — বাহ্য আকারসাম্য ঘটাইতে গিয়া আন্তরিক ভাব-বৈষম্য জাজ্বল্যরূপে ফুটাইয়া তোলেন। আমরা যদি ইংরাজ-বাঙ্গালির মধ্যে বিদ্যা বুদ্ধির সাম্য, জাতি-গৌরবের সাম্য বল-পৌরুষের সাম্য, উদ্যম-উৎসাহের সাম্য সংঘটন করিতে পারি, তবেই আমরা একটা কাজের-মতো কাজ করি ; — তুচ্ছ আকার-সাম্য তাহার তুলনায় কিছুই নহে। সহস্র সাবান মাখিলেও বাঙ্গালির গায়ের রঙ ইংরাজের মতো বিশ্রী উৎকট ধবল বর্ণ হইতে পারে না, ও সহস্র কোট পরিলেও বাঙ্গালির স্নিগ্ধ মনুষ্য-মূর্ত্তি বিকট নেকড়েবাঘ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে পারে না! তাহা হইয়া কাজও নাই! অতএব বলি যে, "হে সাম্যপ্রিয় দেশ-হিতৈষী যুবা! বাহ্য আকার-সাম্য হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া আর্য্য জাতীয় ভাবসাম্যের পথ অবলম্বন কর যে, অন্তঃকরণের মহত্ত্ব লাভে পুরুষার্থ লাভ করিবে!" এক জন বাঙ্গালি ভদ্রলোক যদি নিখুঁত ষোলো আনা ইংরাজ সাজেন, তথাপি দাঁড়াইবে যে, ইংরাজেরা আসল ইংরাজ—তিনি নকল ইংরাজ। আপন মনে তিনি ষোলো আনা ইংরাজ হইতে পারেন, কিন্তু ইংরাজের নিকট তিনি অধম বাঙ্গালি— প্রসাদের কাঙ্গালি— এ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্ততঃ চারিআনা ইংরাজ মনে করে, তাহা হইলেও কতকটা রক্ষা, —কিন্তু তাহা হইবার নহে। ইংরাজ সাজিয়া, ইংরাজের দলে মিশিতে গেলে— অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজদেরই নিকট এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া কাঁদিতে হইবে যে, "নিদেন—তোমরা আমাদের মান রক্ষা কর!" আমরা বলি যে, এরূপ যাচিয়া মান ও কাঁদিয়া সোহাগ উপার্জ্জন করিতে যাওয়ার অর্থই বা কি— প্রয়োজনই বা কি? বাঙ্গালির উচিত যে, যাহাতে স্বদেশীয় হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উপরে অন্ততঃ বারো আনা ভর দিয়া দাঁড়া'ন ; ও সেইখানে অবিচলিত থাকিয়া বিদেশীয় শক্তি-পুঞ্জ (অর্থাৎ বাহ্য আকার-পরিচ্ছদ নহে কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-পৌরুষ কার্য্য-নৈপুণ্য, কর্ম্মিষ্ঠতা, প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণ) অল্পে অল্পে আত্মসাৎ করিতে থাকুন, — তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরবও বজায় থাকিবে, তাছাড়া আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রী নূতন হইয়া উঠিবে, ইহাকেই আমরা বলি, — সোণায় সোহাগা।

# নব্য-বঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি*

নব্য বঙ্গ কাহাকে বলে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই, — যে বঙ্গ আমাদের চক্ষের সামনে দেদীপ্যমান তাহাই নব্য বঙ্গ। এ বঙ্গের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? নব্য বঙ্গ অকস্মাৎ আকাশ হইতে পড়ে নাই, — বায়ুর অলক্ষিত পদ-সঞ্চারে দুগ্ধে যেমন ক্রমে ক্রমে সর পড়ে, সেইরূপ কালের অলক্ষিত পদ-সঞ্চারে পুরাতন বঙ্গ হইতে নূতন বঙ্গ ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং এখনো হইতেছে। নব্য বঙ্গের উৎপত্তিসাধনে তাহার তিন বিভিন্ন অবয়বে তিন বিভিন্ন উপাদানের কার্য্যকারিতা নয়ন-গোচর হয় , অন্তঃপুরের হিন্দু আচার ব্যবহারে স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের কার্য্য-কারিতা, বৈঠকখানার বাবুগিরিতে মুসলমান আদব কায়দার কার্য্যকারিতা, এবং সভাস্থলের বক্তৃতায় ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে ইংরাজি বিদ্যালয়ের কার্য্যকারিতা স্পষ্টাক্ষরে লক্ষিত হয়। হিন্দু নবদ্বীপ, মুসলমান মুরসিদাবাদ এবং ইংরাজি কলিকাতা, এই তিন স্থানের তিন সভ্যতা-স্রোতের ত্রিবেণীসঙ্গমের তরঙ্গ-ফেন ধীরে ধীরে জমিয়া নব্য বঙ্গ সংগঠিত হইয়াছে।

ইংরাজি আমলের অনতিপূর্ব্বে নবদ্বীপের হিন্দুধর্ম্ম এবং মুরসিদাবাদের নবাবী রীতি নীতি উভয়ে বিবাহপাশে বাঁধা পড়িয়া বঙ্গদেশে নূতন এক সভ্যতার জন্মদান করিয়াছিল , সে সভ্যতার প্রধান আড্ডা ছিল কৃষ্ণনগর এবং তাহার প্রধান নায়ক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। সেই হিন্দু সভ্যতা আমাদের পিতামহদিগের সময়ে যৌবনে পদনিক্ষেপ করিয়া কলিকাতার প্রভূত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল, ও রাজা রামমোহন রায়কে আপনার অধিনায়কপদে বরণ করিল। পরিশেষে রাজা রামমোহন রায় উদ্যোগী হইয়া সেই নবাবি হিন্দু সভ্যতাকে আলোজ্জ্বল ইংরাজি সভ্যতার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। নব্য বঙ্গ সেই বিবাহের শুভ ফল।

দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে নূতন সভ্যতার জন্ম কেবল যে এই প্রথম আমরা দেখিতেছি তাহা নহে— সর্ব্বত্রই ঐরূপ দেখা যায়। যাহাকে এখন আমরা বিশিষ্টরূপে গ্রীক সভ্যতা বলি, তাহা গ্রীকদেশের পুরাতন আর্য্য সভ্যতা এবং পুরাতন মিশর দেশের সভ্যতা এই দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে প্রসূত , যাহাকে এখন আমরা রোমান্ কাথলিক ধর্ম্ম বলি, তাহা ইহুদীয় পুরাতন খ্রীষ্টধর্ম এবং গ্রীক দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান এই দুয়ের বিবাহ হইতে প্রসূত, আর পাউল মহাপ্রভু (St Paul) এই বিবাহের ছিলেন প্রধান ঘটক। সারাসেনিক সভ্যতা এবং রোমান্ কাথলিক সভ্যতা এই দুয়ের বিবাহ হইতে ইউরোপের মধ্যমাবীয় সভ্যতা প্রসূত হইয়াছিল, বৌদ্ধ সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতা এই দুই সভ্যতার বিবাহ হইতে পৌরাণিক সভ্যতা উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দুইদিক্ হইতে দুই সভ্যতা একত্রে মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে যে নূতন এক সভ্যতার সূত্রপাত করিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, জন্ম মাত্রই বিবাহের ফল।

পুত্র সকল বিষয়ে অবিকল পিতার মত হয় না— হইয়া কাজও নাই। যদি প্রকৃতির

* ১৮০৭ শক, ১২৯৫ সালে চৈত্রের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত।

এইরূপ নিয়ম হইত যে, পুত্র অবিকল পিতার অনুরূপ হইবে তবে পৃথিবীর নগর গ্রাম হইতে বৈচিত্র জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিত, — তাহা হইলে একজন মনুষ্যকে জানিলেই তাহার বংশের সকল মনুষ্যকেই জানা হইত! তাহা যে হয় না— ইহা জগতের সৌভাগ্য। নবদ্বীপের সভ্যতা এবং মুরসিদাবাদের সভ্যতা উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার সেই নবদ্বীপের সভ্যতা অথবা আবার সেই মুরসিদাবাদের সভ্যতা এ ভিন্ন আর কিছুই না হইত, তাহা হইলে তাহাতে কাহার কি লাভ হইত? না হিন্দুর কোনো লাভ হইত— না মুসলমানের কোনো লাভ হইত। তেমনি আবার নবাবি হিন্দু সভ্যতা এবং ইংরাজি সভ্যতা উভয়ের বিবাহের ফল যদি আবার সেই নবাবী হিন্দু সভ্যতা অথবা আবার সেই ইংরাজি সভ্যতা এ ভিন্ন আর কিছুই না হইত তাহাতেই বা কাহার কি লাভ হইত? না হিন্দুর কোনো লাভ হইত না ইংরাজের কোনো লাভ হইত। তাহা হইলে পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনো তাহাই থাকিত, নূতন কিছুই হইত না।

নবাবি হিন্দুসভ্যতার সহিত ইংরাজি সভ্যতার বিবাহের সুফল হাতে হাতে ফলিতেছে,— মুসলমান সভ্যতার পরাক্রমে বঙ্গের পুরাতন আর্য্যসভ্যতা ক্রমশই হীন-জ্যোতি হইয়া পড়িতেছিল— ইংরাজদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির আলোকে প্রাণ পাইয়া এক্ষণে তাহা আবার মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে। প্রাচীন লোকেরা অনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে "হিন্দুয়ানি আর থাকে কদাচ!" ইঁহারা শুধু বোঝেন— দেশাচার রক্ষা করাই হিন্দুয়ানি! কোনো হিন্দুশাস্ত্রে লেখে না যে, অন্তঃপুরের বাহিরে স্ত্রীলোকদিগের পদার্পণ নিষেধ, — বরং ইহার অবিকল বিপরীত , হিন্দুশাস্ত্রে আছে "ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা" ছায়ার ন্যায় স্ত্রী স্বামীর অনুগতা হইবেন, — বোম্বাইয়ের হিন্দুরা সপরিবারে লোকালয়ে যাতায়াত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। পর্দানশীন্ শব্দটাই মুসলমানী শব্দ। স্ত্রীদিগকে সাধারণতঃ মাতৃ-সম্বোধন করাই হিন্দুদিগের চিরকালের অভ্যাস— এখন যদি তাহার কোনো ব্যত্যয় হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাহা পরাধীনতার ফল। পুত্রের সমক্ষে মাতা যেমন অসংকোচে বাহির হইতে পারে, হিন্দু-স্ত্রী সেইরূপ রীতিমত ভদ্রতা রক্ষা করিয়া ভদ্রসমাজে অসংকোচে বাহির হইতে পারেন, — তাঁহার প্রতি যে ব্যক্তি ইংরাজি বদভ্যাচার (gallantry) ফলাইতে যায়, সে জাতিতে হিন্দু হইলেও তাহার মন ফিরিঙ্গির অধম, — এই শ্রেণীর কদর্য্য কাপুরুষ লোকদিগের প্রতি একজন সুবিজ্ঞ রাজার এইরূপ অভিসম্পাত দেওয়া আছে Honi soit qui maly pense যে মন্দভাবে তাহার মন্দ হউক্। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে স্ত্রীলোকদিগকে শক্তাশক্তি করিয়া ঘরে চাবি রাখিবার রীতি নাই কেন? দিল্লীর প্রতাপ যে সকল স্থানে পূর্ণতেজে পৌঁছিতে পারে নাই— এই তাহার একমাত্র কারণ।

রামমোহন রায়ের দূর-দর্শিতাকে ধন্য—তিনি একাকী আপন বুদ্ধিপ্রভাবে নব্য-বঙ্গের উন্নতির জটিল সমস্যা অবলীলা-ক্রমে পূরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নব্য-বঙ্গের জন্মদান করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, তাহার সঙ্গে তিনি তাহার স্থিতি এবং গতি উভয়েরই মূল-পত্তন করিয়া গিয়াছেন। সে স্থিতি এবং গতি কিরূপ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক।

গতি, কিনা পরিবর্ত্তন। যখন গ্রীষ্ম ঋতু আইসে তখন মনে হয় যে, ইহার আর অন্ত নাই , প্রত্যহই লোকেরা রৌদ্র-তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কায়ক্লেশে কোন রূপে দিবা অবসান করে, কাহারো শরীরে বস্ত্র সহে না। তাহার পর যখন শীত ঋতু আইসে তখন সমস্তই উল্‌টিয়া যায় , পূর্ব্বে লোকেরা অর্দ্ধ-উলঙ্গ থাকিত, এখন বস্ত্রের বোঝা বহন করে ; পূর্ব্বে জল

সেবন করিত এখন অগ্নি সেবন করে ; এককালে আর এক-কালের সকলই উল্‌টিয়া যায়। শীত কাল চলিয়া গেলেও যে ব্যক্তি অভ্যাস গুণে শীত-বস্ত্র পরিধান করে সে ব্যক্তির স্বাস্থ্য অচিরে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। এতকাল গ্রীষ্ম চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া চিরকালই যে গ্রীষ্ম অবাধে চলিতে থাকিবে, তাহার কোনো অর্থ নাই। বৎসরের যেমন কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক সমাজেরও সেইরূপ কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক ; এই কালোচিত পরিবর্ত্তনকেই এখানে আমরা "গতি" এই ক্ষুদ্র একবর্ণ নামে নির্দ্দেশ করিতেছি। কিন্তু আর একদিকে দেখা যায় যে, যদিও শীত-কালোচিত বস্ত্র-পরিধানের নিয়ম গ্রীষ্মকালে পরিবর্ত্তন করিতে হয় ও গ্রীষ্মকালোচিত বস্ত্র পরিধানের নিয়ম শীতকালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু বস্ত্র পরিধানের একটি নিয়ম কোনো কালেই পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না— সে নিয়ম এই যে, স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে। যদি বলি যে উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে সে কথা গ্রীষ্মকালে খাটে না, যদি বলি যে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে তবে সে কথা শীতকালে খাটে না, কিন্তু যদি বলি যে স্বাস্থ্যোপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে, তবে সে কথা শীতকালে যেমন খাটে, গ্রীষ্মকালেও তেমনি খাটে, বর্ষাকালেও তেমনি খাটে, কোন কালেই তাহা উল্টায় না। এখানে দুইরূপ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে— প্রথম, কালোচিত নিয়ম কিম্বা যাথাকালিক নিয়ম, — শীত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে ইহা একটি যাথাকালিক নিয়ম, কেননা এ নিয়ম যাথাকালেই খাটে, অযথা-কালে খাটে না ; দ্বিতীয় সার্ব্বকালিক নিয়ম,— স্বাস্থ্যের উপযোগী বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে— এ নিয়ম সকল কালেই খাটে। এখন আমরা এইটি বলিতে চাই যে, সমাজের যত প্রকার সামাজিক নিয়ম আছে তাহার মধ্যে যে-গুলি সার্ব্বকালিক তাহার স্থায়িত্বই সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল এবং যে গুলি যথাকালিক তাহার কালোচিত পরিবর্ত্তন সমাজের গতির ভিত্ত-মূল।

রামমোহন রায় বঙ্গের গতি ভাল'র দিকে ফিরাইবার জন্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং তাহার স্থিতি অটল রাখিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মূল-প্রতিষ্ঠা করিলেন। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আচার-ব্যবহার রীতি নীতি ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিবে ইহা অনিবার্য্য কেবল নয়, — ইহা প্রার্থনীয়। কিন্তু যাথাকালিক রীতিনীতির কালোচিত পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া আমরা যেন সেই সঙ্গে সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম-নিয়মের স্থৈর্য্য বিনাশ না করি— এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

রামমোহন রায় ইংরাজি বিদ্যালয়ের সূত্রপাত করিয়াই স্বচ্ছন্দে মনে করিতে পারিতেন যে, একা একজন সমাজ-সংস্কারকের যত্ন ও পরিশ্রমে এই যা হইল ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু তাহা হইলে এই বঙ্গ সমাজের কি দারুণ দুর্দ্দশা হইত তাহা একবার ভাবিয়া দেখ! তাহা হইলে ছত্রাবরণশূন্য ইংরাজি কিরণে বঙ্গ-সমাজের মাথা এরূপ ঘুরিয়া যাইত যে, বঙ্গসমাজ অচিরে ভ্রমান্ধ খ্রীষ্টান এবং জ্ঞানাভিমানী নাস্তিক এই দুই সম্প্রদায়ের অন্ধকারময় জটলার আড্ডা হইত। তাহা হইলে বাঙ্গালিরা আসল কাজে যাহাই হউক না—বাহ্য আকারে ইংরাজ অপেক্ষাও ইংরাজ হইয়া উঠিত; বাঙ্গালি সভ্যতা এবং ইংরাজি সভ্যতা দুয়ের সম্মিলনের ফলস্বরূপ আর যে কোন প্রকার নূতন সভ্যতা উৎপন্ন হইবে তাহার পথ বন্ধ হইয়া যাইত। মুসলমানদিগের আমলে বঙ্গদেশে যেরূপ পারস্য ভাষার অনুশীলন প্রচলিত ছিল, তাহাতে লোকের স্বাধীন চিন্তার চক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে পারে এমন কোন অঞ্জন ছিল না ; এই জন্য

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে মুসলমানদিগের আদব-কায়দা এবং স্বদেশের পুরাণতন্ত্র এ-দুয়ের মিলন-মিশনের পক্ষে বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু ইংরাজি বিদ্যার অনুশীলন সহসা যেরূপ লোকের স্বাধীন চিন্তার চক্ষু ফুটাইয়া তোলে, তাহাতে সে অনুশীলনের সঙ্গে সমগ্র পুরাণতন্ত্রের ধর্ম্ম কোন গতিকেই মিশ-খাইতে পারে না,— ঐ দুই বিরোধী সামগ্রীকে বলপূর্ব্বক মিশাইতে গেলে তেলে-জলে মিশানো হয় মাত্র। স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বতন কালে বঙ্গের স্থিতির ভিত্তিমূল ছিল—এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যার তোড়ের মুখে তাহা কোন ক্রমেই টেঁকিতে পারে না— এখন বঙ্গের স্থিতির এইরূপ একটা নূতন ভিত্তিমূল আবশ্যক যাহা ইংরেজি বিদ্যার উন্নতি স্রোতে না টলিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থির থাকিতে পারে।

পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে স্থিতির কিছু অতিমাত্রা বাড়াবাড়ি ছিল। আপাদ-মস্তক শৃঙ্খলা-বন্ধনে হিন্দুসমাজ জড়-আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার কর্ত্তব্য, সমস্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ব্বাচিত ও অলঙ্ঘ্য গণ্ডি দিয়া সীমাবদ্ধ করা ছিল। মনুর আমলের বাঁধা রাস্তায় বাঁধা চালে চলা হিন্দুসমাজের এরূপ অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে যে, এখনকার এই ঘুমন্ত হিন্দুসমাজও ঘুমের ঘোরে সেই একই বাঁধা রাস্তায় একই বাঁধা চালে চলিতেছে। কামারের কাজ কামার করিতেছে, কুমোরের কাজ কুমোর করিতেছে, তাঁতির কাজ তাঁতি করিতেছে, চাসার কাজ চাসা করিতেছে, — তা'ই না হয় নূতন প্রণালীতে করুক, তাহাও না, — মান্ধাতার আমল হইতে যেরূপ কার্য্য-প্রণালী চলিয়া আসিতেছে আজিও সেই প্রণালীতে সকলে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে। স্থিতির যেখানে এসরূপ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানে গতি সহজেই মন্দা পড়িয়া আসে— ইহাই সমাজের নাড়ী-ত্যাগের পূর্ব্ব-লক্ষণ। স্থাবর স্থিতি-শীলেরা বলিবেন সন্দেহ নাই যে, "চাসা দিব্য চাস করিতেছে, পণ্ডিত অধ্যাপনা করিতেছে, রাজা রাজ-কার্য্য করিতেছে, অন্ন-প্রাসন বিবাহ শ্রাদ্ধ যথা নিয়মে চলিতেছে, সকলই দিব্য নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক ভাল আর কি আশা করা যাইতে পারে? তবে কেন মিথ্যা একটা পরিবর্ত্তনের বিপ্লব আনিয়া শুধু শুধু সমাজের শান্তি-ভঙ্গ করা!" অন্ধ-সংস্কার দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন "সমাজ দিব্য চলিতেছে।" কিন্তু সত্য-সত্যই কি সমাজ দিব্য চলিতেছে? গতিহীন স্থিতিশীল সমাজের উপরে জ্ঞানের এক-বিন্দু আলোক পড়িলেই তাহার দিব্যত্ব ঘুচিয়া যায়। এরূপ সমাজের নীচের লোকেরা

কাঁপে সদা কর-যোড়ে, দিবা নিশি গ্রীবা অবনত
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত॥

স্বপ্ন প্রয়াণ।

উপরের লোকদিগের—

গর্ব্ব অভিমান ওঠে সকল-হইতে উচ্চে চড়ি,
সাধ যায় চরাচর পদতলে যাক্ গড়াগড়ি॥

ঐ।

এরূপ স্থিতি-শীল সমাজের নীচের লোকদিগের উপরে-উঠিবার সিঁড়ি নাই, উপরের লোকদিগের নীচের সাহায্যে নামিবার সিঁড়ি নাই। স্থিতিশীল সমাজের উপর-শ্রেণীর লোকেরা বিনা যত্নে বিনা পরিশ্রমে শুদ্ধ কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃপায় সমাজের উচ্চ আসনে অধিকার পাইয়াছেন— তাঁহারা প্রাণ থাকিতে সে আসন যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তিকেও ছাড়িয়া দিতে পারেন

না ; তাঁহারা চাহেন "সমাজ যেমন আছে তেমনি থা'ক্‌"। তাঁহারা মনে জানেন যে, সমাজ যেমন আছে তেমনি থাকিলেই তাঁহারাও যেখানে আছেন সেইখানে থাকিবেন—সমাজের মস্তকের উপরে থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা মুখে এইরূপ কারণ দর্শান যে, "পুরুষানুক্রমে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না।" যাঁহাদের "স্থিত" আছে—অর্থাৎ ধন-মান খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে—স্থিতিশীল সমাজ তাঁহাদের প্রস্তরের দুর্গ ; এই সব দুর্গপতির—

"চাবি-বন্ধ হৃদয় পাষাণময়, দৃঢ়-মুষ্টি কর।
পদ প্রসারিতে মানা, চারিদিকে গতি আঁকা ঘর।"

নূতন উপার্জ্জনের কষ্ট স্বীকার করিতে ইঁহারা সম্মত নহেন—পূর্ব্বপুরুষদিগের শ্রমার্জ্জিত ধন-মান রক্ষা করাই ইঁহাদের প্রধান কার্য্য, এবং যাহা আছে তাহা হারাইবার ভয়ই ইঁহাদের প্রধান ভয়। গতিশীল সমাজে নূতন উপার্জ্জনের সহস্র পথ নিরন্তর খোলা থাকে, ও সহস্র ব্যক্তি-উৎসাহ এবং উদ্যমের সহিত অভীষ্ট পথে চলিয়া অভীষ্ট ফললাভ করে ; স্থিতিশীল সমাজে ঠিক ইহার বিপরীত। এ সমাজে ধন-মান যাঁহাদের আছে তাঁহাদেরই আছে, আর সমস্ত লোকে অতি দীনহীনভাবে তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কোনোরূপে স্ব স্ব পরিবার প্রতিপালন করে। স্থিতিশীল সমাজ যাঁহাদের প্রস্তরের দুর্গ তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থের অনুরোধে বলিতে পারেন "সমাজ দিব্য চলিতেছে", এমন কি নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও অন্ধ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধেও উপরি-উক্ত কথায় মাথা নোয়াইতে পারে—কিন্তু অপক্ষপাতী জ্ঞান কখনই ওরূপ কথায় সায় দিতে পারে না। জ্ঞান স্পষ্টই বলিবে যে, "এ সমাজের নাড়ী পাওয়া যাইতেছে না, ইহাতে গতির তাড়িত-সঞ্চার করিতে আর এক দণ্ডও বিলম্ব করা উচিত হয় না।" কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, গতিরোধক স্থিতি সমাজের পক্ষে যতই কেন ভয়াবহ হউক্‌ না, স্থিতি-ভঞ্জক গতি তাহা অপেক্ষা আরো অধিক ভয়াবহ। ঐকান্তিক স্থিতির গুরুভার যখন সমাজের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সমাজ পরিবর্ত্তনের দিকে স্বভাবতই উন্মুক্ত হইয়া থাকে। সমাজের এইরূপ তপ্ত অবস্থায় বাহির হইতে পরিবর্ত্তনের উদ্দীপক কোনো নূতন উপকরণ তাহার উপরে আসিয়া পড়িলে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সঙ্গে কিছুকাল ধরিয়া বোঝাপড়া চলিতে থাকে ; প্রথম প্রথম নূতন-কিছুই শরীরে পরিপাক পায় না, —ক্রমে যখন নূতনের নূতনত্ব থিতাইয়া মন্দা পড়িয়া আসে তখন পুরাতনের সহিত তাহার কতকটা মিশ খায়। প্রথম প্রথম নূতনকে অদ্ভূত নূতন মনে হয়, পরে চলন-সই নূতন মনে হয়, তাহার পর পুরাতনের সহিত নূতনের রীতিমত লয় বাঁধিয়া গিয়া নূতনগুলা পুরাতনের অঙ্গের সামিল-হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পুরাতনের উপরে নূতনের আসন জমিতে না জমিতে তৃতীয় নূতন আসিয়া তাহার উপর চড়িয়া বসে, মুহুর্মুহু নূতনের পর নূতন আসিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তবে সমাজ নিতান্তই অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ফরাসিস্‌ বিপ্লবের সময় কত যে নূতন-নূতন অদ্ভুত ব্যাপার আসিয়া কত যে দুই-দিনের নাবালক স্থিতিকে বৎসর-কয়েকের মধ্যে গ্রাস করিয়া ফেলিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঋতু পরিবর্ত্তন হইলে বৎসরের ফল যেমন ভয়ানক হয়, ক্রমাগত নূতন-নূতন নূতনের স্রোত বহিতে থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ দুর্দ্দশা হয়।

নব্য-বঙ্গের বিষম সমস্যা এই যে, গতি স্থিতিকে ভঙ্গ করিবে না, স্থিতিগতিকে রোধ

করিবে না, উভয়ের মধ্য-পথ দিয়া বঙ্গ সমাজ'কে উন্নতি-মঞ্চে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্রের ধর্ম্ম যাহা এ যাবৎকাল বঙ্গ সমাজের স্থিতির ভিত্তি-মূল ছিল তাহা এক্ষণকার কালোচিত গতির উপযোগী নহে। এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যানুশীলন নব্য-বঙ্গকে স্বাধীনতার উত্তেজনায় মাতাইয়া তুলিয়াছে, — "আপনার স্বাধীন চিন্তার পরামর্শ ভিন্ন আর কাহারো কথা মানিব না" এই মহামন্ত্রে কৃতবিদ্য বঙ্গ-সমাজকে দীক্ষিত করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের শাসন নব্য-বঙ্গের এই নবোদ্দীপ্ত স্বাধীনতা-স্পৃহাকে কিছুতেই বাঁধ দিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না— পারিবেও না। এই স্বাধীনতা-স্পৃহাকে প্রতিরোধ করিতে যাওয়া নিতান্তই হীনবুদ্ধির কার্য্য, উল্টা আরো, যাহাতে উহা সম্যক্‌রূপে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে তাহার উপায় অন্বেষণ করা কৃতবিদ্য লোকের কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতার উপর্য্যুপরি তিনটি ধাপ আছে,—প্রথম, স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি ; দ্বিতীয়, স্বাধীন-চিন্তা দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়মের সংস্থাপন ; তৃতীয়, স্বাধীনতার আপনারই চিন্তা-প্রসূত সেই সকল ধর্ম্মনিয়ম দ্বারা আপনাকে নিয়মিত করা, — এক কথায় ধর্ম্মনিয়মানুসারে চলা।

প্রথম স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি। স্বাধীনতা আপনার নূতন স্ফূর্ত্তির প্রথম উদ্যমে অধীরে বলিয়া উঠে "আমি কাহারো বলের বশবর্ত্তী হইয়া চলিব না, আমার নিজের স্বাধীন চিন্তা যাহা বলিবে তাহাই করিব।" কিন্তু স্বাধীনতা এখনও বালক—এখনো তাহার চিন্তা-শক্তি জন্মে নাই , এ দুর্দ্দান্ত বালক-স্বাধীনতার উপর সমাজ কিছুতেই নির্ভর করিতে পারে না , এ স্বাধীনতা গতির উত্তেজনায় প্রমত্ত হইয়া সমাজের স্থিতিকে ভঙ্গ করিতে সর্ব্বদা গদাহস্ত। এ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার অধিক উপরে উঠিতে পারে না।

দ্বিতীয়, স্বাধীন-চিন্তা হইতে সার্ব্বভৌমক নিয়মের উৎপত্তি। স্বাধীনতা যথোচিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, জ্ঞান তাহাকে এইরূপ উপদেশ দেয় যে, "তুমি যখন স্বাধীন চিন্তা করিতে শিখিয়াছ তখন তাহার চরম পর্যান্ত যাও—মধ্য-গঙ্গায় হাল ছাড়িয়া দিও না ; তোমার স্বাধীন চিন্তা যে পর্যান্ত না সার্ব্বভৌমিক সত্যে পৌঁছায় সে পর্যান্ত নিবৃত্তি মানিও না ; যতক্ষণ না সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ-জনক ধর্ম্মনিয়ম অন্বেষণ করিয়া পাও, ততক্ষণ আপনাকে কৃতকার্য্য মনে করিও না।" এইবার স্বাধীনতার জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়াছে ; স্বাধীনতা বুঝিয়াছে যে, শুধু-গতিতে কিছুই হয় না— গতির সঙ্গে সঙ্গে স্থিতি চাই ; বুঝিয়াছে যে, পরিবর্ত্তনীয় রীতি নীতির পরিবর্ত্তন করা যেমন আবশ্যক, অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম-নিয়মকে ধরিয়া থাকা তেমনি আবশ্যক ; কিন্তু সেই যে ধর্ম্ম-নিয়ম তাহা ঐ স্বাধীনতার আপনারই চিন্তা-প্রসূত— পুঁথি হইতে সংগ্রহ করা বচন মাত্র নহে।

তৃতীয়, আপনার স্বাধীন-চিন্তা প্রসূত ধর্ম্ম-নিয়মে আপনি চলা। আমাদের দেশে স্বাধীনতা এ-যাবৎকাল ক্রমাগতই বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বলের অধীনে ঘাড় পাতিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মনু বলিয়াছেন অমুক কার্য্য করা কর্ত্তব্য অতএব তাহা কর্ত্তব্য, ধর্ম্ম মনুর শাসনাধীন ; গুরুর আজ্ঞা পালনই সার ধর্ম্ম ধর্ম্ম গুরুর শাসনাধীন। কুন্তী যখন পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, "তোমরা পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বাঁটিয়া লও" তখন সেই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ আদেশ পালন করাই পাণ্ডবদিগের ধর্ম্ম হইল। দেবতারা বলবান্ বলিয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত অধর্ম্মও দোষের নহে—তেজীয়সাং ন দোষায়। এখনকার জ্ঞানোজ্জ্বল সমাজে মনুর শাসন বা গুরু-আজ্ঞা, কিংবা ঋষিবাক্য, ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার

করিতে গেলে, তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ দেখিতে হয়। এখন যেরূপ কাল পড়িয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের নিয়ম কৃতবিদ্য ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা হইতে প্রসূত হইলে তবেই তাহা লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারে। প্রতি জনেই আপনার স্বাধীন চিন্তা হইতে ধর্ম্মের নিয়ম উদ্ভাবন করিবার অধিকারী। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধির দোষে যে সে নিয়ম ধর্ম্মনিয়ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিবে না ; কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। কেননা নির্দ্ধারিত নিয়মটি সত্য-সত্যই ধর্ম্মের নিয়ম কি না তাহার পরীক্ষা সহজেই হইতে পারে। যদি সে নিয়ম সার্ব্বভৌমিক পদবীর উপযুক্ত হয়, অর্থাৎ যদি তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রচারোপযোগী হয়, তবেই তাহা ধর্ম্ম-নিয়ম—নচেৎ নহে। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি ; — "মিথ্যা কথা কহিবে" এই নিয়ম সর্ব্বসাধারণে প্রচারোপযোগী না "সত্য কথা কহিবে" এই নিয়ম সর্ব্বসাধারণে প্রচারোপযোগী ? যদি কোনো রাজা স্বীয় রাজ্যে এইরূপ একটী নিয়ম প্রচলিত করেন যে "কেহই মিথ্যা ছাড়া সত্য কহিবে না," তাহা হইলে সকলেই সকলের কথা অবিশ্বাস করিবে, কেহ কাহারো কথায় কর্ণপাত করিবে না , কেহ কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিলে কোনো কথা কহিতে কাহারো প্রবৃত্তি হইবে না— সমস্ত রাজ্যে কথা কহা একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে ; তাহার সঙ্গে মিথ্যা কথাও বন্ধ হইয়া যাইবে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, "মিথ্যা কহিবে" এ নিয়মটি যদি কোনোকালে সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হয়, তবে আত্মহত্যা তাহার ললাটে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এই প্রকার শুভবুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে শ্রেয়ঃ-পথের সন্ধান পাইয়া আমার নিজের স্বাধীন-চিন্তা আমাকে বলিতেছে যে, সত্য কহিবে এই নিয়মটিই সর্ব্বসাধারণে প্রচারোপযোগী— সুতরাং আমি যদি সত্যের নিয়মে চলি তবে আমি আমার আপনারই স্বাধীন চিন্তার পরামর্শ অনুসারে চলি—কাহারো কোনো বল দ্বারা বাধ্য হইয়া চলি না।

স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তিতেই জ্ঞানের উৎপত্তি সাধিত হয় ; স্বাধীন চিন্তার ফলে—এক দিকে প্রাকৃতিক নিয়ম আর-এক দিকে ধর্ম্ম-নিয়ম এই দুই প্রকার নিয়মের আবিষ্কারে—জ্ঞানের স্থিতি সাধিত হয় ; এবং স্বাধীন চিন্তা-প্রসূত সেই সকল নিয়মকে নানা প্রকার হিত-কার্য্যে প্রয়োগ করা হইলেই জ্ঞানের গতি সাধিত হয়। জ্ঞানের এইরূপ উৎপত্তি স্থিতি এবং গতির উপরে সভ্যতার উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি বিশেষরূপে নির্ভর করে। বৈদিক মুনিঋষিদিগের স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি প্রভাবে আমাদের দেশে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছিল— এবং তাহার পর মন্বাদি রাজর্ষির আবিষ্কৃত ধর্ম্মনিয়মে আমাদের দেশে জ্ঞানের স্থিতি সাবধানে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে ; কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো দেশেই জ্ঞানের গতি রীতিমত সাধিত হইতে পারে না— অর্থাৎ জ্ঞানকে রীতিমত কার্য্যক্ষেত্রে নাবানো যাইতে পারে না। আমাদের দেশে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমাদের দেশে জ্যোতিষ ছিল—কিন্তু নাবিকীয় কার্য্যে জ্যোতিষের প্রয়োগ ছিল না ; আমাদের দেশে গণিত-বিদ্যা ছিল, কিন্তু যন্ত্র-তন্ত্রে-গণিতের প্রয়োগ ছিল না ; আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিল কিন্তু সাংসারিক কার্য্যক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োগ ছিল না ; আমাদের সমাজে স্থিতির পীড়ন-ভারে গতির শ্বাস অবরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, স্থিতি এবং গতি, দুইই সমান আবশ্যক ; এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই যে, আমাদের দেশে স্থিতির কোনো উপাদানেরই অভাব নাই— আমাদের যত কিছু অভাব সমস্তই গতির প্রসঙ্গাধীন। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য যে, আমরা

আমাদের স্বদেশীয় স্থিতির সহিত ইউরোপীয় গতি মিশ্রিত করিয়া সেই মৃতপ্রায় স্থিতির জীবন সঞ্চার করি। ইংরাজি-বিদ্যালয় জ্ঞানের কিরণ-বর্ষণে দিন দিন নব্যবঙ্গের ভাব-ভক্তি পরিবর্তন করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু যতই কেন পরিবর্তন করুক্ না— ব্রাহ্মসমাজ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোনো অবস্থাতেই নব্যবঙ্গ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে না ; স্বাধীন-চিন্তার নূতন স্ফূর্ত্তি কিয়ৎ পরিমাণে দুর্দান্ত হইয়া উঠিবে— ইহা তো হইতেই পারে, কোন্ ভাল বস্তুর সঙ্গে মন্দ একটু-না-একটু লাগিয়া না থাকে? কিন্তু সেই স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইতেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়ম উদ্বোধিত হইয়া স্বাধীনতাকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবে— ইহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে। কালোচিত পরিবর্তনের নিয়ম প্রবর্তনের জন্য যেমন আমাদের দেশে ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইরূপ অপরিবর্তনীয় ধর্ম্ম-নিয়ম প্রবর্তনের জন্য আমাদের দেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। একটি নব্য-বঙ্গসমাজের গতির ভিত্তি-মূল, আর একটি স্থিতির ভিত্তিমূল। আমাদের স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ইংরাজি বিদ্যার বিবাহ সংঘটন হইলে সেই সঙ্গে স্থিতি এবং গতির বিবাহ-বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয় ; ইহাই নব্যবঙ্গের মঙ্গলের একমাত্র নিদান।

আমাদের দেশের নব্যসম্প্রদায়েরা একটি বিষয়ে বড়ই ভুল বোঝেন। স্বাধীন চিন্তা বলিতে তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তাই বোঝেন— দেশের স্বাধীন চিন্তা বলিয়া যে একটা সামগ্রী আছে তাহা তাঁহারা বোঝেন না। যেমন আমি তুমি তিনি, তেমনি আমার দেশ তোমার দেশ তাঁহার দেশ। দেশের স্বাধীন অবস্থায় দেশের মস্তক-স্বরূপ ব্যক্তিদিগের মন হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ সত্য এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা বিনিঃসৃত হয় তাহাই দেশের স্বাধীন-চিন্তা। স্বভাবত যেরূপ চিন্তা বিনিসৃত হয়—অর্থাৎ কোনো বিদেশীয় জাতি-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বাধিত না হইয়া যেরূপ চিন্তা বিনিঃসৃত হয়। প্রথমে প্রেম আসিয়া স্বাধীনচিন্তাকে উস্কাইয়া দিবে, তাহার পর জ্ঞান আসিয়া স্বাধীনতাকে নিয়মিত করিবে, এই হ'চ্চে নিয়ম। যদি আমার প্রেম না থাকে তবে আমার স্বাধীন চিন্তাই বা কিসের জন্য—স্বাধীনতাই বা কিসের জন্য। যে জাতির স্বদেশের প্রতি আন্তরিক প্রেম আছে সেই জাতিই স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে। প্রেমের উত্তেজনায় প্রথমে স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি হয় ; সেই স্ফূর্ত্তির ফলিত অবস্থায় জ্ঞানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম নিয়ম-সকল উদ্বোধিত হয়, অতঃপর সেই উদ্বোধনের চরম পরিণামে সেই-সকল নিয়ম দ্বারা স্বাধীনতা কার্য্যে নিয়মিত হয়। এইরূপে আমার স্বাধীন চিন্তা হইতে যে ধর্ম্ম প্রসূত হয় তাহাই প্রকৃত পক্ষে আমার স্বধর্ম্ম—আর এক জনের মতানুযায়ী ধর্ম্ম যদি আমার স্বাধীন-চিন্তার বিরোধী হয় তবে তাহা আমার স্বধর্ম্ম নহে—তাহা পরধর্ম্ম। স্বদেশের সম্বন্ধেও ঠিক ঐকথাটি পুনরুক্তি করা যাইতে পারে, বলা যাইতে পারে যে, স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনায় স্বদেশে স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি হয়, সেই স্ফূর্ত্তির ফলিত অবস্থায় স্বদেশের জ্ঞানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-নিয়ম-সকল উদ্বোধিত হয়; অতঃপর সেই উদ্বোধনের চরম পরিণামে সেই সকল নিয়ম দ্বারা স্বদেশের স্বাধীনতা পৈতৃভূমিক কার্য্যে নিয়মিত হয়। এইরূপ স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত ধর্ম্মই স্বদেশের স্বধর্ম্ম; আর এক জাতির নিকট হইতে শেখা ধর্ম্ম যদি স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তার বিরোধী হয়, তবে তাহা স্বদেশের স্বধর্ম্ম নহে কিন্তু পরধর্ম্ম। ভগবদ্গীতায় আছে "পরধর্ম্মোভয়াবহঃ"— অর্থাৎ যে ধর্ম্ম আপনার স্বাধীনচিন্তার বিরোধী— যে ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক লোকের স্কন্ধে বা দেশের স্কন্ধে আরোহিত হয় তাহা ভয়াবহ। প্রেম যেমন

স্বাধীনচিন্তাকে উস্কাইয়া দেয়, বল তেমনি স্বাধীনচিন্তাকে দমাইয়া দেয়। পুরাকালে সামাজিক শাসনবলে আমাদের দেশের স্বাধীনচিন্তা অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল ; আর, সেইজন্য, চিন্তাশীল মুনি-ঋষিরা একপ্রকার আরণ্যক-সম্প্রদায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদের স্বাধীন-চিন্তার সে ভয় নাই, কিন্তু তাহার স্থানে আর এক গুরুতর ভয়ের পূর্ব্ব-সূচনা দেখা দিতেছে। ইংরাজি শিক্ষা আমাদিগকে বলপূর্ব্বক নিষ্ফল বিদ্যার মোট বহাইয়া না ছাড়ে— এই সে ভয়। এক পয়সা ফেলিয়া দিলেই মুটে মোট মাথায় করে— ইংরাজেরা আমাদের তৃষিত চক্ষের সম্মুখে কেরানি-গিরি নিক্ষেপ করিলেই আমরা বিদ্যার বোঝায় ঘাড় পাতিয়া দিই।

ইউরোপীয় লোকেরা যে আপনাদের স্বাধীন-চিন্তার স্ফূর্ত্তি হইতে আপনাদের সমস্ত বিদ্যা উদ্বোধন করিয়া তুলিয়াছে— এবং তাহাদের সেই স্বাধীন-চিন্তাটির মূল্য যে তাহাদের সমস্ত বিদ্যার মূল্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভুল ক্রমেও আমরা সে দিক্‌পানে চাহিয়া দেখি না। ইউরোপীয় সমস্ত বিদ্যা যদি অটুট থাকে— ও কেবল যদি স্বাধীন-চিন্তাটুকু তাহার গাত্র হইতে খসিয়া যায়— তবে ইউরোপীয় বিদ্যার মূল্য একেবারেই স্বর্গ হইতে রসাতলে নিপতিত হয়। তাহা হইলে আর যে নূতন কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইবে তাহার পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। ইংরাজি পুঁথির যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ভিন্ন—আপনাদের স্বদেশোচিত স্বাধীন-চিন্তা হইতে জ্ঞানালোকের উদ্দীপন আমাদের নব্যশাস্ত্রে লেখে না বলিলেই হয়। পূর্ব্বে আমরা বলিতাম "মনু বলিয়াছে অমুক কার্য্য কর্ত্তব্য অতএব তাহা কর্ত্তব্য,' এখন আমরা বলিতেছি ইংরাজি মতে অমুক কার্য্য কর্ত্তব্য—অতএব তাহা কর্ত্তব্য।' পূর্ব্বে মনুর স্বদেশানুরাগ-মিশ্রিত আধ্যাত্মিক বলের অধীনে আমরা গ্রীবা নত করিতাম, এখন ইংলণ্ডের সর্ব্বস্ফীত পার্থিব বলের অধীনে আমরা গ্রীবা নত করিতেছি। — স্বাধীন-চিন্তা পূর্ব্বে আমাদের দেশে নব্য-ইউরোপের মত এতটা প্রবল ছিল না এই মাত্র—কিন্তু এক্ষণে আমাদের স্বাধীন-চিন্তা নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে অন্ততঃ আরণ্যক মুনি-ঋষিদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা পাখা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল ; — এখন একদিকে ইউরোপীয় পরাক্রমের গুরুভার—এবং আর একদিকে ভ্রষ্ট হিন্দুয়ানি রূপী মৃত ঘটোৎকচের গুরুভার দুই দিক্ দিয়া দুইভার আসিয়া আমাদের দেশের স্বাধীন-চিন্তাকে যাঁতায় পিসিয়া বধ করিবার উপক্রম করিয়াছে। এই উভয়-সঙ্কট হইতে আমরা নব্য সমাজকে রক্ষা না করিলে কিছুতেই তাহার রক্ষা নাই। সমগ্র মনুর বিধান এখনকার কালোচিত নহে, এ জন্য এখন আমরা তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া চলিতে পারি না ; ইউরাপের সমগ্র সামাজিক রীতিনীতি আমাদের দেশোচিত নহে—এজন্য তাহাও আমরা নির্ব্বিচারে মানিয়া চলিতে পারি না। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য আমাদের এই যে,-এ-দেশের স্বাধীন চিন্তায় ইউরোপের যে সমস্ত রীতি নীতি এ দেশের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহা আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিব ; আবার এ-কালের স্বাধীন চিন্তায়—মনুপ্রভৃতি স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের যে সমস্ত বিধান বর্ত্তমানকালের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহাও আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিব। ইংরেজরাও আর্য্যজাতি—আমরাও আর্য্যজাতি,— ইংরাজদিগের সহিত আমাদের এক প্রকার জ্ঞাতি সম্পর্ক; ইংরাজদিগের মধ্যে এমন অনেক সামগ্রী আছে যাহা এক সময়ে আমাদের মধ্যেও ছিল — মুসলমানদিগের রাজ্যকালে সেরূপ অনেক সামগ্রী আমরা অযত্নে হারাইয়া ফেলিয়াছি,—ইংরাজদের সান্নিধ্য-বশতঃ যদি সে-গুলি পুনরায় নূতন বেশে উদ্দীপ্ত হইয়া

উঠিতে সুযোগ পায়—তবে তেমন সুযোগ কোন মতেই আমাদের ছাড়া উচিত হয় না। ইউরোপ নিকট হইতে আমাদের স্বদেশোপযোগী সভ্যতার উপকরণ গ্রহণ করিবার বৈধ প্রণালী সবিস্তারে বিবৃত করিয়া বলিবার এ সময় নহে—এখানে তাহার দুই একটি স্বল্প আভাস প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি। কান্টের দর্শন-শাস্ত্র এবং আমাদের দেশের দর্শন-শাস্ত্র দুয়ের মধ্য হইতে সার-মন্থন করিয়া লইলে সে দুই সারাংশের কেবল যে পরস্পর মিল খায় তাহা নহে, কিন্তু উভয়ের দোষাংশে উভয়-কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং উভয়ের গুণাংশে উভয়ের যোগে সংবর্দ্ধিত হইয়া নূতন এক সারবান্ দর্শন-শাস্ত্র আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে। আমাদের দেশের পারদ-ভস্মাদির নানাবিধ রাসায়নিক প্রকরণ ইংরাজি কিমীয় বিদ্যার সহিত মিলিয়া মিশিয়া নূতন এক রসায়ন বিদ্যার উৎপত্তি ঘটাইতে পারে। চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে ঐরূপ মিলনের কথা আরো জোরের সহিত খাটে। লৌকিক শিষ্টাচার-প্রথাও এমন অনেক পাওয়া যায়, যাহা সাধারণ আর্য্যজাতির মধ্যে এককালে পরিব্যাপ্ত ছিল, —এখন বঙ্গ-দেশ হইতে তাহার অনেকগুলি উঠিয়া গিয়াছে , নব্যবঙ্গে তাহার পুনরুদ্দীপন ভাল বই মন্দ নহে। ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত — হস্ত-আলোড়ন রূপ অভিনন্দনের প্রথা ;—এপ্রথা হিন্দুস্থানি খোট্টা মহলে এখনো প্রচলিত আছে। ইউরোপীয় অভিনন্দন-প্রথা এবং ভারতবর্ষীয় অভিনন্দন-প্রথা দুয়ের মধ্যে কেবল এইটকু প্রভেদ যে, দুই হস্তে হস্ত ধরিয়া আলোড়ন করা ভারতবর্ষীয় প্রথা—দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আলোড়ন করা ইউরোপীয় প্রথা—এ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কালিদাসের সময় বোধ হয় আমাদের দেশে ইউরোপের অনুরূপ অভিনন্দন-প্রথা প্রচলিত ছিল ; — পুরুরবা রাজার সহিত চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের সাক্ষাৎকারের সময়, রাজা রথ হইতে নামিয়া বলিলেন "স্বাগতং প্রিয়সুহৃদে," ইহার অবিকল ইংরাজি অনুবাদ Welcome dear friend ; ইহার পরেই লিখিত আছে "অন্যোন্যাং হস্তং স্পৃশতঃ" উভয়ে পরস্পর হস্ত স্পর্শ করিলেন ; হস্ত এখানে দ্বিবচন নহে কিন্তু একবচন—ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, কালিদাসের সময়ের অভিনন্দন-প্রথা এক্ষণকার ইউরোপীয় প্রথার অনুরূপ ছিল। এইরূপ যেখানে আমাদের দেশের রীতি-নীতির কালোচিত পরিবর্ত্তন আমাদের স্বদেশেরই পূর্ব্বতন রীতিনীতি উস্কাইয়া তুলে, সেখানে সেরূপ পরিবর্ত্তনকে মিছামিছি স্বদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ভাবিয়া কেন যে আমরা ভয় করিব তাহার কোন কারণ নাই। আমাদের দেশ স্বাধীন অবস্থায় যেরূপ ছিল তাহা আমরা হারাইয়াছি,—এক্ষণকার কোনো কালোচিত পরিবর্ত্তন যদি সেই হারাসামগ্রী আমাদিগকে মিলাইয়া দেয়, তবে উল্টা-আরো তাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করা আমাদিগকে শোভা পায়। ইউরোপীয় আধুনিক আর্য্য-রীতিনীতি যদি আমাদের দেশের পুরাতন আর্য্য রীতি-নীতিকে ভস্মের আচ্ছাদন হইতে টানিয়া বাহির করে, তবে নূতন পুরাতনের মধ্যে—গতি এবং স্থিতির মধ্যে—সহজেই ঐক্য বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়,—ইহা কত না প্রার্থনীয়।

এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রীতি-নীতি আচার ব্যবহার—যাহা থাকিলেও বিশেষ কোন লাভ নাই— না থাকিলেও বিশেষ কোন হানি নাই, তাহার কথা এখন যাইতে দিয়া—স্বদেশের স্বাধীন-চিন্তা প্রসূত ধর্ম্ম-নিয়ম সকল কালোচিত গতির সহিত কিরূপে সৌহার্দ্দপাশে বদ্ধ হইতে পারে তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যা'ক। আমাদের দেশে বেদ স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র হইতে যদি এরূপ এক উচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া পাওয়া যায়, যাহা বর্ত্তমান কালের উন্নত জ্ঞানের উপযোগী, তবে তাহাই নব্য-বঙ্গের স্থিতি-বন্ধন-কার্য্যে যথার্থ অধিকারী। বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-

তন্ত্রের মথিত সারাংশ—যাহার আর-এক নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম—তাহা একদিকে যেমন স্বদেশের স্বাধীন চিন্তা প্রসূত—আর একদিকে তেমনি বর্ত্তমান কালোচিত উন্নত জ্ঞানের সবিশেষ উপযোগী,—এক দিকে যেমন তাহা নব্য-বঙ্গের স্থিতি-সংস্থাপনের উপযোগী আর এক দিকে তেমনি তাহা নব্য-বঙ্গের গতির অবিরোধী, — ঈশ্বরকৃপায় যেটি আমাদের চাই সেইটি আমরা ঠিক্ সময়ে পাইয়াছি—এজন্য তাহার প্রতি সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

স্থাবর স্থিতিশীলতা-নিবন্ধন বঙ্গদেশের শোচনীয় জড়-ভাব রামমোহন রায়ের বিশাল হৃদয়কে কত যে তীব্র বেদনায় ব্যথিত করিয়াছিল, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। আর কোন ব্যক্তি হইলে—যাহাতে বঙ্গের স্থিতিভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া যায় তাহারই চেষ্টায় তিনি আপনার জীবন উৎকর্ষ করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের হৃদয় যেমন বিশাল ছিল তাঁহার বুদ্ধিও তেমনি তীক্ষ্ণ ছিল—একাধারে প্রেম এবং জ্ঞানের সমান উৎসর্গ যদি কোথাও দেখা গিয়া থাকে, তবে তাহা রামমোহন রায়েই দেখা যায়। রামমোহন রায়ের কার্য্য দেখিলেই তাঁহার মনের মহদ্ভাব দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় ; সে ভাব এই যে, বঙ্গ সমাজের স্থিতি-ভঙ্গ না করিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে গতির সঞ্চার করিতে হইবে। তিনি দেখিলেন ইংরাজি বিদ্যালয় ভিন্ন গতি-সঞ্চারের উপায় নাই, ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন স্থিতি-রক্ষার উপায় নাই ; এইজন্য তিনি সমাজরূপী তুলাদণ্ডের এক দিকে ব্রাহ্মসমাজ এবং আর-এক দিকে ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ; যদি একটিকে উঠাইয়া লও তবে আর একটি নিম্নে ঝুঁকিয়া তদ্দণ্ডেই ধূলিসাৎ হইবে! রামমোহন রায়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানদর্শী ত্রিনেত্রে নব্যবঙ্গের উৎপত্তি স্থিতি এবং গতি তিনই সাক্ষাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং তাঁহার একা হস্ত তিনেরই নির্ব্বাহ-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধনের কিছুই অবশিষ্ট রাখে নাই। নব্যবঙ্গের উৎপত্তির মূল ইংরাজি এবং বাঙ্গালি সভ্যতার বিবাহ—স্থিতির মূল ব্রাহ্মসমাজ—গতির মূল ইংরাজি বিদ্যালয়,—রামমোহন রায় এই-তিনটি আপনার অটল কীর্ত্তি-স্তম্ভ এবং নব্যবঙ্গের অটল আশ্রয়-স্তম্ভ একাধারে সংস্থাপন করিয়া পৃথিবীর একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন; ভবিষ্যতে ইহার শুভ-ফল যে কত দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া পড়িবে, এখন আমরা তাহার বাষ্পও হয় তো জানি না।

# মুখ্য এবং গৌণ

বঙ্গ-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল কি মন্দ এবং কিরূপে তাহার উন্নতি সাধন হইতে পারে, সংবাদপত্র-সমূহে ইহার বিচার ক্রমাগতই চলিতেছে, কিন্তু বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে মুখ্য কি এবং গৌণ কি ইহার প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় অনেকেই ভ্রমে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের দেশে যে কথাটি উত্থাপিত হয় তাহাই মুখ্য-রূপে গৃহীত হয়। "জাতীয়-ভাব" "উন্নতিশীলতা" "ভারত-জননী" "সুসভ্য আচার ব্যবহার" এমনি এক একটি কথার উল্লেখ মাত্রেই তাহার এক-একটি কার্য্যাকার্য্যবিচার-নিরপেক্ষ অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। অর্থ দুইরূপ—বাক্যার্থ এবং ভাবার্থ; বাক্যে যাঁহাদের আঁট তাঁহারা বাক্যার্থই গ্রহণ করেন, কার্য্যে যাঁহাদের আঁট তাঁহারা ভাবার্থই গ্রহণ করেন। বাক্যার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার অপ্রাসঙ্গিক; বাক্যের মুখ্য অর্থটিই বাক্যার্থ, তাহার এদিক্ ওদিক্ হইলেই তাহার অপলাপ ঘটে। কিন্তু ভাবার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার নিতান্তই আবশ্যক। উদাহরণ;—"জাতীয় ভাব", এ শব্দটির বাক্যার্থ স্বজাতির প্রতি অনুরাগ—এই মাত্র; কিন্তু সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ অথবা বিরাগ অথবা উপেক্ষা থাকিতে পারে, এমন কি ভিন্ন জাতির প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগও থাকিতে পারে। যদি কেহ বলেন যে, "স্বজাতির প্রতি আমার অনুরাগ যথেষ্ট আছে, সুতরাং আমি যে, জাতীয়-ভাব রক্ষা করি না, একথা তুমি বলিতে পার না, কিন্তু ভিন্ন জাতির প্রতি আমার তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ;" তবে তাঁহার সে বাক্যে আমরা সায় দিতে পারি না কেন? জাতীয়-ভাবের বাক্যার্থ মাত্র দেখিলে বোধ হয় যে তিনি ঠিক্ কথাই বলিতেছেন। কিন্তু তাহার ভাবার্থ দেখিলে তাঁহার কথা অযথা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে। কেননা জাতীয়-ভাবের বাক্যার্থে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ—এই মাত্র; কিন্তু তাহার ভাবার্থ, মুখ্যরূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, এবং গৌণরূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ। ইহার বিপরীতে, মুখ্য-রূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ এবং গৌণ-রূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বর্ত্তিলে জাতীয়-ভাব কেবল একটা কথার কথা হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোল্লিখিত "জাতীয়-ভাব" ইত্যাদি চারিটি বিষয়ের ক্রমান্বয়ে মুখ্য-গৌণ নিরূপণ করাই বর্ত্তমান-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জাতীয়-ভাব রক্ষা করা সকল জাতিরই স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সার্ব্বভৌমিক ভাবের নিকটে জাতীয়-ভাবের লাঘব স্বীকার করাও তেমনি স্বভাবসিদ্ধ। সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিতে গেলেই স্বজাতীয় ভাবের সহিত বিজাতীয় ভাবের মুখ্য এবং গৌণ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" ইহা একটি মাত্র বচন, কিন্তু ইহা হইতে যে যেমন সে তেমনি অর্থ নিষ্কর্ষণ করিয়া লয়। এজন্য "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" ইহার অর্থ এত গুলি যথা;—প্রথম; স্বদেশে বিজাতীয়-ভাবকে তিল-মাত্র

* ১৭৯৭ শকের (১২৮২ সালের) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে উত্তরোত্তর ক্রমে মাসে মাসে প্রকাশিত।

স্থান না দেওয়ার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। দ্বিতীয়, বিজাতীয়-ভাবের প্রতি উপেক্ষা করা, এবং স্বজাতীয়-ভাবকে পোষণ করা ইহার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। তৃতীয়, স্বজাতীয়-ভাব এবং বিজাতীয়-ভাব দুইকে সমানরূপে রক্ষা করা। চতুর্থ; বিজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে এবং স্বজাতীয়-ভাবকে গৌণ-রূপে রক্ষা করা। পঞ্চম; স্বজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে এবং বিজাতীয় ভাবকে গৌণ-রূপে রক্ষা করা। আমাদের মতে উক্ত কয়টি অর্থের মধ্যে শেষোক্তটিই কার্য্যকর, অন্যগুলি সমস্তই অকার্য্যকর। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে চৌকিতে বসিলেই জাতীয়-ভাবের অন্যথাচরণ করা হয়। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে ইংরাজি অধ্যয়ন করিলেই জাতীয়-ভাবের অবমাননা করা হয়। তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে বাঙ্গালি-সমাজে ধুতি-চাদর ও ইংরাজি-সমাজে কোর্ত্তা ও পেণ্টুলন পরিধান করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। চতুর্থ অর্থটি গ্রহণ করিলে জাতীয়-ভাব একেবারেই লোপ পায়। পঞ্চম অর্থটি গ্রহণ করিলে সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—ইহাই "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" এই বচনটির প্রকৃত অর্থ।

মনুষ্য-জাতি যেমন, পশ্বাদি অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য অপর জাতীয় মনুষ্য হইতে বিভিন্ন। আম্র-বৃক্ষ যেমন জম্বু-বৃক্ষ হইতে ভিন্ন, অথচ উভয়েই বৃক্ষ বটে; সেইরূপ বাঙ্গালি, ইংরাজ, ফরাসিস্, সকল জাতীয় মনুষ্যই মনুষ্য বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আম বৃক্ষে যেমন আম্র-ফলই শোভা পায়, জম্বু-বৃক্ষে যেমন জম্বু-ফলই শোভা পায়, সেইরূপ ফরাসিস্ জাতির ফরাসিভাবই শোভা পায়, ইংরাজ জাতির ইংরাজি-ভাবই শোভা পায়, বাঙ্গালি জাতির বাঙ্গালি-ভাবই শোভা পায়। অপিচ আম্র-বৃক্ষ যেমন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়া যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল উৎপাদন করে, এবং তাহা না করিলে তাহার বৃক্ষত্বে দোষ পৌঁছে, সেইরূপ জম্বু-বৃক্ষও যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল প্রসব করে, না করিলে তাহার বৃক্ষত্বে দোষ পৌঁছে। এমনিই জানিও যে, ফরাসিস্ দেশীয় ব্যক্তি দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্বের হানি হইবে; বাঙ্গালি জাতিও দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্ব রক্ষা পাইবে না। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা সকল জাতিরই আবশ্যক। আম্র-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা যেমন আবশ্যক, আম্র-বৃক্ষত্ব রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক; জম্বু-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু আম্রবৃক্ষ রক্ষা করা আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক তাহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। সেইরূপ, ইংরাজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, ইংরাজিত্ব রক্ষা করাও উচিত; বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, কিন্তু ইংরাজিত্ব রক্ষা করা বাঙ্গালির পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি উপহাসাস্পদ। মনুষ্যের সার্ব্বভৌমিক ভাবের সহিত জাতীয় ভাবের কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে—এক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বাঙ্গালি, বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিবেক—এইটি জাতীয়-ভাবের উত্তেজনা; বাঙ্গালি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবেক—এইটি সার্ব্বভৌমিক ভাবের উত্তেজনা; উভয়ই বাঙ্গালির শিরোধার্য্য। এক্ষণে উভয়ের সামঞ্জস্য-সাধনের পদ্ধতি কিরূপ, তাহাই দেখা যাউক।

কেহ মনে করেন যে, সকল জাতির ভাব সংগ্রহ করিয়া একত্র সন্নিবিষ্ট করিলেই সার্ব্বভৌমিক-ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ই রক্ষিত হয়। ইহাদের যুক্তি এইরূপ যে, সকল জাতীয়-ভাব যেখানে একত্র করা হইয়াছে, সেখানে স্বজাতীয়-ভাব যেমন আছে বিজাতীয়-

ভাবও তেমনি আছে, সুতরাং জাতীয়-ভাব এবং সার্ব্বভৌমিক-ভাব উভয়ই রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এটি ভ্রম। একটি আম্র-বৃক্ষে যদি জম্বু-ফল, আতা-ফল, তিন্তিড়ী-ফল একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন বিকারের প্রলাপের সহিত উপমেয় হয়, নানা জাতীয় ভাব একত্র করিলে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। জাতীয়-ভাব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ের সামঞ্জস্য করা কেবল মাত্র বিচারের কার্য্য নহে, উহা শিক্ষা সংস্কার এবং অভ্যাসের কার্য্য। এজন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়ের যেমন বৈশদ্য হইতে পারে, যুক্তি দ্বারা তেমন হইতে পারে না। অতএব দৃষ্টান্তচ্ছলে নিম্নে তাহার উপায় কথিত হইতেছে।

প্রথম, বাঙ্গালিদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইবে—এইটি উপদেশ। বাঙ্গালিদের মধ্যে মনুষ্য * জন্মিয়াছে, এবং মনুষ্য বর্ত্তমান আছে—এটি প্রত্যক্ষ এবং জন-শ্রুতি উভয়েরই সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়, বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিতে হইবে—এইটি উপদেশ; এবং ইহা যে বাঙ্গালি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে, ইহা বলাবাহুল্য।

উপরের দুই প্রত্যক্ষ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়া তাহা হইতে জিজ্ঞাস্য উপায়টি নির্দ্ধারণ করাই বৈধ-প্রণালী। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিরা মনে করেন যে, দশ জনকে প্রতিপালন করাতে মনুষ্যত্ব হয়; পোষ্যবর্গ এবং পোষক উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা উপযুক্তরূপে রক্ষা করাতেই মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয়; কেবল স্বার্থ লইয়া থাকিলে মনুষ্যত্বের বিপরীতাচরণ করা হয়। এ ভাবটি রক্ষা করিয়া চলিলে বাঙ্গালিত্ব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ই রক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের একটি ভাগ রক্ষা করিলেই যে সম্যক্ রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা করা হয়, তাহা নহে। সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন মনুষ্যত্ব রক্ষা করা আবশ্যক। বাঙ্গালিরা যেমন স্বার্থ-বিহীন পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ রক্ষা করাকে মনুষ্যত্ব কহে; ইংরাজেরা সেইরূপ স্বাধীন-ভাব রক্ষা করাকে মনুষ্যত্ব কহে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উক্ত দুই ভাবই মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, অতএব উভয়ের কোনটিই ত্যাজ্য নহে।

কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গালিরা বহুকাল হইতে মঙ্গলভাবকেই বিশেষরূপে আদর করিয়া আসিতেছেন; ইংরাজেরা স্বাধীনতাকেই বিশেষরূপ আদর করিয়া আসিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাঙ্গালীরা কিরূপে ইংরাজদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের বহু যত্নার্জ্জিত স্বাধীনভাব শিক্ষা করিবেন; এবং ইংরাজরাই বা কিরূপে বাঙ্গালীদের নিকট হইতে তাঁহাদের বহুকালার্জ্জিত মঙ্গলভাব শিক্ষা করিবেন। বাঙ্গালীরা দেশীয় কুসংস্কার উন্মূলনেও সমান আগ্রহ প্রকাশ করেন, ইহা অতি নিন্দনীয়। আজকাল সকল বিষয় সমান চক্ষে দেখাই উদারতার চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং আপনাদের উদারতা সাধন করিবার জন্য অনেক সুসংস্কার এবং কুসংস্কার উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। স্বাধীনতা বিষয়ে বাঙ্গালীদের অনেক কুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু মঙ্গল-অনুষ্ঠান বিষয় বাঙ্গালিদের যে অনেক সুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিতে কেন আমরা কুণ্ঠিত হইব? বাঙ্গালীদের সমাজে মঙ্গল-ভাবের যখন আদরাধিক্য, তখন সেই ভাবের মধ্য দিয়া কিরূপে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইতে পারে, ইহাই তাঁহাদের চেষ্টা করা উচিত। চিরার্জ্জিত মঙ্গল ভাবের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া

* এখানে মনুষ্য শব্দের অর্থ যে—মনুষ্যে মনুষ্যত্ব বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি পায়।

ইহা ভিন্ন আর কিছুই মনুষ্যত্ব নহে, ইহা বলা তাৎপর্য্য নয়। সংক্ষেপ-মানসে মনুষ্যত্বের কোন একটি ভাগ (যে ভাগটির প্রতি বাঙ্গালি জাতির বিশেষ লক্ষ্য তাহাই) দেখান হইল।

যিনি স্বাধীনতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে যান, তাঁহার সে ভক্তি ভাণ ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না যিনি মঙ্গল ভাবের প্রতি অভক্তি করিতে পারেন, তিনি কি কখন স্বাধীনতার ভক্ত হইতে পারেন, এও কি কখনও সম্ভবে? এমন হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবেরই অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহার একপ্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে; এজন্য মঙ্গল-ভাবের প্রতি তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিক ভক্তি; এ প্রকার ভক্তির আধিক্য স্বাভাবিক। কিন্তু মনে কর যে, বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন করিয়াও তাহার প্রতি যাঁহার ভক্তি জন্মে নাই, এরূপ ব্যক্তি কি এত মহৎ হইতে পারেন যে, স্বাধীনতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিবামাত্রই তৎপ্রতি তাঁহার ভক্তি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে? স্বাধীনতা এবং মঙ্গলভাব এ দুইটি যদি নিতান্তই বিরোধী বিষয় হইত, তাহা হইলে একের প্রতি অভক্তি এবং অন্যের প্রতি ভক্তির আতিশয্য একত্র শোভা পাইত; কিন্তু স্বাধীনতা এবং মঙ্গল-ভাবের মধ্যে সেরূপ বিরোধ থাকা দূরে থাকুক,—একটি আর একটির সোপান-স্বরূপ। স্বাধীনতা হইতে মঙ্গলভাবে এবং মঙ্গলভাব হইতে স্বাধীনতাতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতএব বাঙ্গালীরা আপনাদিগের পৈতৃক ধনস্বরূপ মঙ্গল ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী একটা কৃত্রিম স্বাধীনতাতে ঝম্প প্রদান করেন, ইহা কোনরূপে যুক্তিসিদ্ধ নহে; বাঙ্গালি যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার উপায় এই :—বাঙ্গালি জাতি যে যে ভাবকে বিশেষরূপে মনুষ্যত্বের চিহ্ন বলিয়া আদর করিয়া আসিতেছেন, এমন কি, যে যে ভাবের অনুশীলনে তাঁহাদের এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে সেই সেই ভাবকে মূল করিয়া অনভ্যস্ত স্বাধীনতার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন; ইহাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথাচরণ করা উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতে আশা করা মাত্র। এখানকার ভাব এরূপ নহে যে মঙ্গলভাব স্বাধীনতা কোন অংশে, ন্যূন, অথবা স্বাধীনতা অপেক্ষা মঙ্গল-ভাব কোন অংশে ন্যূন। এখানকার অভিপ্রায় কেবল এই যে, মঙ্গলভাবের অনুষ্ঠানে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তিনি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন ইহা অতীব উত্তম, কিন্তু তাহা বলিয়া মঙ্গল-ভাবের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবে কেন? মঙ্গল-ভাবের মধ্য দিয়া কি স্বাধীনতাতে পৌঁছান যায় না? যদি বল "না—পৌঁছান যায় না," তবে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তুমি যাহাকে স্বাধীনতা বলিতেছ তাহা স্বাধীনতাই নহে, তাহা স্বেচ্ছাচার। এখানে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনাতে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে না—বাঙ্গালির কার্য্যতঃ কিরূপ করা উচিত, তাহাই দেখা যাউক।

বাঙ্গালিদের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ইহা জানিয়া যেরূপ করিলে সেই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে তাহাই বাঙ্গালিদের কর্ত্তব্য। "প্রকৃত অবস্থা" এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আনুমানিক এবং মনঃকল্পিত অবস্থাই সহজে লোকের দৃষ্টিতে পড়ে, প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে অনুসন্ধান, পরীক্ষা, আলোচনা, বিবেচনা ইত্যাদিক্রমে বুদ্ধি চালনা এবং শ্রম স্বীকার আবশ্যক হয়। যেমন কোন ভূমিখণ্ড অধিকার করিতে হইলে অগ্রে তাহার একটি মানচিত্র চাই, সেইরূপ বঙ্গ-সমাজের তত্ত্বানুশীলন করিবার অগ্রে তাহার একটি মানচিত্র আবশ্যক; তাহা এইরূপ;—প্রথমতঃ, বাঙ্গালি-সমাজ ইংরাজি-সমাজ দ্বারা বেষ্টিত, দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালি-সমাজের রীতিনীতি সমস্তই প্রাচীন আর্য্য-বংশ হইতে প্রবাহিত; তৃতীয়তঃ, মুসলমানদিগের প্রভাব দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম ঘটনা।

এই মানচিত্রটি সম্মুখে রাখিয়া দেখা যাউক্ যে, হিন্দু মুসলমান ইংরাজ এই তিন জাতি কী-তিন ভাবে বঙ্গসমাজের দশা-চক্রের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছেন। সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুরা মঙ্গল-প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব করিয়াছেন, মুসলমানেরা বল-প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব করিয়াছেন, ইংরাজেরা স্বাধীনতা-প্রধান ভাবে কর্তৃত্ব করিতেছেন। বাঙ্গালি-সমাজের মধ্যে মঙ্গল-প্রধান ভাব এবং বল-প্রধান ভাব স্ব স্ব কার্য্য করিয়া অবসর লইয়াছে, এক্ষণে স্বাধীনতা প্রধান ইংরাজী ভাবের অভ্যুদয় হইতেছে। যাহা বলা হইল, সংক্ষেপে তাহার দুটি একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। মনু প্রভৃতি ঋষিদিগের ব্যবস্থাতে আর যে কিছুর ত্রুটি থাকুক না কেন, কিন্তু উক্ত বিধান কর্ত্তাদিগের মঙ্গল ভাবের কোনো অংশে ত্রুটি ছিল না। তাঁহারা যে কোনো বিষয় উপকারী জানিতেন, তাহা কিরূপে জন-সাধারণের ভোগে আসিবে, যে কোনো কার্য্য হিতকারী জানিতেন তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা জন্মিবে, এই চিন্তাই তাঁহাদের মনে সর্ব্বদা জাগিত। সামান্য গৃহ-ধর্ম্ম বিষয়ে উক্ত তিন জাতির মধ্যে কাহার কিরূপ ব্যবস্থা-প্রণালী তাহা দেখিলেই তিন জাতির তিন প্রকার ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারিবে। গৃহ ধর্ম্ম বিষয়ে মন্বাদি ঋষিগণের ব্যবস্থা সংক্ষেপতঃ এইরূপ;—মাতা-পিতাকে দেবতুল্য জানিবে, স্ত্রীকে স্বামী ভরণ পোষণ করিবে, ছায়ায় ন্যায় পত্নী পতির অনুবর্ত্তী হইবে, পুত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবে, কন্যাগণকেও অতি যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে; দাস-বর্গ ছায়ার ন্যায়, দুহিতা কৃপা-পাত্র, অতএব এ সকলের দ্বারা উত্যক্ত হইলেও সংযত হইয়া সমস্ত সহ্য করিবে ইত্যাদি। ইহাতে কেমন মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ব্যবস্থা যে বল-প্রধান তাহা তুলনাতেই ধরা পড়ে; ঋষিগণের ব্যবস্থাতে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়াছে, যথা "কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে," "স্ত্রী গৃহের শ্রী স্বরূপা" ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান ব্যবস্থাপকেরা স্ত্রীজাতিকে অপেক্ষাকৃত হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। যাঁহারা বলের পক্ষপাতী তাঁহারা দুর্ব্বল অবলা জাতিকে হেয় জ্ঞান করিবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? কেবল যাঁহারা মঙ্গলের অনুরাগী তাঁহারাই স্ত্রীজাতির দুর্বলতার মধ্যেও স্নেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির বল দেখিতে পা'ন। ইংরাজদিগের স্বাধীনতা কিছু অতিরিক্ত; তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর অনুগামী হইবে।" ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।" এরূপ অতিরিক্ত স্বাধীনতা—স্বাধীনতার অন্তিম দশা, উহা কখনই আমাদের অনুকরণীয় নহে। বাঙ্গালি-সমাজে যে কিছু মঙ্গল ভাবের চর্চ্চা অদ্যাপি চলিতেছে তাহা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রসাদাৎ। অনতিপূর্ব্বকালে বলবানের আনুগত্য ও দুর্ব্বলের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যাহা দেখা যাইত, তাহা মুসলমানদিগের প্রসাদাৎ। এক্ষণে যে স্বাধীনতার চর্চ্চা চলিতেছে তাহা ইংরাজদিগের প্রসাদাৎ। এক্ষণে বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ;—স্বজাতীয় ভাবের প্রতি, অর্থাৎ মঙ্গলপ্রধান ভাবের প্রতি, বাঙ্গালীদের নিতান্তই অনাদর জন্মিয়াছে; বলপ্রধান ভাবের প্রতি, তদপেক্ষা অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা—যাহার সহিত মঙ্গল-ভাবের যোগ আছে; প্রত্যুত মূল ছাড়া শাখার ন্যায় যে স্বাধীনতা মঙ্গলভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে সে স্বাধীনতা প্রকৃত নহে—সে স্বাধীনতা বিকৃত, তাহাকে স্বেচ্ছাচার বলাই সঙ্গত। এরূপ স্বাধীনতা কখনই শ্রদ্ধেয় নহে।

ইংরাজ জাতিরা আপনাদের স্বাধীনতা আপনারা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাই, স্বাধীনতা লাভের

যে কিরূপ পদ্ধতি, ইংরাজদিগের পুরাবৃত্ত পাঠে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"—ইহা ইংরাজ জাতিরা বিলক্ষণ বুঝেন। মঙ্গল ভাবের পরিস্ফুটন দ্বারা তাঁহারা স্বহস্তে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের স্বাধীনতা যদিও স্থলবিশেষে তীব্র বৈকারিক ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহা স্বাভাবিক, তাহাতে পরাণুকারিতা ও কৃত্রিমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের লোকেরা ইংরাজদিগের পরিপাটী উপকরণ-সামগ্রী সকল দেখেন, এবং তাহাতেই মুগ্ধ হন, কিন্তু যেরূপ প্রকরণ দ্বারা সে সকল সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় তাহা দেখেন না। তাঁহারা ইংরাজদিগের স্বাধীনতা মাত্র দেখেন এবং তাহাতেই এমনিই মুগ্ধ হন যে, কি প্রকরণ দ্বারা ইংরাজেরা আপনাদের স্বাধীনতা আপনারা উপার্জ্জন করেন, তাহা দেখিতে তাঁহাদের ভার বোধ হয়। ইংরাজেরা যখন ম্যাগনাচার্টা নামক নিয়মপত্রের উপরে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মঙ্গল-ভাব কেমন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; রাজার অত্যাচার হইতে ক্ষুদ্র প্রজাদিগকে বাঁচাইবার জন্য, প্রধান প্রধান দলপতিরা যে মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন—ইহা মঙ্গল-ভাবের একটি প্রধান উদাহরণস্থল বলিতে হইবে। কিন্তু এ সকল মহৎ দৃষ্টান্ত কেন উল্লেখ করিতেছি? যাঁহারা পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুকে ছাড়িয়া কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে বা ইংলণ্ডে স্বাধীনতার গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে যা'ন, তাঁহাদের স্বাধীনতার সঙ্গে ঐ প্রকার স্বদেশপ্রেমী নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতার কি কোন সম্পর্ক আছে? নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতা কী, তাহা যদি জানিতে চাও তবে পুরু-রাজা বন্ধনদশায় আলেক্জাণ্ডরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে তাহা জানিতে তোমার বিলম্ব হইবে না। তোমরা কতকগুলি চাকচিক্য দেখিয়া আপনার দেশকে ভুলিয়া যাও—তোমরা যদি স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্থল হইলে, তবে যাঁহারা তাহাতে না ভুলেন, যাঁহারা পুরু-রাজার ন্যায় স্বদেশের গৌরব রক্ষা করেন তাঁহারা এ ছার দেশে জন্মিলেন কেন? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা-ভক্ত উপাধি দেওয়া যাইতে পারে? যিনি বঙ্গসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজিত্ব ব্রত অবলম্বন করেন, তিনি কি স্বাধীন? এক প্রকার স্বাধীন বটে, তিনি ইচ্ছামতে পান ভোজন করিতে পারেন, ইচ্ছামতে আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন, তাঁহার স্বাধীনতার ব্যাপ্তি এই পর্য্যন্ত। স্বাধীনতা কত না উচ্চ মূল্যের সামগ্রী! স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীতে কত রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে; স্বাধীনতার জন্য লোকে কতদিন উপবাস করিয়াছে; ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে কত সুখে বঞ্চিত করিয়াছে; কত কঠোর তপস্যা করিয়াছে; বিষয়সুখের প্রলোভন হইতে মনকে কত বল পূর্ব্বক উচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে; কেবল অন্তরের মহত্ত্বের জন্য বাহ্যিক সকল প্রলোভন, সকল সুখ-সম্পত্তি, অট্টালিকা পরিচ্ছদ বেশভূষা সমস্তই তুচ্ছ করিয়াছে। সে সকল গিয়া এক্ষণকার স্বাধীনতা কী? না "আমি স্বাধীন দেশবিশেষে পদার্পণ করিয়াছি—সুতরাং আমি স্বাধীন!" এই প্রকার স্বাধীন যুবা মনে মনে বলেন, "ইহাই কি সুখের বিষয় নয় যে, ইংরাজেরা এত কষ্টে এত পরিশ্রমে যে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছেন, আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা কষ্টে সেই স্বাধীনতা আপনাদের করিয়া লইতেছি। আমরা কী বুদ্ধিমান্! আমাদের ধীশক্তি কী চমৎকার! ইংরাজেরা এত বুদ্ধিবিদ্যা ব্যয় করিয়া যে সকল অত্যাশ্চর্য্য পণ্যসামগ্রীতে বিপণী সাজাইয়া রাখিয়াছে, আমরা কেবল মুদ্রা মাত্র ব্যয় করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমাদের কি সৌভাগ্য!"

এক্ষণে বঙ্গযুবকদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপুরুষদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া মঙ্গল-ভাবের যথাসাধ্য অনুশীলন কর, তাহা হইলে স্বাধীনতা ঐক্য এবং মনুষ্যত্ব সকলই তোমার হস্তগত হইবে। যখন পিতামাতাকে যথোচিত ভক্তি করিবে, ভ্রাতৃগণের সহিত যথোচিত সদ্ভাব রাখিবে, স্ত্রী পুত্রকন্যা সকলের প্রতি কর্ত্তব্যানুযায়ী ব্যবহার করিবে, যখন স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হইবে,—স্বদেশের যে সকল উত্তম রীতিনীতি, যে সকল জ্ঞানগর্ভ উক্তি, যে সকল উদার ব্যবস্থা, সে সকলকে যখন প্রাণতুল্য জানিবে,—স্বদেশের যে আচার-ব্যবহার নিন্দনীয় জানিবে তাহা বিনা আড়ম্বরে (যত সহজ ভাবে হয়) যখন পরিত্যাগ করিবে, স্বদেশের পূর্ব্বতন মহাত্মাগণের প্রতি যখন সমুচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে, এইরূপে যখন চলিবে, তখন দেখিবে যে, স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না, স্বাধীনতা স্বয়ং আসিয়া তোমাদের চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবেন। যাঁহারা মঙ্গল-ভাব ছাড়িয়া স্বাধীন হইতে চান, এবং যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে চান, উভয়েই সমান! হইব স্বেচ্ছাচারী, বলিব স্বাধীন, এ ভাব পূর্ব্বে ছিল না, এ ভাব একটি নূতন সৃষ্টি। স্বাধীন ভাবের অনুশীলন অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু "স্বাধীনতা" নামটির বাক্যার্থ মাত্র গ্রহণ করিলে হইবে না, তাহার ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের যেরূপ আত্ম-নির্ভর ছিল, পরানুকরণে তাঁহাদের যেরূপ অপ্রবৃত্তি ছিল, এবং ইংরাজদিগের এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই আইস আমরা অনুকরণ করি, আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দ্বারা আমরা যেন আমাদের পবিত্র পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নামকে কলঙ্কিত না করি। কার্য্যে অনুকরণ-প্রিয়তা, এবং বাক্যে অনুবাদ-প্রিয়তা, এ দুটি থাকিতে, আমরা স্বাধীনতাই বলি আর উন্নতিশীলতাই বলি, যাহা বলি তাহার বিপরীত অর্থগ্রহণ করিলেই ঠিক হয়। স্বাধীনতার অর্থ অভিধানে যাহা থাকুক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ—ইংরাজি চাকচিক্যের অধীনতা, এবং উন্নতির আভিধানিক অর্থ যাহা হউক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের শ্রী বিদ্যা এবং কল্যাণ এই তিনের প্রতি যে কতদূর যত্ন ছিল তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে, অথচ তাহার প্রতিই আমরা অন্ধ, পরন্তু তাঁহাদের যে সকল দোষ ছিল তাহারই আলোচনাতে আমরা অত্যন্ত পটু হইয়াছি, সে দোষগুলি যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে প্রকৃত একটি কার্য্য করি,—সে দিকে আমরা এগই না, কেবল আলোচনাই করি, কেহ বা ইংরাজদের শ্রবণ রঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে তাহা আলোচনা করেন, কেহ বা স্বেচ্ছাচারের পথ খুলিয়া দিবার মানসে তাহা আলোচনা করেন, কেহ বা ক্রীড়াচ্ছলে তাহা আলোচনা করেন —জানেন না যে অনর্থক আপনাদের দোষ ঘোষণা করা, নিরুৎসাহের বীজ বপন করা মাত্র। সংশোধন-মানসে দোষ কীর্ত্তন করা স্বতন্ত্র, আর ক্রীড়াচ্ছলে দোষ কীর্ত্তন করা স্বতন্ত্র। দোষ-সংশোধন-মানসে যাঁহারা বঙ্গসমাজের দোষ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা যদি অল্পাংশ দোষ কীর্ত্তন করেন তবে অধিকাংশ গুণ কীর্ত্তন করেন। কিন্তু ক্রীড়াচ্ছলে যাঁহারা দোষ কীর্ত্তন করেন তাঁহারা শুদ্ধ কেবল দোষই দেখেন, গুণ তাঁহারা একটি মাত্রও দেখিতে পা'ন না। এইরূপ দোষ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালীরা নিরুৎসাহ নির্বীর্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। স্বদেশের মঙ্গল-প্রধান ভাব যে কত যত্নের ধন, তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃত্রিম স্বাধীনতার দিকে সকলেই ধাবিত হইতেছে। মুখ্যরূপে মঙ্গল-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই কালে বাঙ্গালীদের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারিবে, ইহা ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। "আমি কিছু মানি না" বলিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার নাম স্বাধীন-ভাব নহে; তাহার

নাম বিশৃঙ্খল ভাব; পুত্র যদি পিতাকে না মানে, স্ত্রী যদি স্বামীকে না মানে, লোকেরা যদি পূর্ব্বপুরুষদিগের মাহাত্ম্য সকল বিস্মৃত হয়, সৈন্যেরা যদি সেনাপতিকে অমান্য করে, তবে তাহাকে কি স্বাধীনতা বলা যাইবে? যে অবস্থায় যেখানে যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য, সেই অবস্থায় সেইখানে সেই সময়ে তাহা করা—ইহারই নাম স্বাধীন ভাব। বাঙ্গালীদের দেশ কাল অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তটি স্থির হয় যে, স্বজাতীয় ভাব, অর্থাৎ মঙ্গল-প্রধান ভাব অবলম্বন করিয়া চলাই বাঙ্গালীদের মুখ্য কর্ত্তব্য; বিজাতীয় ভাবের (তীব্র স্বাধীন ভাবের) অনুশীলন আপাতত গৌণকল্প—কিন্তু ভবিষ্যতে যখন আমরা মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিব, মঙ্গল-প্রধান স্বজাতীয় ভাবের প্রতি যখন আমাদের ভক্তি প্রেম ও নিষ্ঠা জন্মিবে, তখন স্বাধীনতা মুখ্যরূপে অবলম্বনীয় হইবে।—এটি আপনা আপনি হইবে।

যাহা বলা হইল তাহা এই,—প্রথমতঃ সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয় ভাব দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলা উচিত, দ্বিতীয়তঃ মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করাই সেই সামঞ্জস্য সাধনের উপায়; তৃতীয়তঃ বঙ্গসমাজের এইরূপ একটা বিকৃত ভাব দাঁড়াইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজদিগের অনুকরণকেই সার জ্ঞান করেন; ইংরাজেরা বাস্তবিক স্বাধীন জাতি,—বাঙ্গালীরা তাঁহাদের দেখা-দেখি স্বাধীনতার ভান করিয়া থাকেন—স্বাধীনতার ভান করিলেই যদি স্বাধীন হওয়া যাইত, তাহা হইলে শুক পক্ষীও বক্তৃতাবিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিত। স্বাধীনতার ভান না করিয়া, স্বাধীনতা লাভের উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের আবশ্যক। সে উপায় মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন। কেন না আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহাতেই লোকের মধ্যে ঐক্য হয়, তাহই সকল স্বাধীনতার মূল। মঙ্গল ভাবের অনুশীলন করিলে, হিন্দুদিগের স্বজাতীয় ভাবেরই অনুশীলন করা হয়, কেন না হিন্দুজাতি মঙ্গল-প্রধান। এই প্রকার মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করিলেই বাঙ্গালীদের মঙ্গল হইবে।

লক্ষ্য এবং উপায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, মুখ্য এবং গৌণের মধ্যে সেই সম্বন্ধ। লক্ষ্য যদি আমাদের স্বাধীনতা হয়, তবে তাহার উপায় মঙ্গলের অনুষ্ঠান। লক্ষ্য যদি আমাদের সার্ব্বভৌমিক ভাব হয়, তাহার উপায় মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন। এই শেষোক্ত বিষয়টি বিশদরূপে বুঝা আবশ্যক। যাঁহারা সার্ব্বভৌমিক ভাবে উঠিবার জন্য নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ করিয়া বেড়ান, তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে, স্বজাতীয় ভাবের মুখ্য আলোচনা-রূপ সোপান ব্যতিরেকে কোনরূপেই সার্ব্বভৌমিক ভাবে উত্থান করিতে পারা যায় না। অগ্রে যে মুখ্যরূপে অন্যকে বা অন্য জাতিকে জানিতে পারে, এবং মুখ্যরূপে আপনাকে আর গৌণরূপে অন্যকে জানিলে তবেই উভয়ের মধ্যে কি সার্ব্বভৌমিক এবং কি ব্যক্তিগত তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনী। মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ"—ইহার অর্থ এই যে, যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রীপুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দানক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র (অর্থাৎ ভান মাত্র), বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ। এইরূপই বলা যাইতে পারে যে, যে ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাব অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করেন, তাঁহার সে যে ভাব, তাহা সার্ব্বভৌমিক ভাবের ভান মাত্র, বাস্তব তাহা সার্ব্বভৌমিক ভান নহে। স্বজাতীয় ভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বজাতীয় ভাষা

সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে, কেন না, ভাষা ভাবের দর্পণস্বরূপ। যথা—যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহার সে বাগ্‌বিদ্যা বিদ্যার প্রতিরূপ মাত্র—ভানমাত্র—বাস্তব তাহা বিদ্যা নহে। সার্ব্বভৌমিক ভাবের সহিত সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্যের কিরূপ সম্বন্ধ ইহা না জানা বশতঃ অনেকে নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ করাকেই সার জ্ঞান করেন। সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্য, উভয়েই মধ্যে কিরূপ অবয়ব-সাদৃশ্য, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

| সার্ব্বভৌমিক ভাব | সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্য |
|---|---|
| (১) হিন্দু জাতীয় ভাব | (১) হিন্দু জাতি মুখ্যরূপে হিন্দু-ভাব এবং ভাষা, গৌণরূপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা অনুশীলন করিবেক। |
| (২) মুসলমান জাতীয় ভাব | (২) মুসলমান-জাতি মুখ্যরূপে মুসলমান-ভাব এবং ভাষা, গৌণরূপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা আলোচনা করিবেক। |
| (৩) ইংরাজ-জাতীয় ভাব | (৩) ইত্যাদি। |

উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে, মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধন সার্ব্বভৌমিক ভাবের অনুপযোগী হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই আরো সার্ব্বভৌমিক ভাবের তাৎপর্য্য। যদি বল যে, স্বদেশীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিদেশীয় ভাষার চর্চ্চা করা উচিত, তবে তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, বিদেশীয় ভাষাতেই ভাব ব্যক্ত করা যায়, স্বদেশীয় ভাষাতে ভাব ব্যক্ত করা যায় না, সুতরাং তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, ভাষা দ্বারা ভাব ব্যক্ত করা সকল জাতীয় ধর্ম্ম নহে, উহা একটি বিশেষ জাতীয় ধর্ম্ম। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আপনার ভাষা অবহেলা করিয়া পরের ভাষা অনুশীলন করিলে, সার্ব্বভৌমিক ভাবের একটা ভান-মাত্রই করা হয়, একটা আড়ম্বর মাত্রই করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক সার্ব্বভৌমিক ভাবের ঠিক যাহা বিপরীত, তাহাই করা হয়। যাঁহারা কথা-ভক্ত এবং আড়ম্বর ভক্ত তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ—"দেখ দেখি ও ব্যক্তি কেমন উদারচরিত্র, উঁহার জাতি-বিচার নাই, আপনার জাতিকেও যেমন চক্ষে দেখেন, অন্য জাতিকেও তেমনি চক্ষে দেখেন, পরের প্রতি উঁহার এমনি অলৌকিক প্রেম, এবং আপনার প্রতি উঁহার এমনি উপেক্ষা যে, আপনার ভাষা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং পরের ভাষা শিক্ষা করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহার উন্নতি সাধন পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। কি চমৎকার ধীশক্তি!" যাঁহারা কার্য্যভক্ত এবং অকৃত্রিম ভাবের ভক্ত তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ;—"উনি আপনার ভাষাই ভাল জানেন না, অন্যের ভাষা জানিতে যা'ন। তাহা হইলেও পদে থাকিত—তাহার আবার উন্নতি সাধন করিতে য'ান। কি মূর্খতা। উঁহার কার্য্যের সম্বলমাত্র অনুকরণ, এবং কথার সম্বল মাত্র অনুবাদ, কার্য্যে বানরত্ব, কথায় শুক-পক্ষিত্ব, এই উঁহার ধীশক্তি!" যদি বল যে, আপনার ভাষাকে অবহেলা করিতে বলি না, বিদেশীয় ভাষা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া আপনার ভাষার পুষ্টিসাধন করা অতীব আবশ্যক, আমি তাহাই করিতে বলি; তবে তাহার প্রতি বক্তব্য, এই যে, অগ্রে যদি তুমি স্বদেশীয় ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী

হও, তবেই বিদেশীয় ভাষা দ্বারা তাহার পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে; অগ্রে পাকস্থলীতে বলাধান হইলে তবেই গুরুপাক সামগ্রী জীর্ণ করিতে পারিবে। পরন্তু তুমি যদি তোমার চিরাভ্যস্ত লঘু অন্নই জীর্ণ করিতে না পার, তবে তুমি তোমার অনভ্যস্ত গুরু অন্ন কিরূপে জীর্ণ করিবে? আপন রুচির ব্যাঘাত করিয়া অন্যের রুচি অনুসারে আহার করিলে যেমন রোগে পড়িতে হয়; সেইরূপ স্বদেশীয় রুচির ব্যাঘাত করিয়া, ভিন্ন দেশীয় রুচি অনুসারে ভাষা ব্যবহার করিলে ভাষার নিতান্তই অনিষ্ট সাধন করা হয়। ইহার একটি উদাহরণ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমা সম্ভবের একস্থানে আছে।

'যথা পক্ষরাজ বাজ (নির্দয় কিরাত অভিমানে লুটিলে কুলায়ে
তার) শোক অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া" ইত্যাদি।
বাজ পক্ষীকে পক্ষরাজ বলা এ দেশীয় রুচিসঙ্গত নহে।

এস্থলে ইগল্ পক্ষী মনে করিয়া বাজ পক্ষী বলা হইয়াছে। এরূপ করিলে স্বজাতীয় ভাষার উন্নতিসাধন দূরে থাকুক, তাহার বিলক্ষণ অপকর্ষ সাধন করা হয়। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব এবং স্বাধীন ভাব এখনো বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা অনুকরণ এবং অনুবাদপরায়ণ হইয়া "স্বর্গরাজ্য" প্রভৃতি ঈহুদীয় শব্দ সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, এরূপ করিলে বঙ্গ ভাষার নিতান্তই অগৌরব করা হয়।

উন্নতিশীলতা এই আর একটি কথা বালকদিগের মন আকর্ষণ করে। বালকেরা কোথায় উন্নত ভাব শিক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া কেবল উন্নতিশীলতাই শিক্ষা করিতেছে। উন্নতিশীলতার আভিধানিক অর্থ যাহা হউক্ না কেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অর্থ ঔদ্ধত্য এবং জ্যাঠামি। প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে, এবং কিরূপেই বা উন্নতি সাধিত হয়, ইহা যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা যায়, তবে অনেক বিষয়—যাহা এক্ষণে উন্নতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া গৃহীত হয়—তাহা অধোগতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, তাহাতে লোকের বিরাগ জন্মিয়াছে;—বাঙ্গালি-সমাজের এইরূপ একটি বিকারের দশা উপস্থিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা উন্নতিও বোঝেন না, শ্রেয়ও বোঝেন না, আড়ম্বরই বুঝেন; উন্নতিসাধনের অর্থই এক্ষণে আড়ম্বরসাধন। ভাষার উন্নতি সাধন কি? না শব্দাড়ম্বর। মনুষ্যের উন্নতি সাধন কি? না বাহ্যাড়ম্বর। যাহাতে পদার্থ আছে তাহাই এক্ষণে অপদার্থ, যাহাতে চাকচিক্য আছে, যাহাতে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাই এক্ষণে সেরা পদার্থ।

যাঁহাদের বাস্তবিক উন্নত ভাব আছে, তাঁহারা কৃত্রিম ভাবে কোন কার্য্য করেন না, তাঁহাদের যেটি মুখ্য মনের ভাব সেইটাই তাঁহারা কার্য্যে প্রকাশ করেন। এমন একটি কোন মহদ্ভাব যাহাতে তাঁহাদের নিজের মন অভিভূত হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা আপনার অভ্যন্তরে পরিস্ফুট করেন, তাহাই তাঁহারা অন্যের নিকটে প্রচার করেন। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন সকল মহৎব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা গৌণরূপে পূর্ব্বপুরুষদিগের মহদ্ভাব এবং মুখ্যরূপে সত্যের বা ধর্ম্মের বা ন্যায়ের বা মঙ্গলের মহদ্ভাব প্রচার করিয়া জাতিবিশেষ বা সমাজবিশেষকে উন্নতি-সোপানের এক ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দেন। আবার এমনও সকল ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহাদের মনে তাদৃশ মহদ্ভাব নাই, অথচ মহদ্ব্যক্তিশ্রেণীতে গণ্য হইবার জন্য নিতান্তই অভিলাষ। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এ প্রকার কৃত্রিমতা অপর ব্যক্তিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ

করুক, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের চক্ষে অবশ্যই ধরা পড়ে। কিন্তু এ কৃত্রিমতা অপর-সাধারণের মনোহরণ করিতে পারে না, ইহা বিদ্বান ব্যক্তিদিগেরই মনশ্চক্ষুতে ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপ করে। এরূপ যে করে তাহার কারণ এই;—বিদ্বান ব্যক্তিরা পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া থাকেন, এবং যেখানে যাহা কিছু ঘটনা হয় তাহা পুরাবৃত্তের সঙ্গে ঐক্য করিয়া দেখেন, এবং পুরাবৃত্ত অনুসারে সকল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন। অমুক দেশের অমুক প্রকারে উন্নতি সাধন হইয়াছিল, অতএব এ দেশেও সেই প্রকারে উন্নতি সাধন হইবে; অমুক সময়ে এই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অতএব এ সময়েও সেই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইবে, এই তাঁহাদের যুক্তি। মহত্ত্বাব ব্যতিরেকেও যাঁহারা মহৎব্যক্তি হইতে চাহেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, পুরাবৃত্তের অমুক মহৎ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করিত, কিরূপ কথাবার্ত্তা কহিত, তাঁহার আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, যেমনটি দেখেন সেই প্রণালী অনুসারে চলিতে অভ্যাস করেন। পুরাবৃত্তজ্ঞ কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মহৎ ব্যক্তিবিশেষের আদর্শের সহিত তাঁহার কার্য্যের অবিকল ঐক্য দেখিয়া, মহৎ ব্যক্তিবিশেষের কথার সহিত তাঁহার কথার অবিকল ঐক্য দেখিয়া, মনে করেন যে, ইনি একজন তেমনিই মহদ্ব্যক্তি। এই প্রকার কৃত্রিমতা কৃতবিদ্য ব্যক্তির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করুক, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকটে অতি সহজে ধরা পড়ে। যদি বল "কিসে ধরা পড়ে?" এইরূপে;—মহদ্ব্যক্তি মাত্রেই অকৃত্রিম ভাবে কার্য্য করেন; সকল ব্যক্তিই সকল বিষয়ে মহৎ নহেন; যিনি যে বিষয়ে মহৎ, তিনি সেই বিষয়ে অকৃত্রিম ভাবে চলেন। বাল্মীকি কবিতাতে মহৎ ছিলেন; নেপোলিয়ান যুদ্ধ কৌশলে মহৎ ছিলেন ; নিউটন বিজ্ঞানে মহৎ ছিলেন; যে-যে বিষয়ে যিনি মহৎ, সেই সেই বিষয়ে তিনি অকৃত্রিম ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ অন্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হ'ন নাই, আপনার মনের ভাবানুসারে চলিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, যাঁহারা আপনার মনের ভাবানুসারে চলেন তাঁহারাই মহদ্ব্যক্তি; বালকেরা আপনাদের মনের ভাবানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, উন্মত্ত ব্যক্তিরাও তাহাই করিয়া থাকে। কোন একটি মহদ্ভাবে যাঁহাদের মন অভিভূত হইয়া যায়, তাঁহারা যখন আপন ভাবানুসারে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যই তাহাদের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। বাল্মীকিও কবিতাতে মহৎ ছিলেন, কালিদাসও কবিতাতে মহৎ ছিলেন। বাল্মীকিও রামায়ণ লিখিয়াছেন, কালিদাসও রামের ইতিহাস লিখিয়াছেন। অথচ, কালিদাসের কবিতাকে বাল্মীকির কবিতার অনুকরণ বলা যাইতে পারে না। বাল্মীকি আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন। কালিদাসও আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা কৃত্রিম মহদ্ব্যক্তি, তাঁহারা অনুকরণ এবং অনুবাদ ব্যতীত এক পদও চলিতে সাহসী হন না। এই জন্য এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিলেই তাঁহাদের মনের ভাব গতি বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের দেশের উন্নতির প্রধানতম সোপান। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা প্রবেশ না করে, এ বিষয়ে আমাদের অতীব সাবধান হওয়া উচিত। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এক্ষণকার রাজধর্ম্ম; সাবধান আমরা যেন তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত না হই। অনেকের বিশ্বাস আছে, খ্রীষ্ট এক জন অতীব মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মস্ত একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন ইহা স্বীকার করি; কিন্তু খ্রীষ্ট যদি মূসার অনুকরণ করিতেন; তবে কি তিনি মহৎ ব্যক্তি হইতেন? নানক একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যদি খ্রীষ্ট বা মহম্মদের অনুকরণ করিতেন, তবে কি তিনি মহৎ ব্যক্তি হইতেন? অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, অকৃত্রিম মহত্ব ব্যতিরেকে মনুষ্যের উন্নতি সাধন

হইতে পারে না। আপনি না অকৃত্রিম হইলে অন্যকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করা যায় না। যে ব্যক্তি লাভালাভ গণনা করিয়া, পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া, চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া ভাবোন্মত্ত হন, তাঁহার সে উন্মত্ততা নাটকাভিনয় মাত্র—তাহা সঙ্ সাজন। অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতিরেকে কিছুতেই আমাদের দেশের উন্নতি হইবে না, ইহা আমাদের বিশ্বাস। এজন্য উন্নতির কথা উত্থাপন হইলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি কিসে হয়, ইহাই অগ্রে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য।

এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উচিত মীমাংসা করিতে হইলে, মুখ্য গৌণ বিবেচনা নিতান্তই আবশ্যক। মনুষ্যের উন্নতি দুইটির উপরে নির্ভর করে; সে-দুইটি কি? না দেব-প্রসাদ এবং আত্ম-প্রভাব।

কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা জগতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের কথার ভাবে ইহাই প্রতীতি হয়, দেব-প্রসাদই মুখ্য, আত্ম-প্রভাব গৌণ। নিউটনের প্রসিদ্ধ খেদোক্তি ("আমি কেবল সমুদ্রের ধারে কতকগুলি লোষ্ট্র কুড়াইতেছি") কাহারো অবিদিত নাই। "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" এরূপ আত্মলাঘব এবং দেব-মহিমা কীর্ত্তন আমাদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। এমন কি খ্রীষ্টও বলিয়াছেন যে "আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল পরমেশ্বর।" যাঁহারা কোন একটা মহদ্ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই ভাবেরই প্রাধান্য মুখ্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, আপনার প্রাধান্য গৌণরূপেই অনুভব করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যেমন কোনো রাজার অনুচর রাজারই গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, সেইরূপ অপৌরুষেয় ভাববিশেষের গৌরবেই মহদ্ব্যক্তি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন; মুখ্যরূপে আপনার গৌরব কিছুই দেখিতে পান না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক বঙ্গীয় যুবকেরা ব্যক্তি-মাহাত্ম্য যেমন বোঝেন, ভাব-মাহাত্ম্য তেমন বোঝেন না। ইহাতে সমাজের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

ভাব-মাহাত্ম্যের প্রতি উপেক্ষা এবং ব্যক্তি-মাহাত্ম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে আমাদের দেশে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। মহত্ত্ব উপার্জ্জন করিতে হইবে, শিক্ষা করিতে হইবে—মহদ্ভাবে কার্য্য করিতে হইবে—ইহা এক্ষণে আর নাই, এক্ষণে কেবল মহদ্ব্যক্তি হইতে পারিলেই হইল। এক্ষণে মহদ্ভাবের কার্য্য নাই—মহদ্ভাবের শিক্ষা নাই—অথচ মহদ্ব্যক্তি না হইলেই নয়! এমন কি, অতীব নীচ আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিব, নীচ পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিব, যাহাতে পুরুষানুক্রমে নীচত্ব প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টায় দিবারাত্র নিযুক্ত থাকিব—অথচ মহদ্ব্যক্তি হইব! এইরূপ যাহা কোন প্রকারেই হইবার নহে—এই যাহা দেবতাদেরও অসাধ্য—সেই মৃগতৃষ্ণিকার প্রত্যাশায় সকল প্রকার বাস্তবিক মহত্ত্বে জলাঞ্জলি দিলে তবেই "আমি একজন মহদ্ব্যক্তি" উপাধিটি বৃথায়াস-পরায়ণ দুরাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির ললাটদেশে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এক্ষণে যেমন উকিল চিকিৎসক এবং সংবাদপত্র দিন দিন সুলভ হইতেছে, সেইরূপ মহদ্ব্যক্তিও সুলভ হইতেছে! কিন্তু এটাও দেখিতেছি যে, উকিলের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য বিবাদ-কলহের বৃদ্ধি হইতেছে, চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির বৃদ্ধি হইতেছে, সংবাদপত্রের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাক্যাড়ম্বর বৃদ্ধি হইতেছে, মহদ্ব্যক্তির সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ আচার-ব্যবহার বৃদ্ধি হইতেছে। এরূপ বৃদ্ধি-পরম্পরাকে শ্রীবৃদ্ধি উপাধি না দিলে আজিকার কালের রীতি-বহির্ভূত আচরণ করা হয়! অদ্যকার কালে উপাধিই সার—আর সকলই অসার! সুতরাং উপাধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন

করিলে আধুনিক "সুসভ্য আচার-ব্যবহার" হেলন করা হয়। কেবল যে কার্য্য আড়ম্বর-শূন্য, তাহাই "ঊনবিংশতি শতাব্দীয়" উপাধি লাভে বঞ্চিত হয়। বালকদিগকে রাজা উপাধি দিয়া নৃত্য করাইলে, তাহারা যেমন ক্রন্দনে ক্ষান্ত হয়, ও বাস্তবিক আপনাদিগকে রাজা মনে করে, সেইরূপ আধুনিক মহদ্ব্যক্তিগণ কেবল উপাধিটি পাইলেই আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে আবার উপাধি লাভের এমনি সুবিধা হইয়াছে যে, যত তুমি দেশীয় রুচির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, যত তুমি দেশের বাস্তবিক উন্নতির প্রতি খড়্গ-হস্ত হইবে, ততই তোমার মস্তকে উচ্চ প্রদেশ হইতে উপাধি-পুষ্প বর্ষিত হইবে। সেদিনকার সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজি নাটকের একটি কিম্ভূতকিমাকার অনুবাদ আমাদের দেশীয় সাধু রুচিকে একেবারে নিঃশেষে দলিত করিয়া পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কোথা হইতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে? যেখানে বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও বিদিত নাই সেই প্রদেশ হইতে। দেশীয় রুচি-বহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করিলে যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, সেইরূপ আবার দেশীয় রীতি-বহির্ভূত আচরণ করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। আমাদের দেশীয় রীতি এই যে, যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহারা আড়ম্বর-শূন্য, বিচক্ষণ, অচঞ্চল-স্বভাব, জ্ঞান-পরায়ণ, নম্র, ভক্তিমান, ঋজু, সত্য-পরায়ণ, অকৃত্রিম হইবেন। কিন্তু এক্ষণে এ সকল সদ্‌গুণ অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে—আড়ম্বরশূন্য? তবে ত নিষ্কর্ম্মা। বিচক্ষণ? তবে ত কুটিল-বুদ্ধি। অচঞ্চল-স্বভাব? তবে ত স্থাবর। জ্ঞান-পরায়ণ? তবে ত শুষ্ক তার্কিক। নম্র?—তবে ত কাপুরুষ। ভক্তিমান্? তবে ত ভ্রান্ত। ঋজু? তবে ত কাজের বাহির। সত্য-পরায়ণ? সন্দেহ-স্থল। সত্য যে একটা আছে এ বিষয় এক্ষণকার লোকের মনে বাস্তবিক সন্দেহ জন্মিয়াছে। মুখে সত্যের জয়-ঘোষণা করিতে হইবে, কিন্তু মিথ্যা দ্বারা কাজ আদায় করিতে হইবে, ইহাই এক্ষণকার আন্তরিক কথা। সত্যের যে বাস্তবিক বল আছে ইহা মুখে বলেন সকলেই, বিশ্বাস করেন অতি অল্প লোক। এক্ষণে আড়ম্বর-কারিতা, হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্যতা, প্রতিধ্বনি-পটুতা, পাকচক্রিতা, জ্ঞানদ্বেষিতা, প্রগল্‌ভতা উপাধি-লুব্ধতা, এই সকল গুণের আধার না হইলে, লোকে মহৎ নামের যোগ্য হইতে পারে না। এই জন্য ঐ সকল গুণ ক্রমশই সাধারণের আদর-ভাজন হইতেছে। দেশের লোকের এই যে সকল অনিষ্ট, ইহার মূল কেবল ব্যক্তি গৌরব এবং ভাবলাঘব। যাঁহাদের লঘু ভাব, তাঁহারা গুরু ব্যক্তি হইতে চান, এবং এক্ষণকার সমাজের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাঁহারা মনে করিলেই গুরু ব্যক্তি হইতে পারেন। উপর-ওয়ালাদের নিকটে কোনো প্রকারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেই কল্য যে ব্যক্তি কিছুই ছিল না, অদ্য সে ব্যক্তি একজন মহাপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠে! এই সকল প্রতাপান্বিত ব্যক্তির কার্য্য এই যে, আমাদের সমাজের ভাবগতি বিষয়ে যাঁহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকটে কিসে একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কারক বলিয়া বিখ্যাত হইবেন ইহারি কেবল চেষ্টা; তাহাতে যে বাস্তবিক সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে, এবং তাহার ফল যে তাঁহাদিগকেই অধিক পরিমাণে ভুগিতে হইবে, ইহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। শক্তিগর্ব্বিত উচ্চ প্রদেশ হইতে বৃহৎ একটি ফল-লাভের প্রত্যাশায় প্রথমে তাঁহারা সমাজের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হন, অথচ এইরূপ ভান করেন যেন তাঁহারা নিতান্তই ফল-কামনা-শূন্য—সত্যই যেন তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন। ইঁহারা যে-শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা কাটিতেছেন। ইঁহাদের ভরসা একমাত্র এই যে, অধিষ্ঠান শাখা যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবে অমনি উচ্চ প্রদেশীয় একটি শাখা পাকড়িয়া ধরিবেন। ইঁহাদের জানা উচিত যে, আপনার বাসগৃহ

ভাঙিয়া অন্যের বাসগৃহে যে ব্যক্তি স্থান যাচ্ঞা করে, উভয়েই তুল্য নির্ব্বোধ। অন্যেরা তোমাকে তাহাদের গৃহে স্থান দিবে কেন? এবং তুমিই বা এমন অন্যায় প্রার্থনা করিবে কেন? ইহা না বুঝিয়া, এখনকার নব্য অনুকারক-সম্প্রদায় নিজের অনেকগুলি দোষ রাজ-পুরুষদিগের স্কন্ধে আরোপ করিয়া থাকেন। ইহাদের যুক্তি এইরূপ—'আমরা তোমাদেরই অনুকরণ করিতেছি, তোমাদেরই পরিচ্ছদ পরিতেছি, তোমাদেরই ভাষা ব্যবহার করিতেছি, যেরূপ বলাও সেইরূপ বলি, যেরূপে চলাও সেইরূপ চলি, অথচ তোমারা আমাদিগকে আদর কর না, ইহাতে বোধ হয় যে, তোমরা আমাদের দেশীয় লোকের ভাল দেখিতে পার না।" এক ত—অন্তঃসার শূন্য পরানুকারী ব্যক্তিগণকে ক্রোড়ে করিয়া নাচিতে হইবে—ইহা কোনো শাস্ত্রেই লেখে না, তাহাতে আবার যাচিয়া মান ভিক্ষা করা এবং কাঁদিয়া সোহাগ ভিক্ষা করা যে, কিরূপ হাস্যাস্পদ ব্যাপার তাহা বলতব্য কহতব্য নহে; এমতাবস্থায় আমরা আপনারা আপনাদের ঐ প্রকার নীচ আচরণে কোথায় লজ্জিত হইব—তাহা গেল অধঃপাতে—উল্টা আরো তজ্জন্য অন্যের উপর দোষারোপ করিতে লেশমাত্রও লজ্জা বোধ করি না। জানা উচিত যে, যেমন একটা দুর্দ্দমনীয় মর্কট বানর'কে আদর না দেওয়াই সুবুদ্ধির কার্য্য এবং তাহাকে আদর দেওয়া কুবুদ্ধির কার্য্য, সেইরূপ ধামা-ধরা ব্যক্তিদিগকে প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত কার্য্য , তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত কার্য্য। "সুসভ্য আচার-ব্যবহার" এই একটি কথা অনুকারক-সম্প্রদায়ের স্পর্শমণি স্বরূপ। শত শতকুৎসিত আচরণ কর—দেশের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ কর—স্ত্রীগণকে নির্লজ্জতা শিক্ষা দেও, বালকদিগকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেও, পূর্ব্ব পুরুষদিগের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ দূরে প্রক্ষেপ করিয়া—নানা প্রকার কিম্ভূত কিমাকার উপাধির ভারে নত-মস্তক হইয়া—শক্তের ভক্ত এবং দুর্ব্বলের যম হও, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু "সুসভ্য আচার-ব্যবহার" এই বীজমন্ত্রটিকে উচ্চারণ করিতে ছাড়িও না। ঐ শব্দটি ধ্বনিত হইলেই অতি যে হেয় সামগ্রী তাহা উপাদেয় হইবে—অতি যে নিন্দনীয় বিষয় তাহা প্রশংসনীয় হইবে—অতি যে মর্ম্মভেদী নিদারুণ নিষ্ঠুর আচার তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত হইবে—অতি যে দুর্ব্বিনীত ব্যবহার তাহা যৎপরোনাস্তি ভদ্র হইবে।

সভ্যতার কথা-উত্থাপন হইলেই বসন-ভূষণের পরিপাটী প্রভৃতিকে অনেকে মুখ্য পদে বরণ করিয়া থাকেন ; সভ্যতার বহিরঙ্গকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন, তদ্ভিন্ন সদ্ভাব সদাচার বিনয় নম্রতা ভ্রাতৃভাব কৃতজ্ঞতা দেশহিতৈষিতা আতিথি-জনের প্রতি যথাযোগ্য সমাদর, কর্ত্তব্য কার্য্যে যত্ন, ঔদার্য্য ক্ষমা আর্জ্জব তিতিক্ষা সন্তোষ, উচিত অথচ প্রিয় ভাষণ, ভাবগ্রাহিতা ইত্যাদি সভ্যতার যেগুলি মুখ্য অঙ্গ, এ সকলের প্রতি আদর অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ইংরাজি সভ্যতাই সভ্যতা, এই এক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকেরা স্বজাতীয় উচ্চতর সভ্যতার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন। 'ইংরাজি সভ্যতাই সভ্যতা" পূর্ব্বে এই মাত্র শুনা যাইত ; এখন আমাদের দেশের সভ্যতার এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে যে, "ইংরাজি গৃহই গৃহ, বাঙ্গালিদের গৃহ নাই" এই এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নূতন কথার আন্দোলন কোথাও কোথাও শুনা যাইতেছে! বাঙ্গালিদের গৃহ নাই" ইহার অর্থ এই যে প্রকৃত গার্হস্থ্য ভাব যে কি তাহা বাঙ্গালিরা জানে না। কি হাস্য-জনক কথা! —অথচ ঐ কথা, ধীর গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত হইয়া থাকে, ধীর গম্ভীর ভাবে শ্রুত হইয়া থাকে, কেহ তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, সকলেই সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ বর্ষণ পূর্ব্বক ঐ অসার অপদার্থ বচনটাকে স্বর্গে

তোলেন। যে হিন্দুরা পিতা-মাতাকে গৃহদেবতা বলে, স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বলে, বালক-শূন্য গৃহকে শ্মশান সমান বলে, যে হিন্দুরা ভদ্রাসন বাটী হস্তান্তর করিতে হইলে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে, যে হিন্দুরা গৃহকে আশ্রম বিশেষ বলিয়া ভক্তি করে, সেই হিন্দুরা গার্হস্থ্য-রসে বঞ্চিত! কী সে, না জানি, অপূর্ব্ব সভ্যতা যাহার সংস্পর্শে গৃহ অগৃহ হয়, পিতা অপিতা হয়, ভ্রাতা অভ্রাতা হয়!—এরূপ হৃদয়-শূন্য জীবন-শূন্য কাষ্ঠ-সভ্যতা যাহাদের প্রয়োজন, তাঁহারা হিম-প্রধান দেশের তুষাররাশির মধ্যে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের সভ্যতানুরাগ চরিতার্থ করুন। আমাদের এই ভারতবর্ষে, এই প্রাচীন পুণ্যভূমিতে, সেই সভ্যতাই জন্ম-জন্ম বিরাজ করুক, যে সভ্যতা জননী এবং জন্মভূমিকে স্বর্গ হইতেও গরীয়সী বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করে।

"অপরের গৃহ আছে আমাদের গৃহ নাই", এ বাক্য যে ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ করিতে পারে, সে ব্যক্তি কী না করিতে পারে? আপনার গৃহের প্রতি অভক্তি হয় কাহার? মাতা পিতার প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, ভ্রাতা-ভগিনীর প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, যাহার অন্তঃকরণ দ্বেষ-হিংসাদি কালসর্পের আবাসস্থান, প্রীতি-ভক্তির যেখানে নাম-গন্ধ নাই, এমনি মরুভূমি-তুল্য যাহার হৃদয়, তাঁহাদেরই মতো কাষ্ঠপাষাণে গড়া ব্যক্তিদিগেরই তাহা অঙ্গের ভূষণ। গৃহ-কুটীর হইলেও কী তাহা রাজ-অট্টালিকা নহে? গৃহের ন্যায় পবিত্র সামগ্রীকে যাঁহারা অপরের সহিত তুলনা করিতে যান তাঁহাদের রুচিকে ধন্য! অন্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে গৃহের প্রতি যাঁহাদের অভক্তি জন্মে, তাহাদের হৃদয়কে ধন্য!! এবং আপনার গৃহের কি ভাল কি মন্দ ইহা যাঁহারা পরের নিকটে শিক্ষা করিতে যান তাঁহাদের বুদ্ধিকে ধন্য *!!!

হৃদয়ের যে সভ্যতা তাহাই মুখ্য সভ্যতা—আর আর যত প্রকার সভ্যতা সবই গৌণ

* কোনো একটি আমেরিকান্ মিসনরি-স্কুলের বালকের সহিত অমুক সাহেবের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। বালক আপনিই লেখকের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিয়াছে।

সাহেব। তোমাদের স্ত্রীলোকেরা বড় নিষ্কর্ম্মা—আমাদের স্ত্রীলোকেরা দেখ দেখি কেমন কর্ম্মিষ্ঠ।

বালক। আমাদের স্ত্রীলোকেরা ত সর্ব্বদাই কাজ করে—রন্ধন করে, অতিথি-সেবা করে, গৃহকার্য্য সমস্তই ত তাহারা করে।

সাহেব। ও সকল কাজ আমরা কাজের মধ্যে ধরি না। আমাদের স্ত্রীলোকেরা নেবু হইতে রস বাহির করিয়া ফেলিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশে লবণ সংযোগ করিয়া একরূপ আচার প্রস্তুত করে—তাহা তোমাদের স্ত্রীলোকেরা পারে?

বালক। না তাহা পারে না।

সাহেব। তোমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি তাহা শিখিতে ইচ্ছা করে, তবে আমি তাহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি।

সাহেবের এই কথা শুনিয়া বালকের মনে অবশ্য ইহা প্রত্যক্ষমান হইল যে, বাস্তবিক অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা বড়ই নিষ্কর্মা! না যেহেতু তাহারা উক্তরূপ আচার প্রস্তুত করিতে জানে না! কি চমৎকার যুক্তি! দেশীয় প্রথানুসারে যে যত কার্য্য করুক, তাহা কার্য্যই নহে। রাশি রাশি উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করুক, সাহেবের তাহা মনে ধরে না। সাহেবের রুচি অনুসারে রসোদ্গত নেবুর আচার প্রস্তুত করিলেই আমাদের স্ত্রীলোকেরা ধন্য ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ হইবে। বাল্যকাল হইতে এই সকল শিক্ষা-লাভ হইতে থাকিলে বঙ্গদেশ অচিরেই এক অপূর্ব্ব "স্বর্গরাজ্যে" পরিণত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। নিতান্ত বালকের মনে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা শোভা পায়, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা পরের মনোরঞ্জনার্থে বা পরের বুদ্ধি শুনিয়া আপনার গৃহের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করেন, ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়।

সভ্যতা। গৃহ ইংরাজী-রীতি অনুসারে সজ্জিত না হইলে কি তাহা গৃহ হয় না? হিন্দু জাতির রীতিনীতি আচার-ব্যবহারে যেমন একটি অকৃত্রিম সহজ-শোভন ভাব প্রকাশ পায়, তেমন আর কোথায়? মুখ্য সভ্যতা তাহাকেই বলে যাহা হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, তদ্ভিন্ন আর যত প্রকার সভ্যতা সমস্তই বাজে সভ্যতা। দেশীয় প্রথানুসারে নমস্কার বা প্রণাম করাতে যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করা হয়, ইংরাজি প্রথানুসরে শুদ্ধ কেবল মস্তক নত করিলে তাহার অর্দ্ধাংশও না। দেশীয় প্রথানুসারে সাদরে আহ্বান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাতে যেমন প্রীতি এবং সদ্ভাব প্রকাশ হয়, ইংরাজি প্রথানুসারে চটুলভাবে হস্তালোড়ন করিয়া হাউ-ডু-ইয়ু-ডু বলিলে তেমন কখনই হয় না। ইংরাজেরা বলেন যে "থ্যাঙ্ক্", এই শব্দ যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশক, আমাদের দেশে সেরূপ কোনশব্দ প্রচলিত নাই; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের জাতি বড়ই অকৃতজ্ঞ জাতি। "থ্যাঙ্ক" শব্দের মূল-ধাতু "থিঙ্ক্" শব্দ; "থ্যাঙ্ক্" শব্দের অর্থ এই তুমি আমার মনে রহিলে, অথবা তুমি আমার যে উপকার করিলে তাহা আমার মনে রহিল। "কৃতজ্ঞ" এ শব্দেরও অর্থ ঐরূপ। আমাদের দেশে উপকৃত ব্যক্তি কোন স্থলে নমস্কার করে, কোন স্থলে জয়ী হও, সুখে থাক, চিরজীবী হও, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন, এইরূপ শব্দ সকল ব্যবহার করে। মৌখিক একটা কথা ঝটিতি উচ্চারণ করিয়া, দ্রুতগতি ঋণমুক্ত হইবার প্রথা আমাদের দেশে নাই বলিয়াই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের জাতি মৌখিক কৃতজ্ঞ নহে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। দ্রুতগতি দুই একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পরকে মৌখিকরূপে আপ্যায়িত করাকে যদি সভ্যতা বল, তবেই যাহা হউক, নচেৎ আমাদের দেশের সভ্যতা উৎকৃষ্টতর তাহাতে আর সংশয় নাই। যন্ত্রাদি বিষয়ে ইংরাজদিগের অশেষ পারদর্শিতা আছে, ইহা মানিলাম, কিন্তু আমাদের দেশের সহজশোভন পরিধান-বস্ত্রের তুলনায় পাশ্চাত্য প্রদেশের পরিধান বস্ত্র যে, এক প্রকার কাষ্ঠ পুত্তলিকার গায়ের সাজ, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। আমাদের দেশের সভ্যতা হৃদয়-প্রধান, ইংরাজদিগের সভ্যতা কারিকুরী প্রধান। উহার মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য কোন্‌টি গৌণ, সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহা স্পষ্ট দেখিতে পান, পরন্তু কাষ্ঠ-পাষাণদিগকে তাহা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইলেও তাহারা তাহা দেখিতে পায়ও না – দেখিতে পাইবেও না।

# কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক *

যে দুই শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করিতেছি সে দুয়ের মধ্যে যেমন ভাব-বৈষম্য, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। একজন সত্য বা মঙ্গলের অনুশীলনে আপনাকে ভুলিয়া যান, ইনি বাস্তবিক ভাবের লোক; আর একজন সত্যের আন্দোলন করিয়া থাকেন মঙ্গলেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনাকে ভোলেন না;—ইনি কাল্পনিক ভাব লোক। আপনাকে ভোলা না ভোলা কাহাকে বলে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়;—তবে তার্কিক ব্যক্তিগণ তাহা না বুঝিতে পারেন, সুতরাং ইঁহাদের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার আবশ্যক। "আপনাকে ভোলা" ইহার অর্থ এই যে, সত্য মঙ্গল প্রভৃতি মহদ্ভাব-সকল সমুদায় জগতের সাধারণ সম্পত্তি—একটি বালুকাকণাতেও সত্য আছে, মঙ্গল আছে। তাহা যখন সমুদয় জগতের সাধারণ সম্পত্তি—তখন তাহা আমাদের আপনা আপনা অপেক্ষা ব্যাপক ইহা তো ধরা কথা। অর্থাৎ আমরা প্রতি-জনই সত্য এবং মঙ্গলের অন্তর্গত, সত্য এবং মঙ্গল আমাদের অন্তর্গত নহে শাখা বৃক্ষের অন্তর্গত বই বৃক্ষ শাখার অন্তর্গত নহে। সত্যের অভ্যন্তরে যখন আমরা প্রতি জনে বাস করিতেছি তখন সত্যকে পাইয়া আপনা ভুলিতে কোন হানি নাই। একটা কৌটার ভিতর নানাবিধ রত্ন রহিয়াছে পুঁজি করা, এমতাবস্থায় সেই কৌটাটি পাইয়া কি কি রত্ন তাহার মধ্যে আছে তাহা ভুলিলামই বা তাহাতে হানি কি? কিন্তু তাহাতে যদি তাহার মধ্যকার কোন একটি বিশেষ রত্নের প্রতি আমাদের এত লোভ হয় যে সেইটির কুহকে পড়িয়া অন্যগুলিকে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেই ক্ষতির সম্ভাবনা। আমরা প্রতি জনই যখন সত্যের অন্তর্গত তখন সত্যকে পাইলে আপনাকেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়, এজন্য শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সত্যের অনুশীলন করিতে আপনার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করেন না, তিনি জানিতেছেন আমি সত্যের অভ্যন্তরে বাস করিতেছি—সত্যকে পাইলে আমি সত্যের মধ্যে আপনাকে না পাইব এমন নয়--আমি আপনাকে শূন্যে বিসর্জ্জন দিতেছি না—তবে আর চিন্তা কি? আপনার বিষয়ে যিনি এইরূপ নিশ্চিন্ত, তিনি সর্ব্বান্তকরণে সত্যের অনুশীলন করেন, মঙ্গলের অনুষ্ঠন করেন—সত্য এবং মঙ্গলের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন, ইহাকেই বলে সত্যের অনুশীলন এবং মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আপনাকে ভোলা। কাল্পনিক ভাবের ব্যক্তিরা সত্যেরই অনুশীলন করুন আর মঙ্গলেরই অনুষ্ঠান করুন, তাঁহাদের কার্য্যগুলির মধ্যে বিষবীজ একটি যে মাটি-চাপা থাকে তাহাই সর্ব্বনাশের মূল। আপাতত তাহা এমনি সূক্ষ্ম যে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না—নাই বলিলেই হয়; কিন্তু কালে তাহা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া উঠে; সে বিষবীজটা কী? না স্বার্থ।

কাল্পনিক ব্যক্তিরা লক্ষণে ধরা পড়েন। প্রথম লক্ষণ—তাঁহাদের কথাগুলি এমনি ধরণের যে তদ্দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের পরিচয় যত পাও আর না পাও, গুণের পরিচয় বিলক্ষণই

* ১২৮৪ সালের ভারতীর ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত।

পাইবে। যাঁহারা বাস্তবিক ভাবের লোক তাঁহারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই কার্য্যটি বুঝিয়া তাহার নামটিও সেইরূপ দিয়া থাকেন। কাল্পনিক ভাবের লোকেরা তিল প্রমাণ কার্য্যের তাল প্রমাণ নাম দিতে না পরিলে কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না।

দ্বিতীয় লক্ষণ—দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা-বর্জ্জিত অসঙ্গত অনুকরণ। সত্য এবং মঙ্গলের এমনি একটি বল আছে যে, তাহা শ্রদ্ধাবান মনুষ্যকে অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলে, ঠিক যেটি চাই সেইটির মতন করিয়া গড়িয়া তোলে। কিন্তু সত্য এবং মঙ্গল যাঁহাদের মনে নয়—মুখেই কেবল, অনুকরণ ভিন্ন তাঁহাদের আর গতি নাই। অমুক দেশে অমুক লোক অমুক কার্য্য করিয়া লোকের মহোপকার সাধন করিয়াছে, অতএব আমিও অবিকল সেইরূপ প্রথা অবলম্বন করি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; এইরূপ ভাবিয়া যদি পরের আঁচল ধরিয়া চল—তবে অনভিজ্ঞ লোকে তোমাকে দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি মনে করিবে; যদি নিরপেক্ষ সত্য এবং মঙ্গলের হস্ত ধারণ করিয়া চল তাহা হইলে লোকে তোমার মর্ম্মগ্রহ করিতেই পারিবে না, কিন্তু ইহাতে একটা কাজ হইবে, উহাতে কেবল আড়ম্বরই সার। বাস্তবিক-ভাবের লোক কী প্রণালীতে কার্য্য করেন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি;—মনে কর, তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে যে, তিনি দেশীয় চাষা লোকদিগের কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিবেন। প্রথমে চাষাদিগের কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিতেই হয়ত তাহার দুই বৎসর কাটিয়া যাইবে। চাষাদের মধ্যে ভাল মন্দ আছে ; ভাল চাষাদিগের চাষপদ্ধতি কিরূপ তাহা শিক্ষা করিতে হয়ত তাঁহার আর তিন বৎসর কাটিয়া যাইবে। তাহার পর ভাল কৃষিকার্য্য শিক্ষা যাহাতে সাধারণে প্রচলিত হয় তাহার জন্য উদ্যোগ করিতে আর দুই বৎসর যাইবে। তাহার পর তাঁহার উদ্যোগ সফল হইতে হয়ত এক বৎসর লাগিবে। এইরূপ অনেক বৎসর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি যদি আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট কৃষি-পদ্ধতি সাধারণে চালাইতে পারেন, তবে আপনার পরম সৌভাগ্য মনে করেন। তাহার পর তাহা অপেক্ষা কৃষি-কার্য্যের আরো উন্নতি সাধনের চেষ্টা তাঁহার পক্ষে শোভা পায়। তাহা তাঁহার অভিপ্রায় হইলে তিনি বিদেশীয় কৃষি-প্রণালী উত্তমরূপে শিক্ষা করেন; স্বদেশীয় কৃষি-কার্য্যের কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ এদেশের পক্ষে বিদেশীয় কৃষি-কার্য্যেরই বা কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, তাহা তিনি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করেন। এ দেশীয় কৃষিকার্য্যের যাহা ভাল তাহা তিনি নড়াইতে চান না; বিদেশীয় কৃষি-প্রণালীর ভাল অংশ এদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ না হইলে তবেই তাহা এদেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা পা'ন। তিনি জানেন, পত্তন ভূমিটি স্বদেশীয় হওয়া চাই। ব্যঞ্জন নয় বিদেশী হউক, অন্নটি স্বদেশী হওয়া চাই। তুমি সহস্র কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও আমাদের দেশীয় মূল কৃষিপ্রণালীর উপর বিদ্যা চালাইতে গিয়াছ কি অমনি ঠকিয়াছ। আমাদের দেশের প্রকৃতি স্বয়ং যাহা চাষাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহার উপর কাহারো বিদ্যা খাটে না। বাস্তবিক-ভাবের ব্যক্তি আপনার দেশীয় প্রকৃতির পত্তন-ভূমির উপর বিদেশীয় উচ্চ অঙ্গের নীতিগুলি স্থাপন করিতে চেষ্টা পা'ন, তা' ভিন্ন বিদেশীয় বেশভূষা বা কোন প্রকার বাহিরের চাকচিক্য তাঁহার একবার মনেও আইসে না—তাঁহার মন আসলের দিকে, নকলের দিকে নহে, বাস্তবিক ভাবের দিকে, কাল্পনিক ভাবের দিকে নহে।

কাল্পনিক ভাবের তৃতীয় লক্ষণ নাম-পরায়ণতা অর্থাৎ কার্য্য অপেক্ষা নামের প্রতি অধিক দৃষ্টি। তাই কাল্পনিক ভাবের লোক উপরিউক্ত ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে দেব গড়িতে

গিয়া নিশ্চয়ই বানর গড়িয়া ফেলেন। বাস্তবিক আমাদের দেশের কৃষিকার্য্য কিরূপ প্রণালীতে চলে তাহা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শিক্ষা করেন সে দিকে তাঁহার মন যাইবে না, কার্য্যার্থে বৎসর বৎসর পরিশ্রম করিতেছেন, অথচ লোকে তাঁহার কার্য্যের কিছুই দেখিতেছে না, জানিতেছে না; এ অবস্থা তাঁহার পক্ষে কঠোর কারাবাস-তুল্য। তাঁহার দুইটি জপমালা—মুখে একটি, মনে একটি, মুখের জপমালা এই, কৃষককর্ম্মদিগের কিসে ভাল হয়, মনের জপমালা এই, লোক আমাকে কিসে জানে। সুতরাং একটু রহিয়া বসিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করাকে তিনি বৃথা সময় নষ্ট মনে করেন। কেননা ততক্ষণ তিনি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া তুলিতে পারেন। কাজ কত দিনে হয়, তাহার ঠিকানা নাই—আদবেই হয় কি না, তাহাও সন্দেহ কিন্তু তাহা বলিয়া হাঁকডাক কেন থামিয়া থাকে, এইরূপ ভাবিয়া একেবারেই তিনি হয়ত বিদেশীয় কৃষি-প্রথা এদেশে প্রচলিত করণার্থে ইংলণ্ড গমনে কৃতসংকল্প হ'ন। তিনি অমুক দেশে গিয়াছেন, অমুক স্থানে বাস করিতেছেন, যখন যাহা করিতেছেন সকলি সংবাদপত্রে টাট্‌কা-টাট্‌কি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তারপর দেশে ফিরিয়া আইলেন, লোকের আশাচক্ষু তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, কবে বৈলাতিক "স্বর্গরাজ" এদেশের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিবে। তাঁহার ভাবী মহাপকারী কার্য্যকলাপ উপলক্ষ্যে সংবাদপত্রীয় নানা মুনির নানা শুভাশিবাদ বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং তাহার কার্য্যাভিসন্ধির ছিটাফোটা ইঙ্গিত আভাস সাদরে গৃহীত হইয়া ফেনিত প্রতিফেনিত হইতেছে। এইরূপ শব্দাশব্দি ও ফেনাফেনি ব্যাপার যত উচ্চে উঠিবার তাহা উঠিয়া ক্রমে ক্রমে নরম পড়িয়া আসিতে লাগিল। সংবাদপত্রের উৎসাহ আনন্দ অল্প অল্প করিয়া বিলাপে পরিণত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারা লজ্জার অনুরোধে তখন আর তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন না, নিতান্ত মৌন থাকাটাও ভাল দেখায় না, সুতরাং এখন এক যাহা বলিবার আছে তাহাই তাঁহারা বলেন ও অপেক্ষা করেন তাহা এই যে, অমন যে একজন উপযুক্ত লোক ও ব্যক্তি শুদ্ধ কেবল বাঙ্গালীদের দোষে কোন কাজই করিতে পারিল না, একজনও ওকে সাহায্য দিবে না, একা ও ব্যক্তি কি করিবে? প্রকৃত কথা এই যে, যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা আপনার কাজের গুণে লোকের নিকট হইতে সাহায্য আকর্ষণ করেন, অন্যেরা যদি তাহা না পারে সে তাহাদেরই দোষ, সে দোষ গরিব বাঙ্গালী জাতির ঘাড়ে চাপাইলে কি হইবে? শূন্যগর্ভ আড়ম্বরী ব্যক্তিকে কেহ না চেনে, এমন নয়;—কাজের লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক দিয়া বসিয়া আছে যে, এ ব্যক্তির দ্বারা কোন কাজ হইতে পারে না; ভাবের লোকেরা ভাবভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিয়াছে যে যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না; কেবল গল্পের লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারের প্রত্যাশা করেন; এমন কি ভবিষ্যতে যাহা তিনি করিবেন, বর্ত্তমানেই তাঁহা কর্ত্তৃক তাহার অর্দ্ধেকের উপর অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পা'ন।

কাল্পনিক ব্যক্তিদিগের নিকট অনুকরণই সকল রোগের মহৌষধি, সকল উন্নতির মূল, সকল অপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য। কেননা অনুকরণের পথ অবলম্বন করিলে বড় লোকের দোহাই দিয়া অনায়াসে বড় হওয়া যায়—সেক্সপিয়ারের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী নাটক লিখিলে বাঙ্গালী সেক্সপিয়ার হওয়া যায়। মিল্‌টনের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালী মহাকাব্য লিখিলে বাঙ্গালী মিল্‌টন হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার সহজ উপায় যেমন অনুকরণ এমন আর

কিছুই নহে। অনুকরণ-পন্থীদিগের স্বপক্ষে এই কেবল এক বলিবার আছে যে, সকল দেশের লোকই রক্ত-পক্ষে সমান; একথা যথার্থ কথা; কেননা সকল মনুষ্যই মনুষ্য। কিন্তু তা'বলিয়া মনুষ্যের মধ্যে বাস্তবিক যে একটা জাতিভেদ আছে, কাজের সময় তাহা ভুলিবে তুমি কেমন করিয়া? জল এবং বায়ু উভয়েই সমান, কেননা উভয়েই ভৌতিক বস্তু; কিন্তু তা'বলিয়া কি জলপানের পরিবর্ত্তে বায়ুপান করিয়া তৃষ্ণানিবারণ করিতে পারো? যে দেশের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সে দেশের কার্য যদি সুনির্ব্বাহ হইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের দেশে ওক গাছ এবং বিলাতে আম্র কাঁঠাল গাছ সুবর্দ্ধিত হইতেও পারিত। আমাদের দেশে যদি প্রকৃতির কল বিগড়াই যাওয়া গতিকে কখনও ওক গাছ জন্মে তবে সে তেমনি ওক গাছ—যেমন সেক্সপিয়রের বাঙ্গলা অনুবাদ সেক্সপিয়ার! তেমনি আবার বিলাতে যদি আম্র গাছ জন্মে তবে সে তেমনি আম্র গাছ—যেমন শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ শকুন্তলা। কাল্পনিক ভাবের লোক অন্যের চক্ষে ধূলি দিতে গিয়া আপনার চক্ষে আপনি ধূলি প্রদান করিয়া থাকেন; এই তাঁহার প্রধান শাস্তি। তিনি আপনাকে বাহিরে যেমন জানান, ক্রমে ক্রমে আপনাকে সেইরূপ ঠাহরান। পূর্ব্বে তিনি নাম চাহিতেন, কাজ চাহিতেন না; এক্ষণে তিনি নাম যথেষ্ট পাইয়াছেন—নামের অনুরূপ কাজ করিতে চাহেন। কিন্তু নামের জন্য কাজ করাই তাঁহার চিরকালের অভ্যাস, কাজের জন্য কাজ করা তাঁহার অনভ্যস্ত। যদিও তাঁহার এক্ষণে যথার্থই কাজ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না; নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হয়; কেননা এযাবৎ কাল তিনি ক্রমাগতই নাম সাধনার্থেই নানা প্রকার কাজ করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে কাজের সে উত্তেজকটি নাই, নাম যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে তাহা আর কাজকে অপেক্ষা করে না, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহার কাজ বন্ধ হইয়া এক প্রকার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে কাল্পনিকতা-পথের বিষম একটি সঙ্কট-স্থানে পৌঁছিয়াছে; সে পথে যত অগ্রসর হইবে, ততই ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাহাকে পশ্চাদ্‌গমন করিতে হইবে। তাই বলি—এ পথ হইতে যত শীঘ্র পশ্চাদ্‌গমন করা যায় ততই ভাল। বাস্তবিক ছাড়িয়া কাল্পনিক, আসল ছাড়িয়া নকল, এই দিকে এখন বাঙ্গালি জাতির এমন একটা প্রবল টান পড়িয়াছে যে তাহাকে সামলানো ভার। বাঙ্গালী জাতি দেখিয়া শিখিবার জাতি নহে, না ঠেকিলে তাহার শিক্ষা হইবে না কিছুতেই! এ একটি সামান্য বিপদ নহে। এই বিষয়টিতে বাঙ্গালী জাতির যদি একটু চৈতন্য হয়, তাহা হইলে এজাতি অনেক বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় কই? তাহা যে-দিন হইবে সেদিন বাঙ্গালীর স্কন্ধ হইতে বৃহৎ একটা বোঝা নামিয়া যাইবে—তাহার শরীর মন লঘু হইবে—প্রকৃতি-জননীর ক্রোড়ে আসিয়া স্নিগ্ধ হইয়া বাঁচিবে। তখন বুঝিবে, দেশ-কালপাত্র-বিবেচনাশূন্য অনুকরণের আর-এক নাম হনুকরণ।

# সাধনা—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

মহরমের সময় সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা যেমন রাস্তার মাঝখানে হাসেন্ হোসেন্ করিয়া বক্ষে করাঘাত করে, ঠিক সেইরূপ একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্ম্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁদুনি গায়কদিগের ধূয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিমদশা ঘনাইয়া আসিয়াছে— তিনি আর বেশী দিন টেঁকেন না! এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসিও পায়, কান্নাও হাসি পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি এতই তোমার প্রিয় বস্তু, তবে তাহার পথ অবলম্বন কর— ক্রন্দন কেন? একেলে সভ্যতা তো আর তোমার হাত পা বাঁধিয়া রাখে নাই ; কোতোয়ালের প্রতি মহারাণীর এমন কোনো শক্ত রাজাজ্ঞা নাই যে, "কাহাকেও বৈরাগ্যের পথে চলিতে দেখিয়াছ কি আর অমনি তাহার শির লইবে!" বৈরাগ্য তো আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্মূল্য হইয়াছে। বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র, আর, অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র ; বাজারের সামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু- অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে, কাল পড়িয়াছে শক্ত ; চব্বিশ ঘণ্টা সংসার-কার্য্যে চব্বিশ আনা লিপ্ত থাকিলে যদি এক আনা কাজ হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য ; দেখিতেছ না— একটা কেরাণিগিরি খালি হইয়াছে কি আর অমনি দলকে দল বি.এ. এম.-এ কাতারে কাতারে পিঁপড়ার পালের ন্যায় আপিস অঞ্চলে গতায়াত করিতে থাকে! ইহার উত্তরে আমি এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারে কোনো কর্ত্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক, সেরূপ বৈরাগ্য কর্ত্তব্য সাধনের পথ আরো পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা ; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে যেমন তাহাতে, যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে, তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে— যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। মন রাগ-দ্বেষে অধীর থাকিলে হাতের কাজ কখনই ভাল হইতে পারে না ; বৈরাগ্যের অভ্যুদয়ে মন প্রশান্ত হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যে হাত পা আপনা হইতে অগ্রসর হয়। আমরা পরে দেখাইব যে, প্রকৃত বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক ; আর, যে সেকালে যেমন পথে ঘাটে হাটে বৈরাগ্যের ছড়াছড়ি ছিল, একালে তাহার চিহ্নপর্য্যন্তও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে—যদি বল যে, ব্রাহ্মণের মাথায় টিকি নাই, জিহ্বাগ্রে সন্ধ্যার বুলি মুখস্থ নাই—বৈষ্ণবের নাশায় তিলক নাই, গলায় মালা নাই— শাক্তের ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা নাই—এ অপেক্ষা বৈরাগ্যের অভাব আর কি হইতে পারে? তবে সেটা একটা কাঁদিবার কথা বটে! বলিতে কি— সেকাল-ভক্তের এইরূপ হৃদয়ভেদী ক্রন্দন শুনিলে আমাদেরও কান্না পায় ; আমরা কাঁদি আর এক কারণে। সে কারণ এই

যে, ইউরোপের তামসিক মধ্যম অব্দে তৎপ্রদেশে friar, monk, hermit প্রভৃতি কত সম্প্রদায়ের কত যে সন্ন্যাসী তপস্বী এবং বৈরাগী কত যে অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করিয়া বাজ্যের লোকদিগকে চমকিত করিতেন, তাহার আর বক্তব্য কহতব্য নাই ; ইংলণ্ডীয় সাধুগণ আমাদের ডন্‌ষ্টন্‌ মুনি আমাদের দেশের পৌরাণিক আমলের দুর্ব্বাসা মুনি অপেক্ষা পরাক্রমে বেশী বই কম ছিলেন না! ইংরেজেরা মনে করিলে সেই সকল অদ্ভুত যোগী তপস্বীদিগের অদ্ভুত পরাক্রম স্মরণ করিয়া "হায় সেকাল হায় সেকাল" বলিয়া অশ্রুজলে টেমস্‌ নদীকে পদ্মানদী করিয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন না— তাঁহাদের দেশের সেই সকল পুরাতন কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া তাঁহাদের চক্ষে এক ফোঁটা জলের সঞ্চার হয় না, অধরে ঈষৎ হাস্যেরই উদ্রেক হয়। ইউরোপের চক্ষু জল প্রিয় নহে—তাহা আলোক-প্রিয়। ইউরোপ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া যাব দুই হাই তুলিয়া বেগে গা-ঝাড়া দিতেই সেকেলের সেইসব উৎপেতে জঞ্জালগুলো কোথায় যে কোনদিকে সটকিয়া পড়িল—আর তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া গেল না। কিন্তু হায়! আমাদের এই হতভাগা দেশের চক্ষে বিজ্ঞানের আলোক পতিত হইয়া একবার যেই তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিতেছে—পরক্ষণেই আমাদের দেশ যেমন-কে তেমনি শয্যায় অচেতন। কথাটি আর কিছু না—যেখানেই ভক্তি অতিমাত্র প্রবল এবং জ্ঞানালোক অতিমাত্র ক্ষীণ, সেইখানেই পেঁচা বাদুড় সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি তামসিক জন্তুদিগের পরাক্রম দিন দিন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। সার ওয়ালটার স্কটের আইভান্‌হো উপন্যাসে Friar Tuck একজন পেচক শ্রেণীর বৈরাগী ছিলেন—দিবালোকে তিনি কোটরের বাহিরে পদার্পণ করিতেন না। আমাদের দেশে পানিহাটি গ্রামে আজিও বটচ্ছায়াপরিবৃত অতীব একটি রমণীয় কোটর দেখিতে পাওয়া যায়—পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে তাহা কাঙ্গালদাস বাবাজির আকড়া বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ; গ্রামবৃদ্ধদিগের মুখে কাঙ্গালদাস বাবাজির কীর্ত্তি-কাহিনী যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে, পেচক-শ্রেণীর বৈরাগীদিগের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই গেল পেচক-তপস্বী ; বাদুড় তপস্বী কী? না মাথা নীচু পা উঁচু করিয়া গাছে-ঝোলা যোগী তপস্বী। সাপ ব্যাঙ তপস্বী কী? না মাটির নীচে কবর দেওয়া সিদ্ধপুরুষ। এখনকার বাজারে এই সকল যোগী-তপস্বীদিগের অনটন দেখিয়া নব্য-মণ্ডলের কথকেরা কত না ললাটে করাঘাত করেন, কত না হুতাশ করিয়া ক্রন্দন করেন! ইহাদের এই ক্রন্দন কোলাহলের মাঝখানে কে যেন আমাদের কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে বলিতেছে যে, যেখানে দেখিবে—চিড়িয়াখানার যোগী তপস্বীদিগের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়া বিজ্ঞান শিল্প এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রতি লোকের ধিক্কার জন্মিতেছে সেইখানেই জানিবে জ্ঞানের দিবাকর অস্তমিত এবং অবিদ্যার ঘোরা তামসী বিভাবরী সমাগত।

পেঁচা, বাদুড়, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি জন্তু-তপস্বীদিগকে আড়ালে সরাইয়া রাখিয়া প্রকৃত মানুষ-তপস্বী কিরূপ তাহার প্রতি একবার চক্ষুরুন্মীলন কর ;—আফ্রিকা দেশের অন্তর্বিভাগের যাহার যাহার অদ্ভুত কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠ কর—তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, সুর-বীরশ্রেণীর মনুষ্য ভোগস্পৃহাকে কতদূর তুচ্ছ করিয়া, সংকল্পসাধনের পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে। ইঁহাদের এক-একজনের এক-এক কার্য্য দেখিলে মনে হয় যে, মানুষের অসাধ্য কার্য্যই নাই। ইঁহাদের তপঃসাধনের প্রণালীই স্বতন্ত্র! সম্মুখে বিপদ বলিয়া বিপদ নহে—বিপদের পর্ব্বত-পরম্পরা উপর্য্যুপরি মাথা তুলিয়া পথ আগলিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; সমস্ত প্রদেশেই অজ্ঞান

অপরিচিত ; সকলই প্রহেলিকা—সকলই গোলোক-ধাঁধা ; উপস্থিতমতে বুদ্ধি খাটাইয়া এক পদ অগ্রসর হওয়া হইতেছে, আর চারিদিকের কোথায় কি আছে না আছে তাহার সন্ধান লওয়া হইতেছে ; সঙ্গে লোক একে তো পঞ্চাশের অধিক নহে, তাহাতে আবার তাহারা সকলেই কাফ্রী ; ব্যথার ব্যথী কেবল একজন মাত্র স্বদেশীয় ভ্রাতা—তিনি পীড়ায় মরণাপন্ন; তাঁহার সেবার ক্রটি না হয় এটা খুব সতর্কতার সহিত তড়ি-ঘড়ি দেখিতে হইতেছে ; মরুভূমির মধ্যে দুই-তিনদিন জলাভাবে এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের মধ্যে তিন-চারিদিন অন্নাভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত , মাথার উপরে প্রচণ্ড দিবাকর এবং বায়ু যেন কালের নিশ্বাসাগ্নি। তাহাতে আবার ঘটনাক্রমে ভীমরুলের চাকে ঘা দেওয়া হইয়াছে— একজন দেশীয় রাজাকে নজর দিয়া তুষ্ট করা হয় নাই ; সেই গুরুতর অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য চারিদিক সহস্রাধিক শত্রু ঘাটি মারিয়া শিকার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সকল ভয়ঙ্কর বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যস্থলে আবিষ্কর্তা একদিনের জন্যও ভগ্নোদ্যম হ'ন নাই ; ক্ষণকালের জন্যও তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন নাই— বিছানায় শুইয়া পড়েন নাই ; ক্রমাগতই তিনি সাহসে ভর করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যখন যাহা আবশ্যক তাহারই জন্য তিনি প্রস্তুত! সুবিশাল মরুভূমি পার হইতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত। দুস্তর নদীতে নৌ-সেতু বাঁধিয়া ওপারে যাইবার পথ খুলিতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত। প্রাণ হস্তে করিয়া শত্রুদলের মধ্য দিয়া যাত্রা করিতে হইবে, তাহারই জন্য প্রস্তুত। ইহা কি তপস্যা নহে। পৃথিবীর মেরুপ্রান্তের আবিষ্ক্রিয়ার্থী মহাত্মারা আরো ভয়ঙ্কর অধ্যবসায়ী। এক দিন নয়—দুই দিন নয়—ছয় মাস ধরিয়া, কখনো বা বৎসরেক ধরিয়া, প্রতিমুহূর্তে তাঁহারা শবসাধনের বিভীষিকায় পরিবেষ্টিত। এক-এক মুহূর্ত এক-এক বৎসর। কখন কোথা হইতে এবং কতদিক্ হইতে বরফের চাপ আসিয়া তাঁহাদিগকে পিশিয়া ফেলিবে, তার কিছুই ঠিকানা নাই ; কিয়ৎপরেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাপ চৌদিক্ ঘিরিয়া জাহাজকে আটক করিয়া ফেলিয়াছে—আর জাহাজ শুদ্ধ সমস্ত লোক কুঠার হস্তে করিয়া কেবলি বরফ কাটিতেছে— কেবলি বরফ কাটিতেছে। বরফ কাটিয়া কাটিয়া সম্মুখের পথ পরিষ্কার করিতেছে ; পশ্চাতের পথ নহে—সম্মুখের পথ! এইরূপে দিন যাইতেছে রাত্রি যাইতেছে, শুক্লপক্ষ যাইতেছে কৃষ্ণপক্ষ যাইতেছে—চক্ষে নিদ্রা নাই — হস্তপদে বিরাম নাই ; শীত এমনি যে, তাহার প্রবল পরাক্রমে কাহারো কাহারো অঙ্গুলি খসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে! একি তপস্যা নহে। তপস্যা শুধু কি মাথা নিচু পা উঁচু করিয়া গাছে ঝোলা আর পাতা ভক্ষণ করা। আফ্রিকার অন্তর্ভাগের জন্মান আবিষ্কর্তা যাঁহার কথা আমি একটু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—তিনি তাঁহার দৈনিক পুস্তকের একস্থানে এটাও লিখিয়াছেন যে, "এত শত বিঘ্ন বিপত্তির মাঝখানে আমি ভগ্নোদ্যম হইতেছি না কেবল এই ভরসায় যে, সিদ্ধিদাতা বিধাতা কর্ত্তৃক আমি এ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছি—এ কার্য্যে আমার জয় লাভ হইবেই হইবে।" সমস্ত পথে ঈশ্বরের হস্ত ইঁহার নেতা—ঈশ্বরের মুখ-জ্যোতি ইঁহার ধ্রুবতারা—ইনি কি তপস্বী নহেন।

এই সকল মানুষ-তপস্বীদিগের অনুরাগ রাখিবার স্থান সর্ব্বোপরি ঈশ্বর এবং তাহার নীচেই স্বদেশ: ইঁহারা স্বদেশের মুখ চাহিয়া ভীষণ তরঙ্গসংকুল দুস্তর মহাসাগর ভেলায় পার হ'ন ; দুরারোহ পর্ব্বত-শিখরে মনুষ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন ; দেশের নামের দিগ্বিজয়ী মন্ত্রে ইঁহাদের দুই বাহু সহস্র বাহু হইয়া উঠে ; দেশের নামে ইঁহাদের আক্রমণ-বেগ বিদ্যুৎকে

হাসিয়া উড়াইয়া দেয় এবং সেই নামের সিংহনাদে ইঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপ উদাত্ত বক্ষকে ভস্ম করিয়া ফেলে।

প্রতীচ্য প্রদেশে ঈশ্বরানুরাগের এক ধাপ নীচেই স্বদেশানুরাগ পূজা ; তার সাক্ষী—মহাকবি শেক্সপিয়র তাঁহার অষ্টম হেনরি নামক নাটকে কার্ডিনাল উল্‌সীকে দিয়া বলাইয়াছেন— "Be just and fear not. Let all the ends thou aimest at be thy country's, thy God's and truth's ; ন্যায় পথে থাক, ভয় করিও না ; তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন চরম লক্ষ্য হয় তোমার স্বদেশ তোমার ঈশ্বর এবং সত্য।' কার্ডিনাল উল্‌সী যদি আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে খুব সম্ভব যে, ঐ জায়গাটিতে তাঁহার মুখে দেশ শব্দের পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম-শব্দ বাহির হইত ; তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন যে, তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন চরম লক্ষ্য হয়— তোমার ধর্ম্ম, তোমার ভগবান্ এবং সত্য। কিন্তু ধর্ম্ম শব্দের অর্থ এখানে সার্ব্বভৌমক ধর্ম্ম তত নয় যত জাতীয় ধর্ম্ম অথবা, যাহা একই কথা, কুলধর্ম্ম ; যেমন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম সন্ধ্যাবন্দনাদি, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধবিগ্রহ, বৈশ্যের ধর্ম্ম কৃষি-বাণিজ্য। জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, গৃহভেদ, এইরূপ ভেদ-বাহুল্য আমাদের দেশের এমনি একটা অস্থিমজ্জাগত রোগ যে, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মও আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বসিয়া আছে ; তাহা এইরূপ যে, দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন তাহা বিশেষ কোনো একটি সম্প্রদায়ের একচেটিয়া সম্পত্তি। যেমন, শমদমাদি-সাধন মুমুক্ষু ব্রহ্মজ্ঞানীর ধর্ম্ম ; যমনিয়মাদি-সাধন যোগীর ধর্ম্ম, যেন এ দুই প্রকার সাধনাঙ্গের কোনোটিই সাধারণতঃ সকল ব্যক্তির ধর্ম্ম নহে! কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে— কি শমদমাদি সাধন, কি যমনিয়মাদি-সাধন, দুইই, বস্তু যা—তা এক বই দুই নহে; — কী? না সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম , অর্থাৎ সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। এরূপ যখন—তখন তাহা সর্ব্বসাধারণের সাধনের সামগ্রী হওয়া উচিত ; তাহা না হইয়া, মনুষ্য মাত্রেরই অনুষ্ঠেয় সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম আমাদের দেশে যোগী-তপস্বীদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; আর জন-সাধারণের ধর্ম্ম শুদ্ধ কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে ; যেমন, ব্রাহ্মণজাতির ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়জাতির ক্ষাত্র ধর্ম্ম, বৈশ্যজাতির বাণিজ্য ধর্ম্ম, শূদ্রজাতির দাস্য ধর্ম্ম ইত্যাদি। আমাদের দেশে জাতি এবং ধর্ম্ম দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে, জাতিরক্ষার নামই ধর্ম্মরক্ষা এবং ধর্ম্মরক্ষার নামই জাতিরক্ষা। ইহার কারণ আর কিছু না— ইউরোপাদি প্রতীচ্য ভূমি-খণ্ডে মনুষ্যের প্রধান একটি গৌরব স্থল যেমন—স্বদেশ, আমাদের দেশে তেমনি—স্বজাতি। ইংরাজের মুখে "আমি ইংরাজ" এটা যেমন একটা জোরালো কথা বটে—কিন্তু আর এক হিসাবে। "আমি ইংরাজ"এটা দেশীয় গৌরবের উচ্ছ্বাসবাণী ; "আমি ক্ষত্রিয়-সন্তান" এটা জাতীয়গৌরবের অথবা বংশগৌরবের উচ্ছ্বাস-বাণী। ইউরোপীয়েরা যেমন দেশরক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, আমাদের দেশের লোকেরা তেমনি জাতি-রক্ষার্থে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ; তাহার সাক্ষী—এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার রাজ-বিদ্রোহ দেশ-রক্ষার সংকল্প হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল—সিকি শতাব্দী পূর্ব্বে সিপাহী বিদ্রোহ জাতিরক্ষার সংকল্প হইতে, টোটা-কাটার বিভীষিকা হইতে, জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আজ বলিয়া নয়—মান্ধাতার আমল হইতে চিরকালই আমাদের দেশে দেশীয় মর্য্যাদা জাতীয় মর্য্যাদার নিকটে নতশির। আমাদের দেশে স্বজাতি বিজাতির মধ্যে যেমন কড়াকড় প্রভেদের সীমা নির্দ্ধারিত

রহিয়াছে—স্বদেশ বিদেশের মধ্যে তাহার সিকির-সিকিও নাই ; —এখনও নাই, পূর্ব্বেও ছিল না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন যে, ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশ দেশই নয় ; তাহার সাক্ষী—কালিদাস হিমালয়ের বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন "পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" হিমালয় পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যেন পৃথিবী মাপিতেছে—অর্থাৎ এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত জুড়িয়া অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহারা যে আর কোনো দেশের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না—এরূপ কথা আমি বলিতেছি না, আমি কেবল বলিতেছি যে, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ ছিল— যেন ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবী—আর কোন দেশ দেশই নহে। আর আর দেশকে তাঁহারা যদি বিদেশ বলিয়াও গণ্য করিতেন তাহা হইলে সেই বিদেশের প্রতিযোগে ভারতবর্ষ তাঁহাদের স্বদেশ পদবীতে উত্থান করিত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা আর আর দেশকে একেবারেই নস্যাৎ করিয়া উড়াইয়া দেওয়াতে ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকটে সমগ্র পৃথিবী হইয়া দাঁড়াইল—স্বদেশ আর হইতে পারিল না। এই কারণগতিকে— ভারতবর্ষীয় সমস্ত খণ্ড জুড়াইয়া একটি ব্যাপক স্বদেশীয় ভাব, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে জন্মাইবার অবকাশ পাইল না।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে স্বদেশের গায়ে অপমানের একটু আঁচ লাগিলে দেশের এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত সমস্ত নগর গ্রাম পল্লী অগ্নি উদ্‌গীরণ করিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে ; ভারতবর্ষে বাঙ্গালির দুর্দ্দশা দেখিয়া খোট্টা হাসে— খোট্টার দুর্দ্দশা দেখিয়া বাঙ্গালি হাসে ; হিন্দুর দুর্দ্দশা দেখিয়া মুসলমান হাসে, মুসলমানের দুর্দ্দশা দেখিয়া হিন্দু হাসে, সমস্ত ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া হুতোম পেঁচা' হাসে আর বলে—"ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা"। এই গেল মনের ঐক্য ; তা বই আমাদের দেশে যত কিছু দলাদলির তর্জ্জন গর্জ্জন সমস্তই জাতি কুল লইয়া, দেশের সঙ্গে যাহার মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই!

ইউরোপ দেশীয় মর্য্যাদার উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যতে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে ; আমাদের দেশ জাতীয় মর্য্যাদার উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান হইতে অতীতে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। দুয়ের মধ্যে কেবল যদি ভাবের মাত্র প্রভেদ হইত তাহা হইলে কোনো চিন্তা ছিল না ; একজন নয় ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিতেছেন—আর এক জন নয় অতীত লক্ষ্য করিতেছেন, তাহাতে কি? বর্ত্তমান হইতে অতীতও যতদূর ভবিষ্যৎও ততদূর! চিন্তার বিষয় এখানে এই যে, দুয়ের মধ্যে শুধু ভাবের প্রভেদ নয়—কিন্তু কাজের প্রভেদ। দেশীয় ভাবের উদ্দীপনে যেমন কাজ হয়—জাতীয় ভাবের উদ্দীপনে তাহার সিকির-সিকিও হয় না, উল্টা বরং কাজের ক্ষতি হয় ; কেননা, স্বাধীন দেশে-দেশের উন্নতি-সাধনে দেশীয় সকল ব্যক্তিরই সমান অধিকার, পক্ষান্তরে, কৃত্রিম ধর্ম্মবন্ধনে হাত-পা-বাঁধা জাতির উন্নতি-সাধনে জাতীয় ব্যক্তিদিগের কাহারো কোনো হস্ত নাই ; পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া আসিয়াছেন, জাতির নিকটে তাহাই কর্ত্তব্য, পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা বলিয়া আসিয়াছেন জাতির নিকটে তাহাই বেদবাক্য। জাতির জাতিত্ব অতীতের উপরে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত— এবং তাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের দ্বার একেবারেই অবরুদ্ধ।

ভূতকালের স্মরণ এবং ভবিষ্যতের উন্নতি, এ দুয়ের মধ্যস্থলে বর্ত্তমানের সাধনা। পর্ব্বত হইতে যেমন নদী উপত্যকায় নামিয়া আসে, ভূতকালের স্মরণ তেমনি আপনা-আপনি বর্ত্তমানে

নামিয়া আসে, — আর আপনা-আপনি যাহা নামিয়া আসে তাহাই কাজের : তা ছাড়া অতীতের আর যাহা কিছু—সমস্তই অন্ধকারে উপন্যাস-কল্পনা। ভবিষ্যতের উন্নতি কিন্তু কোথা হইতেও নামিয়া আসে না, তাহা সাধনাকে অপেক্ষা করে, পুরুষের কর্তৃত্বকে অপেক্ষা করে। ইংলণ্ডে কেহই Magna chartaর নামও করে না— কি জন্য করিবে? Magna charta ইংলণ্ডে মৃত স্মরণের বস্তু নয়— তাহা জীবন্ত সাধনের বস্তু! Magna charta ইংলণ্ডের পথে ঘাটে হাটে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে—জনপদের প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে চলা ফেরা করিতেছে : ইংলণ্ডের চক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান! যাহা প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান তাহার জন্য স্মরণের চাবি হাতে করিয়া চোরের ন্যায় ভূতকালের অন্ধিসন্ধি হাতড়াইয়া বেড়াইবার কোনো প্রয়োজন করে না। আমাদের দেশের অতীত-কালের স্মরণীয় উপন্যাস যৎ কিছু সমস্তই অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক-পরম্পরায় নির্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে— পুরুষদিগকে তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না ; বর্তমানের সাধনাই পুরুষজাতিকে শোভা পায়। বর্তমানের কাজের কথা ছাড়িয়া ভূতকালের উপন্যাস-কল্পনা অতিবৃদ্ধা পিতামহীর মুখেই—অতি সুকুমার কচি বালকের কর্ণেই—শুনায় ভাল। ইউরোপীয়দিগের ভরসা Living Present. জীবন্ত একাল! আমাদের ভরসা Dead Past. মৃত সেকাল : দুয়ের মধ্যে কি বিশাল ব্যবধান!

বলিলাম "মৃত সেকাল"—কিন্তু এ কথাটির একটু টীকা করা আবশ্যক ; সে কালেরই হউক আর একালেরই হউক যাহা ভাল জিনিস তাহা মরে না—মরিতে কেবল বাজে জিনিসই মরে, ফালতো জিনিসই মরে। মরিতে কেবল শরীরই মরে—আত্মা মরে না।

বেদের শরীর অনেককাল যাবৎ মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার আত্মা আজিও সজীব রহিয়াছে : — যাগযজ্ঞের মন্ত্রতন্ত্র মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে— কিন্তু উপনিষদের ধর্ম্ম নব-জীবন হইতে নবতর জীবনে দিন দিন সমুত্থান করিতেছে। ইংলণ্ডের ক্ষাত্রতন্ত্র (Feudal System) অনেককাল মরিয়া গিয়াছে কিন্তু তাহার Magna Charta আজিও জাগ্রৎ জীবন্ত। পুরাণ তন্ত্রাদিকেই আমরা সেকালের সামগ্রী বলিতে পারি : পুরাণ শব্দের অর্থই হ'চ্চে পুরাতন অথবা যাহা একই কথা সেকেলে; কিন্তু উপনিষদ্ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্রগুলিকে আমরা সেকেলে বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না : —এ-গুলির উৎপত্তি সেকালে হইলেও এগুলি সেকেলে নহে—এগুলি সব-কেলে ; এগুলি পুরাতন নহে—এগুলি সনাতন। সেকেলে হিন্দু-ধর্ম্ম কী? না—বৈদিক যাগযজ্ঞাদি, পৌরাণিক অবতার পূজাদি, তান্ত্রিকে প্রতিমা পূজাদি ; সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কী? না—উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ; ভগবদ্গীতার ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ; এবং ঐরূপ আর আর উচ্চাশয় শাস্ত্রের যে-সকল মহাবাক্য সর্ব্বকালেই এবং সর্ব্বদেশেই লোকের পূজা আকর্ষণ করে, সেই সকল অমূল্য রত্ন। কিন্তু শাস্ত্রের অগাধ সমুদ্র হইতে সেই সকল মহাবাক্য উদ্ধার করিতে পারে—এমন ডুবুরী আমাদের দেশে কয় জন? ডুবুরী যদিবা রত্ন উদ্ধার করিল— তাহা চিনিতে পারে এমন জহুরীই বা আমাদের দেশে কয়জন?*

আমাদের দেশ একটা প্রকাণ্ড রথ ; তার সারথী হ'চ্চে সেকেলে শাস্ত্র, আর অশ্ব হ'চ্চে

---

* আমাদের দেশের জনসাধারণ যে কিরূপ রসজ্ঞ, কিরূপ সমজদার, তাহার পরিচয় আমি অনেকবার অনেক রকমে পাইয়াছি। তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি : ব্রাহ্ম সমাজের কোনো উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই প্রদেশের একটা দেশীয় রাগিণীর একটি গীত ভাঙ্গিয়া একটি ব্রহ্মসঙ্গীত প্রস্তুত করিয়া তাহা

লোকাচার। সারথীটি বার্দ্ধক্যের বশতাধীনে এমনি অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি অশ্বকে চালান কিম্বা অশ্ব তাঁহাকে চালায়—তাহা বলা কঠিন। তাতে আবার সারথীও দশ গণ্ডা, অশ্বও দশগণ্ডা , অশ্ব—নানা প্রদেশের নানা বিরোধী লোকাচার, সারথী নানা মুনির নানা বিরোধী শাস্ত্র ; সারথীদিগের হাতের রাস আলগা হইয়া লটপট্ করিতেছে—তাহা যে তাঁহাদের হাত হইতে খসিয়া পড়ে নাই —এই ঢের। দশগণ্ডা ঘোড়া দশদিকে রুখিয়া পা ছোড়াছুড়ি করিতেছে— রথ বেচারী কোন্‌দিকে যাইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া যেখানকার সেইখানেই স্থির রহিয়াছে। রথের এইরূপ গতিরোধ অপ্রতীকার্য্য দেখিয়া আরোহীদিগের (অর্থাৎ ভারতবাসীদিগের) মনোরথেরও গতিরোধ হইয়া আসিতেছে— তাঁহাদের আশা ভরসা সকলি লোপ পাইয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশের পূর্ব্বাপর ঐতিহাসিক রহস্যে একটু ডুব দিয়া তলাইয়া দেখিলেই আমাদের দেশের রোগের মূল যে কোন্‌খানটিতে তাহা চিকিৎসকের চক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়িবে। রোগটি বড় সহজ নয় — তাহা পক্ষাঘাত বিশেষ।

বৈদিক সময়ে আনাদের দেশের পিতৃপুরুষদিগের মনে কৃত্রিমতার আবরণ যেমন ছিল না বলিলেই হয়, এখন আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ঠিক্ তার বিপরীত! এখন দেখিতে পাওয়া যায়—খাওয়া দাওয়া, ওঠা বসা, চলাফেরা সকলই কৃত্রিম ধর্ম্মাবরণে আবৃত!

---

সভাস্থলে গান করা হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের প্রায় সকলেরই এইরূপ ধারণা হইল যে, সে গীতের সুর নিশ্চয়ই ইংরাজি সুর। বাঙ্গালা এবং হিন্দুস্থানী গীত যাহা আমাদের দেশের কানে চিরাভ্যস্ত— এ দেশীয় লোকের ধ্রুব সংস্কার যে, তাহাই বিশুদ্ধ প্রচীন ভারতবর্ষীয় সামগ্রী, তাহার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে—আমাদের দেশের লোক তাহাকে একেবারেই বিলাতের আমদানি বলিয়া স্থিরস্থার করিয়া বসিয়া থাকেন। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত উচ্চারণ শুনিলে হয় তো বা কৃপার্দ্রচিত্তে আপনাদের মধ্যে এইরূপ বলাবলি করিতেন যে, "এরা খোট্টা মানুষ এদের সংস্কৃত উচ্চারণ কত আর ভাল হইবে।" আমাদের দেশের লোকের এটা জানা উচিত যে, দাক্ষিণাত্য প্রদেশ মুসলমানদিগের পরাক্রমের সংস্পর্শ হইতে অনেক পরিমাণে নির্লিপ্ত ছিল, এইজন্য যদি বিশুদ্ধ প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সামগ্রী কোথাও থাকে তবে সেই সব অঞ্চলের গলিঘুজিতে লুকাইয়া থাকিবার কথা। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় নৃত্যগীত মুসলমান রাজাদের বৈঠকী নৃত্যগীত হইতে—খেয়াল ধ্রুপদ টপ্পা এবং বাইনাচ প্রভৃতি হইতে— অনেক বিভিন্ন ছিল — তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ; তাহার সাক্ষী — কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের গীতাংশের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই এমনি সব নূতন তরো নাম যে—তাহাদের কাহার যে কি অর্থ তাহা এক্ষণকার গীতের বড় বড় ওস্তাদেরাও বলিতে পারেন না। এদেশের পুরাতন-প্রণালীর নৃত্যগীতকে লোকে যে ইউরোপীয় ঢঙের নৃত্য গীত বলিবে তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই , কেননা আর্য্য জাতিগণের গোড়ার একতা বিদ্যমান ছিল ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার অস্ফুট আভাসকালের পর্দার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে চমকানি দিবে—ইহা তো হইতেই পারে। আমাদের দেশের বিশুদ্ধ ভারতবর্ষীয় (অর্থাৎ অযাবনিক) গানের সুর শুনিলে লোকে তাহা ধরিতে পারে না—ধরিতে না পারিলেই তাহাকে ইংরাজি সুর বলিয়া খোঁটা দেয় , তেমনি আমাদের দেশের লোক আদিমকালের উপনিষদাদির পরিষ্কার ব্যাখ্যান শুনিলে তাহাকে আর খ্রীষ্টানি বলিয়া খোঁটা দেয়। আমরা এমনি অসাধারণ সমজদার লোক যে, আমাদের নিকটে পুরাণতন্ত্রাদির ধর্ম্মই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ; বাস্তবিক সনাতন ধর্ম্ম যে উপনিষদাদির অখিত সারাংশ তাহা আমাদের নিকটে খ্রীষ্টান ধর্ম্মেরই সামিল।

কৃত্রিম শব্দের অর্থ এখানে কপট নহে ; যাহা সহজ শোভন নহে—যাহা কষ্ট-কল্পিত—তাহারই নাম কৃত্রিম—ইংরাজিতে যাহাকে বলে artificial। যেখানেই দেখিবে —কড়াকড় কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের বেশী বাঁধাবাঁধি আঁটাআঁটি, সেইখানেই জানিবে যন্ত্রের বাঁধন কষা গিয়ে ; —অমুক বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য করিবে ; অমুক বয়স হইতে অমুক বয়স পর্য্যন্ত অমুক দণ্ডে দেবারাধনা করিবে, অমুক দণ্ডে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবে, অমুক দণ্ডে অধ্যয়ন অধ্যাপন করিবে, অমুক দণ্ডে অতিথিসংকার করিবে, অমুক বয়সে বনে যাইবে — বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ করিবে—এইরূপ শক্তাশক্তি কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের ফল যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে ; — কী? না ছেলে-খেলা! তাহার সাক্ষী — বারো বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য একণে তিন দিনে সাঙ্গ হইয়া যায় ; সন্ধ্যাবন্দনা দেবারাধনা পিতৃতর্পণাদি কতকগুলি মুখস্থ শব্দ উচ্চারণ মাত্র ; এবং পূজা উৎসবাদি আর কিছু নয় — পুরোহিতকে দিয়া কতকগুলি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইয়া লওয়া, —একপ্রকার রোজাকে দিয়া ভূত ঝাড়ানো!

যেমন বলিলাম— বৈদিক কালে — ঋষিদের দেবতা-স্তব তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ছিল ; তাহা মুখস্থ চর্ব্বিত-চর্ব্বন ছিল না ; তাঁহাদিগকে কেহই নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতনা। ক্রমে হইল অমুক সময়ে অমুক যজ্ঞে অমুক মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে — অমুক যজ্ঞে অমুক প্রকার বেদী নির্ম্মাণ করিতে হইবে —অমুক যজ্ঞে এইরূপ পশু এবং এতগুলা পশু এইরূপে হত্যা করিতে হইবে— এইরূপ কত যে বাল্যক্রীড়া তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই! বুদ্ধদেবের নাস্তিক্য অপবাদের কারণ আর কিছুই না। — তিনি যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন ; তা বই — তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করিলে কখনই এ কথা কাহারও মনে তিলার্দ্ধও স্থান পাইতে পারে না যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। খুব সম্ভব যে, তিনি তৎকালের লৌকিক প্রথানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করাতে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা সেইদিকে আর একটু মাত্র ঝোঁক দিয়াছিলেন, সেই-গতিকে চারিদিকে এইরূপ একটা মিথ্যা অপবাদ রটিয়া গেল যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক। বুদ্ধদেবের তপস্যার প্রভাবে সার্ব্বলৌকিক এবং সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম আমাদের দেশে সেই যা একবার চকিতের ন্যায় বিকশিত হইয়াছিল — দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় বন্ধন দূরীভূত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে ভারত-ব্যাপী দেশীয় ঐক্য-বন্ধন অভিব্যক্ত হইবার শুভযোগ সেই যা একবার দেখা দিয়াছিল! কিন্তু হইলে হইবে কি— তখনকার সেই সৌভাগ্যের কাল আমাদের দেশের ভাবি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানির মুখ্য সময়— সাময়িক কার্য সময়ে হওয়া চাই— সেই মুখ্য সময়টিতে যদি দুর্ভাগ্যের বীজ-বুনানি না হইবে তবে আর কখন হইবে, — অতএব দেও বুদ্ধকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া— বুদ্ধের দলকে, বুদ্ধের ধর্ম্মকে, বুদ্ধের শাস্ত্রকে, বুদ্ধের কীর্ত্তিকলাপকে, দেশ হইতে দূর করিয়া দেও! যাজযজ্ঞের ধূমপটল আকাশে উত্থিত হউক! অনেক বৎসরের উপবাসের পরে দেবতাদিগের গৃহে গৃহে ভোজের ধূম লাগিয়া যা'ক্! ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের শুষ্ক হর্ষ-কিরণে সমুজ্জ্বল হউক্! এইরূপ ব্রাহ্মণদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের আধিব্যাধি নির্ব্বাধা হইয়া গেল— সার্ব্বলৌকিক ধর্ম্মের চিহ্ন মাত্রও রহিল না—জাতির জাতিত্ব এবং কুলের কুলীনত্ব হিমালয় ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল! আবার আমাদের দেশে যে-কে-সেই! পুরাবৃত্তের অঙ্কুর গজাইতে সবেমাত্র যেই আরম্ভ করিয়াছে, আর অমনি তাহা প্রচণ্ড বিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া তদ্দণ্ডেই শুখাইয়া মরিল।

এক দিকে "আমি ব্রাহ্মণ আমি মস্ত লোক" "আমি ক্ষত্রিয় আমি মস্ত লোক" এইরূপ কৌলিক বড়ত্ব, আর এক দিকে "আমি শূদ্র আমি ক্ষুদ্র লোক" এইরূপ কৌলিক ছোটত্ব ; এক দিকে প্রভাবপক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ—আর এক দিকে অভাবপক্ষীয় তাড়িত-প্রবাহ—দুয়ের বৈপরীত্যের মাঝখানে পড়িয়া জনসমাজের হৃৎপদ্ম অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল। এই গতিকে পুরাবৃত্ত বলিয়া একটা যে বিজ্ঞান-সামগ্রী তাহা আমাদের দেশে জন্মিতেই অবসর পাইল না। কৃত্রিম ধাঁচার ধর্ম্মবন্ধনে লোকের হাত পা বাঁধা থাকিলে কেহই স্বাধীনভাবে কোনো কার্য্য করিতে পারে না ; — আর যে কার্য্য স্বাধীনভাবে কৃত না হয়— পুরাবৃত্তের বাজারে সে কার্য্যের বিশেষ কোনো মূল্য থাকিতে পারে না। রাজারা প্রত্যূষ হইতে সায়াহ্ন পর্যন্ত কোন্ মুহূর্ত্তে কি কাজ করিবেন তাহা শাস্ত্রে সবিস্তারে বিধিবদ্ধ রহিয়াছে, — যে রাজা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা মানিয়া চলিলেন, সেই রাজা অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন আর যিনি তাহার একচুল এদিক্ ওদিক্ করিলেন তিনি ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন। এইরূপ যেখানে কৌলিক প্রথা মানিয়া চলা না-চলার উপরে রাজাদের সমস্ত খ্যাতি-অখ্যাতি যশ-অপযশ নির্ভর করে, সেখানে কাজেই কৃতির গুণাগুণই ব্যক্তির গুণাগুণের একমাত্র পরিচায়ক এবং পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় কোনো ব্যক্তির নিজের কোনো স্বাধীন কীর্ত্তি ইতিহাসে প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কালিদাসেও রঘুবংশের সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের গুণ-বর্ণনায় যেমন দেখিতে পাওয়া যায়— "যথাবিধি-হুতাগ্নীনাং যথাকালার্চিতার্থিনাং যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাং, রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্বিভবোঽপি সন্" এইরূপ শাস্ত্রীয় বন্ধনে বাঁধাবাঁধা কার্য্য ছাড়া, স্বাধীনভাবে কোনো রাজা যদি খুব একটা ভাল কার্য্যও অনুষ্ঠান করেন, (যেমন বুদ্ধদেব করিয়াছিলেন), তবে তাহা এদেশের পুরাতন পথাবলম্বী ইতিহাস লেখকের গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিতে পারে না।

লোকের বড়ত্ব ছোটত্বের দুইটি বিভিন্ন ধরনের পরিমাণ দণ্ড— জন্ম এবং কর্ম্ম ; জাতি এবং কীর্ত্তি ; ভূধাতু এবং কৃ ধাতু। আমাদের দেশে ভূধাতু কৃ-ধাতুর হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে এমনি একটা কাঠের পুতুল বানাইয়া তুলিয়াছে যে, আমাদের এখানে কৃ ধাতুকে লইয়া যত কিছু নাড়াচাড়া— যত কিছু ক্রিয়াকর্ম্মের আড়ম্বর—সমস্তই একপ্রকার পুত্তলোবাজিরই সামিল। আগাগোড়া সবই তারে-ঝোলানো কাঠের পুতুলের কাণ্ড— তা'র আবার ইতিহাসই বা কি আর পুরাবৃত্তই বা কি! কথাটি এই যাহা বলিলাম, ইহা আমাদেরনিজের মনঃকল্পিত কথা নহে— ইহা শাস্ত্রেরই প্রতিধ্বনি। কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এরূপ মর্ম্মবেদনার দীর্ঘনিশ্বাস সকল শাস্ত্রেরই প্রাণের মধ্য হইতে ভূয়ো ভূয় বাহির হইতে দেখা যায়। দেখ না কেন— রাশি রাশি মুখস্থ শাস্ত্র-বচনের এবং অসংখ্য খুঁটিনাটির ভারে প্রপীড়িত হইয়া — কর্ম্ম এমন যে ভাল সামগ্রী, তাহাও আমাদের দেশে একপ্রকার যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের শাস্ত্রানুশাসিত কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড লোকের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির এমনি ব্যাঘাত উৎপাদন করে যে, কি দর্শন কি পুরাণ কি তন্ত্র সকল শাস্ত্রই একবাক্যে কর্ম্মের নাম দিয়াছে — কর্ম্ম-বন্ধন। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে আলস্য এবং জড়তাই বন্ধন বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত; তার সাক্ষী — shackles of indolence অবসাদের শিকল ; আর, কর্ম্মই কেবল সেই জড়তার বন্ধন খুলিয়া দিতে পারে, —এ ছাড়া আর কেহই তাহা পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে ঠিক বিপরীত— কর্ম্ম নিজেই বন্ধন বলিয়া পরিগণিত হয়! যিনি বন্ধন খুলিয়া দিবেন

তিনি নিজেই যদি বন্ধন হইলেন—যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হইলেন—তবে আর বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় কি? কর্ম্ম-মাত্রই যদি বন্ধন হয় তবে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম করিলে দ্বিতীয় কর্ম্মটিও বন্ধন হইয়া দাঁড়ায়। যদি বলো সংসারের কর্ম্ম-বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তৃতীয় কর্ম্ম-সাধনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে পার না ; কেননা..... তুমি বলিয়াছ কর্ম্মমাত্রই বন্ধন ; তপজপাদি না হয় সোনার বন্ধন, চোর-ডাকাতি না হয় লোহার বন্ধন ; কিন্তু বন্ধন দুইই। হদ্দ তুমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে, সৎকর্ম্ম করিলে অসৎকর্ম্মের লোহার শৃঙ্খল খুলিয়া গিয়া তাহার স্থানে সোনার শৃঙ্খল জড়ানো হয় ; কিন্তু তাহাতে কি?" লোহার শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে সোনার শৃঙ্খল জড়ানোকে কিছু আর মুক্তিসাধনের উপায় বলা যাইতে পারে না। একটা পক্ষীকে লোহার পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সোনার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাকে কিছু আর মুক্তি দেওয়া হয় না। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, কর্ম্ম-মাত্রই কর্ম্ম-বন্ধন তবে অগত্যা এইরূপ দাঁড়ায় যে, মুক্তির জন্য যতই যিনি সাধ্য-সাধনা করিবেন ততই তিনি বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িবেন। যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না সে যেমন জলে পড়িলে কূলে ফিরিয়া আসিবার জন্য যতই হাত পা ছোড়াছুড়ি করে ততই দূরে দূরে ভাসিয়া যায়— হাত পা না ছুড়িলে নীচে তলাইয়া যায়, তেমনি মুক্তির জন্য সাধনা করিলেও কর্ম্মবন্ধন— না করিলেও স্বভাব-সুলভ সংসার-বন্ধন ; বন্ধনের হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। ভাবিয়া দেখিলে দাঁড়ায় এই যে, "কর্ম্মমাত্রই কর্ম্মবন্ধন" এটা কেবল একটা অত্যুক্তি-অলঙ্কার ; শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। শাস্ত্রে কেবল দুইরূপ কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে — (১) কাম্য কর্ম্ম অর্থাৎ ফল-কামনা করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় যেমন যাগযজ্ঞাদি ; (২) নিষিদ্ধ কর্ম্ম যেমন চুরিডাকাতি। এ ভিন্ন তৃতীয় আর-এক প্রকার কর্ম্ম আছে , — কী? না নিষ্কাম কর্ম্ম শাস্ত্রে বলে — আর যুক্তিতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়— যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) বন্ধনের কোটায় স্থান পাইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রবীণ পরামর্শদাতাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মুখে অথবা হাতে কাম্য কিম্বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনে তাহাকে আমল না দিলেই—তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের পদবীতে সমুত্থান করে! ইঁহারা বলেন — এই বিড়াল বনে গেলেই যেমন বনবিড়াল হয়, তেমনি কাম্য অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কৃত হইলেই তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। এ ছাড়া — নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণীর কোনো কর্ম্ম নাই! শাস্ত্রে কিন্তু আর এক কথা বলে— সকল শাস্ত্রেই বলে যে, কায়মনোবাক্যের একতা নিষ্কাম এবং সকাম উভয়বিধ ধর্ম্মেরই—ধর্ম্মমাত্রেরই —একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ ; তা-বই মুখে এক, মনে আর অথবা কাজে আর—এভাবের কার্য্য ধর্ম্মই নহে ; —না তাহা কাম্য কর্ম্ম — না তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম ; তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই শ্রেণীভুক্ত। চতুর পরামর্শদাতাকে একজন খাঁটি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বলিতে পারেন যে ; "তুমি বলিতেছ — মুখে পুত্রং দেহি ধনং দেহি এবং মনে কিছু দিতে হবে না মা — ছেড়ে দেহি' ইহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। — মানিলাম যে, তোমার মনের মধ্যে ধনের কামনা নাই— পুত্রের কামনা নাই, যশের কামনা নাই ; কিন্তু মায়া-ভক্তি দেখাইয়া লোকের মন ভুলাইবার কামনা আছে তো! এটা তো আর তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না!" আমরা তাই বলি যে নিষ্কাম কর্ম্ম কাম্য এবং নিষিদ্ধ উভয় শ্রেণীর

কর্ম্ম হইতে ভিন্ন — তৃতীয় আরেক শ্রেণীর কর্ম্ম। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক— সংসারাসক্তি ; নিষ্কাম কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক—বৈরাগ্য, অথবা যাহা একই কথা—ভগবদ্ভক্তি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিষ্কাম-কর্ম্ম — ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কেবল কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। যথা; — ভগবদ্গীতা বলেন "কার্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জ্জুন সঙ্গংত্যক্তা ফলঞ্চৈব সত্যাগো সাত্ত্বিকো মতঃ।" "কর্ত্তব্য" এইরূপ বোধে বিষয়াসক্তি এবং ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম—সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্য—কথা একই কেবল ভাষা ভিন্ন।

ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্যের নাম শুনিলে অনেক মনে করেন যে, তাহার মধ্যে রস-কস কিছুই নাই, তাহার শরীর কাষ্ঠ-পাষাণে গঠিত। তাঁহারা ভাবেন, বৈরাগ্য শব্দের অর্থই হ'চ্চে অনুরাগের ঠিক উল্টো— মুখ-সিঁটকানো বিরাগ! কিন্তু ভিতরের নিগূঢ় বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে, বৈরাগ্য অনুরাগ সোপানের সর্বোচ্চ মঞ্চ ; তাঁহাদের কাছে —বৈরাগ্যের আগাগোড়া সবই অনুরাগ—বৈরাগ্য অনুরাগ ছাড়া আর কিছুই নহে। জল যেমন অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইলেই বাষ্পাকারে আকাশে সমুত্থিত হয়, অনুরাগ তেমনি জ্ঞানানলে পরিশুদ্ধ হইলেই বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণে সমুত্থিত হয়। লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করা, আর সর্ব্বত্যাগী হওয়া, একই কথা , এ কথাটির মধ্যে সত্য কেবল এইটুকু যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে হইলে অভিনবব্রতীকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেই হয় ; কিন্তু ত্যাগস্বীকারের একটি গোড়ার কথা এখানে ভুলিলে চলিবে না— সেটি এই যে, লোকে ত্যাগ-স্বীকার করিব বলিয়া ত্যাগ-স্বীকার করেও না— করিতে পারেও না। ত্যাগ স্বীকার যিনি যখন করেন, তখন একটা বিষয়ের ভালবাসা সূত্রেই আর-একটা বিষয়ের ত্যাগ স্বীকাব করেন ; কেহ বা পরিবারের মঙ্গলার্থে, ত্যাগ স্বীকার করেন, কেহ বা কুলের মঙ্গলার্থে, কেহ বা দেশের মঙ্গলার্থে কেহ বা সাধারণতঃ মনুষ্যের মঙ্গলার্থে। যে বিষয়ের ত্যাগ স্বীকাব করা হইতেছে তাহার প্রতি বৈবাগ্যের উৎপত্তি এবং যাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি অনুরাগের টান, এ দুই ব্যাপার ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ— অর্থাৎ দুয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী থাকিতে পারে না।

অনুরাগের সহিত বৈরাগ্যের যখন এইরূপ মাখামাখি সম্বন্ধ তখন অনুরাগের অবতারণা-ব্যতিরেকে বৈরাগ্যের আলোচনা কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; এইজন্য আমরা প্রথমে অনুরাগের কতগুলা সিঁড়ির ধাপ এবং কাহার উপরে কোন্টি সমুত্থিত, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাব পরে সেই সিঁড়ি ভাঙিয়া কিরূপে বৈরাগ্যমঞ্চে উত্থান করিতে হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।

অনুরাগ সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কয়টি পংক্তি, অর্থাৎ পইটে, উপর্য্যুপরি সাজানো রহিয়াছে, — (১) প্রাণানুরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের প্রতি অনুরাগ (পরিবার একপ্রকার মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য) ; (৩) কুলানুরাগ অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ ; (৪) দেশানুরাগ, (৫) সার্ব্বভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সার্ব্বদেশিক মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ ; (৬) ঈশ্বরানুরাগ। এই অনুরাগ সোপানে— যিনি যেমন ব্যক্তি তিনি সেইরূপ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন ; কেহ বা নীচের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন,

কেহ বা উপরের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন ; আবার, প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিতি করেন। নীচের পংক্তির লোক বড় জোর একধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাব বুঝিতে পারে ; তা বই, দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের—ভাব বুঝিতে পারা দূরে থাকুক—ভাষাই বুঝিতে পারে না। ইহুদীরা যৎকাল স্বজাতীয় অনুরাগের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, ঈসা তখন সার্ব্বলৌকিক মনুষ্যানুরাগের মঞ্চ হইতে তাহাদিগকে কত না সদুপদেশ প্রদান করিলেন—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল। একই অভিন্ন কারণে ঈসাকে ইহুদীরা এবং বুদ্ধদেবকে ভারতবাসীরা নিতান্তই পর ভাবিল ; সে কারণ আর কিছু না — নীচের পংক্তির লোক দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের ভাবও বুঝিতে পারে না— ভাষাও বুঝিতে পারে না। বুদ্ধ-দেবকে লোকে তো নাস্তিক বলিয়া উড়াইয়া দিল—তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি যে বেদোক্ত যাগযজ্ঞের অলীকতা ঘোষণা করিয়া ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কোনো কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ঈসার ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই একটি প্রচ্ছন্ন উপশাখা ; সে যাহাই হৌক্— দোঁহার প্রবর্ত্তিত দুই সর্ব্বলৌকিক ধর্ম্ম পৃথিবীর দুই মধ্যস্থান হইতে দুই প্রান্ত-স্থানে ছট্‌কিয়া পড়িল—বুদ্ধের ধর্ম পূর্ব্ব-প্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল—ঈসার ধর্ম্ম পশ্চিম প্রান্তে ছট্‌কিয়া পড়িল।

আর, পৃথিবীর সেই দুই প্রান্তেই লোকেরা স্বাধীন রাজ্যে বাস করিয়া সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। শুধু ইতিহাস দেখিলে কি হইবে—ইতিহাসের রহস্যটির ভিতর একবার একটু মনোযোগের সহিত তলাইয়া দেখো ; — তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, একই অপরাধে ঈসা ক্রুসে বিদ্ধ হইলেন এবং বুদ্ধ সশরীরে না হউক্ সদলে দ্বীপান্তরিত হইলেন। সে অপরাধ আর কিছু না—লোকদিগকে কৃত্রিম ধর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া তাহাদের স্বাধীনতা সমর্থন করিতে যাওয়া! যাগ যজ্ঞাদি অলীক ক্রিয়াকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া ভারতবাসী লোকদিগকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা বুদ্ধের হৃদ্‌গত সংকল্প ছিল এবং ফারিসিয় সম্প্রদায়ের কৃত্রিম ধর্ম্মশাসনের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইহুদি জাতিকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা প্রদান করা ঈসার হৃদগত সংকল্প ছিল। কিন্তু কালের কঠোর শাসনে বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল উৎপাটন করিয়া লইয়া ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল—ঈসার ধর্ম্ম ঘূর্ণাবায়ুর ন্যায় ইহুদী জাতিকে উড়াইয়া ছড়িভঙ্গি করিয়া জেরুসালেমকে শ্মশান করিয়া ফেলিল।

যেদিন বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতী-মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া পূর্ব্বসাগরে ঝম্প প্রদান করিল, সেই দিন মাতা-ভারতী রোষে অধীর হইয়া প্রকম্পিত অধরে তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি সন্তানগণকে বলিলেন—"বুদ্ধদেব তোমাদিগকে ভালবাসিয়া তোমাদের হস্তপদ হইতে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন মোচন করিয়া তোমাদের মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন— তাই তোমরা তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে! — বুঝিয়াছি — তোমরা মুক্তি চাও না — তোমরা চাও বন্ধন! তথাস্তু! তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক! স্বাধীনতা তোমাদের অত্যাচার হইতে পলাইয়া বাঁচিয়া অস্পর্শীয় ম্লেচ্ছদিগের গৃহ উজ্জ্বল করুক! যেমন তোমরা বন্ধন প্রিয়— তেমনিই তোমাদের দশা হউক্ — সেই ম্লেচ্ছদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খল জন্ম-জন্ম তোমাদের কণ্ঠের হার হউক্!" দেখিতে না দেখিতে ভারতের প্রলয়-মেঘ মুসলমান

মূর্তি ধারণ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ জুড়িয়া তলোয়ারের বিদ্যুৎক্রীড়া এবং মস্তকের শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল— সেই এক দিন! এবং তাহার পরে গৌরাঙ্গ দেবতারা বজ্রধ্বনিতে দশদিক ফরসা করিয়া লোকের চক্ষে ভরসা আনয়ন করিলেন— এই একদিন ; এইরূপে (দেশের অশ্রুপ্লুত নয়নে কিবা-রাত্র কিবা-দিন!) রাত্রি এবং দিন উলটিয়া-পালটিয়া ভয়-আশা সঞ্চার করিতে লাগিল। বন্ধন যেমন হইতে হয় তাহাই আমাদের হইয়াছে—কিন্তু তাহাতেও আমাদের আশ মিটিতেছে না ; আমরা আরো বন্ধন চাই — আরো বন্ধন চাই! আবার আমরা গাঁয়ে মানুক্ না মানুক্ আপনি মণ্ডল হইয়া কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের বন্ধন যেখানে একটু আধটু আলগা হইয়াছে দেখিতেছি সেখানে তাহার গিরা শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছি। যদি আমাদিগকে কার্য্য-গতিকে সমুদ্র যাত্রা করিতে হয়, তবে মৃত শাস্ত্রকে ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকা চাই— তাকাইয়া না থাকিলেই নয় — তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য! মৃত শাস্ত্র কি আর বলিবে— তাহার পিছনে লুকাইয়া থাকিয়া পাণ্ডারা বলেন, "হাঁ সমুদ্র যাত্রা করিতে পার—তবে কি না—" ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি! ইঁহাদের এইরূপ দুই নায়ে পা দেওয়া ভাষাকে— যদি লোক আজিকের বাজারে খুবই কম , — বাঙ্গালা মুলুকে তো নাই-ই — সমগ্র ভারতবর্ষে আছে কি না সন্দেহ! এসব হ'চ্চে আর কিছু না— ইংরাজিতে যাহাকে বলে Policy! কখনো কখনো যেমন দেখা যায় যে, ডাক্তারের পরামর্শ শুনিয়া মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ ছাড়িয়া আফিম ধরে— অবশেষে মদও চলিতে থাকে, আফিমও চলিতে থাকে; ইঁহাদের পলিসীও তেমনি! উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার কৃত্রিম বন্ধন এড়াইবার মানসে ইঁহারা শাস্ত্রীয় কৃত্রিম বন্ধনের গিরা শক্ত করিয়া আঁটিবার জন্য বিস্তর আয়াস পাইতেছেন। ইহাতে ফল হইতেছে এই যে, দুই কৃত্রিম বন্ধন পরস্পরের পানে চোক টেপাটেপি করিয়া শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি করিতেছে! শাস্ত্রীয় বন্ধনের পাণ্ডারা বলিতেছেন যে, "আমাদের আশ্রিত অনুগত থাকিয়া আমাদের নিকট হইতে ব্যবস্থা লইয়া যাইতে পার—খানা খাইতে পার—সবই করিতে পার, তাহার জন্য চিন্তা কি!" ঊনবিংশতাব্দীয় বন্ধনের পাণ্ডারা বলেন যে—"গোবরের বটিকা দশ গ্রেণের পরিবর্তে এক গ্রেণ এবং তাহার অনুপান সেরভর সুপ—এইরূপ ব্যবস্থা হইলেই ভাল হয়! তাহাই অনুমতি হোক্।" শাস্ত্রীয় বন্ধনের পাণ্ডারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলেন— "তা সেরূপ ব্যবস্থা আমরা দিতে না পারি এমন নয়—তবে কি না—! যা'ই হোক—তুমি দুর্ব্বল অধিকারী— তোমার জন্য—সকলের জন্য নয় শুধু কেবল তোমার জন্য—আমরা তোমার ইচ্ছানুযায়ী ঐরূপ ব্যবস্থা দিতে কোনো হানি বোধ করি না — অতএব তথাস্তু!" এরূপ পলিসী পাড়াগেঁয়ে দলাদলিতে খুবই কাজে লাগিতে পারে ইহা আমি বিলক্ষণই জানিতেছি, কিন্তু এটাও তেমনি জানিতেছি যে, —এরূপ পলিসীতে ভারত উদ্ধার করিতে যাওয়া এক-আধ দিনের কর্ম্ম নহে! ইঁহাদের পলিসীর আর এক উদ্দেশ্য এই যে, যেখানে বল নাই সেখানে বলের একটা প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া কৌশলে কার্য্যোদ্ধার! মানিলাম যে, একটি কাঁচ বালককে সোনার সাপে ভয় দেখানো যাইতে পারে, ইহা খুবই সত্য ; কিন্তু সেই সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া বিসমার্ক বোনাপার্ট এবং প্রভু ক্লাইবের চেলাদিগকে তেমনি করিয়া ভয় দেখাইতে যাওয়া— পলিসীটি কিছু যে অতিরিক্ত মাত্রা বলিয়া বোধ হয়! পৃথিবীতে যে সময়ে উন্নত বিজ্ঞান দর্শন শিল্প সাহিত্যের

জ্ঞানানল-শিখা দিন দিন উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে সমুত্থান করিয়া যোজন দূরে জ্যোতির্মণ্ডল বিস্ফারিত করিতেছে — সেই সময়ের এই প্রকট দিবালোকে ইঁহারা স্বচ্ছন্দে কতকগুলো জরাজীর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড— যাহার প্রাণ যাহাকে ফেলিয়া পালাইয়া অনেককাল হইল প্রেতলোকে ঘর বাড়ি বাঁধিয়া সুখে বসবাস করিতেছে—মর্ত্তে ফিরিয়া আসিবার নামও করে না— সেই শবদেহটাকে বীরপরিচ্ছদে সাজাইয়া তাহাকে জ্বলন্ত সত্যের অভিমুখে ধাক্কা মারিয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছেন, এবং আপনারা দশ হাত পিছাইয়া দাঁড়াইয়া—উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "ভালা মোর বাপ্ — মুখের এক ফুঁয়ে ঐ আলোটা নিভিয়ে দে— এক ফুঁয়ে!" বুদ্ধদেব এবং তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদ্-প্রণেতা ঋষিগণ কৃত্রিম কর্মকাণ্ডের পেষণ-যন্ত্র হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পরাকাষ্ঠা তপস্যা এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু নব্য হিঁদুয়ানির আপনি মণ্ডল মহোদয়েরা—যাঁহারা সংস্কৃত-ভাষার উচ্চারণ পর্যান্ত জানেন না, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে দিব্য একটি সরস নারিকেল পাইয়া—তাহার গাত্র হইতে রাশি রাশি ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দড়ি পাকাইয়া দেশের লোকের হাত পা বাঁধিবার কঠিন বন্ধন প্রস্তুত করিতেছেন ; এমনি আড়ম্বরের সহিত তাহা করিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়—কত না জানি দেশের উপকার সাধন হইতেছে—টিকিহীন মস্তকে টিকি গজাইতেছে— ফোঁটাহীন ললাটে ফোঁটা আবির্ভূত হইতেছে—বিলাত ফেরতারা গোবর খাইয়া তাহার প্রথম অক্ষর দিয়া মুখ-শোধন করিতেছেন— দেশের উপকার ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? ইঁহারা এই এতগুলো ব্যক্তি—আর জন্মিয়াছিলেন রামমোহন রায় একাকী একজন— দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য্য তুলনা করিয়া দেখিলে কি মনে হয়? মনে হয় যে—অসংখ্য তৃণরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত হইলেও তালগাছের মস্তক নাগাল পায় না। যে কারণে প্রাচীন-ভারত বুদ্ধদেবকে চিনিল না—ইহুদীরা ঈসাকে চিনিল না— সেই কারণেই বা রামমোহন রায়ের স্মৃতি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে ছাড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বিশ্ব-ব্যাপী মহান হৃদয়কে স্বদেশের বিদ্যা-দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা যখন সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়াও আঁকড়িয়া পাইলেন না, তখন তাঁহারা আপনাদের অপদার্থতা ঢাকিবার জন্য স্ব স্ব সংকীর্ণ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন "ওটা বিধর্ম্মী— ওকে দূর করিয়া দেও!" এবং সুযোগ পাইলে আজিও আপনি-মণ্ডলের দল ঐ কথার পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিতে ক্রটি করেন না!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগ-সোপানে যাঁহারা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী লোকদিগের নাগাল ছাড়াইয়া বেশী উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সেই পশ্চাদবর্ত্তী ভ্রাতাদিগকে আপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার জন্য নীচে হাত বাড়াইলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ধূলা-কাদা ইট-পাটকেল তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হয়।

অনুরাগ সোপানে যিনিই যত পংক্তিতে অবস্থিতি করুন্ না কেন —একটি নিয়ম কিন্তু সকলকেই মানিয়া চলিতে হয় ; সেটি এই যে, নীচের পইটা না মাড়াইয়া উপরের পইটায় পদনিক্ষেপ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি দেখি যে, একই সময়ে দুই ব্যক্তি যাত্রারম্ভ করিয়াছে অথচ একজন চতুর্থ পংক্তিতে— আর এক জন দ্বিতীয় পংক্তিতে, তবে আমি বলিব যে, প্রথম ব্যক্তির গতির বেগ দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা দ্বিগুণ; তবেই —এরূপ

কথা বলিব না যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পইটা ডিঙাইয়া এক মুহূর্তে চতুর্থ পইটায় উপনীত হইয়াছে। অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির একটি ধারাবাহিক প্রকরণ পদ্ধতি আছে— তাহা এই , — যে-কোনো ধাপের অনুরাগ যখনই অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার নীচের নীচের ধাপের কোনো অনুরাগই মরে না—কেহ বা এক পুরু, কেহ বা দুই পুরু, কেহ বা তিন পুরু, স্তরের নীচে জিয়োনো থাকে এবং জিয়োনো থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে। দেশানুরাগী ব্যক্তির দেশানুরাগের উত্তাপে তাহার কুলানুরাগ এবং গৃহানুরাগ শুখাইয়া মরে না—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা নবতর এবং কল্যাণতর বেশ ধারণ করে। যোদ্ধা বীর যুদ্ধের পূর্ব্বরাত্রিতে সমর-ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কোনো একটি চৌকি-পাহারা-স্থানে ঘুমাইয়া বাড়ির স্বপ্ন দেখে, তখন গৃহানুরাগ কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাহার পর দিন প্রত্যূষে রণ-ভেরীর তীব্র নিনাদে তাঁহার নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া তিনি যখন শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠেন, তখন বটে তাঁহার দেশানুরাগ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া গৃহানুরাগকে পশ্চাতে যাইতে বলে, — কিন্তু তখনও গৃহানুরাগ দেশানুরাগের বক্ষ-প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া বীরের সশস্ত্র বাহুতে মন্ত্রপূত অদৃশ্য তাগা এবং ইষ্ট-কবচ চুপিচুপি বাঁধিয়া দিতে থাকে।

অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম এই যে, প্রথমে নীচের ধাপের অনুরাগ বিকশিত হয়, —নীচের ধাপের অনুরাগ যখন বিকশিত হয়, তখন উপরের ধাপের অনুরাগ বিকাশোন্মুখ থাকে , তাহার পরে নীচের ধাপের সেই বিকাশ-প্রাপ্ত অনুরাগের মধ্য হইতে সার আকর্ষণ এবং অসার পরিবর্জ্জন করিয়া উপরের ধাপের সেই বিকাশোন্মুখ অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠে। যেমন দেখা যায় যে, মৃত্তিকার রসপান করিয়া মূল বর্দ্ধিত হয়, মূলের রস পান করিয়া অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়, অঙ্কুরের রস পান করিয়া শাখা বর্দ্ধিত হয়, শাখার রসপান করিয়া বৃন্ত বর্দ্ধিত হয়, বৃন্তের রসপান করিয়া পত্র পুষ্প ফল বর্দ্ধিত হয়; তেমনি, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগের খাইয়া মানুষ, কুলানুরাগ গৃহানুরাগের খাইয়া মানুষ, দেশানুরাগ কুলানুরাগের খাইয়া মানুষ, সার্ব্বদেশিক মনুষ্যানুরাগ দেশানুরাগের খাইয়া মানুষ , ঈশ্বরানুরাগ সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে। ইহার মধ্যে গুরুতর একটি মন্তব্য কথা এই যে, একদিকে যেমন বৃক্ষের মূল নীচে হইতে উপরে রস-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপোষণ করে এবং আর-একদিকে যেমন পল্লব-পুঞ্জ উপর হইতে আলোক শোষণ করিয়া সেই সঞ্চারিত রস-প্রবাহ পরিশোধন করে, তেমনি, নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগকে পরিপোষণ করে, উপরের ধাপের অনুরাগ নীচের ধাপের অনুরাগকে পরিশোধন করে। প্রাণানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিপোষণ করে, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগকে পরিশোধন করে , গৃহানুরাগ কুলানুরাগকে পরিপোষণ করে, কুলানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিশোধন করে ; সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরানুরাগকে পরিপোষণ করে, ঈশ্বরানুগ সমস্ত অনুরাগকে পরিশোধন করে। নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগ দ্বারা পরিশোধিত না হইলে তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠে ; আর এইরূপ বিষাক্ত অনুরাগকেই আমরা বলি—বিষয়াসক্তি অথবা কাম ; পক্ষান্তরে, নীচের ধাপের অনুরাগ যখন উপরের ধাপের অনুরাগ দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নির্ব্বিষ হয়, তখন তাহাকেই আমরা বলি প্রেম।

অনুরাগের পরিশোধন বলি কাহাকে? না অনুরাগ হইতে দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন—রক্ত হইতে মলাংশের পরিমার্জ্জন —অমৃত হইতে বিষাংশের পরিমার্জ্জন। ইহার উদাহরণ ; —

গৃহানুরাগের টান আপনার বাড়ির প্রতি সব চেয়ে বেশী ; তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইলে নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতিদিগের বাড়ির প্রতি বিরাগ এবং বিদ্বেষ তাহার সঙ্গের সঙ্গী হয় ; এইরূপে, এ-বাড়ির প্রতি অনুরাগ এবং ও বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ দুইই যখন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন গৃহানুরাগ হইতে সেই দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন অত্যাবশ্যক, — হইতে পারে তাহা কি উপায়ে? উপায় আর কিছু না, গৃহানুরাগের জানালা খুলিয়া কুলানুরাগের আলোককে ভিতরে পথ ছাড়িয়া দেওয়া। এ-বাড়ি এবং ও-বাড়ির মাঝখানে মনোমালিন্যের যত কিছু অন্ধকার—সমস্তই কুলানুরাগের আলোকে তিরোহিত হইয়া যায় ; কেন না, কুলানুরাগের চক্ষে এ-বাড়িও যেমন ও-বাড়িও তেমনি। গৃহানুরাগের চুম্বক ইতিবৃত্ত এই ; — প্রথমতঃ, আপনার এবং স্ত্রীপুত্র-পরিবারের প্রাণানুরাগ একত্র ঘনীভূত হইয়া গৃহানুরাগের মাটি প্রস্তুত হয় ; দ্বিতীয়তঃ, সেই ঘনীভূত প্রাণানুরাগ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া গৃহানুরাগ পরিপোষিত হয় ; তৃতীয়তঃ কুলানুরাগের আলোক-প্রভাবে গৃহানুরাগ হইতে তাহার দ্বেষাংশ পরিমার্জ্জিত হইয়া গিয়া তাহার রাগাংশ প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা যখন হয়, তখন এ-বাড়ি যেমন আপনার, ও-বাড়িও তেমনি আপনার হইয়া দাঁড়ায়। গৃহানুরাগের পৈঠায় এ যেমন দেখা গেল— কুলানুরাগের পৈঠাতেও তাই ; আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যত কিছু মনোমালিন্যের জ্বর-জ্বালা—দেশানুরাগের আলোক-রশ্মিই তাহার একমাত্র মহৌষধি। কুলানুরাগের আলোক রশ্মিতে যেমন গৃহানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়, দেশানুরাগের আলোকরশ্মিতে তেমনি কুলানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায় ; এবং ঈশ্বরানুরাগের আলোক-রশ্মিতে সমস্ত অনুরাগেরই দোষ খণ্ডিয়া যায়। এক কথায়—অনুরাগ যতই উচ্চ হইতে উচ্চ পৈটায় পদনিক্ষেপ করে, ততই তাহার দ্বেষাংশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং রাগাংশ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি জোড়-মিলানো শব্দ আছে—তাহার মধ্যে রাগ-দ্বেষ একটি। সংসার-ক্ষেত্রে যাঁহাতক রাগ তাঁহাতক দ্বেষ ; যাঁহাতক ভালবাসা, তাঁহাতক বিবাদ বিচ্ছেদ মারামারি লাঠালাঠি। আপনার প্রতি এবং আপনার আশ্রিত লোকের প্রতি যেখানেই অনুরাগের বাড়াবাড়ি অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সেইখানেই বিরাগের বাড়াবাড়ি ; যেখানে আমিটি এবং আমারটি সর্ব্বস্ব, সেখানে অবশিষ্ট জগৎ শত্রুপক্ষেরই সামিল।

আমিটি এবং আমারটি আর সব ভাল কেবল টি-টাই (অর্থাৎ সংকীর্ণ ভাব-টাই) বিষের খানি। অনুরাগের নীচের নীচের পইটাতেই ঐ বিষদাঁতটি নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে—উচ্চ উচ্চ পইটায় উহার তেজ ক্রমশই নরম পড়িয়া আসিতে থাকে ; অনুরাগের সর্বোচ্চ মঞ্চে ঐ বিষ-দাঁতটি একেবারেই খসিয়া পড়ে। বিষ-দাঁতের আকার-প্রকার ভাবভঙ্গীতেই তাহার বিষের অনেকটা কাজ এগোয় ; — গৃহানুরাগ বিষ-দাঁত বাহির করিয়া আর কিছু না বলিয়া কেবল মাত্র যদি বলে "এরা আমার বাড়ির ছেলে মেয়ে, এদের গায়ে হাত তুলিও না" তবে তাহার অর্থই এই যে, আর কারো বাড়ি বাড়িই নহে। কুলানুরাগ যখন বিষদাঁত বাহির করিয়া বলে 'আমি ব্রাহ্মণ—নৈকষ্য কুলীন—অমুকের সন্তান।" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি আমার পায়ের যোগ্য নহ। দেশানুরাগ যখন বিষ-দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ইংরাজ" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি নিগর—তা তুমি লোহার আফ্রিকা দেশেই থাকো আর সোনার ভারতবর্ষেই থাকো, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। এইরূপ যেখানে যত পৃথিবীর

ভালবাসা তাহারই সঙ্গে বিদ্বেষ এবং অহঙ্কারের বিষ মিশানো রহিয়াছে ; আর, অনুরাগের সঙ্গে এইরূপ অন্ততঃ দু-ফোঁটা এক-ফোঁটা বিষ মিশানো না থাকিলে পৃথিবীর জিহ্বায় তাহা আলুনি আলুনি ঠেকে। তবে, অনুরাগ-সোপানের নীচের নীচের ধাপে বিষের যেমন সাঙ্ঘাতিক প্রকোপ—উপরের উপরের ধাপে তা অপেক্ষা তাহা মাত্রায় অনেক কম ; তা ছাড়া, অনুরাগের সর্বোচ্চ শিখরে বিষের নাম-গন্ধও থাকিতে পারে না।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন্ অনুরাগ সম্পূর্ণ রূপে নির্বিষ, তবে তাহার এক উত্তর এই যে, ঈশ্বরানুরাগ ; তা ভিন্ন — আর আর সমস্ত অনুরাগই জগৎসংসারকে দুই পক্ষে বিভক্ত করে — আত্মপক্ষ এবং পরপক্ষ। কারো কাছে "আমিটি"ই কেবল আপনার — আর সকলেরই পর ; কারো কাছে, আমিটি স্ত্রীটি পুত্রটি কন্যাটি ভাইটি ভগ্নীটি পর্যন্ত আপনার — তদ্ভিন্ন আর সকলেই পর। কারো কাছে আমিটি হইতে আপনার স্বজাতি পর্যন্ত আপনার, তাহার ওদিকে সকলেই পর ; কারো কাছে আমি-টি হইতে স্বদেশ পর্যন্ত আপনার, তাহার ওদিকে সকলেই পর। এই প্রণালীতে লোকে অনুরাগ সোপানের নীচের নীচের পইটা হইতে উপরের পইটায় পদার্পণ করিতে থাকিলে তাহার আত্ম-পক্ষ ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতে থাকে — তাহাতে আর ভুল নাই ; কিন্তু পক্ষিশাবক যত দিন না মুক্ত আকাশে উড়িতে শেখে, ততদিন তাহার পক্ষ বিস্তারের প্রকৃত সার্থকতা হয় না ; তত দিন তাহার উত্থানের সঙ্গে পতন জোড়া লাগানো থাকে ; — লোকে যতদিন না ঈশ্বরানুরাগের মুক্ত সমীরণে উত্থান করে, ততদিন তাহার আত্মপক্ষের সঙ্গে একটা না একটা পরপক্ষ জোড়া লাগানো থাকিবেই চায় ; ততদিন হয় এ-বাড়িরদ্বারের সম্মুখে ও-বাড়ি — নয় এ-জাতির দ্বারের সম্মুখে ও-জাতি, নয় এদেশের দ্বারের সম্মুখে ওদেশ, অষ্টপ্রহর চক্ষু রাঙাইয়া দাঁত মুখ খিঁচাইতে থাকে। কেবল ঈশ্বরানুরাগের পইটায় জগৎশুদ্ধ সকলেই আত্ম-পক্ষীয়— সেখানে পর পক্ষের মূলেই দাঁড়াইবার স্থান নাই ; ইহার কারণ এই যে, স্বদেশীয় রাজ্যের বাহিরে যেমন বিদেশীয় রাজ্য—ঈশ্বরের রাজ্যের বাহিরে তাঁহার সেরূপ কোনো প্রতিপক্ষের রাজ্য স্থান পাইতে পারে না, যেহেতু ঈশ্বর আত্মপর সমস্ত ব্যাপিয়া সমস্তেরই মূলে এবং সমস্তেরই অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির একটি প্রধান পরিচয় লক্ষণ এই যে, ত্রিজগতে কেহই তাঁহার পর নহে ; তাহার সাক্ষী চৈতন্য মহাপ্রভু মুসলমানকে দলে লইতে ডরান নাই—রামমোহন রায় বিলাতে যাইতে ডরা'ন্ নাই—ঈশা জেলে মাল্লা এবং পবলিকান্ প্রভৃতি ঘৃণিত-সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে ডরা'ন্ নাই। কিন্তু হিঁদুয়ানির বড়াই যাঁহাদের ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা পরিচয়-লক্ষণ, এবং বিজাতির প্রতি বিরাগ যাঁহাদের বৈরাগ্যের চরম-সীমা—তাঁহাদের ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্য ঐ পর্যন্ত। ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগৎ-সংসারের মধ্য হইতে একটি কোনো ব্যক্তি অথবা একটা কোনো পরিবার বা জাতি বা দেশ বাছিয়া লইয়া তাহাতে বিশেষরূপে আসক্ত হওয়ার নামই লোক জানে অনুরাগ-বন্ধন ; কিন্তু যে বিশ্বব্যাপি অনুরাগ কাহাকেও না বাছিয়া সকলেরই প্রতি সদ্ভাবের ক্রোড় পাতিয়া দেয়—তাহাকে চক্ষের সমক্ষে বিরাজমান দেখিলেও খুব একজন পাকা জহুরী ব্যতীত কে সে লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না ; — তাহার মুখের পানে তাকাইয়া লোকে ভাবে যে "এ আবার কিরূপ অনুরাগ? সকলকে ছাড়িয়া একজনকে ভালবাসার নামই তো আমরা জানি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা ; সকলকে ভালবাসা আবার

কিরূপ? সকলকে ভালবাসা, আর, কাহাকেও ভাল না বাসা, দুইই সমান ; এ তো অনুরাগ নহে এ একপ্রকার বিরাগ ; একে আমরা বৈরাগ্য বলিতে পারি — অনুরাগ কোনো মতেই বলিতে পারি না।" বাস্তবিক এই কারণেই ঈশ্বরানুরাগের নাম হইয়াছে — বৈরাগ্য।

ঈশ্বরানুরাগ তো দূরের কথা—আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহ-পত্নীরা দেশানুরাগকে অনুরাগ বলিয়া কখনই স্বীকার করিবেন না, তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলিবেন "ও মা! সোনার স্ত্রী-পুত্র নাতি নাত্নী ফেলিয়া যে লোক যুদ্ধে যাইতে পারে — যে সবই পারে, তাহার প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন— তাহার আবার অনুরাগ!" এইরূপ দেশানুরাগকেই যখন লোকবিশেষে অনুরাগ বলিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন ঈশ্বরানুরাগকে অনুরাগ না বলিয়া বৈরাগ্য বলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর, সাধারণ লোকের মধ্যে যে বস্তুর যে নাম রাষ্ট্র—সমজদার জহরী লোক সেই বস্তুকে সেই নামে নির্দ্দেশ করিতে অগত্যা বাধ্য হ'ন—কেননা, তাঁহারা তাহা না করিলে লোকে তাঁহাদের কথার ভাবই বুঝিতে পারিবে না।

ঈশ্বরানুরাগ কি অর্থে বৈরাগ্য এবং কি অর্থে তাহা অনুরাগের চরমসীমা তাহা এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে ; — শুদ্ধ কেবল আমি-টি এবং আমারটি লইয়া অনুরাগের যে-একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাহার প্রতি বিরাগ— এই অর্থে তাহা বৈরাগ্য ; আর, সমস্ত জগতের প্রতি অনুরাগ এবং আনুষঙ্গিকভাবে আমিটি আমারটির প্রতিও অনুরাগ (কেননা আমিটি আমারটিও জগতের এক কোণে প্রাণধারণ করিতেছে), — এই অর্থে তাহা অনুরাগের চরম সীমা। অন্তঃকরণে ঈশ্বরানুরাগ উদিত হইলে— সমস্ত জগতের সহিত আমিটি এবং আমারটি সুর মিলিয়া গিয়া, তাহার ঐ বেসুরা ঝঙ্কারটি—টি-ধ্বনিটি—পাতালে বিলীন হইয়া যায়।

টি ধ্বনিটি আর কিছু না—বিষয়াসক্তি। বিষয়-শব্দের অর্থই হ'চ্চে— মন যাহাতে ভর দিয়া শয়ন করে—মনের একপ্রকার বালিশ , সাধু ভাষায় যাহাকে বলে উপাধি। কোনো একটি পরিমিত বিষয়ে মনের আসক্তি বসিয়া গেলে, মনকে সেখান হইতে টানিয়া তোলা দায়; কাজেই, সেই বিষয়টির সীমার বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিতি করে তাহার প্রতি বিরাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। বিষয়াসক্তি এইরূপ বিরাগ-মিশ্রিত অনুরাগ ; বিদ্বেষ-মিশ্রিত, অহঙ্কার-মিশ্রিত, অনুরাগ , তাই আমরা তাহার নাম দিতেছি বিষাক্ত অনুরাগ। বিষয়াসক্তির আর এক নাম কাম ; —এইজন্য ঈশ্বরানুরাগকে আমরা বলি নিষ্কাম অনুরাগ, অথবা যাহা একই কথা—বিশুদ্ধ প্রেম।

অনুরাগ সোপানের যত উচ্চে ওঠা যায়, ততই অনুরাগের বিষের ভাগ কম পড়িয়া আসে, তাহার প্রমাণ এই যে, আদুরে ছেলের মায়ের বিষ অপেক্ষা, পাড়াগেঁয়ে কুলীন-সম্প্রদায়ের বিষ মাত্রায় কম ; কুলীনের কুলোপানা চক্রের ফোঁস-ফোঁসানি অপেক্ষা মানোয়ারি গোরার মুখের বিষ অনেক কম, হদ্দ ড্যাম্ নিগর-টা আস্‌টা—তার বেশী নয়। তাও আবার—অর্দ্ধেক মুখে, অর্দ্ধেক পেটে! পিতৃ-মাতৃ উচ্চারণ পূর্ব্বক পাড়া সরগরম করা কুলীন সন্তানদিগেরই একচেটে পৈতৃক সম্পত্তি। এটা সত্য যে, কুলীনের মুখের আস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ বই নয়— গোরা লোকের বাল্যক্রীড়া কালা-লোকের মৃত্যু! কিন্তু হইলে হইবে কি—এটাও তেমনি দেখিতেছি যে, ষাঁড়ের শৃঙ্গের আঘাতে মানুষ মারা পড়ে, কেটো পিঁপড়ের কামড়ে কাহারো বিশেষ ক্ষতি হয় না ; অথচ বিষাক্ত বলিতে আমরা কেটো পিঁপড়ের কামড়কেই বিষাক্ত বলি—শৃঙ্গের আঘাতকে নহে। অধিক কি আর বলিব, দেশানুরাগের

গালাগালিও দেশ-ঘটিত, কুলানুরাগের গালাগালি কুল-ঘটিত! কুলানুরাগীর প্রধান গালাগালি হ'চ্চে বাপান্ত—দেশানুরাগীর প্রধান গালাগালি হ'চ্চে দেশান্ত—যেমন ড্যাম্ নিগর প্রভৃতি সাদর সম্ভাষণ! অতএব এটা স্থির যে, অনুরাগ যত উচ্চ হইতে উচ্চে পদার্পণ করে, ততই তার বিষ নরম পড়িয়া আসিতে থাকে, আর যতই তাহা সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণ কোটরে প্রবেশ করিতে থাকে ততই তার বিষ-দাঁত গজাইয়া উঠিতে থাকে।

নিষ্কাম কর্ম্ম আর কিছু না — নির্ব্বিষ অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক, তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম, আর, বিষাক্ত অনুরাগ যাহার মূল প্রবর্ত্তক তাহারই নাম সকাম কর্ম্ম। দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ আপনার উদর-পূরণের জন্য কার্য্য করে, আর এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ স্ত্রী-পুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কার্য্য করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য প্রথম ব্যক্তির কার্য্য অপেক্ষা বেশী নিষ্কাম তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। অতএব ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না যে, অনুরাগ-সোপানের যিনি যত উচ্চ পৈঁঠায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার কার্য্য সেই পরিমাণে নিষ্কাম পদবীতে সমুত্থান করে। তবেই হইতেছে যে, ঈশ্বরানুরাগ যে কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক তাহাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম শব্দের বাচ্য।

অতঃপর প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সাধনের মধ্যে ভেদাভেদ কিরূপ তাহা বলিবামাত্রই বুঝিতে পারা যাইবে। যথা, —

কুলানুরাগের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভবপর, আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তিদিগের সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। আর দেশানুরাগের বিশাল পরিধির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর, প্রতীচ্য দেশে সাধনার দৌড় সেই পর্য্যন্ত। সংক্ষেপে, — প্রতীচ্য ভূখণ্ডের দেশানুরাগ, এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডের কুলানুরাগ, হিতানুষ্ঠানের মূল-প্রবর্ত্তক।

এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, এক্ষণে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের মনে অল্প অল্প করিয়া দেশানুরাগের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা-গতিকে কুলানুরাগের পরাক্রম দিন দিন খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া চারিদিক্ হইতে মুহুর্মুহু এইরূপ একটা ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে যে "সব গেল, সব গেল, কিছুই আর থাকে না!" কাঁদুনি-গায়কদিগের জানা উচিত যে, এক রাজার মৃত্যু হইলে আর এক রাজা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, ততক্ষণ দেশের অরাজক-অবস্থা অনিবার্য্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কে এমন নির্ব্বোধ যে, সেই অরাজক-অবস্থার প্রতিবিধান-মানসে মৃতরাজাকে চিতা হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঠেকো দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাখে! কুলানুরাগ এবং দেশানুরাগ দুয়ের মাঝখানে অরাজকতার মুলুক ইহা আমরা বিলক্ষণই দেখিতেছি ; কিন্তু তার সঙ্গে এটাও দেখিতেছি যে, নবাঙ্কুরিত দেশানুরাগকে দাবিয়া রাখিয়া কুলানুরাগকে সিংহাসনে বসাইতে যাওয়া বৃথা পণ্ডশ্রম। দেশানুরাগ যদি কুলানুরাগের নীচের পইঁটা হইত, তাহা হইলেই উপদেষ্টার মুখে এই কথা শোভা পাইত যে, "হে ভ্রাতৃগণ দেশানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া কুলানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর!" কিন্তু বাস্তবিক তো আর তাহা নহে—কুলানুরাগ তো দেশানুরাগের উপরের পইঁটা নহে— দেশানুরাগই কুলানুরাগের উপরের পইঁটা, কাজেই উপদেষ্টার মুখে উল্টা আরো এই কথাই শোভা পায় যে, "কুলানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া দেশানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর।"

কিন্তু আমাদের দেশে দেশানুরাগের বড়ই এক্ষণে দুর্গতি। এক্ষণে আমাদের দেশের বালকেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পোনের-ষোলো বৎসর ধরিয়া কুলানুরাগ ডিঙাইয়া দেশানুরাগের ইতিবৃত্ত-সকল প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতে থাকে ; অথচ দেশানুরাগ যে কি পদার্থ তাহা তাদের হৃদয়ে পৌঁছে না— কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা গোলযোগ বাধাইয়া তোলে। দেশীয় দলপতিদিগের আবরণের মধ্যে তাহারা স্বার্থের মায়াবী রাক্ষসমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে এবং ঐতিহাসিক মহাত্মা-দিগের যশোরশ্মির অভ্যন্তরে তাহারো নিঃস্বার্থ মহত্ত্বের দেবমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছে—আর এখন তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা দায়! কিন্তু হইলে হইবে কি— দেশানুরাগের পথঘাট সমস্তই তাহাদের নিকটে অপরিচিত ; কুলানুরাগের হস্তাবলম্বন ছাড়িয়া — যেমন তাহারা দেশানুরাগের পইটায় পা দিবার উপক্রম করিতেছে— আর অমনি তাহাদের পা পিছলিয়া তাহারা নীচের ধাপে নামিয়া পড়িতেছে ; কুলানুরাগ হইতে তাহারা উঠিবে কোথায় দেশানুরাগে— নামিয়া পড়িতেছে গৃহানুরাগে! ইহা দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন-সম্প্রদায়েরা এই বলিয়া মুহুর্মুহু বিলাপ করেন যে, এখনকার লোকে কেবল আপনি এবং আপনার পরিবার বোঝে।

আসল কথা এই যে, দেশানুরাগকে আমরা যে, হাত বাড়াইলেই মুঠার মধ্যে পাইব এরূপ এক্ষণে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। ইউরোপে কুলানুরাগের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া তবে দেশানুরাগ জয়ী হইতে পারিয়াছে। ইউরোপের তামসিক মধ্যম অব্দে রাজ-বংশীয় লোকেরা কুলের পক্ষ হইয়া এবং অপর সাধারণ লোকেরা দেশের পক্ষ হইয়া আপনাদের কত না রক্তারক্তি করিয়াছে! এইরূপ অনেক বর্ষের অনেক রক্তারক্তির পর দেশনুরাগ চরমে জয়লাভ করাতে তাহারই গুণে ইউরোপ এক্ষণে ইউরোপ হইয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক তাহার বিপরীত; — আমাদের দেশে কুলানুরাগই দেশানুরাগের উপরে জয় লাভ করিল; ব্রাহ্মণদিগের পাকচক্রে বুদ্ধের সমস্ত সংকল্প তাঁহার জন্মভূমিতে নিষ্ফল হইল ; সাধারণ প্রজামণ্ডলীর উপরে কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল; সনাতন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অরণ্যে প্রস্থান করিল; এবং লোকসমাজে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের যজনযাজন একাধিপত্য করিতে লাগিল।

কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি ; —অতীতকালে যাহা ছিল তাহা ছিল— যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে—তাহার জন্য ভাবিয়া কোনো ফল নাই। বর্ত্তমান কালে আমাদের আছেই বা কি আর আমাদের করিতে হইবেই বা কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

আমাদের আছে যাহা, তাহা ভরপূরই আছে ; নাই যাহা তাহা মূলেই নাই ; আছে কী? না কুলানুরাগ ; নাই কী? না দেশানুরাগ।

এক্ষণে আমরা, করিব তবে, কী? আমরা কি দেশানুরাগের মায়ামৃগ অনুসরণ করিয়া সারা হইব? তাহা যদি করি—তবে কুলানুরাগের সীতা হারানো এবং সেই সঙ্গে এককূল ওকূল-দুকূল হারানো—আমাদের ললাটে অবশ্যম্ভাবী। অকর্ম্মণ্য কুলানুরাগ যদিচ আমাদের দেশের একপ্রকার জ্বর-বিকার, কিন্তু জ্বর ছাড়িলেই নাড়ি ছাড়িবে—এইটি জানিয়া—বুঝিয়া-সুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশ হইতে উচ্চবংশীয় লোকের জাতীয় গৌরব সমূলে উচ্ছিন্ন হইলে—যাহা আমাদের ছিল তাহাও যাইবে, যাহা আমাদের চাই তাহাও পাইব না ; তাহা হইলে আমাদের পৌত্রানুপৌত্রেরা এই বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করিবে

যে, ছিলেন মানুষ, হইতে গেলেন দেবতা, হইয়া পড়িলেন (Darwin-এর মতানুযায়ী) মানুষের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ!

তবে কি আমরা কুলানুরাগকেই সর্ব্বস্ব করিব? তাহা যদি করি তাহা হইলে প্রবল কাল-স্রোতের উজানে আমাদের সমাজের গতি হইবে—জ্ঞানের আলোক নিভিয়া যাইবে—মোহান্ধ কুল-গরিমা নৌকার হাল ধরিয়া মাঝি হইয়া বসিবে ; সেই অন্ধ আনাড়ির হাতে আমরা যদি ধন প্রাণ সঁপিয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকি— তবে নৌকাডুবি অনিবার্য্য!

আমাদের দেশ এক্ষণে দ্বেষ হিংসার তরঙ্গে দোদুল্যমান ভীষণ সমুদ্র , তাহা হইতে ভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া কুলেই আমরা মনে করিতেছি নিরাপদ কূল , — দূর হইতে আমাদের এইরূপ মনে হয় বটে— কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, কূল যে অতি ভয়ানক স্থান— নিবিড় অন্ধকার সেখানে নির্ভয়ে বসতি করিতেছি— তাহা ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং সর্পের বহুকালের আশ্রয়-দুর্গ।

বাস্তবিক, কুলানুরাগ দেশানুরাগের নীচের পইটা বই উপরের পইটা নহে।

ইউরোপীয়েরা দেশানুরাগের উত্তেজনায় কেমন অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব মহৎ মহৎ কার্য্য সাধন করে এবং কেমন অবলীলাক্রমে তাহা করে— তাহা আমরা প্রত্যহই চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি , কিন্তু কুলানুরাগের উত্তেজনায় আমরা কি করি? করিবার মধ্যে করি কেবল—গাঁয়ে মানে না আপনি মণ্ডল হইয়া হিঁদুয়ানির প্রচার, অথবা যাহা একই কথা—হিঁদুয়ানির শ্রাদ্ধ! কখনো বা আমরা বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা হই—তখন আমাদের প্রতাপ দেখে কে? এ'কে জাতে তুলিতেছি— ও'কে জাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি— এ'র নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতেছি— ওকে চালাইয়া লইতেছি— এইরূপ গুরুতর রাজকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া (মহাবীর ডনকুইক্সোট্ আমাদের কাছে কোথায় লাগে!) আমরা আপনা-আপনাকে সিংহ শার্দ্দূল অপেক্ষাও বড় মনে করিতেছি। কুলানুরাগ হইতে আমাদের দেশে কার্য্য বড় জোর এই যা সম্ভবে— এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভবে না।

যদি বল "দেশানুরাগ!" তবে তাহার এখনো ঢের বাকি— আমাদের দেশে তাহার গোড়াপত্তনও হয় নাই। দুঃখের কথা কি বলিব— আমাদের স্বদেশানুরাগও আমাদের স্বদেশীয় সামগ্রী নহে। বিলাতি ধুতির ন্যায় আমাদের বিলাতি স্বদেশানুরাগ ইংরাজি দোকানে খুব সস্তাদরে বিক্রীত হইতেছে—টাকাটা সিকেটা খরচ করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে , — টাকাটা সিকেটা এখানে আর কিছু না—বামন-কায়তের কুল মর্যাদা— তাহার বিনিময়ে আমাদের দেশের আপামর সাধারণ যে-সে লোকে মনে করিলেই "পেট্রিয়ট" নাম ক্রয় করিতে পারে। এরূপ দেশানুরাগ জিনিস খুব সস্তা বট কিন্তু তাহার কিসমোল্লায় গলদ্! বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশানুরাগ, আর, সোনার পাথরবাটি, দুয়ের মধ্যে তিল-মাত্রও প্রভেদ নাই।

এই বিষম সংকটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে— সেটি আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না ; সেটি পলিসীর পথ নহে কিন্তু সত্যের পথ—ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ। এইস্থলে আমি বিনীতভাবে শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে এই একটি আগ্রহ ভিক্ষা চাই—যেন ভগবদ্ভক্তি বলিতে তাঁহারা কেহ প্রতিমা-পূজা অথবা মানুষ-পূজা না বোঝেন, আর, বৈরাগ্য বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বা'র হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিষদের

বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভগবদ্গীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবদ্ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই আমি এখানে বলিতেছি ভগবদ্ভক্তি ; আর তিনি যেরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগ্য।

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দেও—তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মিবারই অবকাশ পায় নাই ; এক্ষণে আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির যত কিছু সংসার-ধর্ম, কুলানুরাগই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক, তা বই, বৈরাগ্য আমাদের দেশে নিষ্কামকর্ম্মের প্রবর্ত্তক দাঁড়াইয়াছে। বৈরাগ্যের বাগ ফিরাইয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় নিযুক্ত করা সকল কাজের সেরা কাজ— এই কাজ এখনো আমাদের আপনাদের হাতে রহিয়াছে।

কুলানুরাগ এপক্ষের নির্ভরস্থল, দেশানুরাগ ও-পক্ষের নির্ভরস্থল ; বৈরাগ্য অনুভয়-পক্ষের নির্ভর স্থল। বৈরাগ্যের মুক্ত-সমীরণ ক্ষণকালের জন্যও যদি আমরা সেবন করি, তবে আমরা বাহিরে পরাধীন হইলেও অন্তরে স্বাধীন হই ; — সে সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে আমাদের ধড়ে প্রাণ আসে— তাহা মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধা-সিঞ্চনে প্রাণ পাইলে মনুষ্য না করিতে পারে এমন অসাধ্য কাজই নাই। দেশানুরাগী ব্যক্তি কামান বন্দুক দিয়া বিদেশ জয় করে— এই পর্য্যন্ত; —ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি হৃদয়ের অনুরাগ দিয়া পৃথিবী জয় করেন। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি যখন অনুভয় পক্ষের মুক্ত সমীরণ হইতে উভয় পক্ষের মধ্য-স্থলে অবতীর্ণ হইয়া সকল-পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন, তখন্ কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এইরূপ উচ্চ অঙ্গের নিষ্কাম-সাধনা কাহাকে বলে তাহা যদি কার্য্যে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে চাও, তবে রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ কর। উভয়-পক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া বিদ্বেষকে অনুরাগ-দ্বারা জয় করিতে হয়—অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হয়— পরকে আপনার করিতে হয়, স্বদেশীয় গুণের উচ্ছ্বাস দ্বারা বিদেশকে বশীভূত করিতে হয়, —তাঁহার জীবনচরিতের প্রত্যেক পত্র এবং প্রত্যেক ছত্র তোমাকে তাহার সন্ধান বাৎলিয়া দিবে। ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধি-মন্দির দেখিয়া ভয় পাইও না, যতদিন সেখানে তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাঁহার মন তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে পড়িয়া রহিয়াছিল ; ততদিন—তাঁহার গাত্রে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ এবং কণ্ঠে স্বজাতীয় উপবীত, দুয়ে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিস্মৃত হ'ন নাই ; অথচ তিনি স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের কৈলাস-শিখরে দেবতাগণের সহিত একত্রে ব্রহ্মগান করিতে ছিলেন ; তাহার সাক্ষী—সমুদ্রের মাঝখানে "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি; দেশভেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ; তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী।" এ গীত তাঁহারই হস্ত দিয়া এবং তাঁহারই কণ্ঠ দিয়া বাহির হইয়াছিল।* ব্রাহ্মণ জাতির প্রধান ধর্ম্ম যে অধ্যয়ন অধ্যাপন দেবারাধনা এবং পরোপকার,

* যাঁহারা পলিসী-সূত্রে উপবীত ধারণা করেন তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক, রামমোহন রায় সে দলের লোক ছিলেন না—ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রামমোহন রায় অবশ্য এটা জানিতেন যে, উপবীত রাখিলেও স্বর্গ-লাভ হয় না, উপবীত ফেলিয়া দিলেও জাত যায় না। বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত এই যে, কোনো একটি গতিশীল ব্যাপার নীচের পইটা ছাড়াইয়া উপরের পৈটায় উঠিলে নীচের পইটার কতকগুলি অবয়বের ছাপ তাহার গায়ে লাগিয়া থাকে—যদিচ বর্ত্তমান পৈটায় তাহা আদবেই

তাহাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি এ দেশ এবং একাল দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া যে চকিতের মধ্যে দুই পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন — দেখিয়া মনে হয় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ; তাহা বলিয়া তাহা কৃত্রিম পলিসীর কোনো ধার ধারে না; তাহা অকৃত্রিম অনুরাগের স্বভাব-সুলভ কার্য্য নৈপুণ্য। তাহা প্রতিভার কন্যা— প্রত্যুৎপন্নমতি। দুর্বুদ্ধি-কন্যা আত্মবর্ত্তিনী পলিসী, সেই স্বর্গীয় দেব-কন্যাটির মতো সাজ-গোজ করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে পারে— কিন্তু তাহার মুখাবরণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম—দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পলিসীবেত্তারা সকলেই বুঝিতেছেন যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, খোট্টা বাঙ্গালির মধ্যে এবং আর আর সহোদর জাতিগণের মধ্যে হামামা কোনো মতে চুকিয়া যাইতে পারিলে ভারতভূমির হাড়ে বাতাস লাগে ; কিন্তু কেমন করিয়া যে, তাহা হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না; একা কেবল রামমোহন রায়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন— তিনি তাঁহার দূরদর্শী প্রজ্ঞা-নয়নে স্পষ্টাকারে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে একেশ্বর-বাদের জয়-ধ্বজার অধীনেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালি খোট্টা শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে, মাতা— ভারতভূমি। পিতা— স্বয়ম্ভূ ভগবান! ইউরোপীয় জাতিদিগের যত কিছু মহত্ত্বের সাধনা সমস্তই প্রধানতঃ দেশানুরাগেরই উত্তেজনা , রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্ধান করিলেনঃ তাঁহার কাজ ফুরাইল— আর তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? এমন একজন মনুষ্য সে দিন আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবুও আমরা তাঁহাকে ঘূণাক্ষরেও চিনিতে পারিলাম না—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া একফোঁটাও অশ্রু বর্ষণ করিলাম না—অথচ আমরা "যায় সেকাল হায় সেকাল" করিয়া বুক চাপড়াইয়া রাস্তার মাঝখানে নতুন একতরো হাসেন হোসেনকে আসরে নামাইতেছি—ইহাতে হাসিব কি কাঁদিব ঠিক করিয়া ওঠা দায়! হাসেন হোসেনের নাট্যাভিনয় যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। রামমোহন রায় যে-পথে নিশান ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন সেই পথের অনুযাত্রী হও। ফালতো মায়া-কান্না মায়া-ভক্তি মায়া চাতুরী ছাড়ো—পলিসী ছাড়ো। সাহসে ভর করিয়া এপক্ষ এবং ওপক্ষের মধ্যস্থলে, এদেশ এবং একালের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হও , সেই বিবাদী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় কর—অনুরাগ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কর—মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে জয় কর—এইরূপ কর যে, দেশের তাহাতে মঙ্গল হইবে—কুলের তাহাতে মঙ্গল হইবে—পৃথিবীর তাহাতে মঙ্গল হইবে।

---

কোনো কাজে লাগে না , বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ইহাকে বলে atavism। সর্প-টিকটিকির জাত ; তাঁহার আদিম পূর্ব্ব-পুরুষদিগের পা ছিল এরূপ অনুমান হয় ; কিন্তু এখন সর্প বিনা পায়ে চলিতে পারে — সুতরাং এখন তাহার পা থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা , না থাকিলে বরং তাহার শরীর হাল্কা হয় , কিন্তু তথাপি পূর্ব্বকালের স্মারক চিহ্ন-রূপে সর্পশরীরের যথাস্থানে পদদ্বয়ের অঙ্কুর এখনো পর্য্যন্ত খোলস ঢাকা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় যদিচ কুলানুরাগের গৈঁঠা ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে উঠিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার কুল-মাহাত্ম্যের একটি স্মারক-চিহ্ন তাঁহাকে দংশিয়া ধরিয়াছিল—কেবল স্বভাবের প্রভাবে ; তা বই — তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা কিছুই ছিল না— পলিসী কিছুই ছিল না।

# বিদ্যা এবং জ্ঞান

যদি-চ একক্ষণে আমার শরীর ইচ্ছানুরূপ কণ্ঠের দৌড় দেওয়াইতে পারিবার মতো সবল নহে, তথাপি এই উপলক্ষে কয়েকটি ভাবিবার বিষয় দেশস্থ বিজ্ঞজনের (বিশেষতঃ অধ্যেতৃজনের) জ্ঞান গোচর করিবার প্রত্যাশায় বহুদিনের পর আমি আজ এইরূপ কৃতবিদ্য-মণ্ডলীর মাঝখানে প্রবন্ধ-হস্তে সমাগত হইয়াছি। আমার বক্তব্য বিষয়টির সংজ্ঞা নির্ব্বাচনের দায় এড়াইবার জন্য আমি সোজা কথা বাছিয়া বাছিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের নাম দিয়াছি বিদ্যা এবং জ্ঞান। কিন্তু তবুও শ্রোতৃবর্গের মনোমধ্যে এইরূপ একটা তর্ক উঠিতে পারে যে, বিদ্যা এবং জ্ঞান এক না দুই। এ তর্কের মীমাংসাকার্য্য লোকের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়াই পরামর্শ-সিদ্ধ, কেন না, লোকের ভাষা লোকে যেমন জানে, এমন আর কেহই না। লোকে কি বলে?

যাঁহারা বিদ্যাধনে ধনী, তাঁহাদিগকে বলে সুপণ্ডিত, যাঁহারা জ্ঞানরত্নের খনি, তাঁহাদিগকে বলে পরম জ্ঞানী ; যাঁহারা দুই-ই একাধারে, তাঁহাদিগকে বলে সোনায় সোহাগা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যা এবং জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ অবশ্যই কিছু-না-কিছু আছে। সেই প্রভেদটির গুরুত্বের প্রতি আমি আজ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব মনে করিয়াছি; আর সেই সঙ্গে বিদ্যা এবং জ্ঞানের দুই বিভিন্ন পথের ঠিকানা নির্দেশ করিব, এটাও আমার একটা মনোগত অভিপ্রায়।

বিদ্যা নানা, আর, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা ভিন্ন সত্যের অনুশীলনে ব্যাপৃত। জ্ঞান এক, আর সেই এক জ্ঞানের লক্ষ্য যেমন এক—পথও তেমনি এক। এক-জ্ঞানের লক্ষ্য এক অদ্বিতীয় মূল সত্য এবং তাহার এক পথ—অধ্যাত্মযোগের সাধন। বিদ্যার পথ হচ্ছে অন্বয়-ব্যতিরেকের পথ, জ্ঞানের পথ হচ্ছে যোগের পথ। বলিলাম অন্বয়-ব্যতিরেকে; তাহা পদার্থটা কী? পদার্থ তাহা আর কিছু না, জ্ঞাতব্য বস্তুতে স্বজাতীয় লক্ষণের অন্বয় (যেমন জলেতে তরলতা লক্ষণের অন্বয়) আর সেই সঙ্গে তাহা হইতে কি জাতীয় লক্ষণের ব্যতিরেক (যেমন জল হইতে কাঠিন্য লক্ষণের ব্যতিরেক)। বিদ্যা এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকের প্রণালী অনুসারে আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বস্তু সকল পৃথক পৃথক করিয়া অবধারণ করে।

একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, তদ্দৃষ্টে সহজেই বিদ্যা এবং জ্ঞানের দ্বিবিধ পথের ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারিবে।

বিদ্যা-বিহীন মনোবৃত্তির নিকটে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা, সবই সমান, সবই ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় প্রয়োজনমতে কাজ চালাইবার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই না। বিদ্যা কিন্তু গৃহিনী খুব গোছালো। বিদ্যা পাঁচরকমের পাঞ্চভৌতিক পদার্থ পাঁচ ইন্দ্রিয়সূত্রে বাঁধিয়া পৃথক পৃথক পাঁচ থাকে সাজাইয়া রাখে। ইহাতে ফল দাঁড়ায় দুইদিকে দুই বিপরীততত্ত্বো। একদিকে ভিন্ন ভিন্ন আকাশখণ্ড, ভিন্ন ভিন্ন বায়বা পদার্থ, ভিন্ন আগ্নেয় পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন জলীয়

পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন মৃন্ময় পদার্থ—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে স্বাজাত্যের বন্ধন আঁটিয়া যায় ; এটা হয় অন্বয়ের গুণে ; আর এক দিকে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা এই সকল বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের মধ্যে বৈজাত্যভেদের প্রাচীর গাঁথিয়া তোলা হয়—এটা হয় ব্যতিরেকের গুণে। এইরূপ একটা সমগ্র বস্তুকে ভাঙিয়া তাহাকে পৃথক পৃথক অবয়বে বিভক্ত করিবার সময় বিদ্যা খুব সহজে তাহাতে কৃতকার্য্য হয় ; কিন্তু তাহার পরে যখন সেই বিশ্লেষিত অবয়ব-গুলা জোড়া-তাড়া দিয়া একটা সমগ্র বস্তু গড়িয়া দাঁড় করাইতে যায়, তখন বিচার-কর্ত্তার সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তাহার কৃত্রিমতা বাহির হইয়া পড়ে। বিচার-কর্ত্তা বিদ্যাকে বলেন এই যে, প্রথমে তুমি তুলা হইতে সহস্র সূত্র সহস্রধা বিশ্লেষিত করিয়া তাহাদের মেলা-মেশার পথে কন্টক নিক্ষেপ করিয়াছ, এখন বলিতেছ যে, সহস্র মিলিয়া এক হইয়াছে—একটা পট হইয়াছে। উহার মধ্যে একত্ব যে কোনখানে, তাহাতো আমি দেখিতে পাইতেছিনা। যতই প্রখর হইতে প্রখরতর অনুবীক্ষণের প্রদীপ ধরিয়া উহার ভিতরে অনুসন্ধান চালনা করা যায়, ততই অসংখ্য ছিদ্রের ভিতর ছিদ্র বাহির হইতে থাকে—এইতো আমি দেখিতেছি। তুমি যাহা করিতেছ, তাহাও আমি দেখিতেছি, —তুমি তোমার নিজের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একত্বের প্রলেপ দিয়া ঐ ফাঁপরা বস্তুটার অসংখ্য ছিদ্রজাল ভরাট করিয়া দিতেছ, আর, তাহাকেই বলিতেছ—যোগ। যাহাকে তুমি বলিতেছ পাঁচের যোগ, তাহা তোমার কল্পনার যোগ, যাহাকে বলিতেছ পাঁচের একত্ব, তাহা তোমার অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একত্ব। বিচার-কর্ত্তার এইরূপ নিক্তির ওজনের বিচারে দাঁড়াইতেছে এই যে, বিদ্যার প্রকল্পিত যোগ একপ্রকার জোড়া-তাড়া দিয়া ঘটাইয়া তোলা যোগ, তা বই তাহা প্রকৃত যোগ নহে। ওরূপ একটা কৃত্রিম ধরনের যোগকে যোগ না বলিয়া বলা উচিত সংগ্রহ, বলিবও আমি তাই। ফলে, বিদ্যা প্রথমে বিশ্লেষণ এবং বিভিন্নতা হইতে যাত্রারম্ভ করে বলিয়া, পরে সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রকৃত যোগে পৌঁছিতে পারে না! জ্ঞান কিন্তু আর এক প্রদেশ হইতে যাত্রারম্ভ করে। জ্ঞান গোড়াতেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড-সত্যের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট করে। আর, সেইজন্য, জ্ঞানচক্ষুর অনিরুদ্ধ-দৃষ্টিতে জলস্থল আকাশ অনিলানল, ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, প্রাণ-মন বুদ্ধি, দেব মনুষ্য, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, তৃণ গুল্ম তরু-লতা, ধাতু প্রস্তর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তর মধ্য এবং অন্তর বাহির সমস্ত লইয়া এক অদ্বিতীয় সত্তা বিরাজমান, আর, সেই অদ্বিতীয় সত্যের একত্বগুণে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আপাদমস্তক এবং অন্তর বাহির যোগে যোগে ওতপ্রোত। যে যোগের কথা উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তাহা সংগ্রহেরই আর এক নাম, এ যোগ সে যোগ নহে ; এ যোগ প্রকৃত পক্ষেই— যোগ। পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে যে, বিদ্যার পথ অন্বয় ব্যতিরেকের পথ, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানের পথ যোগের পথ। এ তো গেল প্রবন্ধের ভূমিকা, এখন কোন স্থান হইতে যাত্রারম্ভ করা যাইবে, সেইটেই বিবেচ্য। ভাবিয়া দেখিলাম যে, বিদ্যার পথ সকলেরই নিকটে সুপরিচিত, জ্ঞানের পথ অনেকের নিকটে হয়তো অপরিচিত। এইরূপ স্থলে বিদ্যার বাঁধা-রাস্তার মধ্যস্থান হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া জ্ঞানের নিভৃত গুহাগহ্বরের পথাভিমুখে ধীরে ধীরে পা বাড়ানোই পরামর্শ-সিদ্ধ ; অতএব তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক।

বিদ্যারাণী নীতিজ্ঞা কম নহেন, যদিচ তাঁহার নীতি কলির শিখাইয়া দেওয়া একালের নীতি—একপ্রকার চাণক্যের নীতি! সে নীতির মর্ম্ম-কথা হ'চ্চে Divide & conquer ভাগ-

ভাগ কর, আর জেতো। বিদ্যা যখন গণিত-রাজ্য জয় করিতে বাহির হ'ন, তখন তিনি পাটীগণিত, বীজগণিত জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিতের খণ্ড-প্রদেশগুলা পরস্পরের সংশ্লেষ হইতে বিশ্লেষিত করিয়া একে একে সেগুলাকে হাতের মুঠার মধ্যে আনয়ন করেন; এইরূপ করিয়া সমগ্র গণিত-রাজ্য অবলীলাক্রমে জয় করিয়া ফ্যালেন। যে কোনো বিদ্যা হউক না কেন, তাহা রীতিমত উপার্জন করিতে হইলে তাহাকে আশপাশের আর-আর সমস্ত বিদ্যা হইতে যতদূর পারা যায় পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহারই উপরে মনোযোগের সমস্ত ভার সমর্পণ করা কর্ত্তব্য ; এইরূপ মনে করা কর্ত্তব্য, যেন উপার্জ্জিতব্য বিদ্যার সঙ্গে আর কোনো বিদ্যার ঘুণাক্ষরেও কোনো সম্পর্ক নাই। বীজগণিতও গণিত, জ্যামিতিও গণিত; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জ্যামিতি অধ্যয়ন করিবার সময় এরূপ অনন্য-পরায়ণ মানসে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য, যেন বীজগণিতের সঙ্গে জ্যামিতির মূলেই কোনো সম্পর্ক নাই। বলিলাম "কর্ত্তব্য" কিন্তু কাহার পক্ষে কর্ত্তব্য? পঠদ্দশায় বিদ্যালয়ের বালকদিগের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য বিশেষতঃ যাঁহারা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে। অন্বয়-ব্যতিরেকের পথ বিদ্যা উপার্জ্জনের প্রকৃষ্ট পথ তাহাতে আর ভুল নাই, কিন্তু তাহা জ্ঞানোদয়ের পথ নহে, —জ্ঞানোদয়ের পথ ঠিক্ তাহার বিপরীত। জ্ঞানোদয়ের পথ—যোগের পথ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যার আদিগুরু "দে কর্ত্তা" (Des cartes) বীজগণিতের সমীকরণ-পদ্ধতি জ্যামিতির অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গণিতের সাধন-সৌকর্য্য কত যে উচ্চে উঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার পূর্ব্বের আমলের বীজগণিত এবং জ্যামিতির মাঝখানে প্রাচীর একটা দাঁড় করানো ছিল বিপর্যায় কঠিন। "দে কর্ত্তা" (Des cartes) সেই বিচ্ছেদের প্রাচীরটা ভাঙিয়া ফেলিয়া— তাহার জায়গায় সৌহার্দ্দ-বিনিময়ের দিব্য একটা সুগম পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যার মধ্যে যোগের এইরূপ গোড়াপত্তন তাঁহার মতো জ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই কাজ। তিনি যদি ঐ কার্য্যটিতে হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে গণিত-বিদ্যা আজিও ভূতলে হামাগুড়ি দিত। সাধারণত বলা যাইতে পারে যে, সকল বিদ্যারই নিগূঢ় মর্ম্মস্থান দিয়া আর-আর নানা বিদ্যার সহিত সম্মিলনের নানা পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে, আর, যে সকল সুড়ঙ্গ পথের রহস্য উদঘাটন জ্ঞানোদয়েরই ফল, তা বই তাহা পাণ্ডিত্যের ফল নহে! ফলে, পণ্ডিত হইলেই কিছু আর জ্ঞানী হওয়া যায় না ; জ্যোতিষ জানিলেই কিছু আর নিউটন হওয়া যায় না; কবিতা লিখিতে জানিলেই কিছু আর শেক্‌স্‌পীয়র হওয়া যায় না! এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, নিউটন শেক্‌সীয়র প্রভৃতি প্রতিভাশালী মহাত্মাদিগকে অসামান্য বিদ্বান বা অসামান্য পণ্ডিত বলিলে তাঁহাদের প্রকৃত মর্য্যাদা মাটি করা হয় ; কেন না, বিদ্যা বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায়, তাঁহাদের বিদ্যা সে রকমের বিদ্যা নহে— শেখা বিদ্যা নহে। তাঁহাদের বিদ্যা এক প্রকার অশেখা বিদ্যা।.তাহা অশিক্ষিত গোড়ার জ্ঞানের উদ্বোধন—চৈতন্যের উদয়। শেখা বিদ্যার নিকটে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারের গণ্ডির মধ্যেই অবরুদ্ধ ; পরন্তু, সে-সমস্তের মর্ম্মে মর্ম্মে পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ-বিনিময়ের যেরূপ নানামুখো পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া অশেখা বিদ্যারই কাজ— মূল জ্ঞানেরই কাজ। জ্যোতিষের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্যার (Mechanics-এর) যে বিশেষ কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে, এরূপ একটা কথা নিউটনের পূর্ব্বের আমলের পণ্ডিত-সমাজে উত্থাপনেরই যোগ্য

ছিল না। নিউটন এই একটা বিস্ময়জনক সমাচার পণ্ডিত মণ্ডলীর মাঝখানে উপস্থিত করিলেন যে, যে কারণে বৃন্তচ্যুত ফল ভূতলে নিপতিত হয়, সেই কারণে গ্রহ-চন্দ্রাদি জ্যোতির্মণ্ডল স্ব স্ব পরিধি-পথে চলাফেরা করে। এরূপ একটি বিশাল জগৎ-জোড়া কথা কে বলিতে পারে? অপ্রতিহত জ্ঞানদৃষ্টিতে সুদূর নভোমণ্ডলের শত সহস্র যোজন-ব্যাপী গ্রহ-চন্দ্রাদি আপেল ফলেরই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এটা কি কম একটা কথা! ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে, সব সত্যই এক সত্য। অত-বড় একটা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালব্যাপী কথা নিউটন কোথা হইতে পাইলেন? বাহির হইতে পা'ন নাই তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। বাহির হইতে পাইবেন কি করিয়া? "সব সত্যই এক সত্য" এটা যে একটা অন্তরাত্মার নিগূঢ় কথা। অন্তরের কথা কি বাহির হইতে পাওয়া যাইতে পারে? তাহা যদি সম্ভব হইত তবে মনুষ্য আপনার অন্তর্নিহিত চৈতন্যও পথে-ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে দেখিত। ফল-কথা এই যে, পাইয়াছিলেন নিউটন্ তাহা— অশেখা-বিদ্যার হস্ত হইতে—যাচাই করিয়াছিলেন শেখা-বিদ্যার বাজারে। যাচাই-কার্য্য আর কিছু না—যথার্থ পরীক্ষা ; অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে বলে Verification। নিউটনের এই যে একটি প্রাণের কথা যে সত্যের নিকটে বড় ছোটো নাই—দূর নিকট নাই ; পরন্তু যে সত্য মহাকাশের মহা মহা জ্যোতির্মণ্ডলে বিরাজমান, সেই সত্যই ক্ষুদ্র একটা আপেল ফলে মাথা গুঁজিয়া রহিয়াছে ; তাঁহার এই প্রাণের কথাটি যখন তাঁহার জ্ঞানের আলোকে মাধ্যাকর্ষণ বেশে সাজিয়া বাহির হইল আর তাহার পরে যখন নানাপ্রকার সুপরীক্ষিত বৃত্তান্তের প্রমাণ বলে বলী হইয়া সেই কথাটি তাঁহার জ্ঞানের মধ্য হইতে পণ্ডিত সমাজে এবং পণ্ডিত সমাজের মধ্য হইতে সাধারণ লোক-সমাজে উথলিয়া পড়িল, তখন জ্যোতিষ এবং যন্ত্রবিদ্যার মাঝখানে এতকাল ধরিয়া যে একটা বিচ্ছেদের প্রাচীর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সেই দুর্নিবার বানের তোড়ে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। তখন দেশ-বিদেশের পণ্ডিতবর্গের চক্ষু ফুটিল, সকলেই তাঁহারা তখন জানিতে পারিলেন যে, জ্যোতিষ এবং যন্ত্রবিদ্যা হরিহরাত্মা। তার সাক্ষী নিউটনের উত্তরাধিকারী লাপ্লাস্ তাঁহার নব প্রণীত জ্যোতির্গ্রন্থের নাম দিলেন Celestial Mechanics নাভসিক যন্ত্রবিদ্যা। জ্ঞান তলে তলে কার্য্য করিয়া বিদ্যার বিশ্লেষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যোগের কিরূপ বন্ধন আঁটিয়া দেয়, তাহার আর একটি নমুন দেখাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বড় বড় জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এইরূপ একটা অকাল-পক্ব মত বিদ্যার বাজারে চালাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিভিন্নজীব-শ্রেণী পরস্পরের সংস্রব হইতে এরূপ কঠিন প্রাচীর দিয়া আগলানো রহিয়াছে যে, কোনো-গতিকেই এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীতে পরিণত হইতে পারে না। ডার্বিন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক জোড়া লম্বপুচ্ছ পায়রা লইয়া তাহাদের পর-পরবর্ত্তী বংশের মধ্য হইতে বেশী-বেশী লম্বপুচ্ছ বাছিয়া-বাছিয়া জোড় মিলাইয়া অবশেষে এরূপ একঝাঁক মাত্রাতীত লম্বপুচ্ছ ফলাইয়া তুলিলেন যে, তেমন-তরো নূতন সৃষ্টিগোচর পক্ষীকে দীর্ঘ-পুচ্ছ পায়রা বলিলেও বলা যাইতে পারে, হ্রস্ব-পুচ্ছ ময়ূর বলিলেও বলা যাইতে পারে। ডার্বিনের পূর্ব্বাচার্য্যেরা সকলেই জানিতেন যে, প্রকৃতিরাজ্যে এরূপ মাঝামাঝি শ্রেণীর জীব অনেক আছে, তার সাক্ষী টেপিরকে বড় বরাহ বলিলেও হয়, ছোটো হস্তী বলিলেও হয় ; জেব্রাকে উচ্চশ্রেণীর গাধা বলিলেও হয়, নিম্ন-শ্রেণীর ঘোড়া বলিলেও হয় ; তাহা জানিয়াও তাঁহারা বরাহ, টেপির্, হস্তীকে, তথৈব গাধা, জেব্রা

এবং ঘোড়াকে তাহাদের স্ব স্ব শ্রেণীর প্রাচীর দিয়া ঘেরাও করিয়া আসিতেছিলেন। ডার্বিনের উদ্ভাবিত নূতন পায়রার ঝাঁকের পাখা'র ঝাপটে সে সমস্ত প্রভেদের প্রাচীর চক্ষিতের মধ্যে সমভূম হইয়া গেল। ডার্বিন অনেক-কাল ধরিয়া অসামান্য অধ্যবসায়ের সহিত দেশ বিদেশের নানা শ্রেণীর জীব-জন্তুর জাতি-বৈচিত্র্যের গোড়ার বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি নিজে যেরূপ প্রণালীতে পায়রার বংশে ময়ূরাবতার সমুদ্ভাবন করিয়া তুলিয়াছেন, প্রকৃতি-মাতা স্বয়ং সেইরূপ প্রণালীতে নিম্ন নিম্ন শ্রেণীর জীবের বংশে উচ্চ উচ্চ শ্রেণীর জীব সমুদ্ভাবন করিয়া আসিয়াছেন। সে প্রণালী আর কিছু না—সুপাত্র বাছিয়া বাছিয়া জোড় মিলানো। ডার্বিন তাঁহার নিজের কৃত পাত্র-নির্ব্বাচনের নাম দিয়াছেন Artificial Selection— কৃত্রিম পাত্র-নির্ব্বাচন, আর প্রকৃতির স্বতঃ-প্রবৃত্ত পাত্র-নির্ব্বাচনের নাম দিয়াছেন Natural Selection— নৈসর্গিক পাত্র-নির্ব্বাচন। ইহা শুনিয়া শ্রোতার মনে সহজেই এইরূপ একটি জিজ্ঞাসার উদয় হইতে পারে যে, নৈসর্গিক পাত্রনির্ব্বাচনের গোড়ার সূত্রই বা কি, আর, চরম গতিই বা কিরূপ? ডার্বিন বলেন এই যে, জীবমাত্রই আপনার সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য চারিদিকের প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, আর যাহারা সংগ্রামে জয়ী হয়, সেই যোগ্যতম জীবেরাই উদ্বৃত্ত হয়। অবেই হইতেছে যে, প্রকৃতিমাতা যোগ্যতম পাত্রের নির্ব্বাচন-কর্ত্রী। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, নৈসর্গিক পাত্র-নির্ব্বাচনের গোড়ার সূত্র হ'চ্চে সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা, আর তাহার চরম গতি হ'চ্চে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। অতএব জীব-শ্রেণীর ক্রম-বিকাশ অলঙ্ঘনীয়, কেন না, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের জীবদিগের মধ্যে যে-যে শ্রেণীর জীব যোগ্যতম, সেই-সেই শ্রেণীর জীবেরাই পর-পরবর্ত্তী যুগে উদ্বৃত্ত হয়।

এই জায়গাটিতে আমি একটী গল্প সাজাইয়া তাহার সাহায্যে ডারুইনের সিদ্ধান্তের একটা স্থূল আদর্শ আপনাদের মনোনেত্রের সম্মুখে দাঁড় করাইতেছি, তাহা হইলেই তাহার মুখ্য অবয়বগুলির মধ্যে কোথায় কিরূপ গ্রন্থিবন্ধনের তোড়-জোড়, তাহা সহজেই আপনাদের দৃষ্টি-ক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। গল্পটা এই ঃ—

ছয়-সমুদ্র-পারে সপ্তম সমুদ্রের মাঝখানে একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ আছে ; সেখানে মনুষ্য, বা অন্য কোনো জীব জন্তুর উপদ্রব নাই, কেবল একপাল শৃঙ্গহীন গোরু মুক্তভাবে চরিয়া বেড়ায়। সেই উপদ্বীপের মধ্যস্থলে ক্রোশ-খানেক বিস্তৃত একটি মাঠ আছে, তাহাতেই কেবল তৃণ জন্মে, তা বই, উপদ্বীপের অন্য কোন প্রদেশে তৃণ জন্মে না। অবেই হইতেছে যে, সেই মাঠটাই গোরুগুলার একমাত্র চরিবার স্থান। গোরুগুলা দিব্য সুখে খায়-দায় থাকে, কাহারো সঙ্গে কাহারো বিবাদ-বিসংবাদ নাই, সকলের সঙ্গেই সকলের প্রাণে প্রাণে হৃদ্যতা—চরিবার মাঠটি শান্তির আলয়। এইরূপে কিয়ৎকাল নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হইল। এই প্রথম পর্য্যায়ের কালাংশটিকে বলা যাইতে পারে শৃঙ্গহীন গোজাতির সত্যযুগ। পরযুগের প্রারম্ভে অজস্র বংশবৃদ্ধি-গতিকে তাহাদের ব্যক্তি-সংখ্যা এরূপ মাত্রাতীত অধিক হইয়া উঠিল যে, তাহারা সকলে মিলিয়া মাঠে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিবার সময় তাহাদের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দুই-একটি গোরু এবং ষাঁড়ের কপালের গ্রন্থিল-প্রদেশ অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল বলিয়া তাহাদের প্রাত্যহিক মধ্যাহ্ন-ভোজনের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না; তাহারা সেইরূপ কপালগুণে ভিড় ঠেলিয়া মুখ বাড়াইয়া নির্ব্বিঘ্নে তৃণভক্ষণ করিতে

লাগিল ; যাহাদের কপালের গাঁঠ অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাহারা হটিয়া যাইতে থাকিল। বংশবৃদ্ধি-গতিকে কঠিন-মৌলি গোরু গুলার যতই সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই ভোজনকালে তাহাদের সহিত কপালের বলে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া কোমল-মৌলি শ্রেণীর অধিকাধিক-সংখ্যক গোরু মাঠ হইতে বাহিরে পড়িয়া যাইতে লাগিল, আর, তাহার ফল হইল এই যে, স্বল্পাহার-গতিকে কোমল-মৌলি গোরুগুলা দিনদিন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া ক্রমশই জীবিকানির্বাহে অধিকাধিক অপটু হইয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে যখন বংশ-বৃদ্ধি-গতিকে কঠিন-মৌলি গোরুর দল মাঠের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া চরিতে আরম্ভ করিল, তখন কোমল-মৌলি গোরুগুলার দলকে-দল অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। আরো কিছুকাল পরে যখন কঠিন-মৌলি গোরুর দল মাঠের বারো-আনা অংশ জুড়িয়া চরিতে আরম্ভ করিল তখন সারা উপদ্বীপে একটিও কোমল-মৌলি গোরু অবশিষ্ট রহিল না ; সকলেই তাহারা অন্নাভাবে শুকাইয়া মরিল।

গোদ্বীপের সত্যযুগে কোমল-মৌলি গোরুদিগের বংশ-বৃদ্ধি হইয়া যখন তাহাদের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি আরম্ভ হইয়াছিল, তখনকার সে অবস্থা Struggle for existence-এর অবস্থা—আত্মরক্ষার জন্য প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ চেষ্টা-পরায়ণতার অবস্থা। তাহার পরে যখন কঠিন-মৌলি গরুদের বংশ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর, সেই সঙ্গে কোমল-মৌলি গরুদের বংশ ক্রমশই লোপ পাইতে লাগিল—তখনকার সেই যে অযোগ্য হইতে যোগ্যের পার্থক্য-সংঘটন তাহারই নাম Natural selection নৈসর্গিক পাত্র-নির্ব্বাচন। আর, সেই নৈসর্গিক পাত্র-নির্ব্বাচনের অনিবার্য্য ফল যাহা পরিশেষে ফলিত হইল—কিনা কোমল-মৌলি গো-বংশের উচ্ছেদ এবং কঠিন-মৌলি গো-বংশের উদ্বর্ত্তন, —তাহারই নাম Survival of the fittest যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। গোদ্বীপ শাস্ত্রীয় সত্যযুগের অবসানকালে উপদ্বীপনিবাসী গোজাতি কঠিন-মৌলিশ্রেণী পর্যান্ত আসিয়াই থামিল। গোদ্বীপের ত্রেতাযুগে কঠিন-মৌলি গো-শ্রেণীর বংশ বৃদ্ধি হইয়া এবারে তাহাদের মাথায়-মাথায় ঠেকাঠেকি শুধু নয়, কিন্তু রীতিমত ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইল ; কেন না, ত্রেতাযুগের গোরুদের সবারই ললাটগ্রন্থি বিপর্য্যয় কঠিন। তাহাদের মধ্যে যে দুটি-একটি গরুর ললাটগ্রন্থি অত্যল্পস্ফুট শৃঙ্গাকারে পরিণত হইয়াছিল, তাহারাই তাহাদের সময়ের যোগ্যতম পাত্র ; কাজেই ত্রেতাযুগের অবসানকালে তাহারাই উদ্বৃত্ত হইল। গোদ্বীপের দ্বাপর যুগে যখন অত্যল্পস্ফুট-শৃঙ্গ গোবংশ মাত্রাতীত পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি শুধু নয়, কিন্তু বেঁধাবিঁধি এবং সেই সঙ্গে রক্তারক্তি কিয়ৎপরিমাণে চলিতে থাকিল, তখন তাহাদের মধ্যে যে দুটি একটি গোরুর শৃঙ্গ সুপরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহারাই তাহাদের সময়ের যোগ্যতম পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, আর সেই কারণে শৃঙ্গী গোবংশ দ্বাপরেও উদ্বৃত্ত হইয়া গোদ্বীপের কলিযুগে সংক্রামিত হইল। এখানে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যেমন দ্বীপ, তেমনি যুগ। আমাদের এই জম্বুদ্বীপ একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী—গোদ্বীপ একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ। কাজেই গোদ্বীপের এক যুগ, জম্বুদ্বীপের এক শতাব্দীও নহে। এইখানে গল্প সমাপ্ত হইল— আমার কথা ফুরাইল। এ যাহা আমি এতক্ষণ ধরিয়া বাখানিলাম, এ যদিচ কাল্পনিক উপন্যাস বই নহে, কিন্তু ডারউইন্ যেরূপ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা উহার সম্ভাবনীয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ কৃত্রিম ঘটনাটি বাস্তবিক হইবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না।

ডার্বিনের এই নূতন সিদ্ধান্তটিকে জীবজগতের গভীর অন্তস্থল পর্যান্ত প্রসারিত করিয়া আধুনিক বিবৃত্তিবাদী পণ্ডিতেরা (Evolutionist এরা) এইরূপ একটি ব্যাপক রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জীব এই জীবাঙ্কুরের (Protoplasm এর) ভিন্নধা বিকাশ আর, সেই ভিন্নধা বিকাশের মূল Struggle for existence সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। আধুনিক বিবৃত্তিবাদের এই মোট মন্তব্য-কথাটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটে খুবই নূতন, পরন্তু আমাদের দিক্ দিয়া আমরা দেখিতেছি যে, তাঁহাদের ঐ নূতন কথাটি বহু পুরাতন কথা ; তার সাক্ষী সাংখ্য দর্শনের একটি গোড়ার কথা এই যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই মূল প্রকৃতির ভিন্নধা বিকাশ, আর সেই ভিন্নধা বিকাশের মূল প্রবর্ত্তক রজোগুণ পদার্থটা আর কিছু না, দুঃখ এবং তন্নিবন্ধন কর্ম্ম-চেষ্টা। দুঃখ এবং কর্ম্ম-চেষ্টাকে একসঙ্গে জোড়া দিলেই দুয়ে মিলিত হইয়া দাঁড়ায় Struggle for existence— সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। তবেই হইতেছে যে, Struggle for existence রজোগুণের আর এক নাম। বলিতে কি প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদঘাটন করিবার অব্যর্থ চাবি ত্রিগুণতত্ত্বের ন্যায় দ্বিতীয় আর একটি খুঁজিয়া পাওয়া ভার। ত্রিধাতু নির্ম্মিত অমন একটি চমৎকার চাবি যখন আমাদের হাতের কাছে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, তখন তাহাকে কাজে না খাটাইয়া কেমন করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? অতএব তাহার চেষ্টা দেখা যাক।

মনে কর, পুষ্করিণী শুখাইয়া গিয়াছে, আর তাহার তলপঙ্কে একটা মৎস্য মৃতবৎ পড়িয়া আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই যেমন ত্রিগুণাত্মক, বেচারী মৎস্যটিও তেমনি ত্রিগুণাত্মক। সত্ত্ব, রজ এবং তম, এই তিনগুণ মৎস্যটির ভিতরে পুঁটুলিবাঁধা রহিয়াছে ; আছে তিনগুণ পুঁটুলি বাঁধা, তবে কিনা মৎস্যটির এক্ষণকার অসাড় এবং নিশ্চেষ্ট শরীরে তমোগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। তমোগুণ তো আর গাছে ফলে না—অসাড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার নামই তমোগুণ। কিন্তু মৎস্যটি কি একেবারেই অসাড়, একেবারেই নিশ্চেষ্ট? তাহা হইতে পারে না ; কেন না, যদিও মৎস্যটি মড়ার মতো পড়িয়া আছে, তথাপি সে বাঁচিয়া আছে—মরে নাই ; বাঁচিয়া যখন আছে, তখন অবশ্যই তাহার তমোগুণের ঘন অন্ধকারে রজোগুণ কিনা দুঃখ এবং ছট্‌ফটানি চাপা পড়িয়া রহিয়াছে—যদি চ সাত হাত জলের নীচে। তা শুধু না— মৎস্যটির তমোগুণের আড়ালে যেমন রজোগুণ লুকাইয়া আছে, রজোগুণের আড়ালে তেমনি সত্ত্বগুণ লুকাইয়া আছে, — দুঃখ এবং ছট্‌ফটানির আড়ালে দুঃখের ঔষধ লুকাইয়া আছে। দুঃখের ঔষধ সে যে কি তাহা জানিতে হইলে দুঃখের কারণ হচ্ছে কি তাহা জানা আবশ্যক। দুঃখের কারণই অভাববোধ। মৎস্যটির অভাববোধ হইতেছে কিসের প্রতিকে? "জল পাইলে বাঁচি" এই কথাটি মৎস্যের অভাববোধের হাড়ে-হাড়ে জাগিতেছে। মৎস্যটির দুঃখের ঔষধ যে কি তাহা বুঝা গেল। সে ঔষধ আর কিছু না—জলের সংস্পর্শ। জলের সংস্পর্শ ঘটিবে কেমন করিয়া—জল যে অনেক হাত দূরে। স্বপ্নে তাহা ঘটিতে পারিবার বাধা নাই। মৎস্যটির অভাববোধের অন্তস্থলে তাহার নৈসর্গিক সংস্কার, ইংরাজিতে যাহাকে বলে instinct ; সেই নৈসর্গিক সংস্কার স্বপ্ন দেখিতেছে, আর, মৎস্যটি সেই স্বপ্নের জলে সাঁতার দিয়া কিয়ৎপরিমাণে সুখ অনুভব করিতেছে—যদিচ তাহা একপ্রকার দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। মৎস্যটি ভুলিতে পারে নাই—ঐ যে জলের প্রকাশ এবং সন্তরণ সুখ, উহাও প্রকাশ, উহাও সুখ ; যদিচ

উহা স্বপ্নের প্রকাশ বই— স্বপ্নের সুখ বই—জাগ্রত প্রকাশ নহে, জাগ্রত সুখ নহে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতা যেমন তমোগুণের ধর্ম্ম, দুঃখ এবং ছট্‌ফটানি যেমন রজোগুণের ধর্ম্ম, সুখ এবং প্রকাশ তেমনি সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। মৎস্যটির নিশ্চেষ্ট অসাড় শরীরে তমোগুণের খুবই প্রাদুর্ভাব, তাহাতো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তা ছাড়া, উহার ভিতরে খানাতল্লাসি করিয়া আর দুইটি নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল এই যে, উহার তমোগুণের আড়ালে রজোগুণ লুকাইয়া আছে, তথৈব রজোগুণের আড়ালে সত্ত্বগুণ লুকাইয়া আছে। অতঃপর মনে কর যে মৎস্যটিকে পঙ্ক হইতে উঠাইয়া লইয়া একটা জলপূর্ণ পুষ্করিণীর অনতিদূরে শুষ্কডাঙ্গায় ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মৎস্যটির রজোগুণ যাহা এ দীর্ঘকাল তমোগুণের ঘন পরিচ্ছদে মুখ মুড়িসুড়ি দিয়া লুকাইয়া ছিল, এক্ষণে তাহা প্রকাশ্যে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল, আর, সেইপর্যন্তকে মৎস্যটির লাফানি-ঝাঁপানি আরম্ভ হইল, ইহারই নাম Struggle for existence সত্তা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। এই সময়ে মৎস্যের ভিতরে আর একটি ব্যাপার আরম্ভ হইল— সত্ত্বগুণের প্রভাব অল্প অল্প করিয়া জানান দিতে লাগিল। মৎস্যটির হাড়ে হাড়ে জাগিতেছে সেই যে স্বপ্নরূপী জলের প্রকাশ এবং সন্তরণ সুখ, যাহা মৎস্যটির নৈসর্গিক সংস্কারের (instinct এর) অবিচ্ছেদ্য সহচর সেই সত্ত্বগুণের ব্যাপারটি অন্ধকারের প্রদীপ হইয়া মৎস্যটিকে ক্রমাগতই জলপূর্ণ পুষ্করিণীর অভিমুখবর্ত্তী পথ দেখাইতে লাগিল। মৎস্যটি সেই নৈসর্গিক সংস্কাররূপী সত্ত্বগুণের আলোকে পথ চিনিয়া চিনিয়া লাফাইতে লাফাইতে পুষ্করিণীর পাড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহার আর কিছুকাল পরে তাহার চক্ষের সামনে পুষ্করিণীতে জল থইথই করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যে-জল তাহার সুখস্বপ্নে ঝাপসা ঝাপসা প্রকাশ পাইতেছিল এক্ষণে সেই জল তাহার চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান। এই সময়ে মৎস্যটির অন্তরের সুখস্বপ্ন বাহিরের জলপ্রকাশে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল! এইরূপ প্রকাশ এবং আনন্দের অভিব্যক্তির নামই সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব। সত্ত্বগুণের আলোক উদ্ভাসিত হইয়া মৎস্যটিকে সিধা রাস্তা দেখাইয়া দিল আর অমনি তৎক্ষণাৎ মৎস্যটি জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পাইয়া বাঁচিল! ত্রিগুণের লীলা নিম্নশ্রেণীর জীবে তো এইরূপ— মনুষ্যে কিরূপ তাহা দেখা যা'ক।

মনে কর, শেষ রাত্রে একজন কবির ঘুম ভাঙিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল! চাঞ্চল্যের কারণ অবশ্য অভাববোধ। আলোকের অভাবের নাম অন্ধকার ; সুতরাং অন্ধকারবোধ একপ্রকার অভাববোধ ; সেই অভাববোধই মনের চঞ্চলতার কারণ। কবির মনের ঐ যে চঞ্চলতা, উহা আর কিছু না, আলোকের জন্য ছট্‌ফটানি; ইহার আর এক নাম রজোগুণের প্রাদুর্ভাব। কালিদাসের শকুন্তলায় একটি সুন্দর শ্লোক আছে, তাহা এই :—

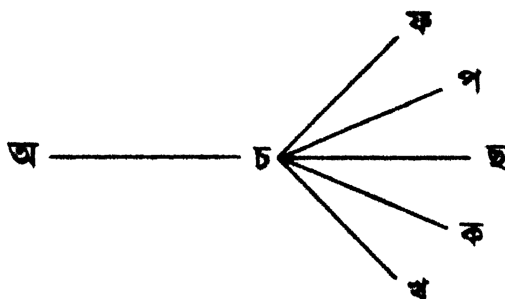
যাত্যেকতোহস্ত শিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতোহরুণ পুরঃসর একতোহর্ক।

একদিকে ওষধিগণের পতি অস্তশিখরে যাইতেছেন, আর একদিকে সূর্য্য উদ্ভাসিত অরুণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বাহির হইতেছেন। কবি এই শ্লোকটি আওড়াইতে আওড়াইতে মনোমধ্যে একপ্রকার স্বপ্নের সূর্য্যালোক জাগাইয়া তুলিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে লাগিলেন। তাহার পরে যখন রজনীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া দিবসের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, এবং আর

কিছুকাল পরে যখন সবিতাদেব হিরণ্ময় জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তখন কবির মনের স্বপ্নালোক জাগ্রত বিশ্বালোকে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। সুষুপ্তিকালে কবির তমোগুণের ঘন পরিচ্ছদে রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ মুখ মুড়িসুড়ি দিয়া লুকাইয়াছিল ; সুপ্তিভঙ্গে রজোগুণ অর্থাৎ মনের ক্ষোভ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল ; তাহার পরে সত্ত্বগুণ অর্থাৎ অন্তরের আলোক বিশ্বের আলোকে তন্ময়ীভূত হইয়া আনন্দে পরিণত হইল। ত্রিগুণের লীলা জীবরাজ্যে দেখিলাম— মনুষ্যে দেখিলাম— দেখিতে কেবল বাকী জড় জগতে। জড়বস্তুর ভিতরে সত্তা আছে শক্তি অছে একথা সকলেই স্বীকার করেন ; কিন্তু তা ছাড়া জড়বস্তুর মূলে যে শক্তির নিয়ামক এবং পথ-প্রদর্শক আছে, রজোগুণের গতি-স্ফূর্ত্তির মূলে যে সত্ত্বগুণের আলোক আছে, একথা স্বীকার করিতে অনেকে ভার বোধ করেন—ভার বোধ করিবারই কথা, কেন না বাস্তবিকই জড় বস্তু তমোগুণ-প্রধান। জড়বস্তুর শক্তিস্ফূর্ত্তি দেখিলে, গতিক্রিয়া দেখিলে সহসা মনে হয়, যেন তাহার গতিক্রিয়ার কোনো পথ-প্রদর্শক বা নিয়ামক তাহার ভিতরে নাই। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, জড়বস্তুর গতিক্রিয়া নিতান্ত অন্ধ নহে ; পরন্তু তাহার ভিতরে তাহার প্রবর্ত্তক যেমন আছে — নিয়ামকও তেমনি আছে; চালাইবার চাবুক যেমন আছে—বাগাইবার রাশও তেমনি আছে।

স্পেন্সর প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিতেরা রজোগুণকে সত্ত্বগুণের সংশ্রব হইতে সমূলে বিশ্লেষিত করিয়া এইরূপ একটা একদিক্-ঘ্যাঁসা সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইয়াছেন যে, অল্পতম বাঁধার পথে চলাই (Least Resistance এর পথে চলাই) গতির মূলনিয়ম। ইহাতে, গতিক্রিয়ার নিষ্পাদনে সত্ত্বগুণের যে কোনোপ্রকার হস্ত আছে, তাহা প্রকারান্তরে অস্বীকরা করা হইয়াছে। স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা মাত্রকেই গতির মূল নিয়ম বলিতেছেন কোন যুক্তিতে? বাধাই কি গতির সর্ব্বস্ব? মনে কর দুই বন্ধু রাম এবং শ্যাম কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ভারত ভ্রমণে বাহির হইলেন। রাম বলিলেন "আসামে যাই চল" শ্যাম বলিলেন "দক্ষিণ প্রদেশ অনেকের নিকটে অপরিজ্ঞাত—কন্যা কুমারীতে যাই চল।" শেষে দুজনের মধ্যে রফাসুরত এইরূপ মন্ত্রণা ধার্য্য হইল যে, মান্দ্রাজে যাওয়া যাক্— মান্দ্রাজ দক্ষিণ-অঞ্চলও বটে, পূর্ব্ব অঞ্চলও বটে।" এরূপ স্থলে, বৈজ্ঞানিক ভাষায় মান্দ্রাজ-মুখো পথই অল্পতম বাধার পথ। এখানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দুজনার যাত্রারম্ভ-সময়ের পৃথক পৃথক মনের গতিই গোড়াই কথা— উভয়ের বাধাগ্রস্ত একথা মনের গতি তাহার পরের কথা। আমি চাহিতেছি অব্যাহত গতির নিয়ম ; তুমি আমাকে আনিয়া দিতেছ বাধাগ্রস্ত গতির নিয়ম আর, তাহাকেই বলিতেছ গতির মূলনিয়ম। ফলে, অব্যাহত গতির নিয়ম ডিঙাইয়া ঘাস খাওয়া, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্পেন্সর প্রভৃতি নব্য শ্রেণীর আধুনিক পণ্ডিতগণের চাইতে নিউটন্ ঢের উঁচুদরের জ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে আর ভুল নাই ; তাই তিনি গোড়ার কথা গোড়াতেই উত্থাপন করিয়া গোড়াতেই তাহার সমুচিত মীমাংসা করিয়াছেন। নিউটন্ গোড়াতেই বলিয়াছেন যে, অব্যাহত গতি সরলরেখার পথ অবলম্বন করে, আর ঐ মূল কথাটির বলে এটাও তিনি বিধিমতে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বক্র-পথগামী বস্তুরাও প্রতি মুহূর্ত্তে সরলরেখার পথে গমোনোদ্যত। মনে কর একটা বস্তু (অ) অব্যাহত গতি, আর, সেই জন্য তাহা সরল পথে

(অ চ ছ পথে) চলিতেছে। সরল পথে যখন চলিতেছে তখন কাজেই তাহা প্রত্যেক মুহূর্তে




অতিবাহিত পথের সমসূত্রবর্ত্তী পথে চালিত হইতেছে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, অতিবাহিত (অ ছ) পথের সমসূত্রবর্ত্তী পথ একটি মাত্র (চ ছ), অসমসূত্রবর্ত্তী পথ অসংখ্য (চক, চখ, চপ, চফ ইত্যাদি) কাজেই চলমান বস্তুটাকে প্রত্যেক মুহূর্তে অসংখ্য বিভিন্নমুখ পথের মধ্য হইতে সমসূত্র পথটি বাছিয়া লইয়া সেই পথে চলিতে হইতেছে। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য বিভিন্ন মুখ পথের মধ্য হইতে সমসূত্র পথটি চিনিয়া লওয়া অন্ধ ব্যক্তির কার্য্য, না চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির কার্য্য? অবশ্য তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরই কার্য্য। তবেই হইতেছে যে, চলমান বস্তুটার ভিতরে অবশ্যই এমন একটা কিছু আছে, যাহা প্রতি মুহূর্তে তাহাকে গন্তব্য সমসূত্র পথটি চিনাইয়া দিতেছে। তা শুধু না, ভিতরের সেই পথপ্রদর্শকটির ন্যায়বোধ আছে। সে বলিতেছে যে, সমসূত্রপথের ডাহিনে যদি চাও, তবে বামদিক্ কি অপরাধ করিল? বামে যদি যাও তবে ডাহিনদিক্ কি অপরাধ করিল? ঊর্দ্ধে যদি যাও, তবে নিম্নদিক্ কি অপরাধ করিল? নিম্নে যদি যাও তবে ঊর্দ্ধদিক কি অপরাধ করিল? অতএব চলিতে যখন হইতেছে, তখন ডাহিনে-বামে বা অধ-ঊর্দ্ধে না হেলিয়া সমসূত্রে চলাই ন্যায়সঙ্গত। প্রথম দ্রষ্টব্য এখনে এই যে, চলমান বস্তুটার ভিতরে একটা ছটফটানি আছে—রজোগুণের কামড়ানি আছে, সেই জন্য সে স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া একমুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, তাহার ভিতরে রজোগুণের উত্তেজনা তো আছেই, তা ছাড়া, গন্তব্যা দকের একটা প্রকাশ আছে—সত্ত্বগুণের আলোক আছে, আর, সেই জন্য তাহার ডাহিনে বামে উচ্চে নীচে অসমসূত্র পথ প্রমুক্ত রহিয়াছে যদিচ সহস্রধা—সে কিন্তু তাহার কোনোটার দিকে না হেলিয়া ন্যায়সঙ্গত সমসূত্রপথটি বাছিয়া লইয়া সেই পথেই চলিতেছে! ফল কথা এই যে, গতির সম্ভাবনীয়তার পক্ষে বাধা যেমন প্রয়োজনীয়, প্রবর্ত্তক তেমনি প্রয়োজনীয়; প্রবর্ত্তক যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়ামক তেমনি প্রয়োজনীয়! গতির বাধা হচ্ছে তমোগুণ, যে হেতু বাধা জড়-ধর্ম্মী ; গতির প্রবর্ত্তক হচ্ছে রজোগুণ, যেহেতু তাহা এক প্রকার ছটফটানি; গতির নিয়ামক হ'চ্ছে সত্ত্বগুণ, যে হেতু তাহা একপ্রকার প্রকাশ—গন্তব্যদিকের প্রকাশ। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সূক্ষ্ম ঈশ্বরই হউক আর স্থূল পৃথিবীই হউক— একটা না একটা কোনো জড়বস্তুর (অথবা যাহা একই কথা—তমোগুণের) আশ্রয় ব্যতিরেকে গতি থাকিতে পারে না ; তেমনি আবার স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য ভিতরের ছট্‌ফটানি বা রজোগুণের উত্তেজনা ব্যতিরেকে গতি থাকিতে পারে না ; তথৈব, দিঙ্‌নিরূপণ ব্যতিরেকে (অথবা যাহা একই

কথা, সত্ত্বগুণের আলোকে গন্তব্যদিগের প্রকাশ ব্যতিরেকে) গতি থাকিতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, গতিক্রিয়ার ব্যাপারটিতে গতির বাধারূপী তমোগুণ, গতির প্রবর্ত্তকরূপী রজোগুণ এবং গতির নিয়ামকরূপী সত্ত্বগুণ, তিনের পরস্পরাশ্রয়িতা অপরিহার্য্য। তবেই হইতেছে যে, সমস্ত জড়জগৎ ত্রিগুণাত্মক, কেন না, গতি জড়বস্তুর শক্তিস্ফূর্ত্তিরই আর-এক নাম। সত্ত্বরজস্তমোগুণ কোথায় কি ভাবে কার্য্য করে—নিম্নশ্রেণীর জীবেই বা কি ভাবে কার্য্য করে, মনুষ্যের মনোমধ্যেই বা কি ভাবে কার্য্য করে, জড়-জগতেই বা কিভাবে কার্য্য করে, তাহা পৃথক পৃথক করিয়া দেখাইলাম। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, এটা যেমন সত্য যে সব বস্তুতে সত্ত্ব-রজস্তম সব গুণই আছে, এটাও তেমনি সত্য যে, সব বস্তুতে সবগুণের প্রাদুর্ভাবের মাত্রা সমান নহে। বিশেষতঃ সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব মনুষ্যের মধ্যে যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, এমন আর কোনো জীবের মধ্যেই নহে। এতো জানাই আছে যে, অভাবের অনুভব হইতে ক্রন্দন বাহির হয় শৃগাল কুক্কুরাদি অনেকানেক জীবের ; পক্ষান্তরে, ভাবের উদয় হইতে হাস্য বাহির হয় কেবল মনুষ্যেরই মুখে। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, ভাবের উদয় এক-প্রকার অন্তরের আলোক; হাস্য আনন্দের অভিব্যক্তি ; আর প্রকাশ এবং আনন্দ দুইই সত্ত্বগুণের নির্ঘাত পরিচয় লক্ষণ। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব মনুষ্যের মধ্যে যেমন, এমন আর কোনো জীবেই নহে। আর একটি দ্রষ্টব্য এই যে, পশ্বাদি জন্তুদিগের ন্যায় মনুষ্যের অভাব বোধ তো আছেই, তা ছাড়া মনুষ্যের নূতন আর একতরোবোধ আছে, যাহা অন্য কোনো জীবেরই নাই। সেটা হ'চ্ছে ভাববোধ—যেমন সৌন্দর্য্যবোধ, মঙ্গলবোধ, সত্যবোধ, ন্যায়বোধ ধর্ম্মবোধ ইত্যাদি। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, Necessity is the mother of invention অধিকন্তু আমি বলি এই যে, নূতন উদ্ভাবনের মাতা যেমন অভাবের অনুভূতি, নূতন উদ্ভাবনের পিতা তেমনি ভাবের উদয়। অভাবের অনুভূতি পশ্বাদি জন্তুর খুবই আছে, কিন্তু সে একলা-নারী হইতে কোনোপ্রকার নূতন উদ্ভাবনের জন্মঘটিতে আজ পর্য্যন্তও দেখা যায় নাই।

পক্ষান্তরে, অনুভূতি যখন মনুষ্যের মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভাবের উদয়কে পতিত্বে বরণ করে, তখনই যথাসময়ে তাহার গর্ভে নূতন উদ্ভাবনা জন্মগ্রহণ করে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্যের ভাব, মঙ্গলের ভাব, সত্যের ভাব, ধর্ম্মের ভাব এই এই প্রকার বিশেষ বিশেষ ভাবের আলোকে বিশেষ বিশেষ মহাত্মারা বিশেষ বিশেষ অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করেন; তার সাক্ষী—কালিদাস সৌন্দর্য্যের আলোকে শকুন্তলা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; প্লেটো মঙ্গলের আলোকে নূতন একপ্রকার সাধারণ-তন্ত্র (Republic) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কোনো লোকপূজ্য মহাপুরুষ ধর্ম্মের আলোকে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সকল ভাবের আলোক—সত্ত্বগুণের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব—কেবল মনুষ্যের মধ্যেই সম্ভবে, যদি-চ সত্ত্বগুণের যথাসম্ভব ন্যূনাধিক প্রাদুর্ভাব সকল জীবেই দেখিতে পাওয়া যায়—এমন কি, জড়বস্তুতেও। তার সাক্ষী—পিপীলিকাদের কার্য্যকলাপ দেখিলে এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, একপ্রকার সামাজিক সুব্যবস্থার আলোক তাহাদেরও মনোমধ্যে ঝিমকিমি দিতেছে—যদি-চ স্বপ্নের ন্যায় অপরিস্ফুট-ভাবে ; সে ঝাপসা আলোকও সত্ত্বগুণেরই আলোক। তেমনি আবার বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে বটবৃক্ষের ভাব যাহা পুঁজি করা রহিয়াছে তাহাও সত্ত্বগুণের একপ্রকার ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি।

ডার্বিন্ জীবরাজ্যে রজোগুণের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইয়াছেন খুবই স্পষ্ট ; তাঁহার তাহা দেখিতে পাইবার কথা, যেহেতু পশ্বাদি জীব বাস্তবিকই রজোগুণ-প্রধান ; কিন্তু তদ্ব্যতীত সেই রজোগুণের পর্দার আড়ালে যে, সত্ত্বগুণ লুকাইয়া-লুকাইয়া কার্য্য করিতেছে, আর, মনুষ্যের অন্তঃকরণে তাহা যে রীতিমত আসর জমকাইয়া বসিয়া আছে, এ কথাটির প্রতি তিনি বিহিত-বিধানে মনোযোগ প্রদান করেন নাই। একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে জীব-জগতে লড়াই ঝগড়ার প্রাদুর্ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার অনিবার্য্য ফল যাহার নাম দিয়াছেন ডার্বিন্ যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, তাহা জীবপ্রকৃতির কেবল একটা মাত্র দিক— ক্ষত্রিয় ভাবের দিক— রজোগুণের দিক। কিন্তু তদ্ব্যতীত আর একটা দিক আছে— সেটাও বিবেচ্য ; সেটা হচ্চে ব্রাহ্মণ ভাবের দিক্— সত্ত্বগুণের দিক্। এ যাহা আমি বলিতেছি, ইহার দৃষ্টান্ত আমি পুস্তকে দেখিয়াছি নানাতরো, পরন্তু একটি দৃষ্টান্ত যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেটি অতি চমৎকার।

বছরদশেক পূর্ব্বে আমি আমার চক্ষের সামনে একটি মনোমুগ্ধকারী ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। গঙ্গার কিনারা-ঘ্যাঁসা একটা অট্টালিকার বারান্দায় ভৃত্যজনেরা থালা-পাথরে পরিষ্কার করিবার সময় উচ্ছিষ্ট অন্নাদি গঙ্গার তীরোপান্তে ঝাড়িয়া ফেলিত ; সেই সময়ে ম্যালা কাক জমা হইয়া সেই সমস্ত পরিত্যক্ত ভক্ষ্য সামগ্রী খুঁটিয়া খাইত। একদিন তাহাদের ভোজন কালে বৃহৎ একটা ডাঁড়কাক তাহাদের মধ্যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিল। তাহার প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া তাহাকে সাক্ষাৎ-যমদূত-বোধে আর-আর কাকেরা তাহার নিকট হইতে অনেক-হাত দূরে সরিয়া বসিল। বলিব কি, ডাঁড় কাকটির মতো দয়াবান মহাপুরুষ আমি আমার জন্মে দেখি নাই ; সেই দুই চারিটি ঠোকর খাইতেছে, আর, ভিন্নজাতীয় কাকগুলাকে খাইতে জায়গা ছাড়িয়া দিয়া পাঁচ ছয় হাত অন্তরে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া বসিতেছে ; ক্রমাগত এইরূপ আসা-যাওয়া করিয়া ভোজ্যসামগ্রীর নিরেনব্বই অংশ নিরেনব্বই কাককে খাইতে দিয়া একাংশ মাত্র আপনি খাইল, তাহাতে তাহার পেট ভরিল কি না সন্দেহ—কেন না, তাহার শরীরের আয়তন আর-আর কাকের অপেক্ষা দ্বিগুণ লম্বা-চওড়া। ইচ্ছা করিলে যে একা আপনি সব ক'টি ভাত স্বচ্ছন্দে-উদরস্থ করিতে পারিত— কেন যে তাহা করিল না, তাহা সেই জানে, আর অন্তর্যামী বিধাতা-পুরুষই জানেন। ডার্বিনের আইন মানিয়া চলিতে হইলে ডাঁড়কাকটার উচিত ছিল—অযোগ্য কাক গুলা'কে ঠোকরে ঠোকরে উচ্ছিন্ন করিয়া আপনি একাকী উদ্বৃত্ত হওয়া। প্রকৃত কথা যাহা, তাহা এই ঃ — ডার্বিন কিছু আর বৈদান্তিক পণ্ডিতদিগের ন্যায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভেদ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না—জীবে জীবে প্রভেদ আছে, এ কথা তিনি মানেন। এটা যখন তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রভেদ আছে, তখন সেই সঙ্গে এটাও তাঁহার স্বীকার করা উচিত যে, মাতা পুত্রে প্রভেদ আছে। প্রকৃতি হচ্চেন মাতা, জীবগণ হ'চ্চে প্রকৃতি মাতার পুত্র, এবং পরস্পরের ভ্রাতা। সময়ে সময়ে ভ্রাতায় ভ্রাতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিতেও দেখা যায়, আর সেই গতিকে যোগ্যতম ভ্রাতার উদ্বর্ত্তন ঘটিতেও দেখা যায়। কিন্তু তা বলিয়া মাতার মনোগত অভিপ্রায় এরূপ হইতে পারে না যে, যোগ্যতম ভ্রাতা অযোগ্য ভ্রাতাদিগকে উচ্ছিন্ন করিয়া আপনি একাকী উদ্বৃত্ত হউক। উল্টা বরং মাতার মনোগত অভিপ্রায় এই যে, যোগ্যতম ভ্রাতা অযোগ্যভ্রাতাদিগের অভাব পূরণ করিয়া তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া লউক্।

নিম্নশ্রেণীর জীবের মতো ছোটো-ছেলেরা মাতার মর্ম্মগত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারুক, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় বড়-ছেলেদের তাহা বুঝিতে না পারিবার কোনো কারণ নাই। কেন না, প্রকৃতিমাতা নিজহস্তে যে-কোনো কার্য্য করেন তাহাতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, তাঁহার কাজই হচ্চে অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া লওয়া।

তার সাক্ষী—ব্যাঙাচিগুলা জলে কিল্‌বিল্‌ করে, ডাঙার একপ্রকার স্বপ্ন তাহাদের ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের হস্তপদ ফুটাইয়া তোলে, আর, সেইগতিকে ব্যাঙাচি ব্যাঙ হইয়া উঠিয়া ডাঙায় বিচরণ করিবার যোগ্যতা লাভ করে। অন্যান্য অবোধ জীবেরা নিতান্ত ছোটো ছেলে, সুতরাং দুরন্তপনা তাহাদিগকে শোভা পায়, কিন্তু মনুষ্য যখন প্রকৃতিমাতার মর্ম্মগত অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অযোগ্য ভ্রাতাদিগের উচ্ছেদের উপরে আপনার যোগ্যতমত্বের গোড়াপত্তন করিতে যায়, তখন প্রকৃতিমাতা কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মনুষ্যকে শিক্ষাদান করেন এমনি নির্ঘাত রকমের যে, মনুষ্য জন্মে তাহা ভুলিতে পারে না। ডার্বিনের এই যে শক্ত আইন "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন", ইহা লোকসমাজে প্রচলিত হইলে লোকে যে কিরূপ "দৌর্ভিক্ষ্যাং যানি দৌর্ভিক্ষ্যাং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ ভয়ং"—দৌর্ভিক্ষ হইতে দৌর্ভিক্ষ্যে ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে পদনিক্ষেপ করে, ফরাসী বিপ্লবের সময় তাহা প্যারিস নগরের পুরবাসীদিগের কাহারো জানিতে বাকি ছিল না। অযোগ্য রাজবংশ এবং রাজপারিষদ্‌বর্গকে শাসাইয়া প্রথমে মিরাবো'র দল যোগ্যতম হইয়া উঠিলেন ; তাহার পর বিধিমতপ্রকারে রাজবংশ ধ্বংস করিয়া রবস্‌পিয়র্‌ যোগ্যতম হইয়া উঠিলেন, তাহার পরে সারারাজ্যের অযোগ্যদিগকে তোপের ধমকে দূরে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া নেপোলিয়ন মহাবীর আপনার যোগ্যতমত্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। যাহাই হোক্ না কেন—ফরাসী বিপ্লবের রাজোগুণপ্রধান উন্মত্ত কোলাহলের গভীর অন্তস্থলে সত্ত্বগুণের রত্নপ্রদীপ, সুমহান্ স্বর্গীয় আলোক বিকীর্ণ করিতে এক মুহূর্ত্তও ক্ষান্ত ছিল না, এবং এখনো পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত সভ্যজাতির কুটিল রাজনৈতিক পাকচক্রের ভিতরে-ভিতরে সে-ই আলোকই বিকীর্ণ করিতেছে—যদিচ বাহিরে তাহার চিহ্ন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। সে আলোক হচ্চে ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ; তাহা যে কী, তাহা আপনারা সকলেই জানেন—সাম্য, সৌহার্দ্দ, মুক্তি। কিন্তু এই যে জ্যোতির্ম্ময় মহামন্ত্র সাম্য সৌহার্দ্দ মুক্তি ইহার সাধন-পদ্ধতি কি ঐ ? অযোগ্য ভ্রাতাদিগকে সবংশে নির্ম্মূল করিয়া যোগ্যতমেরা নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুক—এই কি উহার সাধন-পদ্ধতি ? ফরাসীস্ বিপ্লবের সময় ঐ মহামন্ত্রের সাধকেরা প্রকৃত সাধন পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনাকেই সার জ্ঞান করিয়া তাহারই পশ্চাতে ধাবমান হইয়া ছিলেন, তাই তাঁহারা অকূল বিপত্তি-সাগরে হাবুডুবু খাইয়া সারা হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদি অযোগ্য ভ্রাতাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত না হইয়া তাঁহাদিগকে যোগ্য করিয়া গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ওরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইত না ; —তাহা তো হইতই না, তা ছাড়া, তাহার একশতাব্দী পরে যোগ্যতম বিসমার্কের নিকটে তাহাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না।

অধুনাতন কালের নূতন বিবৃত্তিবাদের মোট কথা যে কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি ; তাহা এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জীব একই জীবাঙ্কুরের (Protoplasm এর) ভিন্নধা বিকাশ, আর সেই বিকাশের মূল প্রবর্ত্তক Struggle for existence, এক কথায় রজোগুণ। কিন্তু

সে বিকাশের নিয়ামক যে কে—পথপ্রদর্শক যে কে সে বিষয়ে ডার্বিন্ একটি কথারও উচ্চবাচ্য করেন নাই। আমাদের দিক দিয়া আমরা দেখিতেছি যে একদিকে যেমন রজোগুণের চাবুক সেই বিকাশকে পথের মাঝে মাঝে খেপাইয়া তুলিতেছে, আর-একদিকে তেমনি সত্ত্বগুণের রাশ বাগাইয়া আনিয়া ধীরে ধীরে মনুষ্যত্বের উন্নত সোপানে পৌছাইয়া দিতেছে। আমাদের দেশের সাংখ্যশাস্ত্র ডারুইনের শাস্ত্রের ন্যায় একদিক্ ঘাঁসা নহে। সাংখ্যশাস্ত্রের মোট মন্তব্য এই যে, একদিকে মূল প্রকৃতি হইতে অনুলোমপথের মধ্য দিয়া স্থূলের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে, আর-একদিকে স্থূল হইতে প্রতিলোম পথের মধ্য দিয়া সূক্ষ্মের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে ; অথবা যাহা একই কথা—অনুলোমপথে তমোগুণের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে, প্রতিলোম পথে সত্ত্বগুণের উত্তরোত্তর বিকাশ হইতেছে, এবং উভয় পথেই রজোগুণ স্বকার্যে ব্যাপৃত হইতেছে। সাংখ্যের মোট মন্তব্য কথাটি আরো সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যদিচ তাহা শুনিতে অনেকের নিকটে হেঁয়ালির মতো ঠেকিবে। খুব সংক্ষেপে যদি বলিতে হয়, তবে তাহা এই : — সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম হচ্চে প্রকাশ, তমোগুণের ধর্ম্ম হচ্চে অপ্রকাশ, রজোগুণের ধর্ম্ম হচ্চে প্রকাশ হইতে অপ্রকাশ এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ, এইরূপ ছট্‌ফটানি! প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে নাবা হচ্চে অনুলোমপদ্ধতি ; অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে ওঠা হচ্চে প্রতিলোমপদ্ধতি। ত্রিগুণতত্ত্ব সম্বন্ধে এতক্ষণ ধরিয়া এযাহা বলিলাম, ইহাতে অন্তত এটা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ডার্বিনের শাস্ত্রের দীপালোক অপেক্ষা আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের সূর্য্যালোক প্রকৃতি নিগূঢ় রহস্যের গভীর মর্ম্মস্থানের তলা পর্যন্ত অনেকদূর যায়। আমাদের দেশীয় শাস্ত্রের মতে শুধু কেবল জীবজগৎ নহে, পরন্তু সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তু ন্যূনাধিক পরিমাণে স্ব স্ব সত্তা সমর্থনের জন্য চেষ্টাপরায়ণ, কেননা, সকল বস্তুতেই অপর দুই গুণের সঙ্গে রজোগুণ ন্যূনাধিক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। আধুনিক বিবৃতিবাদ এবং পুরাতন সাংখ্যের মধ্যে যদিচ আকাশ পাতাল প্রভেদ, তথাপি প্রকৃতির ক্রমবিকাশপরায়ণতা এবং রজোগুণের (অর্থাৎ দুঃখ এবং কর্ম্ম-চেষ্টার) প্রবৃত্তিশীলতা, এই দুইটি গোড়ার ব্যাপারের প্রধানতা-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কতকটা যেন মিল আছে বলিয়া মনে হয়; এটা অন্তত বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের দেশের পুরাতন আচার্যেরা যেখান হইতে যেরূপ করিয়া প্রকৃতির ক্রমবিকাশের এবং রজোগুণের প্রবৃত্তিশীলতার সন্ধান পাইয়াছিলেন, আধুনিক বিবৃতিবাদীরা ঐ দুই বিষয়ের সন্ধান সেইখান হইতেই তেমনি করিয়া পাইয়াছেন, তা বই, ঊনবিংশশতাব্দীর বিদ্যাবুদ্ধির নিকট হইতে ধার করিয়া পান নাই! এ কথা যদি সত্য হইত যে, নিউটন ডার্বিন প্রভৃতি মৌলিক শ্রেণীর আবিষ্কর্তারা বিদ্যার বাঁধা-রাস্তা দিয়া তাঁহাদের স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে এখনকার বিদ্যালয়ের অধ্যেতারা যে পথ অবলম্বন করিয়া কেহ বা বি-এ হন বা কেহ বা বিদ্যাবাগীশ হন, সেই পথ অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে কেহ বা নিউটন, কেহ বা ডার্বিন, কেহ বা সেক্‌স্‌পীয়র হইতে পারিতেন; তাহা তাঁহারা না হইতেছেন কেন? কে তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে? দূরে হাত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে আমি সাক্ষী মান্য করিতেছি। তিনি কি তাঁহার অপূর্ব্ব নূতন সিদ্ধান্তটি ঊনবিংশতাব্দীর বিদ্যার নিকট ভিক্ষা করিয়া পাইয়াছেন? কখনই না। এটা অবশ্য সত্য যে, ঊনবিংশশতাব্দীর যন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথাটির যথার্থ্য

পণ্ডিতগণকে যেমন করিয়া চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ তিনি তাহা রীতিমত Verify করিয়াছেন। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লাপ্লাসের নাভসিক সিদ্ধান্ত (Nebular Theory) আকাশের অপরিসীম জ্যোতি-র্জগৎকে যোগসূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়াছে ; আমাদের চক্ষের সামনে ডার্বিনের বৈকারিক সিদ্ধান্ত (Theory of Evolution) পৃথিবীর জীবজগৎকে যোগসূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়াছে ; গাঁথিতে কেবল বাকি লাপ্লাসের নাভসিক্ সিদ্ধান্ত এবং ডার্বিনের বৈকারিক সিদ্ধান্ত উভয়কে ঐকতানিক যোগসূত্রে। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন বসু মহাশয় কি সেই সুমহৎ কার্য্যের জন্য ভারতীমাতার প্রিয় ভারতভূমিতে করুণাময় বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন? এক সময়ে ভারতী মাতা আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য এবং মহাপুরুষগণকে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছেন কত না যত্নে? ভারতের ক্রন্দনধ্বনিতে সেই সকল পুরাতন কথা কি তাঁহার স্মরণে জাগিয়া উঠিয়াছে তাই তিনি এত দেশ থাকিতে পূর্ব্বের একতকোণে কৃপাদৃষ্টি বিতরণ করিলেন? এ প্রশ্ন আমি এই পূর্ব্বাহ্নে সভার মাঝখানে খাঁটাইতে সাহসী নহি। বাক্যে কাজ নাই— আশার অঙ্কুর যাহা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে, তাহা ঈশ্বরেচ্ছায় ভালোয়-ভালোয় বাঁচিয়া-বর্ত্তিয়া থাকিয়া দিবালোকে সমুত্থান করুক্—তাহা হইলেই বাঁচি।

এতক্ষণ ধরিয়া এ যাহা বলিলাম, তাহাতে অর্জ্জুনসারথি যেমন বিরাটপুত্র উত্তররথীকে সাহায্য-প্রদান করিয়াছিলেন, জ্ঞান তেমনি কিরূপে বিদ্যাকে গুপ্তভাবে সাহায্য-প্রদান করে, তাহার কতকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে জ্ঞান তাহার নিজাধিকারে কিরূপ প্রণালীতে পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্।

যথার্থ কথা যদি বলিতে হয়, তবে বিদ্যার এই যে মূলমন্ত্র "ভাগ ভাগ কর, আর জেতো," এটা এক প্রকার ডাকিনীমন্ত্র। উহার সাধনে আপাতত জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উল্টা ফল ফলে। ঐ রক্তশোষক মন্ত্রের বলে জ্ঞাতব্য সত্যের নানা দিকের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পরের বন্ধন হইতে বিয়োজিত হইয়া জ্যান্তসত্য শবদেহে পরিণত হয়। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। তাহা হইলে ফের আবার সেই সমস্ত নির্জ্জীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়াতাড়া দিয়া একটা সজীব-সত্য গড়িয়া দাঁড় করানো বিদ্যার ক্ষমতার অসাধ্য হইয়া পড়ে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, মস্তিষ্কবিৎ পণ্ডিতেরা নির্জ্জীব মস্তিষ্কতন্তু জোড়াতাড়া দিয়া জ্ঞানের মর্ম্মস্থানে পৌঁছিবার সেতু নির্ম্মাণ করিতে এতকাল ধরিয়া এত যে চেষ্টা করিতেছেন, সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি। তবেই হইতেছে যে, বিদ্যার ডাকিনীমন্ত্র একপ্রকার রূপার কাটি, তাহা মারিতে পারে কিন্তু বাঁচাতে পারে না। সোনার কাটি হ'চ্চে জ্ঞানের যোগমন্ত্র, তাহাই কেবল মৃতশরীরে জীবন সঞ্চার করিতে পারে। আমি এখানে যে জ্ঞানের কথা বলিতেছি, তাহা গোড়া'র জ্ঞান ; তা বই, তাহা শাখা জ্ঞানও নহে— শেখা জ্ঞানও নহে। মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান অমূল্য রত্ন ; অথচ মনুষ্য তাহা বিনামূল্যে পাইয়াছে। মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মনুষ্যকে আমরা বলি জ্ঞানবান জীব। মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান বিদ্যার ন্যায় শেখাজ্ঞান নহে ; তাহা একান্ত পক্ষেই অশেখাজ্ঞান। মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান যদি বিদ্যারূপী হইত, তাহা হইলে শুধু কেবল বিদ্বান লোকদিগকেই আমরা বলিতাম জ্ঞানবান জীব। করি আমরা কি? আমরা পণ্ডিত মূর্খের প্রভেদের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া পৃথিবীসুদ্ধ সকল মনুষ্যকেই জ্ঞানবান্ জীব বলিয়া অবধারণ করি, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মনুষ্যের গোড়ার জ্ঞান বিদ্যা নহে। বিদ্যা যদি নহে তবে তাহা পদার্থটা কী? পদার্থটা তাহা যে কী, তাহা

দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। মৌমাছি ঐতো একরত্তি ক্ষুদ্র জীব, তা বলিলে কি হয়—ও একটি মস্ত কারিকর ; কিন্তু কারিকরি কাহাকে বলে, তাহা জানেনা ; জানিবে কেমন করিয়া? যে জানিবে, সে যে ওর ভিতরে নাই। ওরভিতরে চেতনা আছে ভরপুর তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু চেতনা থাকিলে কি হইবে (Sensation থাকিলে কি হইবে)? চেতনার মাথার উপরে যে চৈতন্য নাই (Consciousness নাই)। মণি আর মাণিক্য কিছু আর এক নহে! মণি অপেক্ষা মাণিক্যের মূল্য ঢের বেশী। চেতন অপেক্ষা চৈতন্যের মূল্য ঢের বেশী। চেতন দেখে কিন্তু কি দেখিতেছে, তাহাও বলিতে পারেনা, কে দেখিতেছে তাহাও বলিতে পারে না। চৈতন্য যেমন দেখে, তেমনি সেই সঙ্গে কি দেখিতেছে এবং কে দেখিতেছে, তাহা তাহার নিকট অপ্রকাশ থাকে না। চৈতন্য আপনি আপনার সাক্ষী এবং তাহার আয়ত্তের মধ্যে যখন যাহা উপস্থিত হয়, তাহারও সাক্ষী। পশ্বাদি জন্তুর মাথার মণি চেতন ; মনুষ্যের মাথার মণি চৈতন্য। মনুষ্যের গোড়া'র জ্ঞান যে পদার্থটা কী এতক্ষণে তাহা বুঝিতে পারা গেল। তাহা চৈতন্য।

চেতনের এক চক্ষু মনশ্চক্ষু। চৈতন্যের তিন চক্ষু মনশ্চক্ষু, আর ধীচক্ষু, মাঝের চক্ষু প্রজ্ঞাচক্ষু। মন বাহিরে বাহিরে দৌড়ায়— মনশ্চক্ষু বহির্মুখ। বুদ্ধি ভিতরে ভিতরে চিন্তা করে— ধীচক্ষু অন্তর্মুখ। প্রজ্ঞাচক্ষু ভিতর বাহির মিলাইয়া একীভূত করে, প্রজ্ঞাচক্ষু যোগমুখ অর্থাৎ অন্তর বাহিরের যোগের প্রতি উন্মুখ। জীব চৈতন্যের প্রজ্ঞাচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ মিলিয়া এক অদ্বিতীয় অখণ্ড মোট সত্য—সর্ব্বাঙ্গীন সমগ্র সত্য—তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হয়।

ফল কথা এই যে, সত্যজ্ঞানই জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান জ্ঞান নহে। সত্যের সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে জ্ঞান জ্ঞানই হইতে পারে না। শরীর যেমন চায় অন্ন, জ্ঞান তেমনি চায় সত্য। শাখা জ্ঞান চায় শাখা সত্য। জ্যোতির্বিদ্যা চায় জ্যৌতিষ সত্য ; রসায়ন বিদ্যা চায় রাসায়নিক সত্য; ডাক্তারি বিদ্যা চায় ডাক্তারি সত্য ; কবিরাজি বিদ্যা চায় কবিরাজি সত্য। তেমনি মোট জ্ঞান চায় মোটসত্য। প্রজ্ঞাচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে জীবচৈতন্য সর্ব্বাঙ্গীন সমগ্র সত্যের প্রতি লক্ষ্যনির্বিষ্ট করে। সমগ্র সত্য কিরূপ সত্য? তাহা কোনপ্রকার একদিক ঘ্যাঁসা ছিন্ন সত্য নহে (Abstract নহে), তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। তাহা শূন্য আকাশ বা শূন্যকাল নহে, তাহা মনের ভাবমাত্র নহে ; তাহা অনির্দ্দেশ্য সত্তা বা অন্ধশক্তি নহে। সে যে সত্য সমগ্রসত্য, তাহা সব সত্য একাধারে। প্রবর্দ্ধক কাচের মধ্য দিয়া (Magnifying glass এর মধ্য দিয়া) সূর্য্যরশ্মি একঠাই পুঞ্জীকৃত হইলে সেই ক্ষুদ্র রশ্মিপুঞ্জটিকে আমরা যখন দেখি স্থিতিগতি তেজবর্ণ আলোক একাধারে কেন্দ্রীভূত, তখন তাহাতে কি প্রমাণ হয়? তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ঐ যে পাঁচ ব্যাপার স্থিতি, গতি, তেজ, বর্ণ, আলোক, উহা সমগ্র সূর্য্যমণ্ডলে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত; কেননা সমগ্র সূর্য্যমণ্ডল সমস্ত সৌরকিরণের মূলাধার। আমরা তেমনি যখন আপনা-আপনিতে দেখি সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন, এবং চৈতন্য একাধারে কেন্দ্রীভূত, তখন তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ঐ যে পাঁচ মৌলিক ব্যাপার সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য উহা সমগ্র সত্যে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। অতএব একটা স্থির যে, সমগ্র সত্যে, অটল ধ্রুবসত্তা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী মহতী শক্তি, জীবন্ত প্রাণ, জাগ্রত চেতন এবং জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় কেন্দ্রীভূত ; এক কথায় — সমগ্র সত্য পরমাত্মা

স্বরূপ। তবেই হইতেছে যে, মনুষ্যের অন্তরাত্মা চায় পরমাত্মা, জীব-চৈতন্য চায় ব্রহ্মচৈতন্য।

অতঃপর জিজ্ঞাসা এই যে, কোথায় ব্রহ্মচৈতন্যের দর্শন পাওয়া যাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্ম-চৈতন্য জলেস্থলে আকাশে-অন্তরীক্ষে, অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন ভরা ; কেননা তিনি সমগ্র সত্তা—তিনি সব সত্তা।

আমরা যদি একবার আমাদের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ঘূর্ণার পাকে পড়িলে নৌকা যেমন সুবিস্তীর্ণ পরিধিপথে চক্র দিতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর পরিধিপথে চক্র দিতে দিতে কেন্দ্রস্থানে আসিয়া পড়ে, সৃষ্টির বিকাশ তেমনি গ্রহাদিচক্র ঘুরিয়া জীবচক্রে এবং জীবচক্রে ঘুরিয়া মনুষ্যে-মনুষ্যে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। সৃষ্টির বিকাশ কিসের বিকাশ? সমগ্র সত্যে যাহা গোড়া হইতেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহারি উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশ। তবেই হইতেছে যে, সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য, এই পাঁচ মৌলিক ব্যাপার যাহা পরমাত্মাতে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, তাহাই তাঁহার ইচ্ছার প্রভাবে, প্রাণের আনন্দে এবং জ্ঞানের নিয়মে দশদিকে উথলিয়া পড়িতেছে। তার সাক্ষী, — গ্রহাদিচক্রে আমরা দেখিতে পাই সত্তা এবং শক্তির বিকাশ ; উদ্ভিদ্‌চক্রে দেখিতে পাই সত্তা এবং শক্তির উপরে প্রাণের বিকাশ ; জীবচক্রে দেখিতে পাই সত্তা, শক্তি এবং প্রাণের উপরে চেতনের বিকাশ। এইরূপ দেখিতেছি যে সত্তা, শক্তি প্রাণ চেতন এবং চৈতন্য এই পাঁচ মৌলিক ব্যাপার যাহা সমগ্র সত্যে পূর্ণমাত্রায় কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, তাহা আকাশের গ্রহাদিচক্র হইতে যাত্রারম্ভ করিয়া উদ্ভিদ্ এবং জীবচক্রের মধ্যদিয়া একে একে ফুটিয়া সমস্তই মনুষ্যে-মনুষ্যে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-পরিমাণে একত্রে জমাট বদ্ধ হইতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, শক্তি, প্রাণ, চেতন এবং চৈতন্য, সমস্তই মনুষ্যে মনুষ্যে কেন্দ্রীভূত—যদিচ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিমাণে। তবেই হইতেছে যে এক একটি মনুষ্য এক একটি ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড, আর, তাহাই পাল্টিয়া বলিলে দাঁড়ায় এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাট্ মনুষ্য। অতএব, ইহা স্থির যে, জীব-চৈতন্য যেমন ক্ষুদ্র মনুষ্যের সারসর্ব্বস্ব, ব্রহ্মচৈতন্য তেমনি বিরাট মনুষ্যের সারসর্ব্বস্ব , তথৈব, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত, জীবচৈতন্য তেমনি ব্রহ্মচৈতন্যের অন্তর্গত।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, এক অদ্বিতীয় সমগ্র সত্তা হইতে—ব্রহ্মচৈতন্য হইতে—জীবচৈতন্য কোনো কালে পৃথক্কৃত হয় নাই ; কেন না, তাঁহা হইতে পৃথক্কৃত হওয়ার নামই বিনাশ পাওয়া। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেক জীবচৈতন্যের অন্তঃকরণে, যেন সে মূল হইতে পৃথক্কৃত, এইরূপ একটা অন্ধতা লাগিয়া রহিয়াছে, আর, সেই অন্ধতাগতিকে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে। মাতা যখন ক্রোড়স্থ শিশুকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া কপাটের আড়ালে লুকাইয়া থাকেন, তখন শিশুটি "মাতা এখানে নাই" মনে করিয়া সুর্কি খাইতে বসিয়া যায়। সুর্কির সোঁদা আস্বাদনে ভুলিয়া প্রথম প্রথম বেশ ঠাণ্ডা থাকে। কিছুকাল পরেই মাতার জন্য তাহার প্রাণে অভাববোধ জাগিয়া উঠে। মাতা তখন ঘোমটায় মুখ ঢাকা দিয়া শিশুটির সাম্নে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভয় দেখান। শিশুটি তখন মাতার হাত জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উঠিবার জন্য কাঁদিতে থাকে। মাতা যেই তাহাকে ক্রোড়ে ল'ন শিশুটি সেই অমি মাতার মুখদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার মুখ হইতে ঘোমটা সরাই ফ্যালে , তখন মাতা পুনঃপুনঃ শিশুটির মুখচুম্বন করেন। কিন্তু শিশু যেমন মাতা'কে চায়, মাতাও তেমনি শিশুকে চা'ন ; শ্রোতৃমণ্ডলী যেমন গায়ককে

চা'ন, গায়কও তেমনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে চা'ন। জীবাত্মা যেমন পরমাত্মাকে চায়, পরমাত্মা তেমনি জীবাত্মাকে চা'ন। পরমাত্মা তাই এক শক্তি দ্বারা জীবাত্মাকে আপনা হইতে পৃথক্ মনে করাইয়া তাহার দর্শনক্ষুধা জাগাইয়া তোলেন, আর এক-শক্তি দ্বারা সেই ক্ষুধার অন্ন হইয়া জীবাত্মার নিকট প্রকাশিত হ'ন।

অতএব জীবচৈতন্য যে আপনাকে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে পৃথক্‌গত মনে করে, তাহা তাহার মনে করিবারই কথা ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রহ্মচৈতন্যের একতাসূত্রে সমস্ত জীবচৈতন্যের পরস্পরের প্রতি, সর্ব্বভূতের প্রতি এবং সর্ব্বমূলাধার ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতি প্রাণের টান রহিয়াছে মর্ম্মে-মর্ম্মে নিগূঢ়। সেই প্রাণের টান যোগের প্রবর্ত্তক।

কিন্তু অশ্বারোহীর হস্তে চাবুকও চাই, রাশও চাই ; অশ্বের প্রবর্ত্তকও চাই, নিয়ামকও চাই। যোগের প্রবর্ত্তক যেমন প্রাণের টান, যোগের নিয়ামক তেমনি-জ্ঞানের অধ্যক্ষতা। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম যোগ হ'চ্ছে শরীর বন্ধন ; দ্বিতীয় যোগ হচ্ছে বিবাহ বন্ধন ; তৃতীয় যোগ কুলবন্ধন ; চতুর্থ যোগ সমাজ বন্ধন ; পঞ্চম যোগ ধর্ম্মবন্ধন ; ষষ্ঠ যোগ ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত জীবচৈতন্যের ঐক্যবন্ধন। এই সমস্ত যোগের ব্যাপারকে যদি জ্ঞানদ্বারা নিয়মিত না করিয়া আপাতদর্শী বুদ্ধি-বিদ্যার হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে হিতে বিপরীত হয়। আনাড়ি বুদ্ধি "যোগের বন্ধন খুব শক্ত করিয়া আঁটিতেছি" মনে করিয়া অনুষ্ঠানের যদি-চ ত্রুটি করেনা একটুও, কিন্তু দৈবের কি বিড়ম্বনা—হইয়া দাঁড়ায় তাহা বজ্র আঁটুনির ফস্কা গেরো। আপাতদর্শী বুদ্ধির কর্ত্তাগিরির উপদ্রবে একদিকে যে পরিমাণে রাজভোগের পারিপাট্যে শরীরে মেদমাংস ঘনীভূত হইতে থাকে, আর একদিকে সেই পরিমাণে অস্থিমাংসের সহিত প্রাণের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতে থাকে। একদিকে যে পরিমাণে দাম্পত্যবন্ধনের আঁটাআঁটি হয়, আর একদিকে সেই পরিমাণে ভ্রাতৃস্নেহের বন্ধন আল্গিয়া যায়। একদিকে যে-পরিমাণে কুলবন্ধনের আঁটাআঁটি গতিকে কৌলীন্যমর্য্যাদা দম্ভে স্ফীত হইয়া ওঠে, আর একদিকে সেই পরিমাণে উচ্চ নীচ শ্রেণীর পরস্পরের সৌহার্দ্দ বিনিময়ের পথে কাঁটা পড়িয়া যায়, একদিকে যে-পরিমাণে সমাজ বন্ধনের আঁটাআঁটি গতিকে লোকাচারকে মাথার উপরে চড়াইয়া দেওয়া হয়, আর একদিকে সেই পরিমাণে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের বন্ধন পায়ের নীচে চাপা পড়ে। একদিকে যে পরিমাণে সম্প্রদায়িক ধর্ম্মবন্ধনের আঁটাআঁটি গতিকে গোঁড়ামি অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, আর একদিকে সেই পরিমাণে সাধারণত মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের ভদ্রব্যবহারের পথে কাঁটা পড়িয়া যায়। এইজন্য বলি যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের নৌকার হাল্ বিদ্যা-বুদ্ধিরূপী আনাড়ি মাঝির হস্তে সঁপিয়া না দিয়া জ্ঞান'কে কাণ্ডারীপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য ; কেননা, দুই দুই পথের দুই দুই আতিশয্যের (রাগাতিশয্যের এবং ত্যাগাতিশয্যের) মধ্যের পথ দিয়া নৌকা চালাইয়া সর্ব্বপ্রকার যোগের সহিত যোগ রক্ষা করা জ্ঞানেরই কাজ। সত্যদর্শী জ্ঞানের কার্য্য আপাতদর্শী বিদ্যাবুদ্ধিকে দিয়া সম্ভামূলে করাইয়া লইতে গেলে কাজেই উল্টা ফল ফলে। জ্ঞানকে যদি মন-অশ্বে আরোহণ করানো যায়, তাহা হইলে জ্ঞান তুরঙ্গী মন-অশ্বের স্ফূর্ত্তি এবং সংযম দুয়েরই প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া রাশ এমনি ঠিক্ মাফিক বাগাইয়া ধরে যে, ঘোড়ার চলন এবং সোয়ারের চালন একতালে মিলিয়া গিয়া ফলে হইয়া দাঁড়ায় ঠিক যেন ঘোড়া এবং ঘোড়সোয়ার দুয়ে এক, একে দুই। তাহার পরিবর্ত্তে যদি আপাতদর্শী বুদ্ধিকে মন-অশ্বে আরোহণ করানো যায়, তাহা হইলে বুদ্ধি রাশ টানিয়া ধারবার সময় এমনি বলপূর্ব্বক

টানিয়া ধরে যে ঘোড়া চলংশক্তি রহিত হইয়া পা ছোঁড়াছুঁড়ি করিতে আরম্ভ করে, তেমনি আবার রাশ আলগা দিবার সময় এত আলগা দ্যায় যে, ঘোড়া উন্মত্ত বেগে যেখানে সেখানে ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। অহঙ্কার-ভরা বুদ্ধি আপনার গোঁ ছাড়েনা, আর, মনের গায়ে বুদ্ধির সেই অহঙ্কারের বাতাস লাগিয়া মনও আপনার গোঁ ছাড়েনা। পক্ষান্তরে, মনের সোয়ায় যেমন পরিশুদ্ধ জ্ঞান, জ্ঞানের সোয়ার তেমনি সত্য ; জ্ঞান সত্যের বাগ মানে, তাই মনের গায়ে জ্ঞানের সেই সুবিনীতভাবের বাতাস লাগিয়া মনও জ্ঞানের বাগ মানে। বুদ্ধির প্রধান একটি দোষ অহঙ্কার। বুদ্ধি তাই আপনাকে জানে বুদ্ধিমান্— মনকে ভাবে উন্মাদ ; আর সেইরূপ বোধের বশবর্ত্তী হইয়া মনের উপরে কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে যায়। মানিলাম মন শিশু, মন উন্মাদ ; কিন্তু তাহা বলিয়া যে, মনকে পাগলা গারদে পুরিয়া তাহার উন্মাদ রোগ'কে রীতিমত পাকাইয়া তুলিতে হইবে, তাহার কোনো অর্থ নাই। প্রকৃত কথা এই যে, ঠিক্ একটা মাঝের পথ আছে—তাহা বিদ্যা-বুদ্ধির কঠিন ব্যবস্থা বন্ধনের পথও নহে, আর, মনের অসংযত স্ফূর্তির পথও নহে ; প্রজ্ঞা চক্ষু সেই মাঝের পথ দেখাইয়া দ্যায়। মাঝের চক্ষু যে কোন্ চক্ষু, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বলিয়াছি যে জীবচৈতন্যের একচক্ষু মনশ্চক্ষু—তাহা বহির্ম্মুখ, আর এক চক্ষু ধীচক্ষু—তাহা অন্তর্ম্মুখ ; মাঝের চক্ষু প্রাজ্ঞচক্ষু—তাহা যোগমুখ অর্থাৎ অন্তর-বাহিরের যোগের প্রতি উন্মুখ। এই মাঝের চক্ষুই মাঝের পথ দেখাইয়া দ্যায়। এতো জানাই আছে যে, সেতারের তার বেশী আঁটিয়া বাঁধিলেও ঠিক সুর বাহির হয়না—কম আঁটিয়া বাঁধিলেও ঠিক্ সুর বাহির হয় না। সুর বাঁধিবার সময় সেতারের কান ক'ফের নুচড়াইতে হইবে—বাদকের কানই তাহা বলিয়া দিতে পারে, তা বই সঙ্গীতের ব্যাকরণ তাহা বলিয়া দিতে পারেনা। তেমনি বিভিন্ন ধাপের বিভিন্ন প্রকার যোগ কতটা চড়া বা নরম সুরে বাঁধিলে ঠিক্ হয়, তাহার মাত্রা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার কর্ত্তা সাধকের অন্তরাত্মা; তা ভিন্ন, আর-কাহারো সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। ফলকথা এই যে, মানুষের প্রাণের গভীরে ব্রহ্মচৈতন্যের আলোক ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় সঙ্গোপিত রহিয়াছে ; সেই প্রাণের আলোক যখন সুপ্তিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, তখন তাহারই নাম জ্ঞানের প্রকাশ বা চৈতন্যের উদয় ; আর সেই চৈতন্যের উদয়ই বিভ্রান্ত পথিককে সেই মধ্যের পথ দেখাইয়া দ্যায়,— যেখানে নানা পথের নানা ক্যাকড়া যোগ ঐকাতানিক যোগে সম্মিলিত।

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।। (ভগবদ্গীতা)

দুঃখ-বিনাশক যোগ তাঁহারি হয়, যাঁহার আহার বিহার, কর্ম্মচেষ্টা এবং নিদ্রাজাগরণ, সমস্তই যোগ-সঙ্গত।

সকল দেশেরই শাস্ত্রে আবহমান কাল হইতে এই কথা খাদের সুরে ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে যে, শুদ্ধ কেবল বিদ্যাবুদ্ধির বলে অন্তরাত্মার গভীরতম আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারিবার মত সার সত্যে নাগাল পাওয়া যাইতে পারেনা ; তাহা পাইতে হইলে তাহার প্রধান উপায় চিত্তশুদ্ধি। আমাদের দেশের ব্রহ্মজ্ঞান শাস্ত্রের গোড়াতেই রহিয়াছে যে, চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে ব্রহ্মজ্ঞানে সাধকের অধিকারই জন্মিতে পারেনা। জগৎপূজ্য মহাপুরুষ ঈশা বলিয়াছেন যে, শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিরাই ধন্য, কেননা, তাঁহারা পরমাত্মার দর্শন পাইবেন। আরো তিনি বলিয়াছেন এই যে, যাঁহার চিত্ত বালকের ন্যায় নির্ম্মল, স্বর্গরাজ্যে তাঁহারই অধিকার। বেদে আছে—"পাণ্ডিত্যং

নির্ব্বিদ্য বাল্যেনানুতিষ্ঠেৎ''—পাণ্ডিত্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া বালকের ন্যায় হইবে। যোগশাস্ত্রে আছে, সত্ত্বগুণের উদ্রেকে সাধকের চিত্ত স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হইলে তাহাতেই প্রকৃত সত্যের ছাপ পড়ে। এই গুরুতর বিষয়টি বাহুল্যরূপে উপদেশ দিবার আমার অধিকারও নাই—ক্ষমতাও নাই। এইজন্য, চিত্তশুদ্ধির আদর্শ আমার যাহা মনে হয় পরম উৎকৃষ্ট, তাহাই সংক্ষেপে বলিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

স্বচ্ছ জলাশয়ের ন্যায় ভিতর-বাহির এক হওয়াই আমার মনে হয় চিত্তশুদ্ধির প্রধান আদর্শ ; আর সেই সঙ্গে আমার মনে হয় যে, গায়ত্রীধ্যান চিত্তশুদ্ধির পরম সহায়। কেননা, সাধকের অন্তরের ধ্যানের আলোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জাগ্রত আলোকের সহিত একতানে মিলিত হইলে অন্তর-বাহিরের একত্বের সিধাপথ প্রমুক্ত হইয়া যাইতে পারে। আর, সকল শাস্ত্রই এ বিষয়ে একবাক্য যে, সাধকের অন্তর-বাহির এক হইলেই—প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া এবং মুখের চাওয়া এক হইলেই—অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগৎ ব্যাপিয়া এক সত্য প্রকাশমান হয়—ব্রহ্মের দর্শন লাভ হয়, সদানন্দ বিরাজমান হয়, সমস্ত ক্ষোভ মিটিয়া যায়—

''ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।''

# সাধনের সত্য

ভগবদ্গীতায় আছে ঃ —

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে" মনুষ্য সহস্রের মধ্যে এক-আধজন সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন। মনুষ্যের মধ্যেই যখন সাধন এইরূপ বিরল তখন পশ্বাদি জন্তুদিগের তো কথাই নাই। এটাও কিন্তু দেখিতেছি যে, সাধন না করে এমন জীবই নাই, —জীবমাত্রই সাধনে রত। কুক্কুরদের কর্ত্তব্য কুক্কুরেরা সাধন করে, বায়সদের কর্তব্য বায়সেরা সাধন করে ; পিপীলিকাদের কর্ত্তব্য পিপীলিকারা সাধন করে ; মৌমাছিদের কর্ত্তব্য মৌমাছিরা সাধন করে ; পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই স্ব স্ব জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ত্তব্য সাধন করে ; শুধু যে সাধন করে তাহা নহে—সর্ব্বপ্রযত্নে সাধন করে —প্রাণপণে সাধন করে। এমন কি ক্ষুদ্র মৌমাছিরা ও ভবিষ্যৎবংশের মঙ্গলার্থে প্রত্যেকে আপনার সমস্ত জীবন, সমস্ত পরিশ্রম এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি অকাতরে উৎসর্গ করিয়া দ্যায়। মনুষ্য-প্রহরী রাত্রিকালে দ্বারে পাহারা দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্যসাধনের মাঝপথে ঘুমাইয়া পড়া কুক্কুর প্রহরীর শাস্ত্রে আদৌ লেখে না। কর্ত্তব্যসাধনে কুক্কুর-প্রহরী যেমন সজাগ, কোনও পুলিশের চৌকিদার তেমন নহে। তবে কেন আমরা কুক্কুরদিগের কৃত কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানকে সাধন বলি না? যদি বল' যে কুক্কুরেরা অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করে না এটা যখন স্থির, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, তাহাদের ব্রতানুষ্ঠান অন্ধসংস্কার-মূলক জাতিধর্ম্ম বই আর কিছুই নহে; — তাহা তুমি বলিতে পার না ; কেন না, এটা সকলেরই দেখা কথা যে, পশুপক্ষীরাও ন্যূনাধিক পরিমাণে বিচারপূর্ব্বক যাহাতে তাহাদের শরীর ভাল থাকে তাহাই ভক্ষণ করে। পক্ষীরাও স্থানাস্থান এবং কালাকাল বিচারপূর্ব্বক নীড় নির্ম্মাণ করে, বিশেষতঃ রাজহংসেরা সময় বুঝিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মানস সরোবরে যাত্রা করে এবং সময় বুঝিয়া সেখান হইতে প্রত্যাগমন করে। কুক্কুরেরাও পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া অভ্যাগত অতিথিগণের কাহাকে দেখিয়া ক্রোধে গোঙরাইতে থাকে, কাহাকে দেখিয়া আহ্লাদে ল্যাজ নাড়িতে থাকে। কুক্কুরাদি জন্তুগণ পাত্রাপাত্র কালাকাল এবং স্থানাস্থান বিচার করে তা'তো জানি, কিন্তু একথা তো তুমি মানো যে তাহারা মূঢ় জীব? তা যদি তুমি মানো, তবে তাহাতেই তোমার প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, কুক্কুরাদি জন্তুদিগের বিচারকার্য্যও অন্ধসংস্কারের প্রবর্ত্তনা বই আর কিছুই নহে। বড় শক্ত সমস্যা। মস্ত একটা গোলের কথা এখানে এই যে, পশ্বাদি জন্তুদিগের জ্ঞান যে মূলেই নাই একথা তুমি বলিতে পার না, যেহেতু তাহারা সচেতন জীব। উহাদের অল্পই হোক্ আর অধিকই হোক্, জ্ঞান যখন আছে, তখন উহাদিগকে মূঢ়জীব না বলিয়া জ্ঞানবান্ জীব বলা'ই উচিত। তুমিতো বলিলে "উচিত"। কিন্তু আমার মন যে তাহা বলে না। মনতো বলেই না, তা ছাড়া, বুদ্ধি বিবেচনা ও কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। সুবিখ্যাত রসায়ন-বেত্তা স্যার হম্‌ফ্রে ডেভী বরফের গুণাগুণ বিধিমতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এইরূপ

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে বরফের ভিতরেও উত্তাপ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলেই আমরা বলি যে বরফ শীতল পদার্থ , কেহই আমরা বলি না যে বরফ উষ্ণ পদার্থ। যে কারণে আমরা বরফের ভিতরে উত্তাপ আছে জানিয়াও বরফকে উষ্ণপদার্থ না বলিয়া শীতলপদার্থ বলি, সেই কারণে আমরা পশ্বাদি শ্রেণীর জীবদিগের মনোমধ্যে চেতন জাগিতেছে জানিয়াও উহাদিগকে জ্ঞানবান্ জীব না বলিয়া মূঢ় জীব বলি। সে কারণ এই যে, বরফের ভিতর উত্তাপ আছে সত্য, কিন্তু বরফের অন্তর্নিগূঢ় সে যে উত্তাপ তাহা উষ্ণতা বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারিবার মতো উত্তাপ নহে , তেমি, পশ্বাদি জন্তুদিগের মধ্যে চেতন জাগিতেছে সত্য কিন্তু পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তর্নিগূঢ় সে যে চেতন তাহা জ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পারিবার মতো চেতন নহে। তাহা জ্ঞান বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে না পারিবার প্রধান কারণ এই যে, এটা যদিচ খুবই সত্য যে পশ্বাদি জন্তুরা খাদ্যোপযোগী খাদ্য-খাদ্য বিচার করে, বাসোপযোগী স্থানাস্থান বিচার করে, অনুষ্ঠিতব্য কার্যের কালাকাল বিচার করে, দাম্পত্য বন্ধনের পাত্রাপাত্র বিচার করে, কিন্তু তথাপি প্রকৃত বিচার যাহাকে বলে, —কী? না সত্যাসত্যের বিচার, তাহা তাদের মনের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে দেখা যায় না, আর সেই জন্য পশ্বাদি জন্তুরা জ্ঞানবান্ জীবের কোঠায় কোনোক্রমেই অধিকার পাইতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, পৃথিবীতে যদি এমন কোনো শ্রেণীর জীব থাকে যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে জ্ঞানবান্ জীব, তবে তাহা মনুষ্য।

মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে জ্ঞানবিন্দু হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পরে জলবিন্দু যেমন জল আকর্ষণ করে, জ্ঞানবিন্দু তেমি জ্ঞান আকর্ষণ করিয়া ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। মনুষ্য যদি গোড়ায় জ্ঞানবিন্দু না হইয়া জন্মিত, তবে কস্মিন্-কালেও জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারিত না। শুকপক্ষী শাস্ত্রবচন কণ্ঠস্থ করিলেও তাহার জ্ঞান একতিলও বাড়ে না কেন? তাহার জ্ঞান না বাড়িবার কারণ আর কিছু না—শুকপক্ষী মনুষ্য-শিশুর মতো জ্ঞানবিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করে না, আর সেইজন্য সে শ্রুত-বচনের মধ্য হইতে জ্ঞান আকর্ষণ করিতে পারে না।

মানবচৈতন্যের এপারে হওয়া-জ্ঞান বা জন্মগত জ্ঞান ; ওপারে পাওয়া জ্ঞান বা উপার্জ্জিত জ্ঞান ; মাঝে সাধনের সেতু। হওয়া-জ্ঞান সাধনের বীজ ; পাওয়া জ্ঞান সাধনের ফল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বীজ অগ্রে না ফল অগ্রে? ইহার উত্তর এই যে দুইই সত্য— (১) একবারকার আমের আঁটি আরবারকার আমের বীজ, এটাও সত্য আবার (২) একবারকার আমের বীজ আরবারকার আমের আঁটি, এটাও সত্য।

একটি কচি বালকের মনোমধ্যে ভাষাজ্ঞান প্রথমে বীজরূপে মাটি-চাপা থাকে ; এটা তাহার জন্মগত জ্ঞান বা সহজাত জ্ঞান বা সহজ জ্ঞান ; আর, তাহাকেই আমি বলিতেছি হওয়া-জ্ঞান। তাহার পরে সেই বালক কথাইতে কথাইতে মাতৃভাষা উপার্জ্জন করে ; এবারকার এ জ্ঞান সাধনের মধ্য দিয়া পাওয়া বলিয়া ইহাকে আমি বলিতেছি পাওয়া-জ্ঞান। তাহার পরে বালকটি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া ব্যাকরণ অলঙ্কার এবং সাহিত্যাদির যোগে পুনরায় যখন নূতন করিয়া ভাষা শেখে তখন, প্রথমবারের সেই যে তাহার অবলীলাক্রমে হাত-বাড়াইয়া পাওয়া একমেটে ভাষাজ্ঞান, সেই পূর্ব্বার্জ্জিত একমেটে ভাষাজ্ঞানই তাহার এবারকার (অর্থাৎ দ্বিতীয় বারের) হওয়া-জ্ঞান; আর অপেক্ষাকৃত কঠিন সাধনের মধ্য দিয়া পাওয়া

হইয়া থাকে যে দোমেটে ভাষাজ্ঞান, তাহাই পড়ুয়া বালকদিগের দ্বিতীয় বারের পাওয়া-জ্ঞান। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমবারের হওয়া জ্ঞান জ্ঞানের বীজ ; প্রথমবারের পাওয়া-জ্ঞান জ্ঞানের নবোন্মেষিত পত্রচূড়া ; প্রথমবারের সাধন বীজ হইতে পত্রচূড়ার বৃন্তান্ত পর্য্যন্ত অঙ্কুরের প্রসারণ। দ্বিতীয় বারের হওয়া জ্ঞান কী? না পূর্ব্বোন্মেষিত সেই যে জ্ঞানের পত্রচূড়া একমেটে ভাষাজ্ঞান তাহাই দ্বিতীয়বারের হওয়াজ্ঞান ; দ্বিতীয়বারের পাওয়া-জ্ঞান—জ্ঞানের পুষ্পবিকাশ (ব্যাকরণাদি পরিপুষ্ট দোমেটে ভাষাজ্ঞান) ; দ্বিতীয়বারের সাধন, পূর্ব্বোন্মেষিত পত্রচূড়ার বৃন্তমূল হইতে নবোন্মেষিত পুষ্পমঞ্জরীর বৃন্তমূল পর্য্যন্ত শাখা পল্লবের বিস্তার।

পাখীদেরও ভাষা আছে কিন্তু তাহা একপ্রকার অ-শেখা ভাষা। পাখীদের ভাষা যেমন তাহাদের অভিলষিত ভাব-জ্ঞাপনের প্রথম উদ্যমেই কণ্ঠকুহর হইতে গজাইয়া ওঠে, মনুষ্যের কণ্ঠকুহর হইতে মাতৃভাষা তেমন সহজে গজাইয়া ওঠে না। মনুষ্যের ভাষা প্রকৃত প্রস্তাবেই সাধনের ধন। মনুষ্যের ভাষা প্রথমে যখন অন্তঃপুরের লালন-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, তখন তাহা সাধনের মধ্য দিয়াই অঙ্কুরিত হয় তাহার পরে যখন সেই অঙ্কুরিত ভাষাজ্ঞান অন্তঃপুরের লালন-ক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত হইয়া বিদ্যালয়ের অনুশাসন ক্ষেত্রে রোপিত হয়, আর, কিয়ৎপরে যখন তাহা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন তাহা সাধনের মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হয় ; আবার আর কিছুকাল পরে যখন কবিত্বরসের বারি-সিঞ্চনে সেই শাখা-প্রশাখায় ফুল ধরে, এবং জ্ঞানালোকের রশ্মি-পতনের গুণে তাহাতে ফল ফলে, তখন, তাহা সাধনের সোপান মাড়াইয়াই সিদ্ধিমঞ্চে আরূঢ় হয়।

মনুষ্য যখন যে কার্য্যের সাধনে উদ্যোগী হয়, তখন সাধিতব্য কার্য্যটি কিরূপ কার্য্য এবং কিসের উদ্দেশে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া হইতেছে, তাহা এক মহাপুরুষ আড়ালে থাকিয়া দর্শন করেন। স্থূলদর্শী লোকেরা মনকেই জানে সাক্ষী-পুরুষ, তাই বলে যে মনের অগোচর পাপ নাই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ঐ মহাপুরুষটি ভাবনাচিন্তারও—মনেরও—সাক্ষী। সূক্ষ্মদর্শী বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা তাই মহাপুরুষটির নাম দিয়াছেন সাক্ষী-চৈতন্য। সাক্ষী-চৈতন্য যে অংশে জ্ঞান-ক্রিয়া এবং জ্ঞেয় বিষয়ের সাক্ষী, সেই অংশে দর্শনশাস্ত্রে তাহার নাম দেওয়া হয় সম্বিৎ, অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Consciousness ; আর, সাক্ষীচৈতন্য যে অংশে পুণ্য-পাপ দর্শী, সেই অংশে ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার নাম দেওয়া হয় অন্তরাত্মা অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Conscience ; তার সাক্ষী :—

"যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্যাস্যাৎ
পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎপ্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু
বর্জ্জয়েৎ।।

যেরূপ কর্ম্মের সাধনে অন্তরাত্মা (conscienee) প্রসন্ন হ'ন সেইরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহার বিপরীত কর্ম্মের পথ বর্জ্জন করিবে।" এটাও কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাক্ষী-চৈতন্য সকলের মনে সকল সময়ে জাগ্রত থাকেন না ; প্রত্যুত, অনেকের মনে অনেক সময়ে প্রসুপ্ত থাকেন। আবার এটাও দেখিতে পাই যে, সাক্ষী-চৈতন্য নিদ্রিতই থাকুন্ আর জাগ্রতই থাকুন,

—কাজ ভোলেন না। নিদ্রাকালে তাঁহার অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষুগোলকে দ্রষ্টব্য বিষয়-সকলের ছবি পড়ে ; তাহার পরে তিনি যখন জাগিয়া উঠেন, তখন সেই ছবি দৃষ্টে অতীত কালের হইয়া-যাওয়া ব্যাপারগুলা অবগত হ'ন। তার সাক্ষী, কোনো ক্ষমতাশালী কার্য্যাধ্যক্ষ যদি রাগের মাথায় কোনো নিরপরাধী অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি কঠিন দণ্ড সমর্পণ করিয়া ফ্যালেন, তখন তিনি কি যে কুকার্য্য করিলেন তাহা জানিতে পারেন না— যেহেতু তখন তাঁহার অন্তরাত্মা মোহনিদ্রায় অভিভূত , কিয়ংপরে তাঁহার ক্রোধ নরম পড়িয়া আসিলে তাঁহার অন্তরাত্মা যখন জাগিয়া ওঠেন, তখন তিনি "কি কুকার্যই করিলাম" বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন।

তুমি বলিতেছ যে সাক্ষী-চৈতন্য আড়ালে থাকিয়া সাধকের মনের ভাব এবং হাতের কাজ দুই-ই দেখেন। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সাধন যেন একটা ভাউলে, আর সেই ভাউলের নাবিক যেন তিন ভাই— বড় ভাই সাক্ষী-চৈতন্য বা দ্রষ্টা-পুরুষ, ইনি কর্ণধার; মেজো ভাই ভাবনাচিন্তা বা মানসিক জ্ঞানক্রিয়া ; আর ছোট ভাই হাতের কার্য্য বা শারীরিক কর্মক্রিয়া ; এ দুই ভাই ভাউলের দাঁড়ি। আর, তা-ছাড়া মেজো ছোটো'র উপরে বড়র চক্ষু রহিয়াছে সর্ব্বদা সজাগ। তা যদি হয় তবে সাধককে এক ব্যক্তি না বলিয়া তিন ব্যক্তি বলাই তো ভাল! ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সত্য যদি বলিতে হয় তবে সাক্ষী কর্ত্তা এবং চৈতন্য আপনারই আপনি দ্রষ্টা—দোসরা কোনো ব্যক্তির নহে। দাঁড়ি মাঝির উপমা ঐ যাহা তুমি দেখাইলে, উহার একটি জুড়ি উপমা আমার কাছে আছে ; সেইটিই বর্ত্তমান স্থলের সবিশেষ উপযোগী ; তাহা এই :— মনের ভাব আর হাতের কাজ আয়নার মতো স্থির-দর্পণ। এই দুই দর্পণ সম্মুখে স্থাপন করিয়া সাক্ষী-চৈতন্য তাহার মধ্যে আপনাকে দর্শন করেন; আর সেইজন্যে দুই দর্পণ যখন কলুষে আক্রান্ত হয় তখন সাক্ষী-চৈতন্য আপনাকে কলুষিত দেখেন, আর জল দর্পণটা, কিনা মনটা, যখন ইতস্তত বিচলিত হয়, তখন সাক্ষী-চৈতন্য আপনাকে ইতস্তত বিচলিত দেখেন। অতএব এটা স্থির, যে সাক্ষী-চৈতন্য দেখেন—দর্পণ দুটা'কে নহে পরন্তু আপনাকে , দর্পণ দুটা উপলক্ষমাত্র। অতএব এটা স্থির যে, দর্পণ-ধারী সাক্ষী-চৈতন্য, দুইও নহেন, তিনও নহেন। সাক্ষীচৈতন্য একই অভিন্ন পুরুষ। সাক্ষীচৈতন্য সাধক নিজে। প্রকৃত কথাটা তবে তোমাকে বলি—প্রণিধান কর :—

সত্য এক বই দুই নহে। কিন্তু তথাপি আমাদের ব্যবহার কার্য্যের সুবিধার জন্য আমরা যেমন টাকা ভাঙ্গাইয়া চৌষট্টি পয়সা করিয়া লই, তেমি, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তত্ত্বনির্দ্ধারণ-কার্য্যের সুবিধার জন্য এক সত্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ; আর তাহা যখন করেন তখন সেই সঙ্গে তাহাদের জ্ঞানের প্রকরণ-পদ্ধতিও নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। এই সত্য একদিকে যেমন যন্ত্র-বিদ্যার যান্ত্রিকী সত্য, জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্যোতিষী সত্য, রসায়ন বিদ্যার রসায়নী সত্য, এইরূপ নানা বিদ্যার নানা সত্য ; আর একদিকে তেম্নি বেদোপনিষদের এক অদ্বিতীয় সত্য। একই ষোলো আনা একদিকে যেমন একটাকা, আর একদিকে তেম্নি চৌষট্টি পয়সা ; প্রভেদ কেবল এই যে, একটাকা মোট ষোল আনা ; চৌষট্টি পয়সা ভাঙ্গা ষোলো আনা।

মনে কর একজন জহরী মস্ত এক মহাজনের নিকট হইতে একটি বহুমূল্য হীরা ভাঙ্গাইয়া আনিয়া রাশীকৃত মোহরের তোড়া গৃহের এক অন্ধি-সন্ধিপ্রদেশে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিল , এক ঝুড়ি টাকার তোড়া লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া পুরিয়া রাখিল ; আর চলতি

গোচের খরচ-পত্র নির্ব্বাহের জন্য দুই চারি মুঠা আদুলি সিকি দোআনি পয়সা ক্যাশ্‌ বাক্সের খোপে-খোপে সাজাইয়া রাখিল। মণিমুক্তার জহরীর এ যেমন ধনরক্ষণের বিধি-ব্যবস্থা দেখা গেল, অবিকল সেইরূপ প্রণালীতে বিদ্যারত্নের জহরীরা দর্শনের ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাশি রাশি দার্শনিক সত্য পুঁতিয়া রাখেন ; রাশি রাশি জ্যোতিষী-সত্য—জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দিরে পুঁজি করিয়া রাখেন ; রাশি রাশি যান্ত্রিকীসত্য যন্ত্র বিদ্যার যন্ত্রাগারে পুঁজি করিয়া রাখেন ; রাশি রাশি রসায়নী সত্য রসায়নবিদ্যার সাধনাগারে (Laboratory তে) পুঁজি করিয়া রাখেন। আবার আটপৌরিয়া ব্যবহারের জন্য দুই চারি মুঠা জ্যোতিষীসত্য নূতন-পঞ্জিকায়, দুই চারি মুঠা যান্ত্রিকী সত্য যন্ত্রদীপিকায়, দুই চারি মুঠা রসায়নীসত্য দ্রব্যগুণ-দীপিকায়—এইরূপ রকমওয়ারি ভাঙ্গা সত্য, আবশ্যক হইলেই হাত বাড়াইয়া পাওয়া যাইতে পারিবার মতো করিয়া, আশপাশের কুলঙ্গীতে সাজাইয়া রাখেন। আবার সময়ে সময়ে পৃথিবী-মণ্ডলে আশ্চর্য্য প্রভাবান্বিত ক্ষণজন্মা ধনী মহাজনের আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের এক এক মহাপুরুষ এক এক বিশেষ ভাবের সাধন দ্বারা এক এক দেবদুর্লভ মহারত্ন হাতের মুঠার মধ্যে প্রাপ্ত হ'ন ; আর যাহা তাঁহারা হাতের মুঠার মধ্যে প্রাপ্ত হ'ন তাহা লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া রাখেন না। তাঁহারা বড় বড় দৃঢ়-ভিত্তি সাধারণ ধনাগার বা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তাঁহাদের মহামূল্য সাধনের ধন সেই ব্যাঙ্কে খাটাইয়া রাজ্যের লোহা তাঁবা এবং শীষার মধ্য হইতে সোনা ফলাইয়া তোলেন। তাঁহাদের ব্যাঙ্কের হিরণ্ময়কোষের অর্থাৎ সোনার সিন্দুকের টাকা এক দ্বার দিয়া যেমন জনসমাজে ছট্‌কিয়া বাহির হয়, আর এক দ্বার দিয়া তেম্নি সুদের উপর সুদে স্ফীত হইয়া ঘরে প্রত্যাগমন করে। ব্যাঙ্কের টাকা তো আর ব্যাঙ্কাধ্যক্ষের শুধু কেবল নিজের টাকা নয়—তাহা পৃথিবী শুদ্ধ লোকের টাকা; আর যে অংশে তাহা পৃথিবীসুদ্ধ লোকের টাকা সেই অংশে তাহা হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন ; কিন্তু যে সকল মহাজনের কথার উল্লেখ করিলাম তাঁহাদের হিরণ্ময়কোষের টাকা নিখিল বিশ্বভুবনের মোট সত্য, —সত্য জ্ঞানমনন্তং। তাঁহার হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, উদয়ও নাই অস্তও নাই, তিনি যাহা আছেন তাহাই আছেন।

বাইবেলের কোনো কোনো স্থানে মোট সত্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আল্‌ফা এবং ওমেগা। ইহার কারণ এই যে গ্রীকভাষার আদি অক্ষর আল্‌ফা কিনা অকার এবং শেষাক্ষর ওমেগা কিনা ওকার। সমস্ত বিশ্বভুবনের আদি অন্ত জুড়িয়া যে এক অখণ্ড মোট-সত্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আল্‌ফা এবং ওমেগা বলিলে সেই মোট সত্যের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়ে। আমাদের দেশের সাধনের প্রধান মন্ত্র ওঙ্কার। এই মন্ত্রটি সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য-জাতির ভাষার খনি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তা বই, কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ ভাষার বর্ণমালা হইতে নহে। মনুষ্যমাত্রেরই বাক্যস্ফূর্ত্তির আরম্ভস্থান কণ্ঠকুহর এবং সমাপ্তিস্থান ওষ্ঠাগ্র। অ কণ্ঠ হইতে বাহির হয়, উ মধ্যপথে প্রবাহিত হয়, ম ওষ্ঠাগ্রে পর্য্যবসিত হয়। অ গোমুখীর বিজৃম্ভন, উ গঙ্গার প্রবাহ, ম সাগরে পর্য্যবসান। সাধকের কণ্ঠবদন হইতে ওঙ্কার শব্দ যখন উচ্চারিত হয় তখন তাহা উচ্চারণ-পথের আদি অন্ত এবং মধ্য ব্যাপিয়া এবং পূরণ করিয়া ধ্বনিত হয়। অতএব, সৃষ্টির আদি অন্ত এবং মধ্য যাঁহাতে একীভূত সেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড-সত্যের নাম যদিচ সাধকের বাক্য মনের অতীত, আর সেই জন্য সাধক শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিপূর্ব্বক যে নামে তাঁহাকে সম্বোধন করেন তাহাই যদিচ তাঁহার নাম, কিন্তু তথাপি ওঙ্কারের মতো অমন

আর-একটী পরিপাটী এবং বিশুদ্ধ অর্থবাঞ্জক ঈশ্বরবাচক শব্দ পৃথিবীতে দুর্লভ। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপদের ২৭ সূত্র দেখ ; — সে সূত্র এই যে "তস্যবাচকঃ প্রণবঃ" ঈশ্বরের বাচক শব্দ ওঙ্কার।

আমাদের দেশের সাধনের প্রধান মন্ত্র যেমন ওঙ্কার, সাধনের প্রধান লক্ষ্য তেমনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, অর্থাৎ মোট-সত্য। মনুষ্যের অন্তরে এক প্রকার মোট-জ্ঞান আছে ; সেই মোট জ্ঞানেই মোট-সত্যের উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যায় যেমন জ্যোতিষী-সত্যের উপলব্ধি হয়, যন্ত্র-বিজ্ঞানে যেমন যান্ত্রিকী সত্যের উপলব্ধি হয়, রসায়ন বিদ্যায় যেমন রসায়নী সত্যের উপলব্ধি হয়, মোট-জ্ঞানে তেম্নি মোট-সত্যের উপলব্ধি হয়।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে মোট-জ্ঞান এবং মোট-সত্য বস্তু একই। অন্ততঃ এটা আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্য জ্ঞানই জ্ঞান, এবং জ্ঞান-গর্ভ সত্যই সত্য; তবেই হইতেছে যে, সত্য এবং জ্ঞান একেরই এপিট-ওপিট।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্যশিশু জ্ঞানবিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে জ্ঞানবিন্দু পদার্থটা কী? তাহা আর কিছু না—সম্বিৎ, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Consciousness। সম্বিৎই মনুষ্যের মোট জ্ঞানের বীজ, অথবা যাহা আরো ঠিক—বীজ-ভাবের মোট-জ্ঞান ; আর বিশুদ্ধ সত্তা—খাঁটি সত্তা—সার সত্তা, অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Pure being, তাহাই সেই বীজ-জ্ঞানের বীজ সত্তা। খুব পাৎলা কাগজের এক পিঠের অক্ষর যখন আর একপিঠে ফুটিয়া বাহির হয়, তখন দুই পিঠের অক্ষর কিছু আর দুই অক্ষর নহে , অক্ষর তা— সে এপিঠেও যা ওপিঠেও তা ; প্রভেদ কেবল এই যে, এপিঠে তাহা সোজাভাবে বসানো, ওপিঠে পাশ ফিরাইয়া বসানো। তেম্নি সেই যে বীজ-জ্ঞান সম্বিৎ, আর সেই যে বীজসত্তা বিশুদ্ধ সত্তা, তাহা একেরই দুই পিঠ, তা বই, তাহা প্রকৃতপক্ষে দুই নহে। ফলকথা এই যে, বীজ জ্ঞান বা সম্বিৎ বিশুদ্ধ-সত্তার প্রকাশ ; বিশুদ্ধ-সত্তা বীজ-জ্ঞানের প্রকাশ্য বস্তু। বস্তু এবং বস্তুর পূর্ণ-প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান কোথায়?

এখন দেখিতে হইবে এই যে, বীজ জ্ঞান বা সম্বিৎ আর কিছু না— পূর্ব্বে যাহাকে আমি বলিয়াছি আদিম হওয়া-জ্ঞান তাহা সেই হওয়া-জ্ঞান ; তাহা সর্ব্বপ্রথমে সাধনের মূলে বীজরূপে অন্তর্নিগূঢ় থাকে, এবং সর্ব্বশেষে সাধনের মধ্য দিয়া ফলরূপে আলোকে বিনির্গত হয় ; আর তাহা যখন হয় তখন তাহার নাম হয় প্রজ্ঞা। *তেম্নি যে-সত্য সাধনের পূর্ব্বে সম্বিতের ক্রোড়ে বিশুদ্ধ-সত্তারূপে অন্তর্লীন থাকেন, সেই একই সত্য সাধনের মধ্য দিয়া

* কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রজ্ঞা শব্দ Reason শব্দের অনুবাদ , তাহা যদি কেহ মনে করেন, তবে পাতঞ্জল দর্শনের সমাধি পদের ৪৮ সূত্র দেখিলেই তাঁহার ভুল ভাঙিয়া যাইবে ; সে সূত্র এই :— "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ উহার টীকা এবং ভাষ্যের তাৎপর্য্য রীতিমত অনুধাবন করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ :—

"তৎকালে যে উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানালোক আবির্ভূত হয়, তাহার নাম—ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। এ প্রজ্ঞা কেবল ঋত অর্থাৎ সত্যকেই প্রকাশ করে। তৎকালে ভ্রমের ও প্রমাদের লেশও থাকেনা। যোগিগণ এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা সমুদায়বস্তু যথাযথ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্টতম চরম যোগ লাভ করিয়া মুক্ত হ'ন।

দৃশ্যমান বিশ্বভুবনের বাস্তবিক সত্তা রূপে প্রজ্ঞাতে (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জ্ঞানে) ভাসমান হইয়া ওঠেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, নবপ্রসূত শিশু একরত্তি জ্ঞানবিন্দু। কিন্তু বিন্দু সে তো সামান্য বিন্দু নয়—বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু রহিয়াছে চাপা দেওয়া। সিন্ধু সে অন্ধকারময় অদৃশ্য-জগতের অতলস্পর্শ এবং অপার সত্তাসিন্ধু , তাহা বিশুদ্ধ সত্তা—খাঁটি সত্তা—সত্তাই কেবল। সেই অদৃশ্য-জগতের বিশুদ্ধ সত্তাই যে দৃশ্যমান বিশ্বভুবনের বাস্তবিকসত্তা ; তাহার প্রমাণ এই যে, যাহাকে আমরা বস্তু সকলের বাস্তবিকসত্তা বলিয়া প্রবুদ্ধ-জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহার ব্যাপ্তি এবং তন্ময়তা দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুতেই সমান। যদিচ নবপ্রসূত শিশুর মাসেক দুমাস পরে চক্ষু ফুটিলে সে দৃশ্যমান বস্তু সকলেরই বাস্তবিকসত্তা উপলব্ধি করে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাস্তবিক-সত্তা শুধুই কেবল দৃশ্যমান বস্তুতে আবদ্ধ নহে; পরন্তু দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুই বাস্তবিক-সত্তার মুঠোর মধ্যে রহিয়াছে। আমি এক্ষণে কলিকাতা নগরীর বক্ষোপরি দণ্ডায়মান একটা কোটাবাড়ির দোতালায় বৈঠকঘরে বসিয়া শুধু কেবল দেয়াল কড়িকাঠ টেবিল চৌকি দেখিতেছি বলিয়া পৃথিবীর মধ্যে ঐ গুলাই যে কেবল বাস্তবিক পদার্থ, আর, আমি বড়বাজার দেখিতেছি না, চৌরঙ্গী দেখিতেছি না, বাগবাজার দেখিতেছি না বলিয়া শেষোক্ত প্রদেশগুলা যে অবাস্তবিক পদার্থ, তাহা তো আর নহে। দৃশ্যমান দেয়াল কড়িকাঠ টেবিল্ চৌকিও যেমন, আর, অদৃশ্য বড়বাজার চৌরঙ্গী বাগবাজারও তেমি, সবই সমান বাস্তবিক ; তা ছাড়া, অদৃশ্য গঙ্গাসাগর, মহাসমুদ্র, চীন জাপান ইউরোপ আমেরিকা, গ্রহ নক্ষত্র, সবই সমান বাস্তবিক। দেয়াল কড়িকাঠ প্রভৃতি যে কয়েকটা বস্তু এক্ষণে আমার চক্ষে দেখা দিতেছে, সে গুলার প্রত্যেকেই একতালার মধ্য দিয়া বাড়ির ভিত্তি-মূলের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; একতালায় ঘরদরজা ভিত্তি-মূলের মধ্য দিয়া রাস্তা-ঘাটের সহিত বাঁধা রহিয়াছে, পূর্ব্ব-সমুদ্র বর্ম্মা প্রভৃতি দেশবিদেশের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; পূর্ব্বসমুদ্র বর্ম্মা প্রভৃতি দেশবিদেশের মধ্য দিয়া পাসিফিক মহাসাগরের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; বর্ম্মা চীন জাপান সম্বলিত আসিয়াখণ্ডের পূর্ব্বকিনারা পাসিফিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া আমেরিকার সহিত বাঁধা রহিয়াছে, পাসিফিক মহাসাগর আমেরিকার মধ্যদিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত বাঁধা রহিয়াছে, আমেরিকা আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যদিয়া ইউরোপ আফ্রিকার সহিতও বাঁধা রহিয়াছে ; সসাগরা পৃথবীমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া ঈথরের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; অবায়ু সসাগরা পৃথিবী ঈথরের মধ্যদিয়া গ্রহ উপগ্রহ এবং সূর্য্য-মণ্ডলের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; নিখিল বিশ্বভুবনের বাস্তবিকসত্তা সমস্তের মধ্যদিয়া সমস্তের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; আকাশের মধ্য দিয়া মহাকালের সহিত বাঁধা রহিয়াছে ; অণুর মধ্যদিয়া পরমাণুর সহিত বাঁধা রহিয়াছে। প্রজ্ঞাতে অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জ্ঞানে এই যে এক ধ্রুব বাস্তবিকসত্তা দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একীভূত করিয়া প্রকাশমান, ইহার গোড়ার কথাটি সম্বিতের গায়ে পূর্ব্ব হইতেই স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে ; সে কথা এই যে "আমি আছি।" সাধনের মূলাধিষ্ঠিত এই যে সাক্ষী-চৈতন্য সম্বিৎ, ইনি আপনার সমস্ত চিন্তা এবং কার্য্য-দর্পণে "আমি আছি" এই বিশুদ্ধ সত্যটি দেখিতেছেন ; আর, যাহাকে আমি বলিতেছি সম্বিতের সবেমাত্রধন বিশুদ্ধসত্তা তাহা আর কিছু না সেই "আমি আছি"র আছিত্ব। সাধন দ্বারা সম্বিৎরূপী বীজ জ্ঞানফলে পরিণত হইয়া যখন প্রজ্ঞামূর্ত্তি ধারণ করে, তখন, দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলাধিষ্ঠিত বীজ যেমন দাড়িম্ব ফলের অন্তর্ভূত সমস্ত বীজ-কোষের সমস্তগুলিতে শতধা প্রবিষ্ট হয় সেই

গোড়ার সেই "আমি আছি" বা বিশুদ্ধসত্ত্ব নিখিল বিশ্বভুবনের মর্মে মর্মে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সর্বজগতের ধ্রুব বাস্তবিক-সত্তারূপে প্রজ্ঞাতে ভাসমান হইয়া উঠে ; আর, তাহা যখন হয়, তখন অভাবান্বিত ক্ষুদ্র "আমি আছি"টি প্রভাবান্বিত বৃহৎ আমিকে পাইয়া সেই ধন প্রাপ্ত হয়—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি বিচাল্যতে॥"

যাঁহাকে লাভ করিলে অপর কোনো লাভকেই তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয় না; যাঁহাতে স্থিত হইলে গুরুতর বিপদেও সাধক বিচলিত হয় না।

গোড়ার সেই যে "আমি আছি" বা বিশুদ্ধ-সত্তা, যাহা সম্বিতের সবেমাত্র ধন, তাহা শিশুর ন্যায় সরল এবং নির্মল। মাতা যেমন শিশুর একমাত্র বল, তা ছাড়া, তাহার আর কোনও বল নাই, তেমি, সেই গোড়ায় "আমি আছি"র একমাত্র বল, সত্যের বল, তা ছাড়া আব কোনো বল নাই। আবার, মাতার বলকে শিশু যেমন মাতার বল বলিয়া জানেনা পরন্তু তাহা যেন তাহার আপনারই বল এইরূপ মনে করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করে, তেমি, সম্বিতের "আমি আছি"-বালকটি সত্যের বল'কে সত্যেব বল বলিয়া জানে না, পরন্তু তাহা যেন তাহার আপনারই বল এইরূপ মনে করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পরে সাধনের চরম সীমায় সম্বিৎ যখন জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রজ্ঞা-মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন সাধক বুঝিতে পারে যে সিন্ধুর বলেই বিন্দুর বল, তখন জানিতে পারে যে, সমস্ত বলক্রিয়া এবং জ্ঞানক্রিয়া সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্যে কেন্দ্রীভূত ; আর, সাধক তখন বলে এই যে, "পূর্বে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, সাধনের বল ব্যষ্টি-চৈতন্যেরই বল। কি আশ্চর্য! এই সোজা সত্যটি তখন আমি দেখিয়াও দেখি নাই যে, সমষ্টি চৈতন্যের বলই এই ব্যষ্টি-চৈতন্যের বল ; এই সমষ্টি-চৈতন্যের জ্ঞানই এই ব্যষ্টি চৈতন্যের জ্ঞান , এই সমষ্টি চৈতন্যই এই ব্যষ্টি-চৈতন্য। সাধকের সম্বিৎরূপী বীজজ্ঞান যখন সাধনেব মধ্য দিয়া জাগিযা উঠিয়া প্রজ্ঞামূর্ত্তি ধারণ করে, তখন সাধকের মোট জ্ঞান মোট-সত্তাকে পাইয়া আশ্চর্যরসে দ্রবীভূত হয় এবং আনন্দে ভাসিতে থাকে। এই মোট সত্তাই সাধনের সত্তা। আমাদের দেশেব ভক্তিভাজন আদিম মহর্ষিগণের একটি সার উপদেশ এই যে, মোট-সত্তা স্বয়ং নাম রূপের অতীত, অথচ নিখিল বিশ্বচরাচর মোট-সত্যের নামরূপ! মনুষ্যের স্বরোচ্চারণ পথের আদি হইতে মধ্য পথের মধ্য দিয়া অন্ত পর্যন্ত, অ হইতে উ এর মধ্য দিয়া ম পর্যন্ত যতপ্রকার স্বর উচ্চারিত হইতে পারে সমস্তের ঐকতানিক ধ্বনিস্ফূর্ত্তি যেমন ওঙ্কার, ভূর্লোক হইতে ভূবর্লোকের মধ্য দিয়া স্বর্লোক পর্যন্ত যত প্রকার লোক-লোকান্তর আছে সমস্তের ঐকতানিক তেজস্ফূর্ত্তি তেম্নি ভর্গো দেবস্য, জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় ভর্গ, অথবা যাহা একই কথা শক্তিময় জ্ঞান। শক্তিময় জ্ঞানই বলি, আর মঙ্গলময় সত্তাই বলি, অর্থ একই; কেননা মঙ্গলশক্তিই শক্তি এবং সত্তা জ্ঞানই জ্ঞান। আমাদের দেশের প্রাচীন তত্ত্ব জ্ঞান শাস্ত্রের মোট সিদ্ধান্ত এই যে, (১) ধ্বনিস্ফূর্ত্তি ওঙ্কার, (২) তেজস্ফূর্ত্তি বরণীয় ভর্গঃ, (৩) এবং জ্ঞান স্ফূর্ত্তি ধী, বরণীয় তেজোময় জ্যোতি সমস্ত লইয়া যে-এক অখণ্ড পরিপূর্ণ সমগ্র সত্তা—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তিনিই সাধনের সত্তা।

# আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘাত

ভারতবর্ষের আর্য্যধর্ম্মের মূল আদর্শ অতীব সুন্দর। যেমন সুন্দর, তেমনি মহান্। নিষ্পাপ ঋষিদিগের অকৃত্রিম অনুরাগ নানা প্রকার ছন্দোবন্ধে দেবতাদিগের প্রতি উত্থিত হইত। তাঁহারা কোনোপ্রকার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতেন না। কৃত্রিমতা কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সূর্য্যে চন্দ্রে মেঘে বিদ্যুতে অনিলে সলিলে সর্ব্বত্রই তাঁহারা দৈবশক্তি, দৈবমহিমা, দৈবসৌন্দর্য্য, অবলোকন করিতেন। দেবতাগণকে তাঁহারা পরম বন্ধু বলিয়া জানিতেন ; আর উৎসবের সময়ে, জয়পরাজয়ের সময়ে, সুখে-দুঃখে সকল সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের অতিথি সংকার করিতেন , তাঁহাদের নিকটে মুক্তকণ্ঠে আপন আপন মনের ভাব এবং আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন ; আনন্দের সময় আনন্দ জানাইতেন, দুঃখের সময় দুঃখ জানাইতেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠিল ; তাঁহারা সত্য জানিতে পারিলেন।

তেজঃপুঞ্জ আর্য্যধর্ম্মের নিভৃত সূতিগাকারে—পঞ্চধাপ্রবাহিনী পঞ্চনদীর সমীপবর্ত্তী সুমঙ্গল ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে— যে সময়ে মনুষ্য জাতির জ্ঞান ধর্ম্মের নবোন্মেষ কিছুকাল ধরিয়া বিকাশের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে ইন্দ্র মরুৎ বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিভাস-সকল ধাত্রীর উপন্যাসের ন্যায় তাঁহাদিগের মনে ব্রহ্মের ভাব অল্পে অল্পে উদ্বোধিত করিতেছিল; তাহার কিয়ংশতাব্দী পরে সে সকল উপন্যাসে অমৃতপিপাসু ঋষিদিগের মন তৃপ্তি মানিল না, —তাঁহারা হোমযাগযজ্ঞাদিকে বাল্যক্রীড়া মনে করিয়া অরণ্যের নিভৃত-প্রদেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পরে যথোপযুক্ত সময়ে সর্ব্বজগতের আদিকরণ এবং মূলাধার মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের সেই আদিম পিতৃপুরুষদিগের সমক্ষে সাক্ষাৎ পিতামাতা এবং বন্ধুরূপে দেখা দিলেন। তাহাতে তাঁহারা জানিতে পারিলেন "সনোবন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনি আমাদের বন্ধু জনয়িতা এবং বিধাতা। তাঁহাদের শ্রদ্ধাবান সরল অন্তঃকরণে যেমন যেমন সত্য-জিজ্ঞাসার নব নব উন্মেষ আরম্ভ হইতে লাগিল, তেমনি টাট্‌কাটাট্‌কি পরমেশ্বরের প্রসাদবারি মাতার স্তন্য-দুগ্ধের ন্যায় তাঁহাদের জ্ঞান পিপাসার শান্তি-সুধা রূপে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। মাতৃ-দুগ্ধের ন্যায় জীবন-প্রদ অন্ন আর পৃথিবীতে নাই—সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রাণিত সুবিমল জ্ঞানের ন্যায় আত্মার প্রাণপ্রদ এবং বলপ্রদ অন্ন আর জগতে নাই।

আদিম ঋষিদিগের অন্তঃকরণে—উদয়োন্মুখ সেই যে জ্ঞানধর্ম্মের অভিনব স্ফূর্তি, তাহাতে দেব-প্রসাদেরই মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়। দেব-প্রসাদের অমৃত-সিঞ্চনে তাঁহাদের আত্মপ্রভাবের কলিকা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতে লাগিল ; সত্যের অনুসন্ধান সংশয়ের মৃত্তিকা ভেদ করিয়া, জ্ঞানালোকের অভিমুখে উত্থান করিতে লাগিল। তাঁহারা সব ছাড়িয়া জন-শূন্য নিভৃত স্থানে, একাগ্র চিত্তে, সকল সত্যের পরম সত্য পরব্রহ্মের

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন , আর, তাহার গুণে যখন তাঁহারা আশাতীত ফললাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, তখন জ্বলন্ত অনুরাগ এবং অটল অধ্যবসায়ের সহিত পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা এবং ক্রিয়াকার্য্য সাধনে কায়মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

এটা একটা বিস্ময়জনক ব্যাপার সন্দেহ নাই যে, আদিম ঋষিদিগের সময়ে দর্শন-শাস্ত্র ছিল না ; বিজ্ঞান শাস্ত্র ছিল না , পুঁথিপত্র বা জ্ঞানানুশীলনের অন্য কোনোপ্রকার যোগাড় যন্ত্র কিছুই ছিল না, অথচ তাঁহারা পরম-সত্য এবং অমৃত-আনন্দ হৃদয় ভরিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যখন সুনিশ্চিত যে ঐ বিশেষ বৃত্তান্তটির একটি বিশেষ কারণ আছে, তখন, মনকে বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইতে না দিয়া সেই বিশেষ কারণটির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সুবুদ্ধির কার্য্য।

আমরা যখন কোথাও কোন প্রকার বিস্ময়-জনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তখন আমাদের আপাত দৃষ্টিতে তাহা আকস্মিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবারই কথা, কিন্তু প্রশান্ত চিত্তে তাহার প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে আমরা হয়তো আমাদের জানা-শুনা দৈনন্দিন ঘটনাচক্রের মধ্যেই তাহার জুড়ি খুঁজিয়া পাই, তখন দুইকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দুয়েরই বিশেষ কারণ একসঙ্গে অবগত হই। একটা বৃন্তচ্যুত ফলের পতনক্রিয়ার সহিত সৌর-জগতের গতিবিধি মিলাইয়া দেখিয়া নিউটন ঐরূপ অত ছোটো এবং অত বড় দুইটি বৃত্তান্তের মধ্যে একটি মহাবলশালী বিশ্বব্যাপী নিয়মের কার্যকারিতা দেখিতে পাইলেন ; দেখিতে পাইয়া তাহার নাম দিলেন— গুরুত্বের আকর্ষণ বা ভারাকর্ষণ। অতএব আদিম ঋষিগণের অযত্ন-সম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানের বৃত্তান্তটি মনুষ্য সমাজের কোনোপ্রকার জানা-শুনা নিয়মিত ঘটনার সহিত মেলে কি না, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যা'ক্। যদি কোনোপ্রকার জানা-শুনা নিয়মিত ঘটনার সহিত উহার সৌসাদৃশ্য অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহারই মধ্য দিয়া উহার বিশেষ কারণের অনুসন্ধানের পথ আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

সবে মাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছে—এরূপ একটি অভিনব বালকের মনের ভাব কিরূপ তাহা আমরা জানি—জানিয়াও তাহার গুরুত্বের প্রতি সম্বুচিত মনোযোগ করি না। ফলে ঐরূপ একটি বালকের জ্ঞান-পিপাসা এবং সরল সত্য-জিজ্ঞাসা অতীব খাঁটি বস্তু ; তাহা এখনো মিথ্যা বিদ্যাভিমান, কৃত্রিম সামাজিকতা, অলীক কুসংস্কার, কুটিল স্বার্থাভিসন্ধি, এ সকল পাপাসক্তির কালিমায় কলঙ্কিত হয় নাই। তাহার সরল অন্তঃকরণের অকৃত্রিম সত্যজিজ্ঞাসার— জ্ঞানস্পৃহার—আকর্ষণ এমনি বলবান যে, সেই কচি বালক অল্প সময়ের মধ্যেই মাতার জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে মাতৃভাষার সমস্ত মৌলিক সম্বল বাহির করিয়া লইয়া অবলীলাক্রমে আত্মসাৎ করে—অথচ ব্যাকরণ বা অভিধান যে কাহাকে বলে, তাহা সে জানে না। ক্রোড়স্থ শিশুর চক্ষু ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা (অর্থাৎ জ্ঞান পিপাসা) অল্পে অল্পে উন্মেষিত হয়; যেমন যেমন উন্মেষিত হয়, তেমনি তেমনি মাতা মুখবিনিঃসৃত সুমধুর মাতৃভাষার পথ দিয়া তাহার বিকাশোন্মুখ জ্ঞানাঙ্কুরের উপজীবিকা অবতীর্ণ হইতে থাকে। মাতা ক্রোড়স্থ শিশুকে ক্ষুধারও তীব্রতা টের পাইতে দেন না, জিজ্ঞাসারও (অর্থাৎ জ্ঞান-পিপাসারও) তীব্রতা টের পাইতে দেন না, জিজ্ঞাসারও (অর্থাৎ জ্ঞান-পিপাসারও) তীব্রতা টের পাইতে দেন না। শরীরের ক্ষুধা এবং মনের জিজ্ঞাসা মুখ মেলিতে না মেলিতেই মাতৃদুগ্ধ ক্রোড়স্থ শিশুর মুখপুটে এবং মাতৃভাষা তাহার কর্ণপুটে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়। ক্ষুধা যে কাহাকে বলে তাহা মনুষ্য

তখনই বুঝিতে পারে, তখন তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে ঘর্ম্মজল-সিঞ্চন করিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিতে হয়, জিজ্ঞাসা যে কাহাকে বলে, তাহা তখনই বুঝিতে পারে, যখন তাহাকে নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞানের পাকচক্রময় জটিল পথ অনুধাবন করিয়া সত্য উপার্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু মনুষ্য মাতৃদুগ্ধে পরিপুষ্ট হইয়া বড় হইলে তবে তো সে কৃষিকার্য্য দ্বারা অন্ন উপার্জ্জন করিবে? মাতৃভাষায় তাহার জ্ঞানের গোড়া-পত্তন হইলে তবে তো সে ব্যাকরণাদি শিক্ষা করিয়া জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিবে? অতএব মাতৃভাষা মনুষ্য-জ্ঞানের একটি আদিম উপকরণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুই হাত নহিলে তালি বাজে না। মনুষ্য-জ্ঞানের আর একটি আদিম উপাদান আছে— সেটি হ'চ্চে ধারাবাহিক পৈতৃক সংস্কার—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Heredity। পৈতৃকসংস্কার জ্ঞানের বীজ , আর, এই পৈতৃক সংস্কারই মাতৃভাষার রসাকর্ষণ করিয়া নব প্রসূত মনুষ্যজীবনের কাঁচা-মৃত্তিকায় জ্ঞানরূপে ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হয়। গোড়ায় পৈতৃক সংস্কারের বীজ না থাকিলে— শুধু কেবল মাতৃভাষা মুখস্থ করিয়া মনুষ্যের জ্ঞান অঙ্কুরিত হইতে পারে না ; তাহা যদি হইতে পারিত, তবে একটা কুক্কুরও তাহার প্রভুর নিকট হইতে অনায়াসে ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত। একটা বিশিষ্টরূপ প্রণিধানশীল কুক্কুরকে অনেক-গুলা ইঙ্গিত-প্রধান আদেশ-বাক্যের মোট অর্থ জো-শো করিয়া গিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এই যা কেবল, তা বই—সহস্র চেষ্টা করিলেও একটি সহজ বাক্যের বিভক্তি কারক প্রত্যয় প্রভৃতির প্রয়োগ বিজ্ঞান-সহকৃত অর্থবোধ তাহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে সংক্রামিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা এই যে শ্রবণ-পথবর্ত্তী বাক্যের প্রকৃত অর্থবোধ (অর্থাৎ ব্যাকরণ-ঘটিত এবং অভিধানঘটিত অর্থ বোধ) অবোধ শিশুরই বা স্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গলাধঃকরণ হয় কেন—অবোধ পশুরই বা তাহা না হয় কেন? উভয়ই সমান অবোধ—অথচ ফল বিভিন্ন —ইহার কারণ কি?

"কারণ" স্পষ্টই পড়িয়া আছে। অবোধ শিশুর অন্তর্নিহিত পৈতৃক সংস্কার তাহাকে ভিতর হইতে ধাক্কা দিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের পথে নিয়তই অগ্রসর করিয়া দেয়, কিন্তু অবোধ পশুর পৈতৃক সংস্কার তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়ান্বেষণ প্রভৃতি গোটাকত সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই করিতে বলে না। অতএব এটা স্থির যে, নব-প্রসূত বালকের মনোমধ্যে পৈতৃক সংস্কার তলে তলে কার্য্য করিতেছে বলিয়া তাহারই প্রবর্ত্তনা-গতিকে সে বালক মাতৃভাষার অর্থ-জ্ঞান অল্পে অল্পে আয়ত্ত করিতে থাকে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যজ্ঞানের আদিম উপাদান দুইটি , একটি হ'চ্চে ধারাবাহিক পৈতৃক সংস্কার—আরেকটি হ'চ্চে মাতৃভাষা। মনুষ্যকে যদি মাতৃভাষার প্রভাবমণ্ডলী হইতে বিয়োজিত করিয়া জন্মাবধি কোনো একটা জনশূন্য উপদ্বীপে ফেলিয়া রাখা যায়, তবে তাহার জ্ঞানের বীজ-ভূত পৈতৃক সংস্কার মাতৃভাষার জল-সিঞ্চন ব্যতিরেকে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায় ; আর সেই গতিকে তাহার মনুষ্যত্ব অনেক হাত জলের নিচে চাপা পড়িয়া যায়।

নবপ্রসূত শিশুর অন্তঃকরণে যেমন পৈতৃক সংস্কার এবং মাতৃভাষা এক যোগে কার্য্য করিয়া তাহার জ্ঞান চক্ষু ফুটাইয়া তোলে—আমাদের আদিম পিতৃপুরুষদিগের অন্তঃকরণে তেমনি মহাপৈতৃক সংস্কার এবং মহামাতৃভাষা একযোগে কার্য্য করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। পৈতৃক সংস্কারের মূল—পিতৃপুরুষ, মহাপৈতৃক সংস্কারের মূল পিতৃপুরুষদিগেরও পিতা— সর্ব্ব জগতের পিতা—পরম পিতা পরমেশ্বর। মাতৃভাষার মূল স্বদেশরূপিণী জননী;

মহামাতৃভাষার মূল—ভূর্ভুবঃ স্বঃ সর্ব্ব জগতের প্রসবিত্রী জগজ্জননী পূর্ণ ব্রহ্ম। মহাপৈতৃক সংস্কার এবং মহামাতৃভাষা কিরূপ তাহা খুলিয়া বলিতেছি—শ্রবণ করুণ :—

প্রথমতঃ আত্মা পরমাত্মা ধর্ম্ম এবং পরকাল বিষয়ক জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার যাহা পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রসাদে মনুষ্য-জাতির আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া পাত্রে পাত্রে পুরুষানুক্রমে পরিপোষিত পরিমার্জ্জিত এবং দৃঢ়ীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা পৈতৃক সংস্কার অপেক্ষাও মৌলিক সংস্কার— তাহা মহাপৈতৃক সংস্কার! দ্বিতীয়তঃ জগজ্জননীর সেই নানারসপূর্ণ অকর্ষিত এবং অলিখিত ভাষা— যেমন আদরের ভাষা—মলয়ানিল-বিকসিত সুগন্ধি কুসুমে, হাসাইবার ভাষা—সুপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায়, চোক-রাঙ্গান এবং ধমকানির ভাষা—বিদ্যুৎ-বজ্রে, শান্ত করিবার ভাষা— বিস্তৃত জলাশয়ের স্বচ্ছ সুগভীর সলিলরাশিতে, ঘুম পাড়াইবার ভাষা-ঘোর বর্ষারাত্রির সুধীর ধারা-নিপাতনে ; — জগজ্জননীর সেই স্নেহভরা ভাষা যাহা নানা শব্দ, নানা স্পর্শ নানা রূপরসগন্ধের মধ্য দিয়া যখনই যাহার কর্ণে প্রবেশ করে তখনই তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া যায়, তাহা মাতৃভাষা অপেক্ষাও মৌলিক ভাষা—তাহা মহা-মাতৃভাষা।

আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা পরম পিতামাতা বিধাতার নবপ্রসূত সন্তান ছিলেন— বলিলেও বলা যায়, তাই তাঁহাদের অন্তঃকরণ শিশুর ন্যায় নির্ম্মল এবং কৃত্রিমতাশূন্য ছিল। অভিনব শিশু যেমন মাতৃভাষা অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করে, আদিম ঋষিরা তেমনি প্রকৃতির নিজের মুখের ভাষা—সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রের ভাষা—ঔষধি বনস্পতির ভাষা—নদ-নদী পর্ব্বতের ভাষা—নবানুরাগে আয়ত্ত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া পরম পরিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন। ফলে তাঁহারা যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিবেন, তবে আর কে তাহা করিবে? কেননা, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মই হ'চ্চে এই যে, অকৃত্রিম বিশুদ্ধ-অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ-সত্য আকর্ষণ করে ; নিষ্পাপ নির্ম্মল এবং প্রেমপূর্ণ আত্মা পরমাত্মার প্রসাদ-বারি আকর্ষণ করে। আমরা ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে পঙ্কিল পৃথিবীতে ডুবিয়া রহিয়াছি বলিয় সেই কারণে আমাদের জ্ঞানের মূল মাটি হইয়া যাইতেছে , আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মে ডুবিয়া রহিয়াছিলেন বলিয়া সেই কারণে তাঁহারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ঈশ্বরপ্রাণিত আদি-পুরুষেরা যখন মহা-পৈতৃক সংস্কারের প্রবর্ত্তনায় মহামাতৃভাষার পথ দিয়া সত্য-ভরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করেন, তখন সেই জীবন্ত জ্ঞানের অনুশীলন-কালে জ্ঞাতার দৃষ্টি ঈশ্বরের মহিমাতেই ভরপুর সমাসক্ত থাকে। তাহার পরে যখন তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা গুরু-পরম্পরাগত পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের বিভিন্ন অবয়ব অল্প অল্প করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং এক এক সম্প্রদায় এক এক বিচ্ছিন্ন অবয়বের বিশিষ্টরূপ অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া কেহ বা জ্ঞান-তত্ত্বে কেহ বা প্রকৃতি-তত্ত্বে কেহ বা কর্ম্ম-তত্ত্বে কেহ বা সাধন-তত্ত্বে, কেহ বা ভজন-তত্ত্বে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, তখন সেই সেই একদিক্-ঘাঁসা জ্ঞানের অনুশীলন কালে জ্ঞাতা যদি সাবধান না হ'ন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টি ঈশ্বরের মহিমা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দিন দিন আত্ম-প্রভাবের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে কঠিন হইতে কঠিনতর বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া যাইতে থাকে। যদিচ ঈশ্বরের প্রসাদ হইতেই মনুষ্যের আত্মপ্রভাব সতেজে অঙ্কুরিত হইয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া দাঁড়ায়, তথাপি মনুষ্যজীবনের সেই উন্নতি সময়ে একটি গুরুতর বিপদ আশঙ্কনীয় ; সে বিপদ্ হ'চ্চে এই : —

মনুষ্যের বিশিষ্টরূপ শিক্ষার জন্য মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষ তাহার জীবন প্রবাহিনীর মাঝ-পথায় একটি ফাঁড়া লাগিয়া রাখিয়াছেন। মনুষ্য-নাবিক যখন সেই ফাঁড়াটি কাটাইয়া উঠে তখনই সে পাকা মাঝি হয় ; আর যতক্ষণ তাহা না করিতে পারে, ততক্ষণ কিছুতেই নিরাপদ হইতে পারে না। মনুষ্য যখন কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সত্যের মাঝপথে উপনীত হয়, তখন যদি সে আত্ম-গরিমায় স্ফীত হইয়া ভিত্তিমূলের কথা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে, এমন যে স্বর্গীয়-শতদল—আত্মপ্রভাব, তাহা দেবপ্রসাদের আলোক-বিহীনে অহঙ্কারের নৈশ-তিমিরে অন্ধ হইয়া—হৃদয়ের কপাট বন্ধ করিয়া—ঘাড় গুঁজিয়া রসাতলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে তলবকার উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে—বলিতেছি শ্রবণ করুন ঃ—

"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে"— ব্রহ্ম দেবতাদিগের জন্য জয় করিলেন। "তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত"— সেই ব্রহ্মের বিজয়ে দেবতারা মহিমান্বিত হইলেন। "ত ঐক্ষন্ত অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি"— তাঁহারা মনের মধ্যে এইরূপ অভিমান করিলেন যে, আমাদেরই এ বিজয়—আমাদের এ মহিমা। "তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ"—ব্রহ্ম তাঁহাদের মনের কথাটি জানিলেন ; জানিয়া "তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব"— তাঁহাদের সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। "তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি"—তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন জাতবেদা তুমি জানো গে যাও কে এ অলৌকিক মহাপুরুষ। "তথেতি" আচ্ছা আমি জেনে আসচি। "তদভ্যদ্রবৎ"—অগ্নি দ্রুত-পদক্ষেপে তাঁহার নিকটে গেলেন। "তমভ্যবদৎ কোঽসীতি"—ব্রহ্ম তাঁহাকে বলিলেন কে তুমি। "অগ্নির্বা অহমস্মীতি অব্রবীৎ জাতবেদা বা অহমস্মীতি" অগ্নি বলিলেন অগ্নি আমি জাতবেদা। "তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যং"—তুমি যে অগ্নি জাতবেদা তোমাতে কি সামর্থ্য? "অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি"—এমন কি সব আমি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে। "তস্মৈ তৃণং নিদধৌ"—ব্রহ্ম তাঁহার সম্মুখে একগাছি তৃণ ধরিলেন। "তদ্দহেতি"— ইহাকে দগ্ধ কর। "তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তং ন শশাক দগ্ধুং"— অগ্নি সেই তৃণের উপরে আপনার সমস্ত বলবীর্য্য পর্য্যবসিত করিয়াও তাহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। "স তত এব নিববৃতে"— সেই অবধি অগ্নি নিবৃত্ত হইলেন। "নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্ যক্ষমিতি"—না—পারিলাম না জানিতে কে এ অলৌকিক মহাপুরুষ। বায়ু বলিলেন আচ্ছা আমি জেনে আসচি—এই বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে ব্রহ্মের নিকটে গেলেন। ব্রহ্ম বলিলেন "কে তুমি"। বায়ু বলিলেন আমি বায়ু আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম বলিলেন তুমি যে বায়ু মাতরিশ্বা—কি তোমাতে সামর্থ্য? বায়ু বলিলেন—এমন কি সব আমি উড়াইয়া দিতে পারি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে। ব্রহ্ম বায়ুর সম্মুখে এক গাছি তৃণ ধরিয়া বলিলেন—ইহাকে উড়াইয়া দেও। বায়ু সেই তৃণের উপরে আপনার সমস্ত বলবীর্য্য পর্য্যবসিত করিয়াও তাহাকে নড়াইতে পারিলেন না। সেই অবধি বায়ু নিবৃত্ত হইলেন—বলিলেন "না— পারিলেম না জানিতে কে এ অলৌকিক মহাপুরুষ!" তাহার পরে দেবতারা ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকটে যাইবামাত্র ব্রহ্ম তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্ধান করিলেন। ইন্দ্র তখন সেই স্থানে বহুশোভমানা হৈমবতী উমাকে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে উনি অলৌকিক মহাপুরুষ?" উমা বলিলেন ব্রহ্ম ; ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমার মহিমান্বিত হইয়াছ। উমা হৈমবতী শুনিয়া কেহ যেন এরূপ

মনে না করেন যে, হৈমবতী শব্দের অর্থ হিমবৎ-কন্যা ; কেননা টীকাতে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, হৈমবতী উমা—কিনা হেমালঙ্কার-বিভূষিতা উমা অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা। এই সুন্দর আখ্যায়িকাটির অর্থ দুইরূপ—আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক।

উহার আধ্যাত্মিক অর্থ এই যে, জগতে যাহার যাহা কিছু বলবীর্য্য সমস্তই ব্রহ্মেরই প্রসাদাৎ। ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত হইলে অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না, বায়ুর বায়ুত্ব থাকে না, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব থাকে না, কিছুরই কিছুত্ব থাকে না। ব্রহ্মই সকল সত্তার মূলাধার, সকলশক্তির মূল-প্রবর্ত্তক, সকল আত্মার অন্তরাত্মা। ব্রহ্মেরই প্রসাদে মনুষ্য অন্তরের এবং বাহিরের দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির উপরে জয়লাভ করিতে পারে। কিন্তু মাঝপথে মনুষ্য যখন সেই গোড়ার কথাটি বিস্মৃত হইয়া আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া মনে করে যে, বিজয়-কার্য্যে তাহার নিজেরই ষোলো আনা কর্ত্তৃত্ব—তাহার নিজেরই ষোলআনা মহিমা, তখন তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্রহ্ম তাঁহার সমস্ত বলবীর্য্য হরণ করিয়া ল'ন। তাহর পর যখন সে ব্রহ্মের প্রসাদ হইতে অধঃপতিত হইয়া একান্ত শ্রীভ্রষ্ট, অসহায়, এবং নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে তখন ব্রহ্মের কৃপায় জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিদ্যা উমা আসিয়া তাহার জ্ঞান-চক্ষু ফুটাইয়া দেন। তখন সে ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করে। মনুষ্যের এইরূপ প্রত্যাবর্ত্তনের অবস্থায় তাহার আত্মাতে ঈশ্বরের প্রসাদ অল্পে অল্পে অবতীর্ণ হইয়া তাহার অন্তঃকরণে স্বর্গীয় বল-বীর্য্য এবং আশা-উদ্যমের সঞ্চার করে। অবশেষে সাধক ঈশ্বর-প্রসাদে বলী হইয়া পথের নানাপ্রকার বাধাবিঘ্নের উপরে জয়-লাভ করে, এবং পরম আনন্দে ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইয়া কল্যাণ হইতে কল্যাণে পদনিক্ষেপ করিতে থাকে। এই গেল আধ্যাত্মিক অর্থ। তাহার ঐতিহাসিক অর্থ যাহা—তাহা একপ্রকার ভবিষ্যৎবাণী। তাহা এই যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তানেরা যদি ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া প্রকৃতির শক্তিকে এবং মনুষ্যের বলবীর্য্যকে সর্ব্বোপরি বাড়াইয়া তুলেন; ব্রহ্মের আরাধনা ছাড়িয়া যদি শক্তিপূজায় এবং অবতারপূজায় প্রবৃত্ত হ'ন, তবে তাঁহাদের দুর্গতির আর সীমাপরিসীমা থাকে না, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীভ্রষ্ট অসহায় নির্বীর্য্য এবং হতচেতন হইয়া মস্তকে হস্ত দিয়া হাহাকার করিতে থাকিবেন। যখন কোথাও আর কোনো উপায় দেখিতে পাইবেন না, তখন ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে। ব্রহ্মবিদ্যার ওঙ্কারমন্ত্রপূত সলিল-সিঞ্চনে ক্রমে তাঁহাদেব চক্ষু ফুটিবে। তখন তাঁহারা ব্রহ্মের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার উপাসনায় জীবন সমর্পণ করিবেন ; তাহা যখন করিবেন, তখন সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচিয়া গিয়া তাঁহাদের আর এক শ্রী হইবে, আর এক মূর্ত্তি হইবে, আর এক স্ফূর্ত্তি হইবে ; তখন তাঁহারা ঈশ্বর-প্রসাদে নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া আর এক মনুষ্য হইবেন, এবং নূতন বলে বলী হইয়া অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিবেন।

আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা এক সময়ে যাঁহাকে অগ্নিতে দেখিয়াছিলেন অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জাতবেদা ; আর এক সময়ে বায়ুতে দেখিয়াছিলেন বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মরুৎ; আর এক সময়ে জলরাশিতে দেখিয়াছিলেন জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ কিনা আবরণ-কর্ত্তা—পৃথিবীর তৃতীয়াংশের আবরণ-কর্ত্তা ; আর এক সময়ে গগনমণ্ডলে দেখিয়াছিলেন গগনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র ; আর এক সময়ে সূর্য্যমণ্ডলে দেখিয়াছিলেন সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সবিতা—কিয়ৎ শতাব্দী পরে যখন তাঁহাদের মনোমধ্যে আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইল, তখন তাঁহাকেই তাঁহারা আত্মাতে দেখিলেন আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমাত্মা। তখন তাঁহারা

জানিতে পারিলেন যে, যিনি অনাদি-অনন্তকালের অধিদেবতা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ওঙ্কার, তিনিই অসীম আকাশের অধিদেবতা সর্ব্বজগতের মূলাধার বৃহৎ হইতেও বৃহৎ পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনিই আত্মার অধিদেবতা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা। এইরূপে যখন তাঁহারা সেই অনাদি অনন্তকালের অধিদেবতা-পূর্ণব্রহ্মকে একই অদ্বিতীয় পরমাত্মা জানিয়া তাঁহাকে দেশ-কালের অতীতরূপে আত্মাতে উপলব্ধি করিলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে তাঁহারই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহারা ব্রহ্মের ধ্যান, ব্রহ্মের আরাধনা ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য-সাধন এবং ব্রহ্মের আনন্দরস-পান করিয়া অজেয় ব্রহ্মতেজ উপার্জ্জন করিলেন, আর তাহারই গুণে ব্রাহ্মণ হইলেন।

তাহার পরে তাঁহাদের মধ্য হইতে এক এক সময়ে এক এক দল যাত্রী বাহির হইয়া ব্রহ্মতেজের প্রভাব দূরে দূরে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে নানা স্থানে বিকীর্ণ নানা প্রতাপান্বিত রাজবংশের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিলেন।

অনতিপরে ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষত্রিয়বীর্য্যের সংঘর্ষে বৈরিতা'র ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল , তার সাক্ষী—বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সময়ে বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন "ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং" ধিক্‌বল ক্ষত্রিয়বল— ব্রহ্মতেজ মহদ্‌বল। পরশুরামের তো কথাই নাই—পরশুরাম পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তাহার পরে ইংলণ্ডের ত্রেতাযুগে সাক্সন এবং নর্মান নামক দুই বিভিন্ন জাতি একত্রে বাস করিতে করিতে তাহাদের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল—ভারতবর্ষের ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যেকালে তাহাই ঘটিল। ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষত্রিয়বীর্য্যের মধ্যে প্রথমে যেরূপ সর্প-নকুলের সম্বন্ধ বিষদাঁত বাহির করিয়াছিল—কালের মার্জ্জন-ঘর্ষণে তাহা সমূলে অপনীত হইয়া গিয়া তাহার স্থানে অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ প্রাদুর্ভূত হইল। একই রাজকীয় শরীরে ব্রাহ্মণ হইলেন মস্তক—ক্ষত্রিয় হইলেন বাহুদ্বয়।

পৌরাণিক ইতিহাসের তিনটি মুখ্য সন্ধিক্ষণে তিন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর, তিনজনই ব্রাহ্মণাধিপত্যকে স্ব স্ব কালোচিত বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।

প্রথমে সন্ধিক্ষণ হ'চ্চে—ঋষিবংশীয় ব্রাহ্মণেরা যখন ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়া রাজবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিতেছেন। এই সময়ে যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে, কে কাহার উপর আধিপত্য করিবে, এইরূপ এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল, তখন পরশুরাম পরশুর একুশ আঘাতে সেই সমস্যাটির জটিল গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে পরশুরাম ব্রাহ্মণাধিপত্যের সংস্থাপন-কর্ত্তা।

দ্বিতীয় সন্ধিক্ষণ হ'চ্চে—ব্রাহ্মণেরা যখন আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উপচিয়া উঠিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন। এই সময়ে রামচন্দ্র রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে ব্রাহ্মণদিগকে পরিত্রাণ করিলেন ; আর, কিয়ৎকাল পরে বানরাকৃতি বর্ব্বর জাতিদিগের সাহায্যে রাক্ষসজাতির উচ্ছেদ-কার্য্য সমাধান করিয়া দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণাধিপত্যের মূল পত্তন করিলেন। এইজন্য বলা যাইতে পারে যে, রামচন্দ্র ব্রাহ্মণাধিপত্যের রক্ষাকর্ত্তা এবং বিস্তারকর্ত্তা।

তৃতীয় সন্ধিক্ষণ হ'চ্চে—ইংলণ্ডের দ্বাপর যুগে ইংলণ্ড যেমন শ্বেত পার্টাজি এবং রক্ত পার্টাজি (white rose এবং red rose) এই দুই বিরোধী পক্ষের কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারে তোলপাড়

হইয়া রসাতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তেমনি ভারতের দ্বাপর যুগে যে সময়ে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ মহা ভীষণ প্রলয়ের মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল— সেই সময়। এই সময়ে ক্ষত্রিয় বীর্য্যের প্রখর উদ্যমে ব্রহ্মতেজ রাহুগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় ক্ষত্রিয়-বীরদিগের তো কথাই নাই— দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় ব্রাহ্মণ-চূড়ামণিরাও শাস্ত্রকে হেয়জ্ঞান করিয়া শস্ত্রকেই সার জ্ঞান করিয়াছিলেন ; আর, সেই সকল মহতের দৃষ্টান্ত চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বদা দেখিতে দেখিতে জনসাধারণের মনোমধ্যে এইরূপ একটা সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, বাহুবলই বল, তা বই, বুদ্ধিবলও কোনো কার্য্যের নহে, শাস্ত্রবলও কোনো কার্য্যের নহে, ধর্ম্মবলও কোনো কার্য্যের নহে। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ পূতনা বকাসুর প্রভৃতি শত্রুদিগের দলবল বুদ্ধি- কৌশলে নিহত করিয়া বাহুবল অপেক্ষা জ্ঞানবলের বিশিষ্টরূপ চমৎকারিতা এবং ফলদায়কতার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, দ্বিতীয়তঃ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহুবল অপেক্ষা ধর্ম্মবলের শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিলেন; তৃতীয়তঃ আপন ক্ষত্রিয়-বক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন ধারণ করিয়া শস্ত্রবলের উপরে শাস্ত্রবলের প্রাধান্য আপনাতে মূর্ত্তিমান্ করিলেন। যে সময়ে সরযূ এবং গঙ্গা নদীর সমীপবর্ত্তী বিশিষ্টরূপ উর্ব্বরা প্রদেশ-সমূহে আর্য্যদিগের বসতি বিস্তার যতদূর হইবার তাহা হইয়া চুকিয়া যমুনা নদীর তটোপান্তে মথুরা গোকুল বৃন্দাবন প্রভৃতির নগর-গ্রাম-পল্লির সবেমাত্র পত্তন হইয়াছে; যে সময়ে মথুরা-বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সকল কালীয় পূতনা বকাসুর প্রভৃতি নাগ রাক্ষস এবং অসুর জাতিদিগের আবাসভূমি ছিল, যে সময়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রজপল্লী রাখালগণেরই বসতি ছিল (কৃষিকার্য্যে অনুরাগী ছিলেন, সেখানে, একা কেবল বলরাম) ; যে সময়ে কংশ রাজা যামুনা প্রদেশের অরক্ষণাভাব আড়ালে আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্ম-শাসন অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন; সেই সময়ের অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলতার মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরা নগর হইতে পলাইয়া গিয়া গোকুল গ্রামে নন্দালয়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন সেই অবরোধবিহীন রাখাল-পল্লীতে যে, তাঁহার কৈশোর লীলা আর্য্য ধর্ম্ম-শাসনের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সব রাখালেরা যাহা করিত, শ্রীকৃষ্ণ তাহাই করিতেন—দোলের সময় দোলে, ঝুলনের সময় ঝুলনে, রাস-লীলার সময় রাসলীলায় মাতিতেন। তাহাতে আবার, ইংলণ্ডীয় কোন নাচের মজলিসে যুবরাজ উপস্থিত থাকিলে, তিনি যেমন নাটমন্দিরের সমস্ত সমাদর এবং সম্মান একচেটিয়া করেন—রাখালদিগের নাচের মজলিসে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ক্ষত্রিয়-বংশীয় রূপবান এবং গুণবান বীরপুরুষ যে, সেইরূপ একাধিপত্য করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যৌবন-সুলভ কুহকপাশে জড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে পাশে তিনি যে অধিক কাল বাঁধা থাকিবেন—তাঁহার অন্তরের প্রকৃতি সেরূপ ছাঁচে গঠিত ছিল না—বিলাসিতার ছাঁচে গঠিত ছিল না। তাঁহার অন্তরের প্রকৃতি যে, কর্ম্মী মহাপুরুষদিগের ছাঁচে গঠিত ছিল—সমগ্র মহাভারত তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণ যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই কালীয়-নাগকে (অর্থাৎ সর্পের উপাসক কোন বলবান অনার্য্য জাতিকে) দমন করিয়া আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ; এবং কংশের টুয়াইয়া-দেওয়া পূতনা নামক রাক্ষসীর এবং বক নামক অসুরের দলবল বলে-কৌশলে নিহত করিয়া আপনার অসামান্য বুদ্ধিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। বকাসুরের চঞ্চু বিস্ফারিত করা এবং জরাসন্ধকে দুই চির করিয়া বিভক্ত

করা—দুইই আর কিছু না—ইংরাজীতে যাহাকে বলে শত্রুর রাজ্যকে দুই বিরোধী Party-তে split করা এবং আমাদের দেশের রাজনীতি-শাস্ত্রে যাহাকে বলে ভেদ উৎপাদন করা। বিগত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা যেমন প্রথম নেপোলিয়নের চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার দুর্নাম রটাইয়া তাঁহার সহিত সমস্ত ইউরোপের মনান্তর ঘটাইয়াছিলেন এবং তাহার পরে তাঁহার উপরে ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়াছিলেন, ঠিক সেরূপ না হউক্—কতকটা তাহার অনুরূপ কোন না কোন প্রকার নীতিকৌশলের সাহায্যে জরাসন্ধ এবং বকাসুরকে বধ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই সকল শত্রুদমনকার্য্য অসামান্য নিপুণতার সহিত সুনির্ব্বাহ করাতে তাঁহার যশোরশ্মি দিগ্‌দিগন্তরে ছট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল; আর, সেই সূত্রে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের বীরপুরুষদিগের মধ্যে বিশিষ্টরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শত সহস্র অভ্যাগত ব্রাহ্মণের চরণ-প্রক্ষালনের সঙ্গে সঙ্গে—ব্রাহ্মণের নিকট অবনতি স্বীকারের নিন্দনীয়তা-কলঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া ব্রহ্মণ্য-দেবের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এই জন্য বলা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যদেবের মৃতপ্রায় শরীরে নব জীবন সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে এ কাল পর্য্যন্ত চালাইয়া আনিবার কর্ত্তা। বৃদ্ধ ব্রহ্মণ্যদেব এমন এক জন মহাপ্রতাপশালী অভিভাবকের হস্তাবলম্বন পাইয়াছিলেন বলিয়া এখনও তাই তাঁহার চলা বন্ধ হয় না—এখনও তিনি খোঁড়াইয়া চলিতেছেন। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সত্যযুগের শেষ ভাগে পরশুরাম, ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, এবং দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা-স্তম্ভ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের আগমনের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-বীর্য্য এক সময়ে খুবই উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল—তার সাক্ষী কুরুক্ষেত্রের হত্যাকাণ্ড। এই সময়ে, ক্ষত্রিয়-বীর্য্য তেজের সহিত মাথা তুলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা লোকসমক্ষে আপনাদের আধিপত্য অটুট্ রাখিবার জন্য প্রভূত যাগযজ্ঞাদি বাহ্য ক্রিয়া-কলাপের বিধান-প্রবর্ত্তনার দিকে বেশীমাত্র ঝোঁক দিতে লাগিলেন; তার সাক্ষী—মহাভারতের আদি অন্ত মধ্য, যজ্ঞে যজ্ঞে ছয়লাপ হইয়া গিয়াছে। ক্ষত্রিয়দিগের অভ্যুদয়ের কাল হইতে ক্রমাগতই রাজ্যে রাজ্যে অশ্বমেধ রাজসূয় প্রভৃতি মহা মহা যজ্ঞ বিপুল অর্থব্যয় এবং আড়ম্বর সহকারে সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। হরণ এবং পূরণ পাশাপাশি চলিতে থাকিল—যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দিগের প্রাণ-হরণ, এবং যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগের উদর পূরণ। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মোপাসনা গিরিগুহা অরণ্যে প্রস্থান করিল। এখানে এইটি সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে প্রভূত অর্থব্যয় ব্যতিরেকে বড় বড় যাগযজ্ঞ সুনির্ব্বাহিত হইতে পারা অসম্ভব। কাজেই—সূর্য্য যেমন সমুদ্র হইতে রসাকর্ষণ করিয়া মেঘের ভাণ্ডার পূরণ করে, এবং তাহার পরে সেই ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিয়া উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল করে—প্রতাপশালী ক্ষত্রিয়-বীরেরা তেমনি বৈশ্যদিগের নিকট হইতে ধনরাশি শোষণ করিয়া রাজকীয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং যজ্ঞকালে সেই ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। দ্যুদেবগণের প্রতি ধূমরাশি উত্থিত হইতে লাগিল, ভূদেবগণের প্রতি ধনরাশি বর্ষিত হইতে লাগিল। পৃথিবীর বারো আনা আহার্য্য দ্রব্য দুই দিকের দুই দেবতারা আপনাদের মধ্যে বাঁটিয়া লইতে থাকিলেন, অবশিষ্ট চারি আনা অংশে ভর করিয়া বৈশ্যাদি বর্ণেরা কথঞ্চিৎপ্রকারে দিনপাত করিতে লাগিল। মনুর বিধানমতে রাজারা ষষ্ঠাংশবৃত্তি, অর্থাৎ প্রজাবর্গের কৃষি-জাত ধান্যের কেবল ষষ্ঠাংশের ন্যায্য অধিকারী ; কিন্তু

হইলে কি হয় — সব রাজা রঘুও না, যুধিষ্ঠিরও না! রাজারাজড়াদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের সংখ্যা অতিঅল্প — দুর্যোধনের সংখ্যাই অধিক। তা ছাড়া— প্রভূত যজ্ঞানুষ্ঠানের মহোৎসবে যখন রাজপুরুষেরা এবং রাজাগুরু ব্রাহ্মণেরা মাতিয়া উঠিয়াছেন, তখন রাজা যদি দেবের এবং ভূদেবগণের প্রিয়ার্থে এবং দেশের কল্যাণার্থে আড়াই আনার জায়গায় বারো আনা রাজস্ব আদায় করেন, তবে কে এমন পাষণ্ড— কাহারই বা এত সাহস যে, তাহার বিরুদ্ধে কোনো কথা উচ্চারণ করিবে? এক এক যজ্ঞে অসংখ্য পশুর রক্তপাত এবং অসংখ্য দীনদরিদ্র প্রজার হাড়মাস-নিঙ্ড়ানো রাশি রাশি অর্থের অপব্যয় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত সহৃদয় ব্যক্তিরা যাগযজ্ঞের প্রতি তো বীতরাগ হইলেনই, তা ছাড়া — যে সকল দেবতার নামে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত তাঁদের প্রতিও তাঁহাদের অভক্তি জন্মিল। এই সময়ে বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবপ্রসাদের বিরুদ্ধে আত্মপ্রভাবের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিলেন ; আর, সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে, জ্ঞান ধর্ম্মে সাধারণ মনুষ্য জাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিয়া প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় ভারতের দেশ-বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বসাধারণের বোধোপযোগী প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম পথ-প্রদর্শকদিগের মধ্যে বুদ্ধদেব সর্ব্বাগ্রগণ্য , কেননা, সেরূপে যে ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারে—বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না। ঐহিক পারত্রিক অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করা যে, নিতান্তই বৃথা কার্য্য, আর, আত্মপ্রভাবে ইন্দ্রিয় মন দমন করিয়া এবং চরিত্র সংশোধন করিয়া দয়াধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যে, শ্রেয়ঃপথের একমাত্র দ্বার— এই কথাটির প্রতি বুদ্ধদেব জন-সাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন আপামর সাধারণ সকলেরই প্রতি বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ ছিল এই যে, 'ঠিক্ মতে ভাবনা করিতে শেখ', 'ঠিক কথা বলিতে শেখ', 'ঠিক্ পথে চলিতে শেখ'; তা বই, কৃতবিদ্য পণ্ডিতগণের প্রতি তাঁহার বিশিষ্টরূপ উপদেশ ছিল এই যে, ক্লেশের মূল অন্বেষণ কর, ক্লেশের যাহাতে মূলোচ্ছেদ হইতে পারে তাহার বিহিত উপায় নির্দ্ধারণ কর ; এবং সুনির্দ্ধারিত উপায় অবলম্বন করিয়া ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি-রূপিণী নির্ব্বাহ-মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। বুদ্ধদেবের প্রদত্ত এই সকল কাজের উপদেশ শুনিয়া তাহার উপর যদি কেমন শিষ্য ঈশ্বর-বিষয়ক কোন জ্ঞানের উপদেশ তাঁহার নিকটে শুনিতে চাহিত, তবে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের নাম লইতে পরাঙ্মুখ ছিলেন সত্য, আর, ইহাও, সত্য যে, তাঁহার পরবর্ত্তী-কালে বৌদ্ধ দর্শনকারেরা প্রকারান্তরে নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা বলিয়া বুদ্ধদেব নিজে যে, নাস্তিক ছিলেন, তাহার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, আর, তাহা বিশ্বাস-যোগ্যও নহে। তবে, বুদ্ধদেবের লোকাতেজক কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তখনকার কালের সমাজের নেতৃপক্ষেরা যে, তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া তিরস্কার করিবেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ; সক্রেটিস্ তাঁহার স্বদেশীয় মহামহোপাধ্যায়গণ কর্ত্তৃক ঐরূপে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাপত্রে ঈশ্বরের নাম করা হইবে কি না—ইহা লইয়া প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া অবশেষে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, ঈশ্বরের নাম করা হইবে না। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রতিষ্ঠাতাগণ কি নাস্তিক ছিলেন? তাহা দূরে থাকুক্—তাঁহারা ঈশ্বরভক্ত সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন তাহাতে আর ভুল নাই। তবে কি? না—পাছে পরবর্ত্তি কালের কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ঈশ্বরের দোহাই দিয়া প্রতিষ্ঠাপত্রের

অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করে—এইরূপে ঈশ্বরের নামে রাজ্যের ভিত্তিমূল বিপর্য্যস্ত করিয়া ঈশ্বরের নামকে কলঙ্কিত করে, এই আশঙ্কায় তাঁহারা তাঁহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পত্রে ঈশ্বরের নাম সন্নিবেশিত করিতে সঙ্কুচিত হইলেন।

প্রকৃত কথা এই যে, বুদ্ধদেব পৃথিবীর মধ্যে একজন সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মবীর , এমন কি তাঁহার মতো উচ্চাশয় ধর্ম্মবীর পৃথিবীর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি যে কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি একাকী নির্ভীক-চিত্তে পূর্ণ উদ্যমের সহিত সমাধা করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। অতএব তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি আমাদের অপেক্ষা ভাল বুঝিতেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। তাঁহার সময়ে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার অধিক আর কিছু করিতে গেলে—তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাও হয়তো তিনি করিতে পারিতেন না। করিয়াছেন যাহা—তাহা একটা অপরিমেয় বৃহৎ ব্যাপার। বিশুদ্ধ ব্যবহারধর্ম্মের প্রতি—অহিংসা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, অব্যভিচারিতা, সদাচার এবং শুদ্ধাচারের প্রতি আপামর সাধারণ সকল-শ্রেণীর লোকদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া কম কথা নহে—তাহা লিউথরের ন্যায় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসংস্কারকের কর্ম্ম নহে—তাহা একজন মহাজ্ঞানী উদারচেতা বিশালহৃদয় সর্ব্বলোকহিতৈষী মহাপুরুষেরই কর্ম্ম—তাহা বুদ্ধদেবেরই কর্ম্ম। তাহার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ বুদ্ধদেবের চরণে দুশ্ছেদ্য ঋণপাশে এযাবৎকাল বাঁধা রহিয়াছে এবং চিরকাল বাঁধা থাকিবে। সবই সত্য—কিন্তু তথাপি, তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের বিসদৃশ পরিণাম দেখিয়া আমাদের এইরূপ মনে হয় যে, তিনি যদি তাঁহার শিষ্যদিগের আত্মার ক্ষুধা-নিবারণের জন্য ঈশ্বরাধনার একটি সুনির্ম্মল পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল করিতেন। তাহা না করিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি প্রগাঢ় মৌন অবলম্বন করিলেন! ইহার কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে। আমাদের বুদ্ধিতে আমরা যতদূর বুঝিতে পারি— সে কারণ আর কিছু না— বুদ্ধদেবের ছয় সাত শতাব্দী পরবর্ত্তী-কালের একজন জগদ্বিখ্যাত ইহুদীয় মহাপুরুষ আপন চেলাদিগকে উপদেশচ্ছলে যাহা বলিয়াছিলেন ; — কী? না শূকরদিগের সম্মুখে মুক্তা ছড়াইও না— আমরা বলি উলুবনে মুক্তা ছড়াইওনা। কিন্তু শাক্যমুনির শিষ্যেরা তাঁহার মৌনাবলম্বনের অর্থ উল্টো বুঝিল। তাহারা বুঝিল যে, তবে বুঝি ঈশ্বর কেবল একটা কথার কথা— এইরূপ বুঝিয়া মনুষ্যের পুরুষকারকে এবং অনাদি কর্ম্মকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিল।

পুরাণে যে বলে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ" তা বড় মিথ্যা নয়। বৌদ্ধধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি তলাইয়া বুঝিতে গিয়া—মুক্তার লোভে ডুবুরির যেমন অনেক সময় প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়—তত্ত্বান্বেষী ব্যক্তির তেমনি বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হয়। তার সাক্ষী—এ দিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বরবাদী এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাঙ্মুখ , ও দিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা মনুষ্যপূজা এবং মূর্ত্তি-পূজার আদি-গুরু ঃ— এটা সত্য, কি ওটা সত্য? বিষম সমস্যা! ইতিহাস কিন্তু ওসব হেঁয়ালিকে ডরায় না। যাহা দেখিয়া আমরা বলিলাম "বিষম সমস্যা!" ইতিহাস-দেবতা তাহা দেখিয়া হাস্য করেন আর বলেন 'From the sublime to the ridiculous there is but a step.' — 'কিছু চাহি না' বলিয়া কঠোরতার ডানায় ভর করিয়া আকাশে ওড়াউড়ি, আর, 'পুত্রং দেহি ধনং দেহি' বলিয়া মৃন্ময় প্রতিমার পদতলে গড়াগড়ি, দুয়ের মধ্যে কেবল এক পা ব্যবধান!"

ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে যেমন নানারসের নাটক অভিনীত হয় এমন আর কোথাও না। যেমন করুণ রস— তেমনি হাস্য-রস। একদা চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি চেলা খুব ভাল কামিনী চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই চাউলে ভাত রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব আহারান্তে তাঁহার সেই চেলাটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপ চাউল তুমি পাইলে কোথায়?" চেলাটি বলিল "অমুক বিধবা রমণীর নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি।" এই—চৈতন্য মহাপ্রভুর ক্রোধ দেখে কে! "কী! প্রকৃতি সম্ভাষণ! তুমি আজ হইতে আমার সম্মুখে আর আসিও না!" চেলা-বেচারী আত্মগ্লানিতে জর্জরিত হইয়া অনতিপরে ত্রিবেণীর জলে ডুবিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। যে মহাপ্রভুর কাণ্ডকারখানা এইরূপ, তাঁহার দোহাই দিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন কোন বিখ্যাত শাখা অসঙ্কোচে এইরূপ কথা রচনা করিয়া থাকে যে, প্রকৃতির সাহচর্য ব্যতিরেকে সংসার-ত্যাগী বৈরাগীর ধর্ম্মসাধন সুসম্পন্ন হইতে পারে না! এই হাস্যোদ্দীপক নাটকের জুড়ি আর একটি আছে, তাহা এই :—

পাছে লোকে ঈশ্বর-বিষয়ক কূট তর্কে বিভ্রান্ত হইয়া আত্মপ্রভাব-সাধ্য পুরুষার্থ-সাধনে অযত্ন করে, এই আশঙ্কায় বুদ্ধদেব ঈশ্বর-প্রসঙ্গে নিতান্তই পরাঙ্মুখ ছিলেন ; এত পরাঙ্মুখ ছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরবিষয়ক কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিরুত্তর থাকাই শ্রেয়বোধ মৌনাবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! পৃথিবী হইতে যেমনি তিনি অন্তর্ধান করিলেন, তাহার কিয়ংপরে ভারতবর্ষের এ মুড়া হইতে ও মুড়া পর্যান্ত শত স্থান শত দেব-দেবীর প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পরিকীর্ণ হইয়া উঠিল ; তার সাক্ষী—ইলোরা, অজন্তা, খণ্ডগিরি, শ্রীক্ষেত্র। সেই যে আমাদের দেশে মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত হইল তাহার জেজুড় এখনো পর্যান্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে সটান চলিয়া আসিতেছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখে আমি শুনিয়াছি যে, কিয়ৎপূর্ব্বে যখন তিনি সক্ষেত্রে (অর্থাৎ সরে জমিনে) বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্য অনুসন্ধান করিবার মানসে নেপালে অবস্থিত করিতেছিলেন, তখন সেখানে তিনি দেখিলেন যে, দেবালয় অনেক আছে কিন্তু দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কোথাও বা মহাদেব, কোথাও বা বুদ্ধদেব যা—এই কেবল; তা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার কুত্রাপি নাম গন্ধও নাই। নেপালের অধিবাসীরা শৈব নহে— সবাই বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম দেবপ্রসাদের প্রতি পরাঙ্মুখ অথচ, কি আশ্চর্য্য, নেপালের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের অমন একটা পীঠস্থানে শিবের মন্দির এবং বুদ্ধের মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। ইহার অবশ্য বিশেষ কোন কারণ থাকিবে। সে কারণ আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা ভাঙিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন :—

বুদ্ধদেব অহিংসা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, শুদ্ধাচার, ইত্যাদি নানাপ্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্বলিত সদ্ধর্ম্ম জনসমাজে প্রচার করিলেন ; কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রভাবের প্রশ্রয় দিলেন এত বেশী যে, তাঁহার মৃত্যুর পরবর্ত্তিকালে তাঁহার পন্থাবলম্বী সাধকদিগের মনে এইরূপ একটা অসঙ্গত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে বল করিয়া উঠিল যে, সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ বা অস্ফুট চক্ষু মনুষ্যের আত্মার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—বিশিষ্টরূপ সাধন দ্বারা তাহাকে কেবল ফুটাইয়া তুলিবার অপেক্ষা—তাহা হইলেই মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইতে পারে।

বুদ্ধদেবের ন্যায় ত্রিলোক-বিজয়ী সাধক কেহ হয় নাই, হইবে না। সাধন-প্রভাবে তিনি

সিদ্ধির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন। অতএব বুদ্ধদেব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর।

বুদ্ধদেব এমনি করুণাময় যে, যদিও তিনি মনে করিলেই আর-এক ধাপ উপরে উঠিয়া পরমনির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি সর্ব্বজগতের পরিত্রাণের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য ঈশ্বরের ধাপ পর্য্যন্ত উঠিয়া সেইখানেই থামিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হাজার হউক্, বুদ্ধদেব মনুষ্য—তিনি এক সময়ে হামাগুড়ি দিয়াছেন ; তাহার পর এক সময়ে বাধা-বিঘ্নে আক্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়াছেন ; সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত স্বীয় বুদ্ধ নামের সার্থক্য সম্পাদন করিলেন। তাহার পরে রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহা দেখিয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা বুদ্ধের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বলিলেন বুদ্ধদেব ঈশ্বর বটে কিন্তু মনুষ্য-বুদ্ধই যে ঈশ্বর তাহা নহে। মনুষ্য-বুদ্ধের অভ্যন্তরে তিন শ্রেণীর দেবতা বুদ্ধ স্তরে স্তরে উপর্য্যুপরি অধিষ্ঠান করিতেন ; — প্রথম স্তরে রহিয়াছেন পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর— ইনি ধ্যানী বুদ্ধ ; তৃতীয় স্তরে রহিয়াছেন বজ্রপাণি আদি বুদ্ধ—ইনিই সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বর— ইনিই মহেশ্বর। এখন বক্তব্য এই যে, নেপালে বুদ্ধদেব এবং মহাদেবের মধ্যে যেরূপ হরিহরাত্মা-রকমের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ দেখিতে পাওয়া গেল, তাহার ভিতরকার নিগূঢ় কথাটি আর কিছু না—যিনি বৌদ্ধদিগের বজ্রপাণি মহেশ্বর, তিনিই পৌরাণিকদিগের শূলপাণি মহেশ্বর; যিনি আদি বুদ্ধ, তিনিই শিব।

এখন আমরা দিব্য একটি স্থানে পৌঁছিয়াছি! চমৎকার তীর্থস্থান এটি! ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থান! একটি বেণী হচ্চেন বৌদ্ধশাস্ত্রের সরস্বতী নদী—এক্ষণে যিনি দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া পড়িয়া স্মৃতিপথে প্রবেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বেণী হচ্চেন বেদান্তদর্শনের গঙ্গানদী। তৃতীয় বেণী হ'চ্চেন সাংখ্যদর্শনের যমুনা নদী। এই সঙ্গমস্থানটিতে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত প্রথমতঃ শাঙ্করভাষ্যানুযায়ী বেদান্তদর্শনের ঐক্য, দ্বিতীয়তঃ কাপিল সাংখ্যদর্শনের ঐক্য, তৃতীয়তঃ সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনের ঐক্য—তিন দর্শনের তিন ভাবের ঐক্য—যাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাহা ক্রমান্বয়ে আপনাদের চক্ষের সমক্ষে অনাবৃত করিতেছি—প্রণিধান করুন ঃ—

একটু পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বুদ্ধদেবের স্বর্গারোহণের পরবর্ত্তিকালের বৌদ্ধশাস্ত্রের মতানুসারে মনুষ্য-বুদ্ধের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক পুরী একপ্রকার চৌতালা দেবমন্দির। একতালায় রহিয়াছেন পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর—ইঁহাকে পদ্মপাণি বিষ্ণু বা বৈশ্বানর বলিলেও চলে। দোতালায় রহিয়াছেন ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ কিনা অপরিমিতজ্যোতি— ইঁহাকে সুবর্ণ জ্যোতি হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্মা বলিলেও চলে। তেতালায় রহিয়াছেন বজ্রপাণি আদি বুদ্ধ যাঁহার সহিত শূলপাণি মহেশ্বরের সৌসাদৃশ্যের কথা আমরা একটু পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। চৌতালায় রহিয়াছেন বটে নির্ব্বাণ-মুক্তি কিন্তু সে না রহার'ই মধ্যে। বেদান্তদর্শনের চৌতালা মন্দির ইহারই এক প্রকার দ্বিতীয় সংস্করণ। উপনিষদ্ শাস্ত্রের প্রজাপতি, বিষ্ণু, শিব এবং ঈশান ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি-সূচক নাম ; তা বই, উপনিষদের অভিপ্রায়ানুসারে প্রজাপতি বিষ্ণু এবং ঈশান বিভিন্ন দেবতাও নহেন, আর, ত্রিমূর্ত্তিও নহেন; উপনিষদের ভাষার মধ্যে হেঁয়ালির ন্যায় অস্পষ্ট কিছুই নাই ; উপনিষদে যে বাক্যের যে অর্থ তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে ; তার সাক্ষী —ব্রহ্ম হইতে সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে এই অর্থে তিনি প্রজাপতি ; ব্রহ্ম সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট

রহিয়াছেন এই অর্থে বিষ্ণু , তিনি মঙ্গল-নিধান এই অর্থে শিব ; তিনি সকলের নিয়ন্তা
এই অর্থে বিষ্ণু , তিনি মঙ্গল-নিধান এই অর্থে শিব , তিনি সকলের নিয়ন্তা এই অর্থে
ঈশান। এই অর্থেই, বেদান্তদর্শনের মতানুসারে বিষ্ণু বা বৈশ্বানর, ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ এবং
ঈশ বা ঈশান, তিন স্থানের তিন অধিদেবতা। বৌদ্ধশাস্ত্রের দেখাদেখি—বেদান্ত দর্শনের
চৌতালা দেব-মন্দিরে বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশান, এই তিন দেবতার তিনটি বিভিন্ন
বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একতালা দেওয়া হইয়াছে বৈশ্বানর বিষ্ণুকে বাসের
জন্য—ইনি জাগ্রৎকালীন স্থূল জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দোতালা দেওয়া হইয়াছে হিরণ্যগর্ভ
ব্রহ্মাকে—ইনি স্বপ্নকালীন সূক্ষ্ম জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তেতালা দেওয়া হইয়াছে
ঈশানকে—ইনি সুষুপ্তিকালীন বীজ-ভূত জগতের বা আদ্যাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চৌতালা
দেওয়া হইয়াছে তুরীয় অবস্থাকে—এ স্থানটি জীবেশ্বরের ঐক্যস্থান বা সমাধিস্থান—এখানে
অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কোনো কথাই আসিতে পারে না। ত্রিবেণী সঙ্গমের উঁচা পাড়ে দাঁড়াইয়া
আমরা বেদান্ত-দর্শনের মুখ্যতম কথাটির গোড়ার বৃত্তান্ত চক্ষের সমক্ষে দেদীপ্যমান দেখিতে
পাইতেছি—জীবেশ্বরের ঐক্য-প্রতিপাদন চেষ্টায় গোড়ার বৃত্তান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি
সে বৃত্তান্তটি এই , — বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর নাই — কিন্তু ঈশ্বর চাই। বৌদ্ধেরা প্রথমে মনুষ্য
বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিল, তাহার পরে তাহাদের মনে হইল যে, মনুষ্য-বুদ্ধকে
ঈশ্বর বলিলে ঈশ্বরেতে অনিত্যতা দোষ পড়ে , এইরূপ মনে হওয়াতে পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা
মনুষ্যবুদ্ধের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক জগতের তিনটি বিভিন্ন স্তরে তিনটি দেবতা বুদ্ধ
বসাইলেন। নিচের স্তরে বসাইলেন অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ—মধ্যম স্তরে বসাইলেন অমিতাভ
বুদ্ধ—তৃতীয় স্তরে বসাইলেন আদি বুদ্ধ , সর্বোচ্চ স্তরে বসাইলেন নির্ব্বাণমুক্তি। এইরূপে
যখন তাঁহারা এক বুদ্ধকে চারি বুদ্ধ করিলেন, তাঁহারা ভাবিলেন যে, চারি বুদ্ধকে ঈশ্বর
বলিলে ঈশ্বরের একত্বে দোষ পড়ে , এইরূপ ভাবনার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অগত্যা বলিতে
বাধ্য হইলেন যে, চারি বুদ্ধ একই বুদ্ধ—কেবল উপাধি-ভেদে বিভিন্ন। বৌদ্ধেরা মনুষ্য
বুদ্ধকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বর বলিতে সাহসী না হইয়া আদিবুদ্ধের সহিত ঐক্য-সূত্রে তাঁহাকে
প্রকারান্তরে ঈশ্বর-পদবীতে সমুত্থাপন করাইলেন। এইটিই হ'চ্চে জীবেশ্বরের ঐক্য-প্রতিবাদন
চেষ্টার গোড়ার কাহিনী , তা বই—ঐ কথাটির পোষকতার জন্য উপনিষদের এখান ওখান
সেখান হইতে যে দুই চারিটি মহাবাক্য টানিয়া হেঁচড়িয়া বাহির করা হইয়া থাকে, তাহা
কবিতার উচ্ছ্বাস বই আর কিছুই না। মহারাণীকে "হর্‌ম্যাজেষ্টি" বলিলে এরূপ বুঝায় না
যে, সত্য সত্যই তিনি ম্যাজেষ্টি-মাত্র! সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইহার ভাবার্থ এই যে, সবই ব্রহ্মের
মহিমা। "সোহহং" ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনি অহং অর্থাৎ The Great I am পরমাত্মা
তত্ত্বমসি বাক্যের ভাবার্থ এই যে, তুমি তাঁহারই ভাবের আবির্ভাব। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া
যাইতেছে যে, উপনিষদের ঐ মহাবাক্যগুলি এক প্রকার কবিতার হেঁয়ালি কথা, তা বই তাহার
কোনটিই বিজ্ঞানের কঠোর সত্য নহে। ফলে, বৌদ্ধ চৌতালা মন্দিরের নির্ব্বাণ মুক্তি এবং
বৈদান্তিকের চৌতালা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এপিট ওপিট তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে
আর সেই সঙ্গে এটাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের একজন তীব্র
প্রতিপক্ষ হইলেও বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রভাবসলিলে তাঁহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত চোবানো ছিল
পদ্মপুরাণের প্রণেতা ঠিকই বলিয়াছেন যে, "মায়াবাদং অসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ"

মায়াবাদ প্রকৃত শাস্ত্র নহে—তাহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র।

এই গেল বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত বেদান্তদর্শনের ঐক্য। তাহার পরে আসিতেছে বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত নিরীশ্বর কাপিল দর্শনের ঐক্য।

কাপিল সাংখ্য-দর্শন যে, প্রকৃত প্রস্তাবেই বৌদ্ধদর্শন, "তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার যদি প্রমাণ জিজ্ঞাসা করেন—তবে প্রণিধান করুন্।

দর্শন = আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। আন্বীক্ষিকী শব্দ অন্বীক্ষণ শব্দ হইতে আসিয়াছে। অন্বীক্ষণ = অনু + ঈক্ষণ = অনু + দর্শন। তবেই হইতেছে যে দর্শন = অনুদর্শন। কিসের অনুদর্শন? ধর্ম্মশাস্ত্রের মতামত সমালোচনা করিয়া তাহার মধ্য হইতে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানিয়া বাহির করিবার জন্যই দর্শন-শাস্ত্র হইয়াছে ; অতএব, দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অনুদর্শন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কাপিল সাংখ্য-দর্শন কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুদর্শন? কাপিল সাংখ্যদর্শন কি, বেদোপনিষদ্ শাস্ত্রের অনুদর্শন? বেদোপনিষদ্ তো কাপিল সাংখ্যের ন্যায় নিরীশ্বর নহে। সাংখ্য-দর্শনকার বলেন যে, ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই মুক্তি ; কিন্তু বেদোপনিষদের মতে দুঃখ নিবৃত্তির নামই মুক্তি ; কিন্তু বেদোপনিষদের মতে দুঃখ নিবৃত্তি অতি তুচ্ছ কথা — বেদোপনিষদের মতে ব্রহ্মের সহিত প্রগাঢ় সম্মিলন জনিত অনুপম আনন্দ উপভোগই মুক্তির বিশিষ্ট লক্ষণ। সাংখ্য দর্শনের আদি-অন্তের ঐ দুটি মুখ্য কথা বেদোপনিষদ্ শাস্ত্রের সহিত যেমন মেলে না—বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত তেমনি সর্ব্বাংশে মেলে ; তার সাক্ষী প্রথমতঃ মূল বৌদ্ধশাস্ত্র এবং কাপিল সাংখ্য দুই নিরীশ্বর ; দ্বিতীয়তঃ দুয়েরই মতে ঐকান্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। ফলে, "ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি" এই কথাটার গায়ে লেখা রহিয়াছে যে, বৌদ্ধশাস্ত্রই উহার মূল আকর ; কেন না, বৌদ্ধ শাস্ত্রের গোড়ার কথা জীবের ক্লেশ, মাঝের কথা—ক্লেশের মূলোচ্ছেদ যেরূপে হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ এবং উপায় চেষ্টা; শেষের কথা—ক্লেশের ঐকান্তিক নিবৃত্তি। এই তিনটি মূল কথা এবং তাহার বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা ভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রের মুখে আর কোনও কথা নাই। অতএব এটা যখন স্থির যে, দর্শনশাস্ত্রের আর এক নাম আন্বীক্ষিকীবিদ্যা — দর্শনশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অনুদর্শন, তখন সেই সঙ্গে এটাও সুনিশ্চিত যে, কাপিল সাংখ্যদর্শন বৌদ্ধশাস্ত্রেরই অনুদর্শন। অতঃপর বৌদ্ধশাস্ত্রের সহিত সেশ্বর পাতঞ্জল সাংখ্যের কিরূপ ঐক্য তাহা দেখা যা'ক।

কাপিল সাংখ্য এবং পাতঞ্জল সাংখ্য দুয়ের মাধ্যে আর আর সমস্ত বিষয়েই পুঙ্খানুপুঙ্খ মতের মিল আছে— কেবল একটি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় ; সেটি হ'চ্ছে এই যে, কাপিল সাংখ্য নিরীশ্বর, পাতঞ্জল সাংখ্য সেশ্বর। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে একপ্রকার গোঁজা-মিলন-দেওয়া-ভাবে ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে ; এরূপ ভাবে অবতারণা করা হইয়াছে— যেন তাহা পাঁচ-আঙুলের পার্শ্ববর্ত্তী ষষ্ঠ আঙ্গুল ; তাহা ছাঁটিয়া ফেলিলে পাতঞ্জল শাস্ত্রের অঙ্গ -হানি হওয়া দূরে থাকুক্ — বরং আরও অঙ্গ সৌষম্য হয়। পতঞ্জলি ঋষি মন স্থির করিবার আর আর নানা উপায় প্রদর্শন করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন যে, আর একটি উপায় হ'চ্চে ঈশ্বর-প্রণিধান ; অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান ব্যতিরেকেও সাধকেরা উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া যোগে সিদ্ধি-লাভ করিতে পারে না এমন নহে, তবে কিনা— ঈশ্বর-প্রণিধানও সিদ্ধিলাভের আর আর উপায়ের মধ্যে একটি বিশিষ্টরূপ ফলদায়ক উপায়। পতঞ্জলি ঋষি ঈশ্বরের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার গোড়া'র কথাটির গায়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের স্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে:

পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্রে ঈশ্বর-নির্ণায়ক প্রথম সূত্রের গোড়াতেই রহিয়াছে "ক্লেশ"। সে প্রথম সূত্র এই :—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বর!" ক্লেশ হইতে এবং কর্ম্মফল-পরিণতির আধার যে, বাসনা, সেই বাসনা হইতে, নির্লিপ্ত পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর। আদি বুদ্ধের লক্ষণের সঙ্গে ঈশ্বরের এই লক্ষণটির দিব্য মিল রহিয়াছে। বুদ্ধদেব আর পাঁচজন পুরুষের মধ্যে একজন পুরুষ ; কিন্তু তিনি তোমার আমার মতো যে-সে পুরুষ নহে—তিনি মহাপুরুষ। তা বলিয়া, মনুষ্য-বুদ্ধ ঈশ্বর নহেন ; কেন না মনুষ্য-বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে; মনুষ্য বুদ্ধ ক্লেশ এবং বাসনায় জড়িত। আদি বুদ্ধই নিত্য বুদ্ধ—তিনি ক্লেশ এবং বাসনা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ-বিশেষ—তিনিই ঈশ্বর। তাহার পরসূত্রে পতঞ্জলি ঋষি বলিতেছেন "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং" ঈশ্বরেতে সর্ব্বজ্ঞরূপ বীজ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ নিরতিশয় অর্থাৎ পরাকাষ্ঠা বিকাশপ্রাপ্ত। বুদ্ধদেবেও সর্ব্বজ্ঞত্বের বীজ পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পর-সূত্রে পতঞ্জলি ঋষি বলিতেছেন যে, "স এস পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ" তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন।" এই যে একটি কথা পতঞ্জলি ঋষি বলিয়াছেন—যে "ঈশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু যেহেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন" এই কথাটির ভিতরে একটি নিগূঢ় ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লুক্কায়িত আছে, তাহা এই :— পতঞ্জলি ঋষির জীবিতকালেই হউক, অথবা তাহার এক আধ শতাব্দী পূর্ব্বেই হউক, বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বর বোধে আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল ; পতঞ্জলি ঋষি তাই তাঁহার শিষ্যদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, মনুষ্য বুদ্ধ ঈশ্বর নহেন—যেহেতু তিনি কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যেহেতু তিনি জন্মিয়াছেন মরিয়াছেন। কে তবে ঈশ্বর? না যিনি বুদ্ধেরও গুরু, শুধু তা নয়—বুদ্ধের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যদিগেরও গুরু—যিনি কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন—তিনিই ঈশ্বর ; আদি বুদ্ধই ঈশ্বর। অতএব নেপাল এবং তিব্বত-প্রদেশীয় বৌদ্ধেরা আদিবুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছে এটা যখন স্থির , আর এটাও যখন স্থির যে, যোগশাস্ত্রের প্রদর্শিত আদি গুরু মহেশ্বরের লক্ষণের গাত্রে আদি বুদ্ধের লক্ষণের পরিষ্কার ছাপ পড়িয়াছে, বৌদ্ধ শাস্ত্রের সহিত তখন যোগশাস্ত্রের যে, এক সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাবে গতিকে বুঝিতে পারা যাইতেছে। ফলে, সাংখ্যদর্শন বৌদ্ধ দর্শনেরই নামান্তর। বৌদ্ধ-শাস্ত্র যেমন প্রথমে নিরীশ্বর ছিল—তাহার পরে আদি বুদ্ধকে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া সেশ্বর হইয়াছিল, সাংখ্য দর্শনও তেমনি প্রথমে নিরীশ্বর (যেমন কাপিল সাংখ্য) তাহার পরে সর্ব্বজীবের একজন আদি গুরু সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করিয়া সেশ্বর হইয়াছিল (যেমন পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র) কি আশ্চর্য্য। যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত মুখে আনিতে ভয় করিতেন, সেই বুদ্ধদেবের পন্থাবলম্বী সাধকেরা তাঁহাতেই ঈশ্বরের আরোপ করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র, বেদান্ত-দর্শন, এবং সাংখ্য-দর্শন এই তিন প্রবাহিনীর ত্রিবেণী-সঙ্গম কিরূপ তাহা আমরা দেখিলাম , এক্ষণে বৌদ্ধশাস্ত্রের যে প্রদেশ হইতে পুরাণাদি শাস্ত্র বিনির্গত হইয়াছে, সেখানকার নদীর মোহানাটা কিরূপ তাহা একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যাক।

বৌদ্ধধর্ম্ম বিশিষ্টরূপ সাধন-প্রধান ধর্ম্ম। সাধনের লক্ষ্য ভূতকালের দিকে নয় কিন্তু ভবিষ্যৎকালের দিকে ; সৃষ্টির দিকে নয় কিন্তু পরিত্রাণের দিকে—মৃত্যুকে জয় করিবার দিকে।

এইজন্য মৃত্যুঞ্জয় শিবই বৌদ্ধদিগের এবং যোগী তপস্বীদিগের আরাধ্য দেবতা। সাধন দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ নিবারণ করা—দুঃখ ক্লেশের ঐকান্তিক নিবৃত্তির পথ প্রস্তুত করা—বৌদ্ধশাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্র উভয়েরই চরম লক্ষ্য : তা ভিন্ন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং যোগী তপস্বীদিগের নিকট ভজনের তেমন আদর নাই। ভজনের মর্ম্ম এবং রস বৈষ্ণবেরা যেমন বুঝিয়াছেন এমন আর কেহই নহে।

ইউরোপ-বাসীরা যেমন তারের লাগাম দিয়া এবং বাষ্পের চাবুক দিয়া বাহিরের প্রকৃতি-অশ্বকে বশীভূত করিয়াছেন—যোগী তপস্বীরা তেমনি ধৈর্য্যের লাগাম দিয়া এবং শমদমের চাবুক দিয়া অন্তরের প্রকৃতি অশ্বকে বশীভূত করেন। এখন, কথা হ'চ্চে এই যে অশ্বকে বশীভূত করিলাম কিন্তু অশ্ব আরোহণ করিয়া গম্য স্থানে গেলাম না ; সাধন দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ নিবারণ করিলাম, কিন্তু ভজন দ্বারা পরমেশ্বরের বিমল প্রসাদবারিতে আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিলাম না ; তবে অশ্বকে বশীভূত করাই বা কি জন্য, চিত্তকে বশীভূত করাই বা কি জন্য? বুদ্ধদেব কিন্তু ভজনের প্রতি নিতান্তই মৌনভাব ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের ষোলো আনা দৃষ্টি ছিল সাধনের প্রতি নিবদ্ধ। রোগী ব্যক্তির চিকিৎসার সময় চিকিৎসক যেমন ঔষধ-পথ্যেরই ব্যবস্থা করে—মিঠাই সন্দেশের ব্যবস্থা করে না, বুদ্ধদেব তেমনি তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন—ভজনের কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, লোকের সুখস্বচ্ছন্দতার পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই তারের সংবাদ, রেলের গাড়ি, বাষ্পের আলোক, প্রভৃতি আয়াস-সাধ্য ব্যাপারের যোগাড়-যন্ত্র আবশ্যক; ভজনের পরম পরিশুদ্ধ আনন্দের পথ পরিষ্কার করিবার জন্যই সাধনের পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার আবশ্যক। পথ পরিষ্কার করিবার বিধেয়তা এবং তাহার প্রকৃষ্ট উপায় প্রদর্শন করিয়া বুদ্ধদেব তো ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন— কিন্তু যাত্রীজনেরা পথ পরিষ্কার করিয়া শুধু কেবল সেই পথে হাঁটাহাঁটি করিয়া জীবন অবসান করিতে পারে না! তাহারা গম্যস্থানে না হউক — অন্ততঃ মাঝপথের কোনো একটা পান্থশালায় পান ভোজন করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণার আবেগ প্রশমন করিতে ইচ্ছা করে। বুদ্ধদেবের তিরোধানে পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা আর কাহাকেও হাতের কাছে না পাইয়া বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে আরাধনা করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং যোগী তপস্বীরা সবেমাত্র ভজনের প্রথম পইঠাতে পদার্পণ করিয়া সেই খানেই থামিয়া দাঁড়াইলেন — তা বই, ভজনের ভিতর-মহলে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই জন্য যোগী তপস্বীদিগের ভজন সাধনেরই অঙ্গ—তাহা মনস্থির করিবার একতম উপায় ; তা বই, তাহা মুখ্য ভজন নহে। যোগী তপস্বীদিগের এবং বৌদ্ধদিগের উপাস্য দেবতাও বিশিষ্টরূপে সাধনের দেবতা—তিনি কি? না শূলপাণি মৃত্যুঞ্জয় অথবা যাহা একই কথা —বজ্রপাণি আদি বুদ্ধ।

দক্ষ যজ্ঞের আখ্যায়িকার প্রতি নিবিষ্ট মনে প্রণিধান করিলে রূপকের পর্দ্দার আড়ালে, বুদ্ধদেবের সহিত মহাদেবের কোলাকুলির একটি আবছায়া-রকমের চিত্র চিন্তার আলোকে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে ; কিরূপ তাহা দেখাইতেছি — প্রণিধান করুন্ :—

বহু প্রাচীন কালের যজ্ঞ ছিল ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আহ্বান করিয়া ছাগ মেষাদি এবং হবি দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা ; দেবতাদিগের প্রসাদান্ন সকলের সহিত বাঁটিয়া ভোজন করা : আর সেই সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত দানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা। একপ্রকার যজ্ঞ হ'চ্চে

প্রীতিভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করা ; ঈশ্বর-প্রেরিত সুখ সম্পদ যথা-পাত্রের সহিত যথা-পরিমাণে বাঁটিয়া ভোগ করা, আর সেই সঙ্গে জনসমাজের দুঃখ ক্লেশ এবং পাপ তাপ প্রশমন করিবার জন্য সকলে মিলিয়া জোগাড় যন্ত্র করিয়া তাহার সুনির্ব্বাহ-পক্ষে সাধ্যানুসারে সহায়তা করা। তখনকার যজ্ঞই হউক, আর এখনকার যজ্ঞই হউক, যজ্ঞের অর্থ আর কিছু না—ধর্ম্মের জন্য ন্যায্য-পরিমাণে স্বার্থ-ত্যাগ। দেশকাল পাত্র অনুসারে কিরূপ প্রণালীতে কোন্ প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিশিষ্টরূপ ফলদায়ক হয়, তাহার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে বিদ্যা আবশ্যক। সে বিদ্যার নাম সতী অর্থাৎ লোকহিতকারী সদ্‌বিদ্যা। যজ্ঞ মঙ্গলের ব্যাপার, সদ্‌বিদ্যা সত্যের ব্যাপার। যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞেশ্বর হ'চ্চেন শিব কিনা মঙ্গল ; সদ্‌বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হ'চ্চেন সতী কিনা সত্য-রূপিণী দেবী। অতএব শিবের সহিত সতীর বিবাহ আর কিছু না—মঙ্গলের সহিত সত্যের বিবাহ।

লোকে যখন নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, যখন ঈশ্বরকে মানিয়া প্রীতি ভক্তির সহিত তাঁহার উপাসনা করে, যখন আপনার সুখসম্পদ যথা-পাত্রের সহিত যথা-পরিমাণে বাঁটিয়া ভোগ করে, এবং যখন পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের দুঃখক্লেশ অপনোদন করিতে চেষ্টা করে, তখন সে এক কাল! তখন জন্ম মঙ্গল, বিবাহ মঙ্গল, মৃত্যু মঙ্গল, সবই মঙ্গল। পক্ষান্তরে যখন লোকে ঈশ্বরও বোঝে না, লোকহিতও বোঝে না, কেবল আত্মসুখই বোঝে , যখন বিশিষ্টরূপ সঙ্গতিপন্ন লোকেরা আপনার নাম, আপনার যশ, এবং আপনার ঐহিক পারত্রিক ইন্দ্রিয়-সুখের কামনায় মহা আড়ম্বরের সহিত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তখন জনসমাজ "দৌর্ভিক্ষাৎ যান্তি দৌর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্‌ভয়ং" দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে, পদ-নিক্ষেপ করে , তখন জন্মও অমঙ্গল, বিবাহও অমঙ্গল, সবই অমঙ্গল। কাজেই, জন সমাজের সেরূপ অবস্থায় বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতি মঙ্গল নহে—মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হরই তখন শিব কিনা মঙ্গল।

বুদ্ধদেব বোধ হয় শেষোক্ত প্রকার সামাজিক অবস্থার মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের সময়ে হয় তো বৈশ্যাদি শ্রেণীর লোকেরা খুবই কষ্টে দিনপাত করিত। ব্যাপক রকমের এবং বিশিষ্ট রকমের কোনো কারণ না থাকিলে বুদ্ধদেবের ন্যায় ধীর-প্রকৃতি সুবিচক্ষণ দয়ালু ব্যক্তির মনে ছোটোখাটো কারণে এত বড় একটা সুগভীর দুঃখের কাহিনী প্রবেশ পাইতে পারিত না যে, জীবের জন্ম কেবল ক্লেশেরই জন্য। বাস্তবিকই বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান মত হ'চ্চে এই যে, জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা ক্লেশেরই নামান্তর। তাহা যদি হয়— জন্ম যদি নিছক কেবল ক্লেশেরই ব্যাপার হয়, তবে জন্মের মৃত্যু হইলেই তো ভাল হয়! কিন্তু গুরু মহাশয় মরিলেও বালকের নিস্তার নাই—বাবা আর একটা গুরু মহাশয় আনিয়া যুটাইবে। এ জন্ম মরিলে কি হইবে? মনোমধ্যে যদি বিষয়ের কামনা থাকে—কাম থাকে— তবে সেই দুরন্ত কাম আর একটা জন্ম যুটাইয়া আনিবে। অতএব বিষয়-তৃষ্ণা বা কাম যতক্ষণ না মরিতেছে, ততক্ষণ রক্ষা নাই। ক্লেশের মূল জন্ম, জন্মের মূল কাম, তবেই হইতেছে যে, কামই ক্লেশের মূল উৎস। মঙ্গল তবে কে? শিব কে? যিনি কামকে ভস্ম করেন, তিনিই শিব। ফলে, মঙ্গল যদি ক্লেশের মূলোচ্ছেদ না করিবেন—শিব যদি কামকে ভস্ম না করিবেন—আর কে তাহা করিবে? এটা যেন বুঝিতে পারা গেল যে, কাম যখন ক্লেশের মূল, তখন শিব, যিনি মঙ্গল, তিনি কামকে ভস্ম করিতে বাধ্য, কিন্তু, যজ্ঞ তো আর অমঙ্গল নহে—যজ্ঞ বিশিষ্টরূপ মঙ্গল কার্য্য। শিবের নামই যজ্ঞেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর হইয়া তিনি যে যজ্ঞভঙ্গ করিলেন—এ'র অর্থ কি আমাকে বুঝাইয়া দেও! অর্থ

খুবই স্পষ্ট। শিব যে কারণে কামকে ভস্ম করিলেন, সেই কারণেই কাম-প্রধান যজ্ঞ ভঙ্গ করিলেন।

পূর্ব্বতন কালে বেদের সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রীতিপ্রধান ছিল। আদিম ঋষিরা দেবতাগণকে প্রিয় বন্ধুর ন্যায় অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন বলিয়াই সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া হোমাদি দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধনে যত্ন করিতেন ; এবং যখন মনে করিতেন যে, দেবতাদিগের যথেষ্ট তৃপ্তি সাধন হইয়াছে, তখন তাঁহাদের প্রসাদান্ন সকলের সহিত বাঁটিয়া ভোজন করিতেন। তাই বলিতেছি যে, আদিম ঋষিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ প্রীতিপ্রধান ছিল। তখন, দেবপ্রীতি এবং লোকপ্রীতি যজ্ঞের অন্তরের কথা ছিল। বুদ্ধদেবের সময় যজ্ঞ কামপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল , পুত্রকাম, ধনকাম, যশঃকাম প্রভৃতি নানাপ্রকার ফল-কামনায় দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাল-ক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠানের এইরূপ লক্ষ্য বিপর্য্যয় হওয়াতে শাস্ত্রকারেরা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিতে সাহসী হ'ন নাই; তার সাক্ষী—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম; তা বই, কোনো শাস্ত্রেই বলে না যে, যাগযজ্ঞাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এরূপ কামপ্রধান যজ্ঞ—সকাম যজ্ঞ—সদ্‌বিদ্যার অনুমোদিত হইতে পারে না; যেহেতু তাহা মঙ্গলের বিরোধী—শিবের বিরোধী। সকাম যজ্ঞে সদ্‌বিদ্যা অপমানিত হইয়া যজ্ঞস্থানের ত্রিসীমার সংস্রব পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পরে শিব, কিনা মঙ্গল, জাগ্রত হইয়া সতী বিসর্জ্জনের প্রতিফল প্রদান করেন—যজ্ঞভাঙ্গিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলেন।

দক্ষ শব্দের অর্থ নিপুণ। নিপুণতাই বিদ্যার মূল উৎস। আগে ভাষার সুবিহিত প্রয়োগে লোকের নিপুণতা জন্মে, তাহার পরে সেই নিপুণতা হইতে ব্যাকরণ-বিদ্যা আবির্ভূত হয়।। পাণিনীর ন্যায় একজন সুনিপুণ ভাষাবেত্তাই ব্যাকরণ-বিদ্যা আদি গুরু হইতে পারেন। আদিম পুরাকালে লোক-হিতকর নিষ্কাম যজ্ঞের নির্ব্বাহ-কার্য্যে যাহাদের বিশিষ্টরূপে নিপুণতা জন্মিয়াছিল, তাঁহাদের সেই নিপুণতা হইতে লোকহিতকর সদ্‌বিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল। তার সাক্ষী—ইহা একটি সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য যে, যজ্ঞাদির কাল নির্ণয়ের নৈপুণ্য হইতেই আমাদের দেশে জ্যোতিষ বিদ্যা আবিভূর্ত হইয়াছিল; যজ্ঞাদির বেদী নির্ম্মাণের নৈপুণ্য হইতেই জ্যামিতি বিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল; রোগ-প্রতীকারের নৈপুণ্য হইতেই চিকিৎসা-বিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল; দেবার্চ্চনার নৈপুণ্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূত হইয়াছিল। সদ্‌বিদ্যা নিপুণতারই কন্যা—সতী দক্ষেরই কন্যা। আমাদের এই প্রিয় ভারত-ভূমিতেই সদ্‌বিদ্যা আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আর, আমরাই তাঁহাকে আগে হারাইলাম। যে দোষে আমরা তাঁহাকে আগে হারাইলাম, সে দোষের জন্য আমাদের দেশ-কে-দেশ রাজ্য কে রাজ্য অধঃপাতে গিয়াছে এবং এখনো যাইতেছে, অথচ তাহার প্রতি আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে না; সে দোষ হ'চ্চে স্বার্থপরায়ণতা। আমি হাঁপানি রোগের একটা মাতব্বর ওষুধ জানি কিন্তু কাহাকেও আমি তাহা বলিব না; আবার, আমি কিছুই জানি না, অথচ যেন আমি সব জানি এইরূপ একটা ভড়ং করিয়া গাত্রে ভস্ম লেপন মাথায় জটাজূট ধারণ, এবং মুখে মৌন অবলম্বন, এই সকল মাকড়সার জালা বাঁধিয়া লোকালয়ের নিকটবর্ত্তী গাছ-তলায় বসিয়া ভনভনকারী জনমক্ষিকার সমাগম প্রতিক্ষা করিতেছি! ব্যাপার যেখানে এইরূপ, সেখানে কে বিদ্যা কে অবিদ্যা তাহা চিনিতে পারা সুকঠিন। আদিম যুগ নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোয় ভালোয় কাটিয়া গিয়া যখন মধ্যম যুগ উপস্থিত হইল, তখন পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা লোক-হিতকর নিষ্কাম যজ্ঞের নির্ব্বাহ-কার্য্যে বিশিষ্টরূপ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিরা অর্থের প্রয়াসী হইয়া রাজা-রাজড়াদিগকে নানা প্রকার লোভ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন—

যজ্ঞ করিলে পুত্র লাভ হইবে, রাজ্য-লাভ হইবে, স্বর্গ লাভ হইবে, এইরূপ করিয়া ক্রমাগত কাণে মন্ত্র দিতে আরম্ভ করিলেন। যে নৈপুণ্য আদিমযুগে মঙ্গলের পরম আত্মীয় ছিল, সেই নৈপুণ্য মধ্যম যুগে স্বার্থপরতার সঙ্গে হরিহরাত্মা হইয়া মঙ্গলের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিল—দক্ষ শিবের বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিলেন; শিব-নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইহাতে আর কত ভাল হইবে? সাত্ত্বিকা সতী স্বার্থপরতা-দূষিত লোকালয় হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়া নিঃস্বার্থ সরল-প্রকৃতি কিরাতাদি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে গিয়া পার্ব্বতী হইলেন; এবং কৈলাসের বুড়া শিবকে অর্থাৎ নেপালাদি পার্ব্বত্য প্রদেশের আদি-বন্ধুকে পতিত্বে বরণ করিয়া এবং তাহারপরে তাঁহাকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া, তাঁহার সহিত বিবাহ সূত্রে গ্রথিত হইলেন অর্থাৎ নেপালাদি পার্ব্বত্য-প্রদেশের বৌদ্ধ-বিদ্যা হইলেন।

সতীর তো এইরূপে জন্মান্তরে পতি-লাভ হইল;—এ দিকে শিবের অনুচরেরা—গণেরা—ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যজ্ঞভঙ্গে প্রবৃত্ত হইল। শিবের গণ বলিতে যদিচ ভূত প্রেত বুঝায়,কিন্তু গণ শব্দের মৌলিক অর্থ হ'চ্চে—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Mob অর্থাৎ Common people রাজা-রাজড়া'রা যখন মহা আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞ' অনুষ্ঠান করিতেন তখন তাঁহাদের হইত প্রভূত যশস্ফূর্ত্তি, ব্রাহ্মণদিগের হইত প্রভূত উদরপূর্ত্তি; গণেদের হইত অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালমূর্ত্তি। গণ-শব্দের তাত্ত্বিক অর্থ ভূত প্রেত,—তা তো হইবেই! যজ্ঞাদি কার্য্যের সাহায্যের জন্য গণেদের নিকট হইতে যখন প্রচুর পরিমাণে অর্থ শোষিত হইতে থাকে, তখন অন্নাভাবে তাহাদের মূর্ত্তি যেরূপ হয়, আর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা খেপিয়া উঠিলে তাহাদের কার্য্য যেরূপ হয়, তাহা দেখিলে তাহাদিগকে ভূত প্রেত না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? গণেদের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া বুদ্ধদেবের প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। আদিবুদ্ধ তাই গণেদের মা বাপ, আর গণেরাও তাঁহার ভক্ত অনুচর; তার সাক্ষী—চড়ক পূজার বুড়া শিব ( অর্থাৎ আদিবুদ্ধ ) হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের বিশিষ্টরূপ কুলদেবতা।

বুদ্ধদেব নিজে যদিচ শান্তিরই উপদেষ্টা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে যখন তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বন্যার জলের ন্যায় হু হু করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, তখন যে তাহা বিনা উপদ্রবে সহজে হইতে পারিয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। ইংরাজিতে যাহাকে বলে Mob তাহারা ভূত প্রেতের অধম; তাহারা একবার ক্ষেপিলে রক্ষা নাই ;—তখন তাহারা ক্ষিপ্ত হস্তীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া মাহুতকেও মানেনা, আরোহীকেও মানেনা; তখন তাহারা যাহা সম্মুখে পায় তাহাই পদতলে দলন করে। এই প্রকার ক্ষিপ্ত হস্তীগণের যূথপতি হচ্চেন গণপতি গজানন। তিনি আর কেহ ন'ন—Napoleon বা Cromwell। তাঁহার শুঁড়ের এক টোকায় বহুকালের পুরাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠাস্তম্ভ ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। গণদিগকে খেপাইয়া তুলিবার কর্ত্তা হ'চ্চেন বীরভদ্র—কিনা ভদ্রগোচের বীর। গণপতি Military বীর; বীরভদ্র Civil বীর। গণপতি Cormwell বীরভদ্র Hamden। ফলে, বুদ্ধদেবের তিরোধানের অনতিপরে গণেরা অর্থাৎ গুণ্ডারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কোনো বীরভদ্র কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া অনেকানেক যজ্ঞ বিনষ্ট না করিয়া তাহারা যে হাত পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প।

যজ্ঞের মধ্য হইতে যখন সতী অর্থাৎ সদ্বিদ্যা অন্তর্দ্ধান করিলেন তখন যজ্ঞের ভিতরে আর কোনো পদার্থ রহিল না; তখন যজ্ঞ ফল-কামনা-দূষিত কাম্য কর্ম্ম হইয়া উঠিল; কাজেই, তখন দক্ষের স্কন্ধে কামের বা বিষয় কামনার সাঙ্কেতিক চিহ্ন গজাইয়া উঠিল—ছাগমুণ্ড গজাইয়া উঠিল।

সাংখ্যদর্শন যেমন ছদ্মবেশী বৌদ্ধদর্শন, বুড়া শিবও তেমনই ছদ্মবেশী আদি-বুদ্ধ। আদি বুদ্ধের হস্তে বজ্র রহিয়াছে কিন্তু শিবের হস্তে বজ্র নাই;—বজ্র যেমন নাই— তেমনি ত্রিশূল রহিয়াছে। আদি বুদ্ধের গলায় পৈতা নাই, কিন্তু শিবের গলায় পৈতা রহিয়াছে। ইহারই নাম ছদ্মবেশ। ব্রহ্মার গলায় বরং পৈতা দিলে শোভা পায়, কেন না ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদের এবং ব্রহ্মণ্য-দেবের মূল উৎস; কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণোচিত শুদ্ধাচারের কোন ধারই ধারেন না, যাঁহার কণ্ঠে ঝুলাইয়া দিবার জন্য সর্পের অভাব নাই, তাঁহার গলায় যে, পৈতা ঝুলাইয়া দেওয়া হইল; ব্রহ্মার গলায় না, বিষ্ণুর গলায় না—বাছিয়া বাছিয়া শিবের গলায় যে পৈতা ঝুলাইয়া দেওয়া হইল, এ রহস্যটির ভিতরে অবশ্যই কোনো দুরভিসন্ধি আছে। দুইটি দুরভিসন্ধি আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। প্রথম দুরভিসন্ধি এই যে, যিনি বৌদ্ধদিগের বজ্রপাণি আদিবুদ্ধ, তিনিই যে, ব্রাহ্মণদিগের উপাস্য দেবতা শূলপাণি মহাদেব, এটা যেন কেহ জানিতে না পাবে। আর কিছু না—খ্রীষ্টান পাদ্রী যেমন দীক্ষিত ব্যক্তির মাথায় জল ছিটাইয়া দিয়া তাহাকে দলে টানিয়া ল'ন, সেইরূপ ব্রাহ্মণেরা আদি বুদ্ধের গলায় একটা যজ্ঞোপবীতের ফাঁস নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আপনাদের দলে টানিয়া লইলেন। দ্বিতীয় দুরভিসন্ধি এই যে, ব্রহ্মাকে কমাইয়া শিবকে বাড়াইতে হইবে। ব্রহ্মাই চারি বেদের এবং ব্রহ্মণ্যদেবের আদিম প্রতিষ্ঠাতা, অথচ তাঁহারা গলায় পৈতা না দিয়া শিবের গলায় পৈতা দেওয়াতে, ভাবে গতিকে ব্রহ্মাকে পদচ্যুত করিয়া শিবকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হইল। শিব তো মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেনই, কিন্তু তাহা ছাড়া তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়, অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়া নতুন জীবন আনিয়া দিবার কর্তা—এই বৃত্তান্তটি তাঁহার ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে লেখা রহিয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্র এক প্রকার শাঁকের করাত, তাহাতে জন্মও, বুঝায়, মৃত্যুও বুঝায়, সৃষ্টিও বুঝায়, প্রলয়ও বুঝায়, ক্ষয়ও বুঝায়, বৃদ্ধিও বুঝায়। কেন না, কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধচন্দ্র যেমন কলাক্ষয়ের পরিজ্ঞাপক, শুক্ল পক্ষের অর্দ্ধচন্দ্র তেমনি কলা বৃদ্ধির পরিজ্ঞাপক। প্রকৃত কথা এই যে, জন্ম এবং মৃত্যু একেরই এ-পিঠ ও-পিঠ। মৃত্যু-শয্যাশায়ী ব্যক্তির আত্মা যখন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া পরলোকে উত্থান করে, তখন তাহাও এক প্রকার জন্ম। এটা যখন সুনিশ্চিত যে, ঐহিক মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পারত্রিক জন্ম লাগিয়া আছে, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, যিনি মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনিই জন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মৃত্যুঞ্জয় শিব জন্ম এবং মৃত্যু দুয়েরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কাজেই শিবের ভিতরে ব্রহ্মা প্রকারান্তরে সম্বদ্ধ রহিয়াছেন। শিব ব্রহ্মাকে এইরূপ গিলিয়া বসা'তে পুরাণাদিতে ব্রহ্মার পূজার জন্য কোনো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নাই। গৃহস্থের বধূ পুত্র কামনা করিয়া শিব পূজা করে—ব্রহ্মা পূজা করে না; ব্রহ্মাই প্রজাপতি অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির প্রবাহ কর্ত্তা। ফলে, শিবের সাঙ্কেতিক স্রষ্টা-মূর্ত্তি তাঁহার ললাটের ক্ষয় বৃদ্ধিশীল অর্দ্ধচন্দ্র, এবং তাঁহার কণ্ঠের প্রলয়-মূর্ত্তি নাগোপবীত, উভয়ে মিলিয়া এই সংবাদটি জগতে ঘোষণা করিতেছে যে, এখন হইতে প্রলয়কার্য্য এবং সৃষ্টিকার্য্য দুইই শিব একাকী নির্ব্বাহ করিবেন—ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইল। কিন্তু ব্রহ্মা চারিমুখ দিয়া চারি বেদ উৎসারণ করিয়াছেন; —শিবেরও তো সেইরূপ একটা কিছু করা চাই; তা তিনি করিতে ত্রুটি করেন নাই। ব্রহ্মা যেমন বেদের আদি গুরু শিব তেমনি তন্ত্রের আদি গুরু।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখে আমি শুনিয়াছি যে, তিনি নেপালে অবস্থিতি কালে পুরাতন পুঁথি অন্বেষণ করিতে করিতে কয়েকখানি বৌদ্ধ তন্ত্রের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সকল বৌদ্ধতন্ত্রের সহিত শিবোক্ত তন্ত্রের ভিন্ন প্রভেদ দেখিলেন কেবল

এই যে, শেষোক্ত তন্ত্রের যেস্থানে "শিব বলিতেছেন" বলিয়া কথা আরম্ভ করা হইয়া থাকে, বৌদ্ধতন্ত্রের সেই স্থানে শিবের পরিবর্তে বুদ্ধের নাম লিখিত রহিয়াছে। অবেই হইতেছে যে, শিবের তত্ত্বও যা, বুদ্ধের তত্ত্বও তাই—একেবারেই এপিঠ ওপিঠ। তা ছাড়া, বৌদ্ধশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক আঁক-জোঁকের সহিত তন্ত্র-শাস্ত্রের সাঙ্কেতিক আঁক-জোঁকের এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ মিল রহিয়াছে যে, দুইকে পরস্পরের সহিত জোড়া দিয়া মিলাইয়া দেখিলে দুয়ের অভিন্নতা বিষয়ে কাহারো মনে তিলমাত্রও সংশয় থাকিতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে কেমন করিয়া কি সূত্রে বিকট এবং বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিতে পারিল—ইতিহাস সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনো কথা বলে না; না বলুক—আমরা যুক্তির সাহায্যে ভাবিয়া দেখিলে তৎসম্বন্ধীয় প্রকৃত বিবরণের কতকটা আভাস পাইতে পারি। এ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রদর্শন করিতেছি, প্রণিধান করুন;—

বৌদ্ধধর্ম্ম ভজনের প্রতি একেবারেই পরাঙ্মুখ— বৌদ্ধধর্ম্ম চা'ন সাধন। বৌদ্ধধর্মের উপদেশ এই যে, আত্মপ্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অন্তঃকরণকে দ্বেষহিংসা কাম-ক্রোধ ভয় লোভ মদ মাৎসর্য্য হইতে বিনির্ম্মুক্ত কর—তাহা হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। কিন্তু আন্তরিক রিপুগণের উপরে প্রকৃষ্টরূপে জয় লাভ করিতে হইলে তাহাদিগকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করা চাই। কালিদাস বলিয়াছেন "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি তএব ধীরাঃ" বিকারের হেতু উপস্থিত থাকিলেও যাঁহাদের মন বিচলিত না হয় তাঁহারাই ধীর। এইরূপ বিবেচনায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপ সিদ্ধি-কামী ছিলেন তাঁহারা বিকারের হেতু সম্মুখে আনয়ন করিয়া—কামের উত্তেজক সুন্দরী স্ত্রী, লোভের উত্তেজক মদ মাংস, দ্বেষের উত্তেজক মৃত দেহ এবং কঙ্কালাদি, ভয়ের উত্তেজক নিশীথের শ্মশান, এই সকল উপদ্রব ইচ্ছা পূর্ব্বক যাচিয়া আনিয়া—মনের উপরে আত্যন্তিক জয়লাভের অভিপ্রায়ে রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এটা তাঁহারা বুঝিলেন না যে, কেবল মাত্র আত্মপ্রভাবের কঠোরতার ভর করিয়া একপে রিপুজয় করিতে যাওয়াই ভুল। পর্ব্বতে আরোহণ করিব অথচ এক পায়ে চলিব—ইহা হইতে পারে না! দুই পায়ে চলা চাই। ঈশ্বরারাধনা দ্বারা চিত্তের ভাবগতি এবং লক্ষ্য উপরের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া চাই, আর সেই সঙ্গে আত্মপ্রভাব-রূপী প্রহরীকে দিয়া নিচের প্রবৃত্তি সকল প্রতিরোধ করা চাই; এই দুই উপায় এক সঙ্গে অবলম্বন করিয়া সাধুসেবিত পথে বিনীত ভাবে চলিতে থাকিলে তবেই রিপুগণের উপরে সাধকের ক্রমে ক্রমে বশীকার জন্মিতে পারে। অতএব শুধু কেবল আত্মপ্রভাবের কঠোরতা বলে সম্মুখ যুদ্ধে রিপুজয় করিতে গিয়া সাধক যে, পরাভূত হইবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঘটিলও তাই। বৌদ্ধগণের মধ্যে দুই চারি জন সেয়ানা লোক রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা রণে পরাজিত হইয়া রিপুগণের এরূপ পদানত দাস হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহারা আর সাধু-সজ্জনের সহবাসের উপযুক্ত রহিলেন না; কাজেই তখন তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক ভ্রাতারা তাঁহাদিগকে দল হইতে বাহির করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে যখন তাঁহারা বহিষ্কৃত হইলেন, তখন তাঁহারা বহিষ্কর্ত্তাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আপনাদের মধ্যে গোপনে নূতনতর এক প্রকার সাধন প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, এবং তাহার নাম দিলেন—তন্ত্র। তন্ত্র আর কিছুই না—যথেচ্ছাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জ্জনের প্রণালী। যাঁহারা এইরূপ স্বল্প মূল্যে তপঃসিদ্ধি উপার্জ্জন করিবার নূতন ফন্দী বাহির করিলেন, তাঁহারা আপনাদের দুর্ব্বলতার দায় কলিকালের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলিতে

লাগিলেন যে, "সত্য-যুগের ঋষি তপস্বীরা শমদমাদি কঠোর তপঃসাধন দ্বারা রিপুজয় করিতেন বলিয়া তাঁহাদের দেখা-দেখি কলিকালে যাঁহারা সেইরূপ করিতে যা'ন—পরাজয় এবং পতন তাঁহাদের ললাটে লেখা রহিয়াছে; আর, তাহা না করিয়া যাঁহারা রিপুগণের সম্মুখ হইতে ভয়ে পলাইয়া গিয়া নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেও, তাঁহারা অধম কাপুরুষ—তাঁহারা পশ্বাচারী! আমরা বীরাচারী! আমরা প্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়া রিপুদমন করিব! আমরা সমস্ত কামনার বিষয়—পঞ্চ মকার—অতিমাত্র উপভোগ করিয়া তাহাদের প্রতি মনের বিতৃষ্ণা জন্মাইব; তাহা হইলে রিপুগণ আপনাআপনি পরাভূত হইয়া যাইবে!" দিব্য সহজ উপায়! এটা বুঝিলেন না যে, 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন সাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এ বাভিবর্দ্ধতে।।" কামনা সকল কদাপি উপভোগ-দ্বারা নিবৃত্তি মানে না, প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত বহ্নির ন্যায় ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাঁহারা করিলেন যে এক অদ্ভুত কীর্ত্তি তাহা আর বলিবার নহে! তাঁহারা মোহকে রীতিমত পূজার্চ্চনা করিয়া ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে করিলেন— নৌকার মাঝি; আর, দুর্ব্বুদ্ধির দলবল যুটাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে করিলেন নৌকার দাঁড়ি ; আর, মনে করিলেন যে, "মাঝি পাইয়াছি, দাঁড়ি পাইয়াছি, তবে আর ভাবনা কি? এক্ষণে আমরা সংসার-পারাবার হেলায় তরিয়া যাইব!" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা প্রবৃত্তির প্রবল স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দিলেন; আর, ফলও পাইলেন তেমনি! কিয়ং পথ অগ্রসর হইতে না হইতেই তাঁহারা ভৈরবী চক্রের পৈশাচিক আবর্ত্তে নৌকা ডুবি করিয়া পাতাল যে কতদূর তাহার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিলেন।

এই সকল ব্যাপারের আদি অন্ত মধ্য ঠাহরিয়া দেখিয়া আমরা তিনটি নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সে তিনটি সিদ্ধান্ত এই :—

(১) তন্ত্র শাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের একটা ভ্রষ্ট উপশাখা।

(২) বহিষ্কৃত বৌদ্ধ তপস্বীরা বহিষ্কর্ত্তাদিগের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তন্ত্র-শাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহার কিয়ং পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিপক্ষ দল যখন ঐ পতিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে ক্রোড় পাতিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন সেই পতিকে তন্ত্রশাস্ত্র পুরাণাদির ন্যায় ব্রাহ্মণাশাস্ত্রের একটা অঙ্গের মধ্যে পরিণত হইল।

(৩) কালী দুর্গা প্রভৃতি তন্ত্রের উপাস্য দেবতা সাংখ্যের মতানুযায়ী নিরীশ্বরা প্রকৃতির রূপক রচনা। সেশ্বরা না বলিয়া নিরীশ্বরা প্রকৃতি বলিতেছি কেন—তাহার কারণ আছে;— তাহার কারণ চারিটি : —

প্রথম কারণ এই যে, ভগবতী মহাদেবের সহিত কন্দল করিয়া বাহির হইয়া গিয়া নানা মূর্ত্তিতে নানা স্থানের লোকেদের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অতএব পূজা-গ্রহণের সময় তিনি মহেশ্বর হইতে পৃথক্‌ভূতা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কালীঘাট প্রভৃতি পীঠস্থানে লোকে যাঁহারা প্রতিমা পূজা করে তিনি দেবীর মৃত শরীরের খণ্ডাংশ। তবেই হইতেছে যে, তিনি আত্মা হইতে পৃথক্‌ভূতা মৃতা প্রকৃতি বা জড়-প্রকৃতি। তৃতীয় কারণ এই যে, বিষ্ণুর উপাসক এবং লক্ষ্মীর উপাসক বলিয়া দুই পৃথক্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আমাদের দেশে নাই ; কিন্তু শিবের উপাসক শৈব, এবং শক্তির উপাসক শাক্ত এই দুই সম্প্রদায় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। শিব এবং শক্তি, এই দুই উপাস্য দেবতা যদি পরস্পর হইতে পৃথক্ না হইতেন, তবে শৈব এবং শাক্ত এই দুই উপাসক সম্প্রদায় পরস্পর হইতে পৃথক্ হইতে পারিত না। চতুর্থ কারণ এই যে, শিব প্রকৃতির স্বামী, সুতরাং প্রকৃতি শিবের আজ্ঞাধীনা,

এই জন্য যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া প্রকৃতিকে বশে আনিতে ইচ্ছা করেন—শিব বিশিষ্টরূপে তাঁহাদেরই ইষ্টদেবতা; মৃত্যুঞ্জয় শিব সংযমী উদাসীনদিগেরই ইষ্টদেবতা। কিন্তু তান্ত্রিকেরা সংযমের প্রতি নিতান্তই পরাঙ্মুখ—তাঁহারা যথেচ্ছাচার-ব্রতেই দীক্ষিত। তাঁহারা প্রকৃতি বশীভূত করিতে প্রয়াস পা'ন না—তাঁহারা প্রকৃতির সেবাতেই অহোরাত্র নিযুক্ত থাকেন। এইজন্য শাক্তদিগের উপাস্য দেবতা যিনি শব-শিবের বক্ষের উপরে নৃত্য করেন তিনি শিবাশিব জ্ঞান-শূন্যা প্রকৃতি—তিনি নিরীশ্বরা প্রকৃতি, ইহাতে আর ভুল নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, শাক্তধর্ম্ম এবং শৈবধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের এক প্রকার রাজসিক তামসিক অপভ্রংশ। তার সাক্ষী—

(১) বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঈশ্বরবিহীন জগৎ (২) সাংখ্যদর্শনের ঈশ্বরহীনা প্রকৃতি (৩) শাক্তধর্ম্মের দিগ্বসনা শূন্য কালী, এ তিনটিকে বাম পার্শ্বে রাখা হো'ক; আর, (১) বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ (২) বেদান্তদর্শনের তুরীয় অবস্থাপন্ন পুরুষ (৩) শৈবধর্ম্মের উদাসীন ভোলা মহেশ্বর, এ তিনটিকে পার্শ্বে রাখা হো'ক্। এখন,—বাম পার্শ্বের তিনটিকেই দেখি, আর, দক্ষিণ পার্শ্বের তিনটিকেই দেখি, যে পার্শ্বের তিনটিকেই দেখি না কেন, দেখিলেই মনে হয়—যেন উহা একই শ্লোকের তিনটি ঈষৎ বিভিন্ন পাঠান্তর, অথবা একই আদর্শ লিপির তিনটি ঈষৎ বিভিন্ন প্রতিলিপি। তা ছাড়া— এটা যদি সত্য হয় যে, দর্শন, পুরাণ উপপুরাণ এবং তন্ত্র বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তি-কালের সৃষ্টি, তাহা হইলে অগত্যা এইরূপ দাঁড়ায় যে, তিনের প্রথমটিই (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের বচনটিই) মূল শ্লোকের অথবা আদর্শ-লিপির পদবীতে অধিকার পাইতে পারে; অপর দুইটি তাহার পাঠান্তর অথবা প্রতিলিপি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

শৈবধর্ম্ম এবং শাক্তধর্ম্ম পরস্পরের সহোদর ভ্রাতা; অথচ দুই ভ্রাতার স্বভাব-চরিত্র এত বিভিন্ন এত বিভিন্ন যে, দোঁহার মধ্যে পৃথিবীর এ মুড়া ও মুড়া ব্যবধান। তার সাক্ষী—

কালী মায়ের প্রিয় পানীয় হ'চ্চে সুরা; মহাদেবের প্রিয় পানীয় হ'চ্চে ভাঙ। কালী মা রণোন্মত্তা এবং তাঁহার চক্ষু জবা-ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ; মহাদেব বোম্‌ভোলা এবং তাঁহার চক্ষু ঢুল ঢুল। শাক্তধর্ম্ম উন্মত্ততাপ্রিয়, শৈবধর্ম্ম নিশ্চেষ্টতাপ্রিয়। শাক্তধর্ম্ম রজোগুণ প্রধান, শৈবধর্ম্ম তমোগুণ প্রধান।

পক্ষান্তরে, বৈষ্ণবধর্ম্ম শাক্তধর্ম্মের ন্যায় রজোগুণ প্রধানও নহে, শৈবধর্মের ন্যায় তমোগুণ-প্রধানও নহে, —বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশিষ্টরূপে সত্ত্বগুণ প্রধান। বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ম্মলতম সাত্ত্বিক অংশ—অহিংসা দয়া প্রেম ভক্তি শুদ্ধাচার বিনয় নম্রতা—সমুদয়ই বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সবই ভাল—কেবল একটি দোষ; সেটি হ'চ্চে ভক্তি হইতে জ্ঞানের বহিষ্করণ। জ্ঞানবর্জ্জিত ভক্তির আরেক নাম অন্ধভক্তি। তাহাকে অন্ধ ভক্তি না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে, যাহার চক্ষে বেদোপনিষদের শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হরি, বৃন্দাবনের শ্যাম হরি এবং নবদ্বীপের গৌর হরি, একই অভিন্ন পুরুষ!

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের এ দিকে যেমন ঐক্য দেখিতে পাওয়া গেল, আর এক দিকে তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত-পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম, সাধনেরই ধর্ম্ম; তাহাতে ভজনের কোনো প্রকার বিধি ব্যবস্থা নাই। পরবর্ত্তী বৌদ্ধেরা যখন সাধন এবং ভজন দুয়ের মাঝামাঝি একটা ধাপে পৌঁছিলেন, তখন তাঁহারা বুদ্ধকেই সাধনের দেবতা করিয়া— আদি বুদ্ধ করিয়া—গড়িয়া লইলেন; আর, যোগী-তপস্বীরা তাঁহাকেই শিব করিয়া গড়িয়া লইলেন। বৈষ্ণবেরা ভজনের দেবতা চাহিলেন;— বৌদ্ধশাস্ত্র তাহা তাঁহাদিগকে দিতে পারিল না। বৈষ্ণবেরা দেখিলেন যে, বৌদ্ধেরা আদি বুদ্ধকে বজ্রধর নাম দিয়া ইন্দ্রের সিংহাসনে

বসাইয়াছে; ইহা দেখিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে উপেন্দ্র নাম দিয়া ইন্দ্র অপেক্ষাও বড় দেবতা করিয়া গড়িয়া লইলেন। বিষ্ণুর যতগুলি অবতার কল্পিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বপ্রধান—বিশেষতঃ আমাদের এই বঙ্গদেশে। অবতারবাদের গোড়ার কথা আমার বুদ্ধিতে যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় তাহা এই;—

বুদ্ধদেবের তিরোধানের কিয়ৎ শতাব্দী পরে যখন বৌদ্ধেরা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণকে বিদূরিত করিয়া ইন্দ্রের পরিত্যক্ত সিংহাসন বজ্রধর আদি বুদ্ধকে দিয়া অধিকার করাইল, তখন ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন "সর্ব্বনাশ! এইরূপ করিয়া যদি বৌদ্ধেরা নিজ সম্প্রদায়ের অবতারগণকে দিয়া ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতাগণের পরিত্যক্ত সিংহাসন দখল করাইয়া লইতে থাকে, তাহা হইলে যাগ যজ্ঞের একটু আধটু গলি ঘুচি ফাঁক যাহা এখনো পর্য্যন্ত টেঁকিয়া আছে, তাহাও জন্মের মত অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে।" এই সময়ে তাই পুরাবৃত্ত এবং জনশ্রুতির বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যে বুদ্ধের যশোভানুকে রাহুগ্রস্ত করিতে পারে এরূপ অসামান্য প্রভাবশালী মহাপুরুষদিগের খোঁজ পড়িল। ব্রাহ্মণেরা ইংরাজি প্রবাদানুযায়ী এক বাণে দুই পক্ষী বিদ্ধ করিতে কৃত সংকল্প হইলেন; সে দুই পক্ষী হ'চ্চে (১) দ্যুদেবগণেরপরিত্যক্ত সিংহাসনে অবতার প্রতিষ্ঠা এবং (২) ভূদেবগণের পূর্ব্বতন মহিমার মৃত শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এইরূপ এক উদ্যমে দুই কার্য্য সমাধা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা খুব একটি পাকা চাল চালিলেন। করিলেন কী? না পূর্ব্বতন কালে যে তিন অসাধারণ যশস্বী পুরুষ ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিষ্ঠা-স্তম্ভ ছিলেন—বাছিয়া বাছিয়া সেই তিন মহাপুরুষকেই অবতারের পদবীতে সমুত্থাপিত করিলেন। সে তিন মহাপুরুষ আর কেহ ন'ন—ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতা পরশুরাম, ব্রাহ্মণাধিপত্যের মুখোজ্জ্বলকর্ত্তা রাক্ষস নিধনকারী রামচন্দ্র এবং ব্রাহ্মণাধিপত্যের মুখোজ্জ্বলহে কর্ত্তা ভৃগুপদ চিহ্নধারী শ্রীকৃষ্ণ। আর, ঐ তিন মনুষ্যাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবকাল আলোচ্যমান সময়ের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বলিয়া সেই সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রভাবমাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রমে লোকের মন অধিকার করিয়া আসিতেছে।

পুরাণের মতানুসারে মহাদেবের মাথা হইতে যেমন ভাগীরথী উথলিয়া উঠিতেছে, তেমনি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধদিগের মাথা হইতে অবতারবাদ সর্ব্বপ্রথমে উথলিয়া উঠিয়াছিল; আর ভগীরথ যেমন ভাগীরথীকে তাঁহার গন্তব্য পথ হইতে ফিরাইয়া আপনার অভিপ্রেত পথে চালাইয়া দিলেন, পুরাণকর্ত্তারা তেমনি অবতার-বাদের প্রবাহ বৌদ্ধধর্ম্মের পথ হইতে ফিরাইয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের রাজ্যাভ্যন্তরে চালাইয়া দিলেন। রামচন্দ্র শৌর্য্যবীর্য্য পিতৃভক্তি ঋষিভক্তি এবং সত্য-পরায়ণতার অদ্বিতীয় আদর্শ ছিলেন, আর, শ্রীকৃষ্ণ লোকহিতৈষিতা, বন্ধু প্রীতি, বুদ্ধিচাতুর্য্য, এবং নীতি কৌশলের অদ্বিতীয় আদর্শ ছিলেন—ইহাই রামায়ণ মহাভারতের মুখ্য মন্তব্য কথা; তা বই, তাঁহারা যে ঈশ্বরের অবতার ছিলেন—রামায়ণ মহাভারতের মুখ্য অবয়বের মধ্যে তাহার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ কোনো স্থানেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তবে, ভূমিকায় এবং আশপাশের দুটি একটি আখ্যায়িকাতে, আর, ধান ভানিতে শিবের গীত রকমের গোটাকত খাপছাড়া শ্লোকে, অবতার-বাদের ছিটা ফোঁটা একটু আধটু যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রক্ষিপ্তের কোঠায় স্থান পাইবার যোগ্য। দেখিতে দেখিতে পুঁথি বাড়িয়া উঠিল মন্দ না! ইহার উপরে ইতিহাস চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া আর অধিক পুঁথি বাড়ানো আমি কিছুতেই শ্রেয় বিবেচনা করি না—নহিলে আমি দেখাইতে পারিতাম যে, রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে বিশিষ্টরূপ অবতার করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা পরবর্ত্তী কালের উপপুরাণ-কর্ত্তাদিগের বৌদ্ধ-দমনে আগ্রহাতিশয্যের, এবং তদপেক্ষা আরো আধুনিক বাঙ্গালি এবং

হিন্দুস্থানী গান্ধকারদিগের অসঙ্গত ভক্তির অনিবার্য্য বেগের, অবশ্যম্ভাবী ফল।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রাদুর্ভাব-কালে দেবপ্রসাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মপ্রভাবের উপরে অতিমাত্র ঝোঁক দেওয়া হইল। কিছুকাল পরে তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইল। মনুষ্যের মহাশ্লেষক সংস্কার যে, ঈশ্বরদত্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান, তাহার উপরে লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইল, আর, সেই সঙ্গে মনুষ্যের হস্ত বিরচিত এবং মনঃকল্পিত কারিকরী'র প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির বেশাবেশি হইল। ব্রহ্মাবর্ত্তের আদিম ঋষিরা সাক্ষাৎ পরমাত্মার মহিমাকে আদর্শ করিয়াছিলেন; তাহার পরে সেই পরিষ্কার আদর্শের উপরে কারিকরীর উপর কারিকরী চলিতে থাকিল।

এক একটি ক্ষুদ্র তারকা শত কোটি পৃথিবী অপেক্ষাও বড় —এমন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি বিনা রজ্জুতে শূন্যের উপরে দীপমালা করিয়া লট্‌কাইয়া দিয়াছেন; যিনি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বট অশ্বত্থ আবির্ভূত করিতেছেন, যিনি মাতৃগর্ভস্থিত জড়পিণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, প্রাণের অভ্যন্তরে মন নিঃশ্বসিত করিতেছেন, মনের অভ্যন্তরে জ্ঞান-প্রেম-কর্ম্মোদ্যম সমন্বিত আত্মা উদ্দীপন করিতেছেন; তাঁহার অদ্ভুত কৌশল এবং মহীয়সী শক্তির উপরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ধারণ করা প্রভৃতি ভেল্কি বাজি আরোপ করিলে কি তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্য বাড়ানো হয়? যিনি বিনা চক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দেখিতেছেন—বিনা অবলম্বনে অসীম আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে ত্রিনয়ন মূর্ত্তি করিয়া বৃষের উপর বসাইলে লোকের কি তাহাতে ভক্তি আকৃষ্ট হয়? ওরূপ অসঙ্গত নকল দেখিলে লোকের মনে প্রথম প্রথম ভয় ও বিস্ময় আবির্ভূত হয়, আর ক্রমে ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে হাস্যরসের আবির্ভাবে ভক্তির জীবন-সংশয় উপস্থিত হয়। আমাদের আদিম পিতৃপুরুষেরা তাঁহাদের প্রাণের উপাস্য দেবতার উপরে ওরূপ কারিকরী খেলিতে যা'ন নাই। তাঁহারা সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে, জলে স্থলে অনলে অনিলে, পরমেশ্বরের মহতী শক্তি এবং চিত্ত-চমৎকারী মহিমা যাহা চক্ষের সম্মুখে এবং আত্মার হিরন্ময় কোষে বিরাজমান দেখিতেন, তাহারই দ্বার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন, তাঁহারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আত্মাতে এবং সূর্য্যমণ্ডলে, অন্তরে এবং বাহিরে, সর্ব্বত্রই পরমাত্মাকে দেদীপ্যমান দেখিয়া গায়ত্রী ধ্যান করিতেন। তাঁহাদের সন্তান হইয়া আমরা কি গায়ত্রী ছাড়িয়া "রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসম" ধ্যান করিব? মহাকবি সেক্‌স্‌পিয়র কি বলিতেছেন—শ্রবণ করুন:—

To gild refined gold to paint the lily,
To throw a perfume on the violet,
The smooth the ice, or add another-hue
Unto the rainbow, or with taper-light
To seek the beauteous eye of heaven to garnish
Is wasteful and ridiculous excess.

কাঞ্চনে সোনালি কাজ শ্বেতপদ্মে চুনকাম করা,
গন্ধ ছিটাইয়া দেওয়া বিকসিত গন্ধরাজফুলে,
হিমশিলা পেশল করিতে যাওয়া মাজিয়া ঘসিয়া,
ইন্দ্র-ধনুকের গায়ে নতুন রঞ্জন বিলেপন,
অথবা সুন্দর আঁখি দ্যুলোকের, নব দিবাকর,
মসালের আলো দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস,
অপব্যয়-সার; হেন অত্যাচার, উপহাসাস্পদ।

তেমনি, বিশুদ্ধ জ্ঞানে প্রকাশিত আত্মার অন্তরতম আত্মাতে পরমাত্মাতে, রজত-গিরিসম শরীর এবং চারুচন্দ্রাবিভূষিত ললাট আরোপ করা নিতান্তই উপহাসাস্পদ; ইংরাজীতে যাহাকে বলে Caricature তাহারও অধম!

আমি বাল্যকালে অনেক শুদ্ধাচারী পৌত্তলিক দেখিয়াছি। তাঁহার সকলেই নৈকষ-শ্রেণীর খাঁটি পৌত্তলিক ছিলেন। সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমীর দিন তাঁহারা সম্মুখস্থিত প্রতিমাকে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; এবং মা মা করিয়া তাঁহার চরণতলে সটান লম্বমান হইয়া পড়িয়া ধূলির সহিত মিশাইয়া যাইতেন। বিজয়া দশমীর দিন তাঁহারা আপনাদের চক্ষের ঘনীভূত বাষ্পজলের মধ্য দিয়া মায়ের দীর্ঘ দুটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ এবং শ্রীমুখখানি কাঁদো কাঁদো দেখিতেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বারি সিঞ্চনে নূতন ধরনের এক প্রকার পৌত্তলিকতা—কাষ্ঠ পৌত্তলিকতা—কোনও কোনও উচ্চ ভূমিতে গজাইয়া উঠিতেছে। সম্মুখস্থিত প্রতিমার দেবীত্বের প্রতি ইঁহাদের ষোলো আনার জায়গায় এক আনা বিশ্বাসও নাই। ইঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে বরং অন্ধকে নেত্রবান্ করা যাইতে পারে, তথাপি প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রের এককথায়ে নির্জীবকে সজীব করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহাদের এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে প্রতিমা-খানা দেবতাও না কিছুই না, উহা ঐশীশক্তির বা মূল প্রকৃতির রূপক মাত্র। অথচ সম্মুখের প্রতিমা খানি যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠার এক ফুঁয়ে সত্য সত্যই জাগ্রত জীবন্ত দেবী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা যেন আর তাহা নাই—তাহা যেন তিনি—এই ঢঙের একটা কৃত্রিম বিশ্বাসের স্তোকবাক্যে তাঁহারা কথঞ্চিৎ প্রকারে মনকে প্রবোধ দিয়া মূর্ত্তি-পূজার নাট্যাভিনয়ে প্রবৃত্ত হ'ন। কিন্তু নাট্যাভিনয়েরও সময় আছে। নাট্যাভিনয় এবং দেবারাধনা দুইই একসঙ্গে চলিতে পারে না। মনে কর দুইজন যাত্রী পরপারে যাইবার জন্য নৌকা আরোহন করিলেন—একজন খাঁটি পৌত্তলিক, আর একজন সখের পৌত্তলিক; আর, মনে কর যেন মাঝ গঙ্গায় যাইতে না যাইতে এমনি এক ভয়ঙ্কর তুফান উঠিল যে, নৌকার নিপুণ মাঝিমাল্লাদিগের মধ্যেও ত্রাহি ত্রাহি শব্দ পড়িয়া গেল। খাঁটি পৌত্তলিক অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "মা কালী! ক্রোড়ের সন্তানকে চরণে স্থান দান কর!" কিন্তু সকের পৌত্তলিকের মার্জ্জিত জ্ঞানে মা কালী একটা রূপক মাত্র—সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতির রূপক। সে রূপক নাট্যাভিনয়-কালে অথবা কাব্য-রসের আস্বাদন-কালে খুবই বলতে লাগে, কিন্তু অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া সকের পৌত্তলিক নাট্যাভিনয় ছাড়িয়া অকৃত্রিম ভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিতে ইচ্ছুক হইলেন কিন্তু তাহা তাঁহার নিতান্ত অনভ্যস্ত বলিয়া তিনি তাঁহার সে ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। ভক্ত রামপ্রসাদের ন্যায় যাঁহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে, জগজ্জননী কৃপাণ খর্পর-ধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা দেবী, তাঁহাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া গেলেই তাঁহারা ব্রহ্মের উপাসক হন; কিন্তু সেই নৃমুণ্ডমালিনী দেবীকে যাঁহারা রূপক মাত্র জানিয়াও কৃত্রিম ভাবে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের রোগ ভ্রম নহে—তাঁহাদের রোগ ভণ্ডামী। ইঁহাদের এ রোগের প্রতীকার কেবল এক উপায়ে হইতে পারে; তাহা এই :—অধম শ্রেণীর উকিলেরা যেরূপ মোকদ্দমা সাজায়, আর, সাক্ষীদিগকে যেরূপ গড়িয়া-পিটিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপ সাজানো এবং গড়িয়া পিটিয়া প্রস্তুত করা সত্য হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া তাহাকে প্রকৃত সত্যের পথে পরিচালনা করা হো'ক্। আমাদের আত্মা যেমন শরীর পিঞ্জরে অবরুদ্ধ, ঈশ্বরকে সেইরূপ সম্মুখস্থিত প্রতিমার মৃন্ময় শরীরে অবরুদ্ধ মনে করা একে তো নিতান্তই কৃত্রিম কাণ্ড তাহাতে আবার তাহা নিতান্তই অনাবশ্যক। আমার নিজের শরীরে যখন আত্মা রহিয়াছে, আর সেই

আত্মাতে যখন পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন সেখানে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমার কি এত গরজ পড়িয়াছে যে, প্রতিমাতে কৃত্রিমরূপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে জীবন্ত দেবীরূপে কল্পনা করিব? আমার রত্নাগারে যখন সাঁচা হীরার আঙটি রহিয়াছে, তখন আমার কি এত গরজ পড়িয়াছে যে, আমি একটা ঝুটা হীরার আঙটি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আমার অঙ্গুলীতে পরিধান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইব? একটা সত্য ঘটনা বলি শ্রবণ করুন্ ঃ—বর্ষাকালে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আর, বৈটকখানার মজলিসে গান বাজনার চর্চা হইতেছে। বৈটকখানার এক কোন হইতে সম্মুখে সরিয়া বসিয়া এক জন সামান্য কর্ম্ম চারীর পুত্র বলিল যে, "আমি হারমোনিয়ম অভ্যাস করিতেছি।" গৃহকর্ত্তা বলিলেন "একটা হারমোনিয়ামের মূল্য চার পাঁচ শ টাকার কম না—তুমি তাহা পাইলে কিরূপে?" বালকটি বলিল "আমি এক প্রস্থ লম্বা কাগজে ঠিক্ হারমোনিয়মের দাঁতের মতো সাদা কালো ঘর কাটিয়া তাহার উপরে অঙ্গুলের কর্ত্তপ করিতেছি।" ইহা শুনিয়া গৃহকর্ত্তা সহাস্য বদনে তাহাকে বলিলেন "বেস্ হইয়াছে!—এক্ষণে যেরূপ বৃষ্টি পড়িতেছে—ঘরে যাইবার সময় তোমার পাল্কি আবশ্যক হইবে সন্দেহ নাই, অতএব কাগজে একটা পাল্কি আঁকিয়া তোমার পৃষ্ঠে আঠা দিয়া জুড়িয়া দিতেছি—তাহাতে ভর করিয়া তুমি দিব্য আরামে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরে পৌঁছিবে।" এ সকল কৃত্রিম কাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার-লাভের প্রকৃত প্রণালী-পদ্ধতি কিরূপ তাহা যদি আপনারা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে জানিবেন যে, আমাদের দেশের মৌলিক শাস্ত্রে তাহা যেমন বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে এমন আর কোথাও না। বেদোপনিষদশাস্ত্রে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের তিনটি বিহিত সোপান-পংক্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে তিনটি সোপানপংক্তি হ'চ্চে (১) শ্রবণ— যেমন "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্য শ্রবণ, (২) মনন যেমন ঐ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য ভাবনা; (৩) নিদিধ্যাসন—যেমন ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য পরমাত্মাতে চিত্তের পুনঃপুনঃ সন্নিবেশ। ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছে যে, "যতোযতোনিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরং ততস্ততোনিয়ম্যৈতৎ আত্মন্যেব বশং নয়েৎ" যেখানে যেখানে চঞ্চল মন প্রধাবিত হয়, সেই সেই স্থান হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া পরমাত্মাতেই তাহাকে সমাহিত করিবে। ভগবদ্গীতার এই কথা মানিতে হইলে, কোনো প্রকার মনঃকল্পিত প্রতিমূর্ত্তির দিকে যদি মন দৌড়ায় তবে তথা হইতে মনের বাগ ফিরাইয়া আনিয়া মনকে পরমাত্মাতে সমাহিত করাই বিধেয়। এ সকল মৌলিক শাস্ত্রের কথাগুলি কেমন সরল—কেমন কৃত্রিমতা-বর্জ্জিত! এই সকল খাঁটি সোনা, আর উপপুরাণ এবং তন্ত্রের সোনালি রঙ্ করা তাঁবা, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কৃত্রিমতা-পথাবলম্বী সাধকদিগের এই যে একটি স্তোক-বাক্য যে, মূর্ত্তিপূজা আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনার সোপান—এ কথা যদি সত্য হয় তবে দেশীয় ভ্রাতারা তো অনেক কাল ধরিয়া সে সোপান মাড়াইয়া উপরে উঠিতেছেন! এত দিনেও কি তাঁহারা গম্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হ'ন নাই? অবশ্যই হইয়াছেন—এই ভরসায় আমি তাঁহাদিগকে একটি সামান্য প্রবাদ স্মরণ করিতে অনুনয়-বিনয় করিতেছি; সে প্রবাদ এই যে, শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণং!

আর এক শ্রেণীর উপাসক আছেন যাঁহারা আর একরূপ কৃত্রিমতার ফাঁদে অজ্ঞাতসারে নিপতিত হ'ন। ইঁহারা চা'ন বেদান্ত-দর্শনের নির্ব্বাণ মুক্তি; অথচ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়-বোধে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় বত্ন নিয়োগ করেন। পতঞ্জলি ঋষি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর-ভক্তি চিত্তনিরোধের একতম উপায় বলিয়া তাহা সাধকের পক্ষে

শ্রেয়স্কর। বেদান্তদর্শনেও কথিত হইয়াছে যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মে পৌঁছিবার একটি প্রকৃষ্ট সোপান বলিয়া তাহা অবলম্বনীয়। এ সম্বন্ধে গোটা দুই সাধাসীধা কথা আমার বক্তব্য আছে, তাহা এই:—

প্রথমতঃ অকৃত্রিম প্রীতি ভক্তি ব্যতিরেকে উপাসনা হইতে পারে না। কৃত্রিম বন্ধুতা বন্ধুতাই নহে— কৃত্রিম উপাসনা উপাসনাই নহে। দ্বিতীয়তঃ যিনি যাঁহাকে অন্তঃকরণের সহিত প্রীতি করেন, তিনি মুখ্য-রূপে তাঁহাকেই চা'ন। আদিম ঋষিরা তাই বলিয়াছেন "স এষ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োনাস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা "এই যে অন্তরতর পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, এবং আর আর সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়।" প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তি প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে এইরূপ মুখ্যরূপে চা'ন; তা বই—প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে কোনো প্রকার অভীষ্ট সাধনের উপায় করিয়া গড়িয়া তোলেন না। তৃতীয়তঃ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বমঙ্গলালয়, প্রেমের আকর, এবং করুণার সাগর, এইরূপে তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াই—অনির্ব্বচনীয় মহান্ আধ্যাত্মিক গুণ-সকল তাঁহাতে একাধার পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিয়াই—সাধক তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়রূপে উপাসনা করেন। এইরূপ অপরিসীম সর্ব্বগুণান্বিত পরমাত্মার প্রতি ব্রহ্মোপাসকের অন্তর্দৃষ্টি, গভীর চিন্তা, এবং একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি যখন নিবিষ্ট রহিয়াছে, তখন সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত নির্গুণ সত্তার প্রতি তাঁহার অন্তশ্চক্ষু কিরূপেই বা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে—কেনই বা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? আর, যদি প্রত্যাবর্ত্তন করে তবে তাহাতে প্রমাণ হইবে যে তাঁহার সে উপাসনা অকৃত্রিম উপাসনা নহে; যেহেতু লক্ষ্য রহিয়াছে তাঁর জ্ঞান-শূন্য প্রেমশূন্য ইচ্ছাশূন্য নির্গুণ সত্তার প্রতি, ভজিতেছেন তিনি জ্ঞানপূর্ণ প্রেমপূর্ণ উদ্যমপূর্ণ সগুণ ব্রহ্মকে। এইরূপ তিনি দুই নৌকায় পা দিয়া রহিয়াছেন—ইহারই নাম কৃত্রিমতা। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে:—

মনে কর আমার এক জন প্রিয় বন্ধু প্রশান্ত ধীর গম্ভীর এবং কর্ম্মিষ্ঠ। আমি কখনো বা তাঁহার ধীরতার প্রতি বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করি, কখনো বা তাঁহার কর্ম্মিষ্ঠতার প্রতি বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করি, কখনো বা একই সময়ে তাঁহার ধীরতা এবং কর্ম্মিষ্ঠতা দুয়েরই প্রতি মনোনিবেশ করি। দুয়েরই প্রতি যখন একই সময়ে মনোনিবেশ করি, তখন কি দেখি? তখন দেখি যে, "মণিনা বলয়ং, বলয়েন মণি মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ। পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ॥" মণির গুণে বলয় শোভা পাইতেছে, বলয়ের গুণে মণি শোভা পাইতেছে, আর বলয় এবং মণি দুয়ের গুণে হস্ত শোভা পাইতেছে, জলের গুণে কমল শোভা পাইতেছে, কমলের গুণে জল শোভা পাইতেছে আর, জল এবং কমল উভয়ের গুণে সরোবর শোভা পাইতেছে; বর্ত্তমান দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে তেমনি বলা যাইতে পারে যে ধীরতার গুণে কর্ম্মিষ্ঠতা শোভা পাইতেছে, কর্ম্মিষ্ঠতার গুণে ধীরতা শোভা পাইতেছে, আর, ধীরতা এবং কর্ম্মিষ্ঠতা উভয়ের গুণে ধীরতা শোভা পাইতেছে, আর, ধীরতা এবং কর্ম্মিষ্ঠতা উভয়ের গুণে আমার বন্ধু শোভা পাইতেছে। এ যেমন দেখিলাম, তেমনি ব্রহ্মোপাসক কখনো বা ঈশ্বরের অটল প্রশান্ত ভাবের প্রতি দৃষ্টি করেন, কখনো বা তাঁহার অপরিসীম প্রভাবশালী মহোদ্যমের প্রতি দৃষ্টি করেন, কখনো বা অপরিসীম মহোদ্যম এবং অটল শান্তি দুইটি তাঁহাতে একাধারে দৃষ্টি করেন। তাহার পরে তিনি যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি করেন, তখন দেখেন যে, তাঁহার আপনার উদ্যমের সীমা আছে; তাঁহার আপনার উদ্যম দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অবসন্ন হয় এবং তাহার কিয়ৎ ঘণ্টা পরেই সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিলীন হয়। তিনি আপনি যখন প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন হ'ন—পরমেশ্বর তখন অচেতন

হ'ন না; তিনি আপনি যখন সুষুপ্তির মন্ত্রগুণে নির্গুণ হইয়া যা'ন—পরমেশ্বর তখন নির্গুণ হ'ন না; পরমেশ্বর তখন সেই প্রসুপ্ত-জনের তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার প্রাণ মন শরীর পুনঃসংস্কৃত এবং নবীভূত করিয়া দে'ন। পুনশ্চ ব্রহ্মোপাসক দেখেন, যে, তাঁহার আপনার প্রশান্তিরও সীমা আছে, দেখেন যে, তাঁহার আপনার সুষুপ্তির আরাম কিয়ৎ ঘণ্টা পরেই জাগ্রৎ কালের সগুণ অবস্থায় পরিসমাপ্ত হয়—উদ্যমের স্ফূর্ত্তিতে পরিসমাপ্ত হয়। যখন তিনি আপনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সাংসারিক কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত-সমস্ত হ'ন, তখন অন্তর্যামী পরমেশ্বর ব্যস্ত সমস্ত হ'ন না, তখন পরমেশ্বর সেই কর্ম্মকারী জীবের ভোগের জন্য, শিক্ষার জন্য, এবং উন্নতির জন্য অটল প্রশান্ত এবং ধীর ভাবে সমস্ত জগৎ নিয়মিত করেন। মনুষ্য নাকি অপূর্ণ, তাই সে সীমাবদ্ধ কর্ম্মোদ্যম হইতে সীমাবদ্ধ প্রশান্তিতে, এবং সীমাবদ্ধ প্রশান্তি হইতে সীমাবদ্ধ কর্ম্মোদ্যমে, পর্য্যায়ক্রমে পদনিক্ষেপ করে। কিন্তু সর্ব্বমূলাধার পরমাত্মাতে সুষুপ্তির অটল প্রশান্তি এবং জাগ্রৎকালের প্রভূত কর্ম্মোদ্যম দুইই একাধারে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। পরমাত্মার অপরিসীম মহোদ্যম সুগভীর শান্তিতে অটল এবং গম্ভীর; তাঁহার অটল শান্তি মহাপ্রভাবশালী উদ্যমের স্ফূর্ত্তিতে জাগ্রত এবং জীবন্ত। আমাদের আপনাদেরই অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয়; আমারাই সুষুপ্তিকালে নির্গুণ হই, জাগ্রৎকালে সগুণ হই। ঈশ্বরের অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয় না—ঈশ্বর নির্গুণ হইতে সগুণ বা সগুণ হইতে নির্গুণ হ'ন, না—তিনি সর্ব্বকালেই পরিপূর্ণ; জ্ঞানে পরিপূর্ণ—প্রেমে পরিপূর্ণ—আনন্দে পরিপূর্ণ—শান্তিতে পরিপূর্ণ—উদ্যমে পরিপূর্ণ। অদ্বৈতবাদীরা সগুণ এবং নির্গুণের মধ্যে একটা সুবিশাল মায়া-প্রাচীরের আড়াল দাঁড় করাইয়া, পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিতে এবং সৃষ্টি হইতে পরব্রহ্মে মনের যাতায়াত পথ একেবারেই অবরুদ্ধ করিয়া দে'ন। অদ্বৈতবাদীর মতে সবই ব্রহ্ম—অথচ অবিদ্যা হইতে অর্থাৎ ভ্রম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ভ্রম শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে না—হয় তোমার ভ্রম, নয় আমার ভ্রম, নয় আর কাহারো ভ্রম। সবই যদি ব্রহ্ম—তবে ভ্রম কাহার? ভ্রান্ত জীবের? কিন্তু জীব তুমি কোথা হইতে পাইতেছ? সবই যে ব্রহ্ম! তুমি বলিতেছ—ভ্রান্ত জীব ভ্রমেরই একটা অঙ্গ। এটা তুমি দেখিতেছ না যে "ভ্রান্ত জীব ভ্রমের একটা অঙ্গ" এ কথাও যা, আর, "মাথা মাথা-ব্যথার একটা অঙ্গ" এ কথা বলাও তা—একই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অদ্বৈত-বাদীর সিদ্ধান্ত মানিতে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারে একেবারেই কপাট পড়িয়া যায়।

অদ্বৈতবাদীর ন্যায় আমরা জগৎকে মিথ্যা বলি না; আমরা বলি জগৎ ঈশ্বরের অপূর্ণ প্রকাশ। ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকাশ তাঁহার আপনাতেই রহিয়াছে—জগতের কুত্রাপি তাহা সম্ভবে না। তিনি আপনার অনির্ব্বচনীয় শক্তি দ্বারা যথানিয়মে যথাপরিমাণে যথোপযুক্তরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশ অপাত্রে পড়িয়া ব্যর্থ না হয়—এই জন্য তিনি জীবাত্মাকে আপনার ভাবের ভাবুক করিয়া—আপনার ঐশ্বর্য্যের ভাগী এবং ভাণ্ডারী করিয়া—আপনার প্রেম-মাধুর্য্যের মর্ম্মজ্ঞ এবং রসজ্ঞ করিয়া ক্রমে ক্রমে গড়িয়া লইতেছেন। জীবাত্মার নিকটে তিনি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইলে জীবাত্মার পৃথক সত্ত্বা বিলুপ্ত হইবে; তাহা যাহাতে না হয় এই উদ্দেশে তিনি সত্ত্বগুণাত্মক বুদ্ধি এবং আনন্দকে তমোগুণাত্মক জড়-পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া দিয়াছেন; আবার জীবাত্মা জড়ে-জড়ীভূত হইয়া না যায়, এই উদ্দেশে তিনি তাহার রজোগুণাত্মক অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা দ্বারা জড় জগতের আবরণ অপসারিত করিয়া যথা-সময়ে যথোপযুক্ত পরিমাণে তাহার নিকটে আপনার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বপ্রকাশ আনন্দ জ্যোতি প্রজ্ঞাপন করিতেছেন।

আমাদের দেশে এক্ষণে, একদিকে, সগুণ ব্রহ্ম হইতে তাঁহার নানা উপাধি বিচ্ছিন্ন করিয়া সেই সকল নানা উপাধিকে নানা দেব-দেবীরূপে সাজাইয়া তোলা হয়, আরেক দিকে পরব্রহ্মকে তাঁহার সমস্ত উপাধি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্গুণ সত্তা রূপে সাজাইয়া তোলা হয়। শিব এবং শক্তির মধ্যে—গুণ এবং পুরুষের মধ্যে—এইরূপ গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার কর্ত্তা কে? মূল কে? এ প্রশ্নের সদুত্তর আমার বুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে তাহা এখন বলি—প্রণিধান করুন।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতির ঐতিহাসিক জীবনের মধ্য-পথে বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া দেব-প্রসাদের সহিত আত্মপ্রভাবের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল; আর, সেই ঘটনার পর হইতে দেবপ্রসাদ-ভ্রষ্ট আত্মপ্রভাবের তমো ক্রমশই যত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ততই সেই বিচ্ছেদের কণ্টকাকীর্ণ শাখা প্রশাখা চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল। ঈশ্বর-প্রসাদ হইতে আত্মপ্রভাবের বিচ্ছেদই মূলবিচ্ছেদ; সেই মূল বিচ্ছেদের দ্বার খোলা পাইয়া তাহার মধ্য দিয়া আমাদের দেশের ধর্ম্মরাজ্যে নানা-প্রকার শাখা-বিচ্ছেদের জঞ্জাল প্রবেশ করিল—প্রবেশ করিয়া বহির্জ্জগতের জনসমাজকে নানা বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিল; এবং অন্তর্জ্জগতের প্রধান দিগের মধ্যে—জ্ঞান ভক্তি এবং কর্ম্মোদ্যমের মধ্যে—বিবাদের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে নানা প্রকার দার্শনিক মতামতের বায়ু ব্যজন করিতে লাগিল; তার সাক্ষী :—

সাংখ্য দর্শন, প্রকৃতিকে পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অনাথা, উন্মত্তা এবং উচ্ছৃঙ্খলা করিয়া ফেলিল। এরূপ প্রকৃতি এক প্রকার ছিন্নমস্তা উন্মাদিনী বিভীষিকা।

বেদান্তদর্শন, জ্ঞানকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল। এরূপ উদাসীন জ্ঞান এক প্রকার পঞ্জিকার রাহু ধড়শূন্য মাথা।

বৈষ্ণব শাস্ত্র, ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপ ভক্তি এক প্রকার মস্তক-বিহীন হৃৎপিণ্ড।

শাক্ত ধর্ম্ম এবং তন্ত্র-শাস্ত্র শক্তিকে শিব হইতে অর্থাৎ কল্যাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে বিপথগামিনী করিয়া ফেলিল। এরূপ শক্তি এক প্রকার মদের মাদকতা শক্তি; তা বই, তাহা আত্মার সংযম-শক্তি নহে।

শৈবধর্ম্ম শিবকে অর্থাৎ মঙ্গলকে শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে উদাসীন বোম্‌ভোলা করিয়া ফেলিল; এরূপ ঝিমন্ত মঙ্গল জগতের কোনো উপকারে আসিতে পারে না।

তাহার পরে এই সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবয়বখণ্ডে জীবন সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার কৃত্রিম উপায়ের উদ্ভাবনা আরম্ভ হইল। অনীশ্বরা প্রকৃতিকে কালী দুর্গারূপে সাজাইয়া তোলা হইল। পরমেশ্বরকে শক্তিহীন কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ভোলা মহেশ্বরের রূপে সাজাইয়া তোলা হইল। অজ্ঞানা ভক্তিকে রাধারূপে সাজাইয়া তোলা হইল। এই সকল শাখা-বিচ্ছেদ হইতে নানা প্রকার কণ্টক-বিচ্ছেদ ফুটিয়া বাহির হইয়া বিচ্ছেদই এক্ষণে আমাদের দেশের প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতিবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, দলাদলি, আড়াআড়ি, রেষারেষি, কলহ বিবাদ, পরনিন্দা পরচর্চ্চা, এই সকল দূষিত উপাদানই আমাদের দেশের শরীরের অস্থি মজ্জা শোণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইটিই হ'চ্চে আমাদের দেশের মর্ম্মান্তিক রোগ। এ মহাব্যাধির প্রতীকার কেবল এক উপায়ে হইতে পারে। সে উপায় হ'চ্চে—আত্মার একটি আধ্যাত্মিক অবয়ব ছিন্ন না করিয়া পরমাত্মার সহিত তাহার সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন যোগ সংস্থাপন করা। এইরূপ যোগের নাম অধ্যাত্মযোগ। পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ দুই রূপ —(১) প্রাকৃত

যোগ এবং (২) অধ্যাত্ম যোগ; আর দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে প্রাকৃত যোগ সাধন-নিরপেক্ষ—অধ্যাত্ম যোগ সাধন সাপেক্ষ। এই কথাটি আর একটু খুলিয়া বলিঃ—

আমরা আমাদের সম্মুখে ঐ যে দেয়াল দেখিতেছি, উহা দেয়ালের বহিরাবরণ মাত্র। ঐ দেয়ালটির ভিতরে কত যে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চলিতেছে—আমরা আমাদের চর্ম্মচক্ষে তাহার কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা, কিন্তু, দেয়ালের অভ্যন্তর প্রদেশের প্রথম স্তরে দেখেন—মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় স্তরে দেখেন—যোগাকর্ষণ; তৃতীয় স্তরে দেখেন—রাসায়নিক আকর্ষণ, চতুর্থ স্তরে দেখেন—আলোক উত্তাপ এবং তাড়িত-রশ্মির নিগূঢ় রহস্য-লীলা। এ সকল দেখিয়াও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-দিগের মধ্যে অনেকে এটা এখনো বুঝিতে পারেন নাই যে, অন্তরেরও অন্তর আছে—সকল বস্তুরই গভীরতম অন্তঃস্তর আছে। দার্শনিক পণ্ডিতেরা প্রথম স্তরে দেখেন দেয়ালের দৃশ্যমানতা, দৃশ্যমানতার অভ্যন্তরে দেখেন দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয়ের পরিচালনা ; দর্শনেন্দ্রিয় পরিচালনার অভ্যন্তরে দেখেন মনের সংযোগ ; মনঃসংযোগের অভ্যন্তরে দেখেন বিজ্ঞানাত্মা। এ সকল দেখিয়াও দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এটা এখনো বুঝিতে পারে নাই যে, অন্তরেরও অন্তর আছে— সকল বস্তুরই গভীরতম অন্তঃস্তর আছে। আমাদের দেশের আদিম ঋষিরা ধ্যান-যোগে দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যের গভীরতম অন্তঃস্তর এবং দর্শকের গভীরতম অন্তঃস্তর একই অভিন্ন প্রদেশ। তাহা আত্মার হিরণ্ময় কোষ। আত্মার, সূর্য্যের, এবং সকল বস্তুর সেই গভীর অন্তঃস্তরে—সেই হিরন্ময় কোষে—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ঋষিদিগের ধ্যানে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। অতএব, এমন যে জ্ঞান শূন্য বস্তু দেয়াল, তাহারও অভ্যন্তরে পরমাত্মা জাগ্রত রহিয়াছেন কিন্তু দেয়াল তাহা জানে না; তেমনি আবার, আত্মা যখন অজ্ঞান-নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে তখনও পরমাত্মা আত্মার অভ্যন্তরে জাগ্রত রহিয়াছেন কিন্তু আত্মা তাহা জানিতেছে না। এইরূপ অজ্ঞান-গর্ত্ত যোগের নাম দেওয়া যাইতে পারে—প্রাকৃত যোগ অথবা নৈসর্গিক যোগ। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার যোগ আছে—তাহার নাম অধ্যাত্ম যোগ। সাধক যখন আপনার শিশির-বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র জ্ঞানে পরমাত্মার অতলস্পর্শ গম্ভীর জ্ঞান-সমুদ্রের সংস্পর্শ উপলব্ধি করেন এবং সেই মঙ্গলালয়ের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছাকে একতানে মিলিত করেন: এইরূপ যখন জ্ঞানের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, প্রেমের সহিত, যত্নের সহিত, পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করেন, তখন তাহারই নাম অধ্যাত্ম যোগ।

অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, অধ্যাত্মযোগ—কি যেন একটা অলৌকিক সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, অধ্যাত্মযোগ বিশিষ্টরূপে সাধন-সাপেক্ষ বলিয়া কঠিন—অলৌকিক বলিয়া কঠিন নহে। সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া আকাশে উত্থান করা যে-ভাবে কঠিন—অধ্যাত্মযোগ সে-ভাবে কঠিন নহে । সুখ সম্পদে উন্মত্ত না হইয়া —দুঃখ ক্লেশে অভিভূত না হইয়া—মনকে কর্ত্তব্য-পথে অবিচলিত রাখা যে-ভাবে কঠিন, অধ্যাত্মযোগ সেই-ভাবে কঠিন। পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ এমন কোনো সামগ্রী নহে যে তাহা নাই অথচ কলে-কৌশলে ঘটাইয়া তুলিতে হইবে। পরমাত্মার সহিত আত্মার এক-মেটে যোগ সর্ব্বক্ষণই রহিয়াছে। সেই এক-মেটে যোগকে চিন্তা স্পৃহা এবং যত্ন দ্বারা দোমেটে করিলেই তাহা অধ্যাত্ম-যোগে পরিণত হয়। অধ্যাত্মযোগের একটি ছোটো খাটো উদাহরণ দিতেছি—দৃষ্টে উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য আবাল বৃদ্ধ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

পিতা জানিতেছেন যে, আমি পুত্রের মঙ্গলেরই জন্য তাহাকে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছি; কিন্তু পুত্রের এইরূপ জ্ঞান হইতেছে যে বিদ্যাভ্যাসে পিতা কেবল আমার উপরে প্রভুত্ব খাটাইবার জন্য আমাকে বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে বলিতেছেন ; এ অবস্থায় দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, পিতার জ্ঞান এবং পুত্রের জ্ঞান উভয়ে পরস্পরের বিপরীতমুখী। তাহার কিয়ৎ বৎসর পরে পুত্র যখন বিদ্যাশিক্ষার পথে রীতিমত অগ্রসর হইয়া শিক্ষিত বিদ্যার রস-গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন সে জানিতে পারিল যে, পিতা আমার মঙ্গলেরই জন্য আমাকে বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন। এই দ্বিতীয় অবস্থায় পুত্রের জ্ঞান পিতার জ্ঞানের সহিত একতানে মিলিত হইয়া গেল। তাহার পরে পুত্র আপন ইচ্ছায় বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হইল। এই তৃতীয় অবস্থায় পুত্রের ইচ্ছা পিতার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত একতানে মিলিয়া যাওয়াতে পিতার পুত্রবাৎসল্য এবং পুত্রের পিতৃভক্তির মধ্যে যোগ ঘনীভূত হইল। এই চতুর্থ অবস্থায় পিতার ভালবাসার সহিত পুত্রের ভালবাসা একতানে মিলিত হইয়া গেল। পিতা-পুত্রের মধ্যে ভালবাসা-সম্বন্ধ পূর্ব্বেও ছিল এখনো রহিয়াছে; তবে কি-না পূর্ব্বে তাহা একমেটে ছিল, এখন তাহা দোমেটে হইল। পিতার জ্ঞান ইচ্ছা এবং ভালবাসার সহিত পুত্রের জ্ঞান ইচ্ছা এবং ভালবাসার সহিত পুত্রের জ্ঞান ইচ্ছা এবং ভালবাসার যোগ-বন্ধন এই-যেরূপ দেখিতে পাওয়া গেল ইহা এক প্রকার ছোটো খাটো অধ্যাত্মযোগ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক পরমাত্মাকে ধ্যানে উপলব্ধি করেন, প্রীতি ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করেন, এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। এইরূপে পরমাত্মার সহিত আত্মার জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্মোদ্যম তিনের যোগ নিবন্ধ হইলে তবেই অধ্যাত্ম-যোগের পরিপক্কতা হয়। অনেক মনে করেন আত্মা কেবল জ্ঞান-মাত্র;—তাহা যদি হইত তবে তদনুসারে শরীরও কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় মাত্র হইত, ধড়-শূন্য মুণ্ড-মাত্র হইত! কেহ বলেন আত্মা কেবল কর্ম্মোদ্যম-মাত্র;—তাহা যদি হইত, তবে সেই অনুসারে শরীরও কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়-মাত্র হইত— স্কন্ধকাটা ধড় হইত।

যদি আমরা দেখিতে পাই যে আত্মার জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্মোদ্যম চিরস্থায়ী এবং চিরোন্নতিশীল—শরীর নশ্বর এবং পতনশীল; যদিচ শরীরের জন্য আত্মা হয় নাই—আত্মারই জন্য শরীর হইয়াছে; যদিচ শরীর এবং আত্মার মধ্যে ছায়াতপের প্রভেদ, তথাপি, সেই বিশাল প্রভেদের মধ্যেও আত্মার জ্ঞান কর্ম্মোদ্যম এবং প্রেমের সহিত শরীরের জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং হৃৎপিণ্ডের যেরূপ চমৎকার সৌসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহাতে মঙ্গলনিধান পরমেশ্বরেরই হস্ত জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে আছে "তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চারাঃ সর্ব্বে সমর্পিতা এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ," যেমন রথচক্রের কেন্দ্র, এবং পরিধিতে ভর করিয়া দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে আর-সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তেমনি অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতে ভর করিয়া সকল ভূত, সকল দেবতা, সকল প্রাণ, সকল আত্মা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এ কথা খুবই সত্য; কেননা, ইহা আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি যে পরমেশ্বর

(১) পৃথিবীর ভিতর হইতে আগ্নেয় পদার্থ-সকলের তেজোমণ্ডল বিস্ফারিত করিতেছেন এবং তাহার বাহির হইতে তাহাকে বায়ুভারে চাপা দিয়া রাখিয়াছেন;

(২) বৃক্ষদেহে ভিতর-হইতে প্রাণ সঞ্চারিত করিতেছেন, এবং তাহার বাহির হইতে প্রাণের উপজীবিকা সংযোজিত করিতেছেন;

(৩) পশ্বাদির ভিতর হইতে চেতনা অঙ্কুরিত করিতেছেন, আর, তাহার বাহির হইতে মনঃপ্রাণের উপজীবিকা এবং শরীরের উপাদান সংযোজিত করিতেছেন;

(৪) মনুষ্য-দেহে ভিতর হইতে আত্মা এবং জ্ঞান-ধর্ম্মের স্বাভাবিক সংস্কার নিঃশ্বসিত করিতেছেন, আর, তাহার বাহির হইতে ঐন্দ্রিয়ক উত্তেজনা এবং তাহার আধার-ভূত মনোময় এবং প্রাণময় শরীর সংযোজিত করিয়া সেই স্বাভাবিক সংস্কারের বীজ হইতে চিরোন্নতিশীল জ্ঞানধর্ম্ম অঙ্কুরিত এবং বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছেন।

পরমাত্মাই আমাদের জ্ঞান-প্রেম এবং কর্ম্মোদাম-সমন্বিত আত্মার ভিতরে থাকিয়া আত্মাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং পরমাত্মাই বহির্জ্জগতের ভিতরে থাকিয়া আত্মার বাহির হইতে আত্মাতে শরীর সংযোজিত করিতেছেন; তাই আমাদের এই পতনশীল নশ্বর শরীরেও আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্মোদামের ছাপ পড়িয়াছে। আত্মার এ তিনটি আধ্যাত্মিক অবয়বের তিন প্রকার স্বাধিকারও দিব্য সুপরিচিহ্নিত। জ্ঞান হ'চ্চে নিয়ামক— যেমন হিতাহিত জ্ঞান কর্ত্তব্য-কার্য্যের নিয়ামক; প্রেম হ'চ্চে উদ্দীপক— যেমন স্ত্রীপুত্রের প্রতি ভালবাসা অর্থাগমের উপায়-চিন্তার এবং উপায়-চেষ্টার উদ্দীপক; কর্ম্মোদাম হ'চ্চে পরিচালক বা আয়োজক— যেমন উদামশীল বণিক নগর-গ্রামে কৃষিজাত শস্যের পরিচালক।

আত্মার ঐ তিনটি চিরোন্নতিশীল আধ্যাত্মিক অবয়ব আমরা সৎ চিৎ এবং আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি এটা যখন স্থির; এটা যখন স্থির যে, সৎ-স্বরূপ অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য সত্য আমাদের কর্ম্মোদামের অটল ভিত্তি-ভূমি; চিৎস্বরূপ আমাদের জ্ঞানের পরম আদর্শ; আনন্দস্বরূপ আমাদের প্রেমের চিরন্তন উৎস; তখন সেই সঙ্গে ওটাও সুনিশ্চিত যে, আত্মার ঐ তিনটি আধ্যাত্মিক অবয়বের কোনোটিই অবহেলার সামগ্রী নহে, প্রত্যুত তিনের তন্ত্র-বদ্ধ সমবেত উন্নতি-সাধনের প্রতি সকল মনুষ্যেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনের মধ্যে তন্ত্র-বন্ধন এবং সামঞ্জস্য সংস্থাপন কি উপায়ে সংসিদ্ধ হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, বিশুদ্ধ জল-বায়ু-সেবন, আর, সেই সঙ্গে যথোপযুক্ত আহার বিহার এবং ব্যায়ামাদি করিলে শরীরের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য দৃঢ়ীভূত হয়, তেমনি পরমাত্মাতে শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি সহকারে আত্ম-সমাধান করিলে এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অভিপ্রেত কর্ত্তব্য কার্য্য অনুষ্ঠান করিলে—সংক্ষেপে বলিতে হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিলে, আরো সংক্ষেপে বলিতে হইলে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে, তবাহার সুবিমল প্রসাদবারি এবং প্রেম-সমীরণে আত্মার জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দৃঢ়ীভূত হইয়া আত্মা প্রকৃতিস্থ হয়; তাহা হইলে আত্মা জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়, প্রেম সুধায় সরস হয়, এবং কর্ম্মোদ্যমে তেজস্বী হয়, এই নিস্তেজ মলিন নীরস আত্মাই জাগ্রত জীবন্ত উজ্জ্বল এবং মধুময় আত্মা হয়। পক্ষান্তরে, মনুষ্য যখন পরমাত্মার উপাসনা হইতে বিমুখ হয়, তখন তাহার জ্ঞান প্রেম এবং কর্ম্মোদ্যম বিভিন্ন অশ্বের ন্যায় পরস্পরের বিপরীতমুখী হইয়া আত্মাকে অশান্তির কোলাহলে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

প্রবীন পৌত্তলিকদিগের দেখাদেখি এক দল নব্য কৃতবিদ্য ধর্ম্মালোচক বলিতে আরম্ভ

করিয়াছেন যে, ব্রহ্মোপাসকেরা এক প্রকার নিরাকার শূন্য পদার্থের উপাসনা করেন। ইঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে ব্রহ্মোপাসকের নিরাকার উপাস্য দেবতা শূন্য পদার্থ নহেন, তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা। তাঁহাতে অপরিসীম গম্ভীর জ্ঞান, অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ প্রগাঢ় ধীরতা ও প্রশান্তি, অপরিক্রান্ত মহদ্‌বল এবং মহোদ্যম সমস্তই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আজিকের এই সভাঘরে যদি নিরাকার পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে এ ঘর মেজে হইতে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত চেয়ার টেবিল প্রভৃতি সাকার পদার্থে ভরাট্ হইলেও আমরা বলিতাম—এটা শূন্য ঘর। আজি এই ঘরের অভ্যন্তরে নিরাকার পদার্থের সম্মিলন দেখিয়াই আমরা বলিতেছি যে, আজি এ ঘর জমজমাট্। এই যে নিরাকার পদার্থ সমূহ—এই যে, জ্ঞান, সদ্ভাব, যত্ন এবং কর্ম্মোদ্যম—এ সব ব্যাপার আমরা কোন্ চক্ষে দেখিতেছি? জ্ঞানচক্ষে। কোন আলোকে দেখিতেছি? জ্ঞানালোকে। যে জ্ঞান-চক্ষে এবং যে জ্ঞানালোকে আমরা আমাদের অন্তরে জীবাত্মাকে উপলব্ধি করিতেছি, সেই জ্ঞান-চক্ষে এবং সেই জ্ঞানালোকে আমরা এটাও দেখিতেছি যে, আমাদের কর্ম্মোদ্যম শ্রমক্লম-দ্বারা পরিচ্ছন্ন, আমাদের জ্ঞান জড়তা এবং মূঢ়তা দ্বারা পরিচ্ছন্ন, আমাদের বিমল আনন্দ অস্থায়ী সুখ দুঃখ দ্বারা পরিচ্ছন্ন, আত্মা শরীরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন! আমরা যে জ্ঞানালোকে আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করি সেই জ্ঞানালোকে পরমাত্মার পূর্ণতা উপলব্ধি করি; দুইই এক সঙ্গে এপিট-ওপিট ভাবে উপলব্ধি করি। যেমন আলোক না জানিলে অন্ধকার জানা যায় না, শব্দ না জানিলে নিস্তব্ধতা জানা যায় না, তেমনি পূর্ণতার ভাব উপলব্ধি না করিলে অপূর্ণতার ভাব উপলব্ধি করা যায় না। মনুষ্যই কেবল আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে। বানরেরা মনুষ্য অপেক্ষা এত যে অধম, তথাপি তাহাদের মধ্যে একব্যক্তি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও, আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করে না। তাহারা দিব্য সন্তোষে গাছে ওঠা নাবা করিতেছে—ডাল হইতে ডালে লাফাইয়া বেড়াইতেছে—পাতা ছিঁড়িতেছে—ফল পাড়িতেছে আর খাইতেছে। বানর জাতি যদি আপনার অপূর্ণতা জানে উপলব্ধি করিত, তবে তাহাদের মনোমধ্যে জ্ঞানাভাব পূরণের চেষ্টা হইত; জ্ঞানাভাব পূরণের চেষ্টা হইলে এত দিনে তাহারা উদ্ভিদবিদ্যায় ডারুইনকে হারাইয়া দিত। বানরের জ্ঞানাভ্যন্তরে যদি পরমাত্মার পূর্ণতার ভাব প্রবেশ করিতে পথ পাইত, তবে বানর সেই পূর্ণতার প্রতিযোগিতা সূত্রে আপন জ্ঞানের অপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে;—অন্ততঃ বানর শব্দের আদিতে যতকাল পর্য্যন্ত বা থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানাভ্যন্তরে পূর্ণতা-জ্যোতির প্রবেশ দ্বারে কপাট বন্ধ থাকিবে। বানরের স্থূল-দর্শী বুদ্ধির অভ্যন্তরে পরমাত্মার পূর্ণতা-জ্যোতি প্রবেশ লাভ করিতে পারে না বলিয়াই পূর্ণতার প্রতিযোগিতা-সূত্রে আপনার অপূর্ণতা উপলব্ধি করিতে পারে না। উপনিষদে আছে "ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি" ব্রহ্মবিদেরা বলেন যে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা ছায়া-তপের ন্যায়। পরমাত্মার পূর্ণতার জ্যোতি এবং জীবাত্মার অপূর্ণতার ছায়া দুইই এপিট ওপিট ভাবে একসঙ্গে সাধকের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। মনুষ্যের প্রজ্ঞা আছে বলিয়াই তাহারই আলোকে মনুষ্য আপনার আত্মার অপূর্ণতা এবং পরমাত্মার পূর্ণতা দুইই ছায়াতপের ন্যায় উপলব্ধি করে। সকলেই জানে যে আমি অপূর্ণ জীব; কিন্তু সে অপূর্ণতা শুধু যে কেবল খাওয়া পরার অনটন নহে—সে অপূর্ণতা যে, আধ্যাত্মিক জ্ঞান আনন্দ উদ্যম এবং শক্তির অভাব, আর, আত্মার গভীর অভ্যন্তরে পরমাত্মার পূর্ণতা অপরিস্ফুটভাবে জ্ঞানে জাগিতেছে বলিয়া সেই পূর্ণতার প্রতিযোগে

সেই অপূর্ণতা উপলব্ধি হইতেছে, এই যে একটি সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত, এই কথাগুলি অনেক সময় অনবধানতা-বশতঃ আমাদের অন্তশ্চক্ষু এড়াইয়া যায়; কিন্তু একটু স্থির-চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলেই উহাতে আর আমাদের সংশয় থাকে না। পরমাত্মা পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ ইহা জানিয়াও কেহ যদি বলেন দেবদেবীকে যেমন আমরা প্রতিমাশরীরের মধ্য দিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করি, অসীম পরমাত্মাকে সেরূপ উপলব্ধি করা সাধকের পক্ষে সম্ভব হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে আমাদের দেশের পরম শ্রদ্ধেয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির একটি সুপ্রসিদ্ধ বচনের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। যোহপ্সু তিষ্ঠন্নপ্যাবন্তরিক্ষে বায়ৌ দিব্যাদিত্যে দিক্ষু চন্দ্রতারকে আকাশে যত্তমস্যাবরণাত্মকে বাহ্যে তমসি তেজসি তদ্বিপরীতে প্রকাশসামান্য ইত্যেবমধিদৈবতমন্তর্যামিবিষয়ং দর্শনং দেবতাসু। অথাধিভূতং ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তেষন্তর্যামি-দর্শনমধিভূতম্।

ইহার অর্থ :—যিনি জলের মধ্যে থাকিয়া অগ্নির মধ্যে বায়ুর মধ্যে দিক্ সকলের মধ্যে চন্দ্রতারকের মধ্যে অন্তরীক্ষ তমোগুণাত্মক বাহ্য বস্তুতে অন্ধকারে তেজে সমস্ত বস্তুতে প্রকাশমান এইরূপে চন্দ্রতারকাদি দেবগণের অন্তর্যামিরূপে তাঁহার অধিদৈবত দর্শন এবং ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতগণের অন্তর্যামিরূপে তাঁহার অধিদৈবত দর্শন এবং ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত ভূতগণের অন্তর্যামিরূপে তাঁহার আধিভৌতিক দর্শন, সাধকের পক্ষে সহজেই সম্ভাবনীয়। তাছাড়া শরীরের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা যদি সাধকের প্রয়োজন হয় তবে প্রতিমাদির মৃন্ময় শরীর গঠন করিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার নিতান্তই যে প্রয়োজনাভাব তাহা মূল বচনটিতে ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে অতীব সুস্পষ্টরূপে যথা :—

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোহন্তরো, যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ আত্মাহন্তর্যাম্যমৃতঃ। যিনি সকল ভূতের মধ্যে থাকিয়া, সকল ভূত হইতে নির্লিপ্ত রহিয়াছেন, সমস্ত ভূতগণের কেহই যাঁহাকে জানে না, সর্ব্বভূতই যাঁহার শরীর, সকল ভূতের অন্তরে থাকিয়া যিনি সকল ভূতকে নিয়মিত করিয়াছেন এই সেই অন্তর্যামি অমৃত আত্মা।

আমরা আধুনিক কল্পনা এবং জল্পনা-পরায়ণ অকর্ম্মণ্য লোকদের কলহ কোলাহল হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া সত্যের কৃত্রিমতাশূন্য সরল মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলেই এক মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারি যে, পরমাত্মা এখানে যেমন অধিষ্ঠান করিতেছেন—সূর্য্যমণ্ডলেও তেমনি অধিষ্ঠান করিতেছেন—ধূমকেতুতেও তেমনি অধিষ্ঠান করিতেছেন—দূরাৎ সুদূর নক্ষত্রেও তেমনি অধিষ্ঠান করিতেছেন—অসীম আকাশ ভরিয়া তিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন—কোথাও এক তিলও এমন ফাঁক নাই যেখানে তিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন না। অসীম আকাশের যদি আকার থাকিত, তবে পরমাত্মাকে সাকার বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এটা যখন স্থির যে, অসীম আকাশ চতুর্ভুজাকৃতিও নহে, দশভুজাকৃতিও নহে, দ্বিভুজাকৃতিও নহে; অসীম আকাশ মহান্ অচিন্ত্য এবং অনির্ব্বাচনীয়; তখন সেই সঙ্গে ওটাও সুনিশ্চিত যে, যিনি অসীম আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি আকাশের অতীত; কিন্তু তা বলিয়া তিনি থাকিয়াও নাই এরূপ নহেন। তিনি শূন্যও নহেন উদাসীনও নহেন। তাঁহার চক্ষু নাই অথচ সব দেখিতেছেন, কর্ণ নাই অথচ সব শুনিতেছেন, হস্তপদ নাই অথচ সব দেখিতেছেন, কর্ণ নাই অথচ সব শুনিতেছেন, হস্তপদ নাই অথচ সব স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সব কার্য্য প্রবর্ত্তনা করিতেছেন।

কোথায় পৃথিবী, কোথায় সূর্য্য, কোথায় নক্ষত্র মণ্ডলী—সকলেই তাঁহার অসীম মহাপ্রাণের অধিষ্ঠান-মাত্রে ভর করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিরন্তর প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

ব্রহ্মোপাসকেরা যে, পরমাত্মাকে পুরুষ বলেন তাহার অর্থ এই যে, পরমাত্মা জ্ঞানে পরিপূর্ণ, প্রেমে পরিপূর্ণ, আর, অটল প্রশান্ত গম্ভীর মহদ্বল এবং মহোদ্যমে পরিপূর্ণ। অভিধানের মতেও পুরুষ-শব্দ পূর্ণতা ব্যঞ্জক—শূন্যতাব্যঞ্জক নহে।

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকেরা এক্ষণে স্পেন্সর্, হক্সলী প্রভৃতি সুপক্ক বিজ্ঞানবিৎ কিন্তু অপক্ক তত্ত্ববিৎ আর, হার্টমান্ প্রভৃতি দিশাহারা উদ্‌ভ্রান্ত তত্ত্ববিৎ, এই দুই ধাঁচার পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলীর অধমাংশ হইতে গোটাকতক অর্থহীন শব্দ খুঁটাইয়া আনিয়া তাহাই অল্পবয়স্ক বালকদিগকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছেন; আর, সেই অল্পবয়স্ক বালকেরা স্ব স্ব কচি মস্তিকের উদ্ভাবিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মধ্যে সেই সকল চক্‌চোকে ঝুঁটা সামগ্রীর দোকান সাজাইয়া আপনাদের মতন আর পাঁচ জন অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষু আকর্ষণ করিতেছেন। এইরূপ করিয়া আপনারাও ফাঁদে পড়িতেছেন, অন্য লোকদিগকেও ফাঁদে ফেলিতেছেন।

সেই সকল রঙ্‌চঙে কথার মধ্যে একটি সর্ব্বনেশে কথা এই যে, God is impersonal অর্থাৎ পরমেশ্বর অপুরুষাত্মক? আমাদের দেশের শাস্ত্রে ঠিক্ ইহার উল্‌টা কথা রহিয়াছে। যে শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর সেই শাস্ত্রই বলিবে যে পরমেশ্বর বিশিষ্টরূপে পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যে শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর সেই শাস্ত্রই বলিবে যে, পরমাত্মা যা পরম পুরুষও তাই; মহাত্মা যা মহাপুরুষও তাই—আত্মাও যা পুরুষও তাই। God is impersonal ইহার অবিকল অনুবাদ এই যে, পরমেশ্বর অপুরুষ, অথবা যাহা একই কথা—পরমেশ্বর অনাত্মা।

অনেক নব্য ইউরোপীয় দর্শনকার কাণ্টের দোহাই দিয়া পরমাত্মাকে মনের ভাব মাত্র বলেন। মনের ভাবকে যেমন জড় বস্তু বলা যাইতে পারে না, তেমনি আত্মাও বলা যাইতে পারেনা। পরমেশ্বর যদি তোমার আমার মনের ভাব বই আর কিছুই না হন, তবে তিনি অনাত্মাই তো বটে—অপুরুষই তো বটে। কিন্তু বাস্তবিক পরমাত্মা কি অনাত্মা? তাহা দূরে থাকুক্, তিনি পরম আত্মা, পরম পুরুষ। প্রকৃত কথা এই যে, পরমাত্মাকে অপুরুষ বা অনাত্মা বলা মায়াবাদের পরাকাষ্ঠা প্রান্ত সীমা—এমন কি বেদান্ত দর্শনও মায়াবাদের পথে অতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হ'ন নাই। বেদান্তদর্শন জগৎ মিথ্যা পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত আছেন—কিন্তু কাণ্টের ভীষণ মায়াবাদ সকল সত্যের মূল সত্য পর ব্রহ্মকে পর্য্যন্ত মনের একটা ভাবমাত্র বলিয়া প্রতিপাদন করিতে বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছে! স্বয়ং পরমাত্মা যিনি পরিপূর্ণ সত্য তিনিই যদি জীবাত্মার মনের ভাবমাত্র হইলেন, তবে অপূর্ণ জীবাত্মা দাঁড়াইবে কোথায়? তবে, জীবাত্মা পরমাত্মা জগৎ সমস্তই ভ্রম ভ্রম ভ্রম, সত্যও ভ্রম, মিথ্যাও ভ্রম, সবই ভ্রম। এই সকল ঊনবিংশ শতাব্দীর বিলাতি অনাত্ম-বাদ নিতান্তই প্রলাপ বাক্য। এ গুলার মতো তীব্র অনাত্ম-বাদ নহে কিন্তু তাহাকে অনাত্ম-বাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে এইরূপ নরম ভাবের আর এক প্রকার অনাত্মবাদ আছে— সেটা হ'চ্চে দিশী অনাত্মবাদ ; তাহা এই ;—

ঈশ্বর এবং ঐশী শক্তি দুইকে পরস্পর হইতে পৃথক্‌রূপে ভাবনা করিলে এক দিকে দাঁড়ায় শক্তি বিহীন সাক্ষী মাত্র রূপী উদাসীন ঈশ্বর আর এক দিকে দাঁড়ায় জ্ঞানহীনা শক্তিরূপিণী উন্মাদিনী ঈশ্বরী। সেরূপ শক্তিহীন উদাসীন ঈশ্বরও অনাত্মা, আর, সেরূপ

জ্ঞানহীনা উন্মাদিনী ঈশ্বরীও অনাত্মা; দুইই শুদ্ধ কেবল মনের ভাব মাত্র। কেননা, শুধু জ্ঞানেও আত্মা হয় না—শুধু কর্ম্মোদ্যমেও আত্মা হয় না; ইচ্ছা এবং অনুরাগ সমন্বিত উদ্যমশীল জ্ঞানই আত্মার বিশিষ্ট লক্ষণ। পরমাত্মা সৎ চিৎ এবং আনন্দ তিনিই একাধারে।

সেই পরম মঙ্গলালয় পিতা মাতা সুহৃৎ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা ইহলোকে পরলোকে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান আছেন জানিয়া শুদ্ধ কেবল সেই ভরসায় তাঁহার ভক্ত এবং প্রিয়কার্য্যকারী সাধু পুরুষেরা মৃত্যুতেও আনন্দের আস্বাদ প্রাপ্ত হ'ন। তাঁহারা নিদ্রাকে যেমন জগজ্জনীর ক্রোড় মনে করেন—মৃত্যুকেও সেইরূপ। তাঁহারা জানেন যে, দিবসের পরে রাত্রি আসে বলিয়া দিবসের উন্নতি স্রোত বন্ধ হয় না, সৃষ্টিস্থিতির পরে প্রলয় আসে বলিয়া সৃষ্টির উন্নতিস্রোত বন্ধ হয় না; কোনো বাধা বিঘ্নেই—না ব্যক্তিগত উন্নতিস্রোত বন্ধ হয়—না সমাজের উন্নতিস্রোত বন্ধ হয়—না জগতের উন্নতিস্রোত বন্ধ হয়। তাঁহারা জানেন যে এক দিবসের উন্নতি-স্রোত নিদ্রার উদ্‌ঘাটন করিয়া পর দিবসে সংক্রামিত হয়; ইহলোকের উন্নতি-স্রোত মৃত্যুর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পরলোকে সংক্রামিত হয়, সত্যযুগের উন্নতিস্রোত কলিযুগের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া পরবর্ত্তী সত্যযুগে সংক্রামিত হয়, পূর্ব্ব সৃষ্টির উন্নতিস্রোত প্রলয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া উত্তর সৃষ্টিতে সংক্রামিত হয়। নিদ্রা মৃত্যু কলি এবং প্রলয় বিশ্ব সঙ্গীতের মাঝের ফাঁকতাল মাত্র; তাহাতে সঙ্গীতের তাল ভঙ্গও হয় না—তান-ভঙ্গও হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যকারী ভক্ত সন্তানদিগের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিস্রোত বন্ধ হইতে পারে না; তাই ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

''ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'' তাত! কল্যাণকারী কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। আজ, যে বালক বর্ণমালার দ্বিতীয় পাঠ সাঙ্গ করিল, কাল সে বালক বর্ণমালার পঞ্চম পাঠ সাঙ্গ করিবে; পরশ্ব, হিতোপদেশ ধরিবে। তাহার পরে সে বালক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া শিক্ষককে দেখাইলে শিক্ষক যদি তাহাকে বলেন যে, তোমার প্রবন্ধে বানানের অনেকগুলো ভুল দৃষ্ট হইতেছে—পুনরায় তুমি নিচের শ্রেণীতে গিয়া বর্ণমালা ভাল করিয়া শিক্ষা কর; তবে বালকের সেই যে ক্ষণিক অবনতি, তাহা উন্নতিরই সোপান। অতএব এটা স্থির যে, আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে যাহা অবনতি বলিয়া মনে হয়, তাহা উন্নতিরই সোপান।

পাপাসক্তিই মনুষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র প্রতিবন্ধক। মনুষ্যের আত্মা যখন পাপে আক্রান্ত হয়, তখন সে উন্নতিস্রোতের উজানে হাত পা আছড়াইতে থাকে, আর, যতই সে হাত পা আছড়াইতে থাকে—ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম ততই তাহাকে বল পূর্ব্বক অথচ ধীরে ধীরে টানিয়া হেঁচড়িয়া মঙ্গলের পথে ফিরাইবার জন্য তৎপর হয়। পাপাসক্তি প্রথমে মনুষ্যের আত্মাকে বিষয়ের মায়াপাশে বন্ধন করে, তাহার পরে দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া এক দিকে সেই বন্ধনের গ্রন্থিগুলা শক্ত করিয়া আঁটিয়া দেয়, আর একদিকে তাহাকে অহঙ্কার-মদে এরূপ উন্মত্ত করিয়া তোলে যে যতই সে রিপুগণের দাসত্ব-শৃঙ্খলে জড়াইয়া পড়িতে থাকে ততই সে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মনে করে, আর, সেই বড়ত্ব দৃঢ়রূপে সমর্থন করিবার জন্য বিবিধ উপায়ে অন্যের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। তাহার পরে ঈশ্বর-প্রেরিত শুভ বুদ্ধির আলোকে মনুষ্যের যখন চক্ষু ফোটে, তখন সে দুর্ব্বুদ্ধির সেই সকল পুষ্পময় কঠোর গ্রন্থি একে একে খুলিয়া ফেলে, এবং অহঙ্কারের বিষপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে ঈশ্বরের নিকট শান্তি-সুধা প্রার্থনা করে; এবং ক্রমে ক্রমে; ঈশ্বরের প্রেমামৃত পানে আত্মাতে বল-সঞ্চয় করিয়া পাপাসক্তির জটিল পাশ কঠোরতা সহকারে ছিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপে যখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে পাপাসক্তির বন্ধনপাশ অপনীত হয়, তখনও কিন্তু ক্ষীত

বন্ধন স্থান গুলাতে বেদনা থাকে তাহার পরে যখন সাধক ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার সুর মিলাইয়া তাঁহার আদিষ্ট কল্যাণ-পথে যাত্রারম্ভ করে, যাত্রারম্ভ করিয়া সেই পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকে, তখন পরমাত্মা যথোপযুক্ত মুহূর্ত্তে অজ্ঞানান্ধকারের যবনিকা অপসারণ করিয়া তাঁহার নিকট আপনার প্রেমানন্দ মূর্ত্তি প্রকাশ করেন; তখন সাধকের "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" হৃদয় গ্রন্থি ভগ্ন হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়, পাপ তাপ সমূলে উচ্ছিন্ন হয়। আত্মার এইরূপ পাপবিনির্মুক্ত স্বচ্ছ সুনির্ম্মল অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দের অবস্থাই মুক্তির অবস্থা। পাপ হইতে মুক্তিই মুক্তি। ভিতর বাহিরের পাপ হইতে মুক্তি—শুধু কেবল বাহিরের পাপ হইতে নহে। এমনও হইতে পারে, যে লোককে দেখাইবার জন্য পরোপকার করিতেছে—সবই করিতেছে—অথচ তাহার মন হইতে পাপ যায় নাই। এই লোকে কেবল এ'র ও'র তা'র দোষ অন্বেষণ করিয়া—কথার ছল ধরিয়া—এবং আচার ব্যবহারের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়া মনের অভ্যন্তরে ক্রমিকই আপনার সাধুমত্তার অহমিকা সঞ্চয় করিতে থাকে। সেক্স্পীয়র্ বলিয়াছেন "wish is father to the thought" ইচ্ছা চিন্তার জনয়িতা। ইঁহাদের ইচ্ছা এই যে, আর সকলে পাপী হোক্, তাহা হইলে তাহাদের সহিত তুলনায় তাঁহাদের নিজের সাধুতা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইবে। যেমন তাঁহাদের ইচ্ছা তেমনি তাঁহাদের ভাবনা। তাঁহারা আপনা-আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাধু মনে করেন। পুণ্যাভিমানের পাশে যাঁহাদের অন্তঃকরণ এইরূপ জড়িত-বিজড়িত, তাহারা সহস্র বাহ্যশোভন সাধু ব্যবহার করিলেও সাধু হইতে পারে না। যিনি লোকের প্রতি সদ্‌ভাব মুখে ব্যক্ত করিয়াও ক্ষান্ত হ'ন না—কাজে দেখাইয়াও ক্ষান্ত হ'ন না—কিন্তু মনের অভ্যন্তরে সত্য সত্যই পোষণ করেন; সত্য সত্যই যিনি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত লোকের মঙ্গল কামনা করেন, পিতা যেমন পুত্রের মঙ্গল কামনা করে—বন্ধু যেমন বন্ধুর মঙ্গল কামনা করে—তেমনি যিনি বিধর্ম্মী শত্রু মিত্র সকল লোকের সত্য সত্যই মঙ্গল কামনা করেন; আর যাহাতে যাহার মঙ্গল হইতে পারে তাহার জন্য প্রেমপূর্ণ সদুপায় অবলম্বন করেন—যিনি ঈশ্বর প্রেমে বিভোর হইয়া, নিষ্পাপ এবং নির্ম্মল চিত্ত হইয়া, পাপ এবং পুণ্য দুইই মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলেন, তাঁহাকেই বলা যাইতে যে, তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ।

পাপ বন্ধন যেমন উন্নতি-স্রোতের প্রতিবন্ধক—মুক্তি তেমনি উন্নতির সোপান। মুক্ত আত্মা স্বচ্ছ প্রতিফলকের সহিত উপমেয়। দীপের আলোক এবং প্রতিফলকের প্রত্যালোক এক সঙ্গে মিলিত হইয়া যেমন গৃহ উজ্জ্বল করে; তেমনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান প্রেম এবং উদ্যমের রশ্মি মুক্ত আত্মাতে যতই বর্ষিত হয় ততই তাহা প্রতিফলিত হইয়া সেই আলোকের সহিত সেই প্রতিবিম্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর আলিঙ্গনে মিশিয়া যাইতে থাকে; আর যতই মিশিয়া যাইতে থাকে ততই আনন্দ হইতে আনন্দে, শান্তি হইতে শান্তিতে, উদ্যম হইতে উদ্যমে, জ্ঞান হইতে জ্ঞানে, বিকাশ হইতে বিকাশে পদ নিক্ষেপ করিতে থাকে। ইহারই নাম মুক্তি;—মুক্তি নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির অক্ষয় উৎস।

অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি;—মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অসীম করুণায় আমি আমার নির্জীব হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের যে টুকু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া ধরাইয়াছি, তাহা সাধ্যানুসারে আপনাদের সমক্ষে অনাবৃত করিলাম। আন্দোলনের বাতাস দিয়া আপনারা তাহাকে রীতিমত প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতে সহায়তা করিবেন এই আমার মনোগত অভিলাষ। এ অগ্নি লোকসমাজে একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তাহার পরে তাহার উপরে যিনি যে

ভাবেই বাতাস দি'ন—জ্বালাইতে ইচ্ছা করিয়াই বাতাস দিন, আর নিভাইতে ইচ্ছা করিয়াই বাতাস দি'ন—যে ভাবেই বাতাস দি'ন সে অগ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিতই হইতে থাকিবে। আমি করিলাম আর কিছুই না—যে স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, ঘন্টা দু'ঘন্টা তাহাতে বায়ু ব্যজন করিলাম। আমার যা কাজ আমি তাহা যথাসাধ্য করিয়া চুকিলাম; আপনার যাহা আপনাদের কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন আপনারা তাহা করুন;—এক্ষণে অবসর দি'ন—আমি ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে একটি সুসমাচার প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

শাক্ত সম্প্রদায় শক্তিরই সাধনে রত; কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে প্রেমের নিকটে শক্তি নতশির। ইংরাজিতে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে বটে যে Might is right বলই ধর্ম্ম, কিন্তু এ প্রবাদটির বলবত্তা কেবল ভৌতিক এবং পৈশাচিক রাজ্যেই খাটে—আধ্যাত্মিক রাজ্যে খাটেনা। আধ্যাত্মিক রাজ্যের তোরণের মাথায় ঠিক উহার বিপরিত কথা লেখা রহিয়াছে;—লেখা রহিয়াছে যে, Right is might ধর্ম্মই বল অথবা যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। শাক্তেরা নিছক বলের উপাসনা করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের এই যে সকল অস্ত্র—বলিদানের খাঁড়া, ডাকাতির তলোয়ার, মারণ উচাটন এবং বশীকরণের মন্ত্র—এসব শাণিত অস্ত্রে কলঙ্ক ধরিয়া ওগুলা একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রেমেরই সাধনে রত। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রেমের অতীব উচ্চ মর্য্যাদা তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু প্রেমকে নিয়মে রাখিতে পারে এরূপ একজন পাকা অভিভাবক তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, আর, তাহার কর্ম্ম-কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারে এরূপ একজন শক্ত-সমর্থ সুনিপুণ কর্ম্মচারী তাহার পক্ষে তেমনি প্রয়োজনীয়। সে অভিভাবক হ'চ্চে জ্ঞান, আর, সে কর্ম্মচারী হ'চ্চে উদ্যমশীলতা। জ্ঞানের অভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম উন্মত্ততা এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় আক্রান্ত হইয়াছে, আর উদ্যমশীলতার অভাবে প্রেম অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মদিগের স্কন্ধে এক্ষণে ব্যাপক-তর এবং গভীরতর সাধনের ভার আসিয়া পড়িয়াছে, সে সাধন হ'চ্চে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রীতি, এবং ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য, তিনের সামঞ্জস্য পূর্ব্বক সাধন।

আমাদের স্কন্ধের ভার এইরূপ গুরুতর, অথচ আমরা সাধনের পথে নূতন ব্রতী। আমাদের পদে পদে ভ্রম প্রমাদ মোহ, পদে পদে প্রলোভন এবং বিভীষিকা, পদে পদে বাধা বিঘ্ন! হাফেজ কি বলিতেছেন শ্রবণ করুন্ ঃ—

রাত্রি অন্ধকার! উঠিছে তরঙ্গ!
ঘুরিছে ঘূর্ণার পাক লক্ষিয়া পাতাল!
এ হেন বিভ্রাট ঘোর তা'রা কি বুঝিবে
দাঁড়াইয়া আছে যারা নিরাপদ কূলে।

কিন্তু পরমেশ্বর আমাদের কাণ্ডারী—কি ভয়! রাত্রি প্রভাত হইবে—তরঙ্গের উদ্যম অবসান হইবে—ঘূর্ণার ঘোর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে—নৌকা বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া শান্তির কূলে উপনীত হইবে—ধন্য পরমাত্মার করুণা, ধন্য পরমাত্মার প্রেম, ধন্য পরমাত্মার মহীয়সী শক্তি!

# সভাপতির অভিভাষণ*

সভাস্থ সজ্জনগণ।

দুই বৎসরকাল আমি আপনাদের সাদর আহ্বানের আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া সাহসে ভর করিয়া ভয়ে ভয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আমার ভয়ের কারণ এই যে, এ'র পূর্ব্বে সভাপতির কার্য্য আমি আমার বয়সে কখনো করি নাই;—কাজেই, সে কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে হইলে যে সকল উচ্চ অঙ্গের বশীকরণ গুণ আবশ্যক, তাহার কিছুই আমার ভিতরে নাই। আমি একপ্রকার খোঁয়ে বন্ধনে আটক পড়িয়া গিয়াছি। খই হ'চ্চে আশার প্রলোভন, আর থাম হ'চ্চে সভাপতির আসন। কোনো গতিকে যদি দেশীয় সাহিত্য-সেবকদিগের কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারে—এ ছার আশার মায়াও আমাকে ছাড়িতেছে না, আর উপকার কাহারো কিছু করিতে পারিব না, লাভের মধ্যে হইবে কেবল—কাহারও বা কৌতুক দৃষ্টির, কাহারও বা বিষদৃষ্টির, কাহারও বা কৃপাদৃষ্টির লক্ষ্যস্থান; এ ছাড়া দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাও আমাকে ছাড়িতেছে না। আমার ভয়ের কারণ কি তাহা বলিলাম,—সাহসের কারণ কি তাহাও বলি। সাহসের কারণ এই যে, বঙ্গ সাহিত্যের আমি একজন পুরাতন পরিচারক। দশোন অর্দ্ধ শতাব্দী প্রতিদিন আমি তাঁহার চরণকমলে বিবিধ বর্ণের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছি; আর, সেই উপলক্ষে তাঁহার দেবালয়ের সন্নিহিত নিবিড় বনাকীর্ণ প্রদেশের পথ-ঘাট এবং অন্ধিসন্ধি কতক কতক আমার জানা হইয়াছে। সেই আরণ্যক পতিত ভূমিতে কোথাও বা ফুলের মালঞ্চ, কোথাও বা সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনের ছায়াময়ী বীথিকা, কোথাও বা ফুলের উদ্যান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বিহিত প্রণালী-পদ্ধতি কতক বা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, কতক বা ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক বা হাতে কলমে করিয়া-কর্ম্মিয়া শিখিয়াছি, আর, তা যাহা শিখিয়াছি তাহাতে জোশো করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কাজ চালানো যাইতে না পারে এমন নহে। তা ছাড়া, আমার সাহসের আর একটি কারণ আছে—সেইটিই প্রবল কারণ; তাহা এই যে, সাহিত্য পরিষদের শিরোভূষণস্বরূপ তিন চার জন সম্মানাস্পদ মহোদয় আমাকে এই বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন যে, আমার কার্য্যপটুতার অভাব, তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা দ্বারা পূরণ করিয়া লইবেন। ইঁহাদের অটল পৃষ্ঠপোষকতা এবং অকৃত্রিম উৎসাহ প্রদানের বলে আমি এযাবৎকাল সাভাপত্য কার্য্য কথঞ্চিৎরূপে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতে পারিয়াছি। সত্য বলিতে কি—কার্য্যভার আমাকে ততটা বহন করিতে হয় নাই—যতটা উঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভার। বিশেষতঃ বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যেমন সুপণ্ডিত

* পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিগত ৪ঠা বৈশাখ সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে যে বার্ষিক অভিভাষণ। (অর্থাৎ address) পাঠ করেন, তাহাই প্রকাশিত হইল।

তেমনি সুযোগ্য, যেমন সুযোগ্য, তেমনি পরিশ্রমী; যেমন পরিশ্রমী, তেমনি ধীর, সহৃদয় এবং বিনয়-সম্পন্ন, আর, সেই কারণে সভাশুদ্ধ লোকের পরম প্রীতিভাজন; এই রূপ সহস্রের মধ্যে এক যিনি আমাদের সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁহার শ্লাঘনীয় গুণরাশি আজীবন আমার স্মরণ-পুটে মুদ্রিত থাকিবে।

দুই সংবৎসরকালের পরীক্ষার তোলা-পাড়ায় পরিষদের অবলম্বনীয় কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আমি মোটামুটি একটি সার কথা বুঝিয়াছি। সে কথা এই যে, প্রথম নেপোলিয়ন যখন গোলোন্দাজি সৈন্যবিভাগে অধ্যক্ষতায় নিয়োজিত হইয়া লাইয়ন্স নগরের প্রত্যভিমুখে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিলেন,—এলাহি কারখানা—নবাবি রকমের বন্দোবস্ত—অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটী নাই, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জা, কিছুরই অপ্রতুল নাই! "পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং" এই চাণক্য শ্লোকার্দ্ধটির অনুবাদ একজন পাঠশালার ছাত্র এরূপ করিয়াছিল যে, পণ্ডিতের সবই গুণ—দোষের মধ্যে কেবল তিনি মূর্খ। নেপোলিয়ন তেমনি দেখিলেন যে, সবই অতি পরিপাটী বন্দোবস্ত, দোষের মধ্যে কেবল, গোলা তপ্ত করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে ক্রোশ-খানেক অন্তরে, তপ্ত করিয়া তাহাকে কার্য্যস্থানে আনিতে না আনিতেই পথিমধ্যে তাহা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, গোলা নিক্ষেপ করা হইতেছে দুর্গের প্রতি, পড়িতেছে তাহা দুর্গে না পৌঁছিয়া মাঝখানকার ফাঁকা স্থানে। আক্রমণ করা উচিত জাহাজের বন্দর, আক্রমণের চেষ্টা নগরের সুরক্ষিত বক্ষঃস্থলের উপরেই বিফলে ক্ষপিত হইতেছে। আমি তাই বলি যে, এইরূপ বৃথা পণ্ডশ্রমের তুমুল কাণ্ডকারখানা হইতে পরিষদের হস্ত যত অলগ্ থাকে ততই ভাল। কেননা ওরূপ কাণ্ডকারখানা হইতে ফল যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহা উহার গায়ে লেখা রহিয়াছে—কী? না বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া! এখনো সময় হাত ছাড়া হয় নাই;—পরিষৎ যদি সুবুদ্ধির পরামর্শ শোনেন, তবে এই বেলা তিনি সিরাজুদ্দৌলাদিগের নিকট হইতে শেখা অকেজো নবাবি চাল দূরে বিসর্জ্জন করিয়া ক্লাইভ এবং তাঁহার তুখোড় বুদ্ধিমান্ চেলাদিগের নিকট হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক্ষম পাকা চাল্ শিক্ষা করুন; কিরূপে প্রথমে সহজ-সাধ্য আশপাশের ছোটি ছোট কার্য্যগুলা হস্ত হইতে নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে হয় তাহার পরে কিরূপ আটঘাট-বাঁধিয়া দৃঢ়তার সহিত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পা বাড়াইতে হয় তাহার পরে কিরূপে সম্যক্ যোগাড়যন্ত্র করিয়া আয়াসসাধ্য বড় বড় কার্য্যগুলা একে একে মুঠার মধ্যে আনিতে হয়; সংক্ষেপে—কিরূপে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইতে হয় তাহার সুবিজ্ঞ প্রণালী-পদ্ধতি বিধিমতপ্রকারে শিক্ষা করুন; শিক্ষা করিয়া তদনুসারে তৎপরতার সহিত স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Petty intrigues, সেই সকল কর্ম্মনাশা জঞ্জালগুলা সমূলে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া ঘর পরিষ্কার করুন, ঘর পরিষ্কার করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে মূলমন্ত্র (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Cause সেই মূলমন্ত্র) জপ করুন; এবং সেই মূলমন্ত্রকে (Causeকে) সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া ও তাঁহার অধীনে সুবিনীত সৈন্যদলের ন্যায় যন্ত্রবদ্ধ হইয়া—সকলের সহিত সকলে একাত্মা হইয়া—কোমর বাঁধিয়া কাজে লাগুন্। এখনও যদি পরিষদ্ গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া এইরূপ সুবিহিত প্রণালীতে কার্য্যারম্ভ করেন, তবে যাহা তিনি পঞ্চাশ বৎসরে দেখিতে পাইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা দশ বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার আনন্দোৎফুল্ল নয়ন-যুগলের সম্মুখে আপনা হইতে আসিয়া বিরাজমান হইবে। সে যাহা বিরাজমান হইবে তাহা কী?

তাহা সিদ্ধিদেবীর প্রসন্ন বদন যাহার দর্শন-লাভ বাঙ্গালীর পক্ষে ঘটে কদাচ—ঘটে না কেবল তাহার আপনার দোষে।

সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য যেমন মহৎ এবং উদ্যম যেমন প্রশংসনীয়—তাহার কার্য্য নির্ব্বাহের প্রণালী-পদ্ধতি তেমনি প্রকৃষ্টরূপে ফলদায়ক হওয়া চাই; নহিলে তাঁহার উপক্রমণিকার সহিত উপসংহারের দেখা সাক্ষাতের পথে কাঁটা পড়িবে; অর্থাৎ গোড়ার কথা হইয়াছিল একপ্রকার—ফল দাঁড়াইবে আর-এক-প্রকার।

সাহিত্য-পরিষদের পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্যের পৃথক্ পৃথক্ সাধনপ্রণালী আমার বুদ্ধিতে আমি যাহা সুসঙ্গত বিবেচনা করি তাহা একে একে আপনাদের দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করিতেছি। আমার মন্তব্য কথাগুলির প্রতি আপনাদের বড় জোর ঘণ্টা দুয়েকের মনোযোগ যাচ্ঞা করিতেছি—এই সামান্য ভিক্ষাটি আজ আপনারা আমাকে প্রদান করিতে ভারবোধ করিলে চলিবে না।

সাহিত্য-পরিষদের প্রথম উদ্দেশ্য—বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন। স্বদেশীয় সাহিত্যানুরাগী কৃতবিদ্য মহোদয়েরা অনেক সময় এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, আজ পর্য্যন্ত দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে বঙ্গভাষার একখানিও সন্তোষজনক ব্যাকরণ বাহির হইল না। ইঁহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ যদি বঙ্গভাষার একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে একটা কাজের মত কাজ হয়। ব্যাকরণ বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝি তাহা স্বতন্ত্র, এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ যাহা আমি বলিতেছি হইলে ভাল হয়, তাহা স্বতন্ত্র। যেরূপ ধরনের বঙ্গীয় ব্যাকরণ সচরাচর মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতে দেখা যায় তাহা সাহিত্য-সেবকদিগের কাহারো কোনো উপকারে আসিতে পারে না, উপকারে আশা দূরে থাকুক—তাহার সকল কথা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিলে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। কিরূপ হিতে বিপরীত হয়, তাহার আমি অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। আপনারা ভীত হইবেন না—আজ আমি কেবল আমার ঐ মন্তব্য কথাটির একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ভালোয় ভালোয় ক্ষান্ত হইতেছি।

বলিতে কি—না পড়িয়া পণ্ডিতকে সংক্ষেপে N.P.P. কে তত আমি ডরাই না—যত আমি ডরাই পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া দিগ্গজ পণ্ডিতকে, P.K.D.P. কে। শেষোক্ত শ্রেণীর কোন ব্যাকরণ দিগ্গজ বলিতে পারেন যে, ইংরাজেরাই বলে "Do this কর এই"—আমরা বলি "এই কর this do"; অতএব সাবধান! বাঙ্গালা লিখিবার সময় ক্রিয়া-কারকের পরে কর্ম্মকারক বসাইও না—যেহেতু বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিধান-মতে তাহা নিষিদ্ধ। বাঙ্গলা ব্যাকরণের বিধান এই যে, অগ্রে কর্ম্মকারক—পরে ক্রিয়াকারক—নিবেশিতব্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া তাঁহার একটি বাল্যকালের সহাধ্যায়ী বন্ধু তাঁহার শিখা ধরিয়া টান দিলেন; টান প্রাপ্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাগত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কর কি"—"কি কর" না বলিয়া বলিলেন "কর কি"! এইরূপে যখন তিনি মুখে বলিলেন "ক্রিয়া-কারকের পরে কর্ম্মকারক বসাইতে নাই" অথচ, কাজে তিনি অম্লান বদনে ক্রিয়াকারকের পরে কর্ম্মকারক বসাইয়া বলিলেন "কর কি" তখন তাঁহার বাল্যকালের সহাধ্যায়ী বন্ধুটি জো পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "বল্লে এক—ক'ল্লে আর"! ভট্ট মহাশয়ও যেমন উদ্ভট্ট মহাশয়ও তেমনি! যেমন গুরু তেমনি চেলা! ভট্ট মহাশয়ও ক্রিয়ার পরে কর্ম্ম বসাইয়া বলিলেন 'কর কি'? উদ্ভট্ট মহাশয়ও ক্রিয়ার

পরে কর্ম্ম বসাইয়া বলিলেন—"বলিলে এক করিলে আর"। অতএব ভট্ট মহাশয়ের হার, উদ্ভট্ট মহাশয়ের জিত। তবেই হইতেছে যে, ভাষার প্রচলিত প্রথার উপরে বৈয়াকরণিক পণ্ডিতের পুঁথিগতবিদ্যার তর্জ্জন গর্জ্জন খাটে না। প্রচলিত প্রথাটিকে আপনারা কম লোক ঠাওরাইবেন না। প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণকেও ব্যাকরণ দিতে পারে! কে বলে যে, প্রচলিত প্রথা ব্যাকরণ মানে না? ব্যাকরণ খুবই মানে! কিন্তু সে ব্যাকরণ যাহা সে মানে, তাহা তোমার আমার প্রণীত ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ নহে; তাহা মা সরস্বতীর সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণ! এই সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের অমুক অধ্যায়ের অমুক সূত্রে আছে যে, যেখানে কারকের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক সেই স্থানে সেই কারক সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিতব্য। সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের এই প্রশস্ত বিধানটি আমাদের কানে আজ পুরাতন ঠেকিতে পারে, কিন্তু কাজে চিরকালই আমরা ইহার অধীনে গ্রীবা অবনত করিয়া আসিতেছি। যখন কর্ম্ম অপেক্ষা ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন আমরা "কি করিলাম" বলি না—তখন বলি "করিলাম কি"। যখন কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ম্মের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয়; তখন আমরা "আমি তোমাকে ডাকি নাই" বলি না—তখন বলি "তোমাকে আমি ডাকি নাই"। যখন কর্ত্তা অপেক্ষা ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হয়, তখন আমরা "সে যা'ক্ যেখানে তার ইচ্ছা" বলিনা—তখন বলি "যা'ক সে যেখানে তার ইচ্ছা"। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের কাছে ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণের * দম্ভ-আস্ফালন খাটে না। সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের শাসনাধিকার (Jurisdiction) কেবল আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গভূমিতেই আবদ্ধ নহে, তাহার দৌড় পৃথিবীর এমুড়া হইতে ওমুড়া পর্য্যন্ত। সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের ঐ যে একটি সূত্র—যে, যেস্থানে যে কারকের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক সেই স্থানে সেই কারক সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিতব্য, এই সূত্রটির একটি অতি পরিপাটী উদাহরণ সেক্স্পীয়রের জুলিয়স্ সীজারের প্রথম পংক্তিতেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রোমনগরের ইতর শ্রেণীর কারিকরেরা সীজারের বিজয়-মাহাত্ম্য-ঘটা দর্শনার্থে দঙ্গল বাঁধিয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রোমের একজন মাথালো ব্যক্তি তাহাদিগকে সীজারের পক্ষপাতিতা হইতে

---

* এখানে ভট্টাচার্য্যের অর্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহে। পুঁথিগত বিদ্যাই যাঁহার সর্ব্বস্ব তাঁহাকেই এখানে ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রদান করা হইতেছে। যিনি স্থানাস্থান কালাকাল পাত্রাপাত্র নির্ব্বিচারে সব তাতেই পুঁথিগত বিদ্যা খাটাইতে তৎপর, তিনিই এখানে ভট্টাচার্য; তিনি ইংরাজ হইলেও ভট্টাচার্য্য, বাঙ্গালী হইলে ভট্টাচার্য্য, শূদ্র হইলেও ভট্টাচার্য্য যবন হইলেও ভট্টাচার্য্য। তেমনি আবার, কোন্ বিদ্যা কোথায় খাটে কোথায় খাটে না, যেখানে খাটে সেখানে কিভাবে খাটে কিভাবে খাটে না, কোন পাত্রে খাটে কোন পাত্রে খাটে না যে পাত্রে খাটে সে পাত্রের কোন্ অবস্থায় খাটে কোন্ অবস্থায় খাটে না, এই সকল বিষয় যাঁহার জানা আছে, এক কথায়—যাঁহার স্থানাস্থান কালাকাল পাত্রাপাত্র বোধ আছে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও—জাগ্রত জীবন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও—প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সন্ধ্যাবন্দনা এবং গঙ্গাস্নানাদি করিলেও—এখনকার শাস্ত্র অনুসারে ভট্টাচার্য্য উপাধি তাঁহাতে বর্ত্তিতে পারে না। ভট্টাচার্য্য শব্দের অর্থ আর কিছু না—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Pedant। ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ কি? না, যে ব্যাকরণ ছাত্রদিগকে Pedantry শিক্ষা দেয়। ভট্টাচার্য্য উচ্চারণ কি? না, যে উচ্চারণ না বিশুদ্ধ বাঙ্গলা না বিশুদ্ধ সংস্কৃত, পরন্তু উভয়ের মাঝামাঝি অশুদ্ধ সংস্কৃত। "একই" এই শব্দের ভট্টাচার্য্য উচ্চারণ "একৈ" প্রকৃত উচ্চারণ "অ্যাকি"। "দেখ" এই শব্দের ভট্টাচার্য্য উচ্চারণ Dekhaw প্রকৃত উচ্চারণ "দ্যাখো"।

প্রতিনিবৃত্ত করিবার মানসে তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিলেন "Hence home ye idle creatures get ye home"! "Hence home" এই ল্যাজামুড়াবিহীন, ক্রিয়কারকের উল্লেখবিহীন খণ্ড বচনটি নাটকের শিরোভাগে সন্নিবেশিত দেখিয়া ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ অবাক্! ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণের মনোগত কথা এই যে, পংক্তিটির শিরোভাগে hence home কথাটা অনর্থক জায়গা জুড়িয়া থাকে কেন? অবিলম্বে সমালোচক ডাকাইয়া আনিয়া ক্ষৌরীকরণ দ্বারা পংক্তিটির মস্তক মুণ্ডন করানো হ'ক; তাহা হইলে উহার মুখমণ্ডলে দিব্য বৈয়াকরণিক শ্রী ফুটিয়া বাহির হইবে। তাহা হইলে নাটকের মস্তকটি শুধু কেবল "ye idle creatures get ye home" এইরূপ চাঁচা-ছোলা মূর্ত্তি ধারণ করিবে। প্রকৃত কথা এই যে, "Hence flee to your home" অথবা "hence get ye home" বলিলে মাঝে ক্রিয়া-কারকের ব্যবধানগতিকে hence শব্দ হইতে Home শব্দ দূরে পড়িয়া যায়; কিন্তু রোমান বক্তার মনের বেগ hence হইতে home-এর সেরূপ বাচনিক দূরবর্ত্তিতাও সহ্য করিতে পারে না; রোমান বক্তার মনের বেগ শ্রোতৃবর্গকে চকিতের মধ্যে স্ব স্ব ঘরে পুরিতে পারিলে তবেই শান্তি মানে। যে কথা মনের বেগ হইতে বাহির হয় সেই কথাতেই বেশী ঝোঁক পড়ে; আর, যে কথাতে বেশী ঝোঁক পড়ে, সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে বক্তার মুখ দিয়া বাহির হয়। কাজেই Hence home এই খণ্ড বচনটি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চারিত হইল। নাটকের ঐ পংক্তিটি দুই অংশে বিভক্ত; Hence home ye idle creatures এইটি প্রথম অংশ। এবং Get ye home এইটি দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে hence home-এর উপর ঝোঁক পড়িয়াছে—দ্বিতীয় অংশে get ye-র উপরে ঝোঁক পড়িয়াছে। দুই অংশের কথার উপরে ঝোঁক পড়িবার বিশিষ্টরূপ কারণ ও আছে সেই কারণ এই :—

আমরা যখন কোনো অভীষ্ট কার্য্যের সাধনে কৃত সংকল্প হই, তখন প্রথমেই আমরা তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি ঝোঁক দিয়া তাহাকে মনশ্চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্তিমান করি; তার সাক্ষী— সাহিত্যপরিষদের নিয়মাবলীতে প্রথমেই রহিয়াছে "সভার উদ্দেশ্য" এই কথাটি বড় অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত, তাহার পরে আমরা উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়ের প্রতি ঝোঁক দিয়া অবলম্বনীয় কার্য্য-প্রণালীর একটা সুব্যবস্থা ফাঁদি। রোমান বক্তার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রোতা এস্থানে না থাকুক্ এবং বাড়ীতে থাকুক্; তাই তিনি পরিহর্ত্তব্য স্থান এবং গন্তব্য স্থান এই দুই স্থানের উপর ঝোঁক দিয়া পংক্তিটির প্রথম অংশের প্রথমেই বলিলেন Hence home। তাহার পরে পথ অতিবাহনের উপায়ের প্রতি ঝোঁক দিয়া দ্বিতীয়াংশের প্রথমেই বলিলেন "Get ye যাও তোমরা"। আর একটি কথা এই যে, শ্রোতৃবর্গ নিতান্তই নগণ্য শ্রেণীর লোক বলিয়া সম্বোধন-কারকের উপর ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল না; তাই Ye idle creatures এই সম্বোধন-কারকটি প্রথমাংশের প্রথমে না বসিয়া শেষে বসিল। পক্ষান্তরে ব্রুটস্ যখন রোমানদিগকে সম্বোধন করিতেছেন তখন সম্বোধন-কারকের উপর রীতিমত ঝোঁক দেওয়া আবশ্যক হওয়াতে সর্ব্বাগ্রেই "Romans countrymen and lovers" এইরূপ সম্বোধন-কারকের ধারা-বর্ষণ হইল।

সার্ব্বভৌমিক-ব্যাকরণের কারক-বিন্যাস-ব্যবস্থা-অধ্যায়ের মূল সূত্র এই যা আমি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, বৈয়াকরণিক পণ্ডিত চূড়ামণিদিগের মত লইয়া কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া যথা স্থানে বসাইতে হইবে, এরূপ বিধান-প্রবর্ত্তনা একপ্রকার মেগের আইন

জারি। তাহার উদ্দেশ্য অতীব প্রশংসনীয়—কী? না ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন! কিন্তু শ্রীবৃদ্ধি হয় কই? হইবার মধ্যে হয় কেবল ভাষার স্বাভাবিক শ্রী ঘুচিয়া গিয়া উল্টা শ্রীর উৎপত্তি!

আমাদের দেশে বৈয়াকরণিক এবং নৈয়ায়িকদিগের প্রখর বুদ্ধির প্রতাপে মা সরস্বতী সর্ব্বদাই ভয়ে জড়সড়! ব্যাকরণ না থাকিতেই এই! একখানি তৈয়ারি ব্যাকরণ হাতে পাইলে খুনী সমালোচকেরা গ্রন্থকারদিগের হাতে মাথা কাটিবেন—সেটা বড় সর্ব্বনেশে ব্যাপার! মহাসমালোচক বল্‌টেয়ার সেক্‌স্‌পিয়রকে একেবারেই ন স্যাৎ করিয়া দিয়াছিলেন! ইংলণ্ডে নব্য সাহিত্যের উঠন্তি সময়ে (অর্থাৎ এলিজাবেথের আমলে) যদি French academy এবং Voltaire-এর ন্যায় সমজদার সমালোচকেরা Shakespeare-কে ঘিরিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে Shakespeare বেচারি Pope এবং Dryden-এর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিত না। আমি তাই বলি যে French academy-তে কাজ নাই—বঙ্গভাষা আরও কিছুদিন খেলাধুলা করিয়া স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে বিচরণ করুক। দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই বঙ্গভাষা বেচারী অকাল প্রবীণা বি এ, এম্ এ, হইয়া চসমা ধরিলে, তিনি নিখিল বিদ্বজ্জনের বিভীষিকা হইবেন—দূর হইতে নমস্কার্য্যা হইবেন, কেহই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারৎপক্ষে এগোবে না।

ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতেই হয়, তবে একদিকে সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণ, আর একদিকে দেশীয় চাষাভুষা এবং অন্তঃপুর মহলের ব্যাকরণ সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ, আর একদিকে খাস্ সংস্কৃত ব্যাকরণ, এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণী সঙ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সুপাঠ্য এবং সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে খুবই ভাল হয়; কিন্তু তাহা যতক্ষণ না হইতেছে, ততক্ষণ বঙ্গভাষা বিনা ব্যাকরণে যেমন চলিতেছে, তেমনিই আরও কিছুদিন চলুক। উঠন্তি ভাষার কাঁচ বয়সে তাহাকে ভীমার্জ্জুনের পাচো হাতিয়ার পরাইয়া ভূতলে পাড়িয়া ফেলা পরামর্শ সিদ্ধ নহে। এস্থলে কেহ যদি বলেন যে নেই মামা অপেক্ষা কাণা মামা ভাল, তবে তাহার উত্তরে আমি বলি যে, দুর্দ্দান্ত বলদ অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল; ছাত্রদিগের প্রাণবধকারী একটা যা' তা' ব্যাকরণ হওয়া অপেক্ষা, ব্যাকরণ না হওয়া ভাল।

অভিধান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সুযোগ্য পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অভিধানের যেরূপ নমুনা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা অতীব আশাপ্রদ।

এখন, বিশ্বকোষকে অভিধান বলিব কি Encyclopedia বলিব সেইটিই হচ্চে কথা। আমার বিবেচনায় বিশ্বকোষ Encyclopedia-রই সামিল। অভিধানের আকার প্রকার এবং সংঘটন প্রণালী স্বতন্ত্র। রামকমল ভট্টাচার্য্য—প্রণীত প্রকৃতিবাদ অভিধান খানি উহারই মধ্যে দেখিতে শুনিতে ভাল; কিন্তু তাহাতেও আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। আমরা চাই ওয়েব্‌ষ্টারের মত একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিধান। প্রকৃতিবাদের শব্দ-ভাণ্ডার পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম যে, চলিত ভাষার অনেকগুলি শব্দ তাহাতে নাই। টেঁকন নাই; অথচ আমরা বলি যে বিলাতি-ধুতি বেশী দিন টেঁকে না। চোঁচ শব্দ আছে কিন্তু চোঁচা শব্দ নাই; অথচ আমরা বলি "চোঁচা দৌড়।" তাড়ন শব্দ আছে কিন্তু তাড়স শব্দ নাই; অথচ আমরা বলি "ফোঁড়ার তাড়সে জ্বর হইয়াছে।" ঢোকা আছে কিন্তু ঠোকা নাই। থিতনও নাই; অথচ আমরা বলি "নদীর জল থিতিয়ে তাহার তলায় পাঁক জমিয়াছে।" থেতনো নাই। ভোঁ নাই অথচ আমরা বলি "নেশায় ভোঁ হইয়া বসিয়া আছে।" ঠিকরোনো নাই; আমরা বলি "লবণ্য ঠিকরাইয়া

পড়িতেছে।" ঠ্যাঙ আছে কিন্তু ঠ্যাঙ্গাও নাই ঠ্যাঙ্গালোও নাই। দম্‌কাও নাই; অথচ বলি দম্‌কা বাতাস। জটল্লা নাই। যোটক আছে কিন্তু যোটবন্ধী নাই—যোটপাট নাই। যোগাড় আছে কিন্তু যোগাড়যন্ত্র নাই। তা ছাড়া, অনেকগুলি শব্দের অনেকগুলি অর্থ মাঠে মারা গিয়াছে। টঙ্ক শব্দের দেখিলাম "পাথর কাটা অস্ত্র" প্রভৃতি অনেকগুলি অর্থ লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক" এখানে টঙ্ক শব্দের অর্থ কি তাহার কোনো উল্লেখ দেখিলাম না। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতিবাদ অভিধান খানি নেহাৎ ভট্টাচার্য্য অভিধান; তাহা উইল্‌সন্ সাহেবের সংস্কৃত ইংরাজি অভিধানের একপ্রকারের বাঙ্গালা অনুবাদ। প্রকৃতিবাদের বিশেষগুণ হচ্চে সাধু-ভাষার মান্য-গণ্য শব্দগুলির প্রতি যথেষ্ট যত্ন সমাদর; আর, তাহার মহৎ দোষ হচ্চে—চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীনহীন শব্দগুলির প্রতি হতশ্রদ্ধা। প্রকৃতিবাদের ঐ বিশেষ গুণটির জন্য উইল্‌সন সাহেব আমাদের নিকট বিশিষ্টরূপ ধন্যবাদের পাত্র; আর, তাহার ঐ মহৎ দোষটির জন্য তাহার লোকান্তরিত প্রণেতা রামকমল ভট্টাচার্য্য একাকী দায়ী। প্রকৃতিবাদের ঐ মহৎ দোষটির যদি তাহার পরবর্ত্তী সংস্করণে খণ্ডাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা বঙ্গভাষার দিব্য একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিধান হয়।

অতঃপর আসিতেছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাষার পরিভাষা সঙ্কলন। সাহিত্য পরিষদের এ সংকল্পটি অতি-উত্তম প্রস্তাব; কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে রীতিমত যোগাড়-যন্ত্র আবশ্যক। সাহিত্যপরিষদে আমি একটি বিষয়ের অভাব বড্ড দেখিতেছি—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের অভাব। সংস্কৃত কলেজ আছে, ভাট পাড়া আছে, নবদ্বীপ আছে, বিক্রমপুর আছে। এই সকল পুরাতন খনিতে অনেক প্রশান্ত স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল রত্ন (Many a Gem of purest ray serene) খুঁজিলে হয় ত পাওয়া যাইতে পারে; সে সকল রত্ন খুঁজিয়া পাতিয়া আনিয়া পরিষদের উষ্ণীষে বসানো না হয় কেন? তবে, এটা ঠিক যে, সভার শোভার জন্য রত্নের তেমন আমাদের প্রয়োজন নাই, যেমন সভার কাজের জন্য যত্নের আমাদের প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মধ্যে কে গুরু কে লঘু, তাহা তৌল করিয়া দেখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই; আর, তাহা তৌল করিয়া দেখিবার প্রয়োজনও আমাদের নাই। তাঁহাদের শ্রেণীর কোন সদাশয় ব্যক্তি সাহিত্য সভার কোন্ কাজে লাগিতে পারেন এবং কি হইলে তিনি সে-কার্য্যের নির্ব্বাহপক্ষে বিধিমতে সহায়তা করিতে পারেন, তাহাই কেবল আমাদের জানিবার প্রয়োজন। উঁহাদের মধ্যেকার দুইটি অভিজাতরত্নের সহিত আমার বহুকালের সৌহার্দ্দ আছে; দুইজনেরই সম্বন্ধে আমি মুক্তকণ্ঠে এবং মুক্তপ্রাণে বলিতে পারি যে, তাঁহারা সাহিত্য-পরিষদের সম্মানিত সভ্য হইলে পরিভাষা সমিতির এবং আর আর শাখা-সমিতির উপকারে আসিতে পারেন। উভয়েই তাঁহারা সংস্কৃতের অগম্য কৈলাস-শিখর হইতে বাঙ্গালার আসরে নামিয়াছেন; আর, সেইটিই তাঁহাদের বিশেষত্ব। এসম্বন্ধে যদি আপনাদের মধ্যে কাহারও মনোমধ্যে কোনো প্রকার কিন্তু বা সন্দেহ থাকে, তবে তাঁহাদের দুইজনের নাম করিলেই সে সন্দেহ তন্দণ্ডেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। একজন হচ্চেন দর্শনাস্ত্রের অনুবাদক শ্রীযুক্তকালীবর বেদান্ত বাগীশ মহাশয় আর একজন হচ্চেন রামায়ণের অনুবাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়। এ দুই মহাত্মা নামে শুধু নয় কিন্তু কাজে আমাদের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছেন কেননা, উভয়েই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট অধিকার ক্ষেত্রে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন।

পারিভাষিক সমিতির যদি রীতিমত কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকে তবে তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য যে, তিনি সুবিধামতে মাঝে মাঝে দিনস্থির করিয়া সেই সেইদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভা আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তিশালী সেই বিষয়ের অধিকারভুক্ত শব্দাদি আয়োজনের ভার তাঁহার হস্তে বিন্যস্ত করেন।

প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজসাধ্য বিষয় হইতে কার্য্যারম্ভ করা হোক্ :—

বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বলা হোক্ যে, ভরত যখন সমস্ত পুরবাসী-সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন, তখন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর কারীকর বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল এটা তাঁহার অবিদিত নাই; এটাও তাঁহার অবিদিত নাই যে, ঐ সময়ে একদল কারীকর ভরতের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল—আর একদল কারীকর তাঁহার আগে আগে রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছিল। সেই সকল বিভিন্ন কারীকর শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যবসায় এবং যন্ত্র-তন্ত্রাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক তিনি তাহা বিশদরূপে বিবৃত করিয়া লিখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতির জন্য প্রেরণ করুন্।

স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক্ যে, মনুর স্মৃতিতে যতপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য ও সামাজিক কর্ম্মবিভাগের উল্লেখ আছে তাহার তিনি একটা বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির জন্য প্রেরণ করুন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে বলা হোক্ যে, প্রত্যক্ষের এবং অনুমানের প্রণালী পদ্ধতি কোন্ দর্শনের মতে কিরূপ; ভাবনা, ভাব, চেতনা, চিত্ত, অনুভূতি, বেদনা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, প্রত্যয়, এই শব্দগুলির ভেদাভেদ গুণ লক্ষণ ধর্ম্মোপাধি এই শব্দগুলির, বিশেষ বিশেষ দার্শনিক অর্থ কতরূপ? উহাদের প্রচলিত অর্থই বা কতরূপ? উহাদের লৌকিক এবং দার্শনিক অর্থের মধ্যে ভেদাভেদই বা কতরূপ? কোন কোন স্থলে কাহারই বা কিরূপ প্রয়োগ পদ্ধতি? এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর তিনি বিশদরূপে বিবৃত করিয়া লিখিয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসের মধ্যে সমিতির অবগতির জন্য প্রেরণ করুন্।

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রের ঘূর্ণাচক্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার আকর্ষণবলে নানা দিক দিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবহারোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আমদানী হইতে থাকিলে, পারিভাষিক সমিতি সেই সকল কাঁচা সামগ্রীগুলা (raw material গুলা) সুবিবেচনা-যন্ত্রে চড়াইয়া আবশ্যক মতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া মাজিয়া ঘষিয়া অথবা যেমন তেমনি অব্যাকৃত রাখিয়া, রচিতব্য পরিভাষা উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ মতে ধীরেসুস্থে রচনা করিতে পারেন্। প্রকৃত কথা এই যে, শ্রমের বিভাজন, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Division of Labour, তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো ষড়যন্ত্রীতব্য বৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সমিতি সুতা পাইলে কাপড় বুনিতে পারেন কিন্তু সুতা পাকাইতে জানেন না;ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গ কাপড় বুননের জন্য সুতা পাকাইতে পারেন, কিন্তু কাপড় বুনিতে জানেন না। দুইদল পৃথক থাকিলে দোঁহারই হস্ত অসাড় হইয়া যায়; দুইদল জোটবদ্ধ হইলে দোঁহারই কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে। সূত্রে অনটন হইলে বস্ত্র বয়ন যে ভাবে চলে—পরিভাষিক সমিতির কার্য্য এক্ষণে সেইভাবে চলিতেছে; অচলভাবে চলিতেছে; অর্থাৎ কিনা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

সাহিত্যের পরিভাষার জন্য উদ্বেগের বিশেষ কোনোও কারণ নাই—বিজ্ঞানের পরিভাষাই

শক্ত সমস্যা। জ্যোতিষ, দেহতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের অধিকারভুক্ত অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত পুঁথি ঘুঁটিয়া বাহির করা যাইতে পারে সত্য, কিন্তু তেমনি আবার অনেকগুলি পরিভাষা সংস্কৃত-শাস্ত্রের কোথাও অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে না। শেষোক্তস্থলে একেবারেই হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রয়োজনীয় পরিভাষা যথাসম্ভব সংস্কৃতানুযায়ী করিয়া লওয়াই পরামর্শ সিদ্ধ: Nerve শব্দের দেশীয় প্রতিশব্দ নাই। Nerveকে ধমনী বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ধমনী = Artery; স্নায়ু বলা যাইতে পারে না, যেহেতু স্নায়ু = Tendon। আমি তাই বলি যে, Nerveকে তৈজস তন্তু এবং Ganglionকে তৈজসপিণ্ড বলিলে মন্দ হয় না। বেদান্তাদিশাস্ত্রে সূক্ষ্ম শরীরাবচ্ছিন্ন জীব তৈজস শব্দে উক্ত হয়। Nervous System স্থূল শরীরের তেজোহংশ সম্ভূত এক প্রকার সূক্ষ্ম শরীরের সামিল—সুতরাং তাহা স্বচ্ছন্দে তৈজস শব্দের বাচ্য হইতে পারে। কেহ যদি বলেন যে, না—Nerve তৈজস শব্দে বাচ্য হইতে পারে না; যেহেতু তৈজস পত্র বলিতে ধাতুময় পাত্র বুঝায় ইহা সকলেরই জানা কথা; তবে তাহার উত্তর এই যে, ধাতু বলিতে সোনা রূপা বুঝায় বলিয়া ধাতুজ্ঞ চিকিৎসক বলিতে সোনারূপাজ্ঞ চিকিৎসক বুঝায় না। Spring বলিতে উল্লম্ফণও বুঝায়; কিন্তু তা বলিয়া ঘড়ির Spring বলিলে ঘড়ির উল্লম্ফণও বুঝায় না—ঘড়ির উৎসও বুঝায় না। তেমনি তৈজসপত্র বলিতে ধাতুময়পাত্র বুঝায় একথা সত্য হইলেও শাস্ত্রোক্ত তৈজস জীবের অর্থ ধাতুময় জীব নয় অতএব Nerveকে তৈজস-তন্তু বলিলে পাছে লোকে ধাতুময় তন্তু বোঝে এরূপ আশঙ্কা, বাতিকের দুর্ভাবনার কোঠায় স্থান পাইবার যোগ্য।

যন্ত্রবিজ্ঞানের পরিভাষা রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেশীয় তাঁতি, কামার, কুমার, ছুতার, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি কারীকরদিগের ব্যবসায়ী ভাষার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। যন্ত্র এবং যন্ত্রাঙ্গগুলার দিশা প্রতিশব্দ যেখানে যত পাওয়া যায় সেগুলা আগে ত খুঁজিয়া পাতিয়া সংগ্রহ করা হোক্; তাহার পরে এ তো জানাই আছে যে, অবশিষ্ট গুলার প্রতিশব্দ দেশীয় ভাষার চতুঃসীমার মধ্যে সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যাইবে না। কাজেই, শেষোক্ত স্থলে নূতন প্রতিশব্দ সঙ্গঠন করা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই। যন্ত্রবিজ্ঞানের সামান্য গোটা চার পাঁচ শব্দ আমি উপস্থিত মতে গড়িয়া নমুনা স্বরূপে আপনাদিগকে দেখাইতেছি তাহা আপনাদের মনে ধরুক্ বা না ধরুক্—তাহা দৃষ্টে বঙ্গভাষার নূতন সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনাদের কাহারও না কাহারো চক্ষু ফুটিবে, তাহা হইলেই হইল বর্ত্তমান স্থলে আমার আকাঙ্ক্ষা তাহার অধিক আর কিছুই নহে :—

Lever তোলক
Pendulum দোলক
Screw আবর্ত্তক
Spring প্রস্থাপক

আমার বিবেচনায় রসায়নের অধিকারভুক্ত শব্দগুলির বৈজ্ঞানিক নাম যত কম পরিবর্ত্তন করা যায় ততই ভাল, কেননা রসায়নের অধিকারভুক্ত পদার্থ সকলের সাঙ্কেতিক নামের সঙ্গে সমগ্র রসায়নবিজ্ঞান এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জড়িত রহিয়াছে যে পূর্ব্বোক্তের একচুল ইতস্ততঃ হইলেই শেষোক্তের প্রাণে আঘাত লাগে; আমি তাই বলি যে, কার্বনকে কার্বন বলাই ভাল; তবে Sulphurকে গন্ধক বলিতে দোষ নাই। আমার মনে হইতেছে আমি যেন

ইতিপূর্ব্বে কোথাও Sulphuric Sulphurous এবং Sulphate গন্ধিক গন্ধীয় এবং গন্ধিত বলিয়া উক্ত হইতে দেখিয়াছি; আমার বিবেচনায়—এইরূপ নামকরণ প্রণালী রসায়নের পরিভাষার পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপযোগী। মোট কথা এই যে, দেশীয় লোকেরা অবাধে উচ্চারণ করিতে পারে অথচ মূলের সহিত হয় অর্থের না হয় শব্দের, সর্ব্বাঙ্গীন না হোক্ অন্ততঃ আংশিক সাদৃশ্য থাকে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রসায়নের পরিভাষা বিরচিত হইলেই ঠিক হয়।

অতঃপর আসিতেছে—ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ। ভাষান্তর হইতে অনুবাদ খুবই কাজের সামগ্রী যদি না পড়ে ধরা। অনুবাদ যদি অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়ে তবে বেচারা জন্মের মতো গেল—বাজে কাগজপত্রের ঝুড়ি তাহাকে উদরস্থ করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। অনুবাদ ষোলো আনা মাত্র অনুবাদ হইবে অথচ তাহা অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকটে ঘুণাক্ষরেও অনুবাদ বলিয়া ধরা পড়িবে না, এই সুকঠিন ব্রতটি উদ্‌যাপন করিতে না পারিলে কোনো অনুবাদই কোনো কার্য্যের হয় না। অনুবাদের উভয়সঙ্কট। (১) অনুবাদ যদি মূলের অবিকল প্রতিবিম্ব না হয়, তবে তাহা অনুবাদ না—তাহা অন্যথাবাদ আবার (২) অনুবাদ যদি আপনাকে মূলের অবিকল প্রতিচ্ছবি করিতে গিয়া বিদেশীয় ঢঙের স্বদেশীয় ভাষায় সং সাজিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে তাহা অনুবাদ না—তাহা হনুবাদ। এইরূপ ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। যাঁহারা অনুবাদ কার্য্যে বিশিষ্টরূপ নৈপুণ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে তাঁহারা দেশীয় প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত গদ্যের ভাষা এই দুই পিতা পুত্র ভাষার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুয়েরই অন্তর্নিহিত অঙ্গী সন্ধি এবং খোঁচ খাঁচ গুলা ঠাওর করিয়া সমঝিয়া দেখেন। অধিকন্তু সেই সঙ্গে ইংরাজি এবং সংস্কৃতের মধ্যে যে যে অংশে প্রথা-সাদৃশ্য আছে, সেই সেই অংশ যদি খোঁচাইয়া তুলিয়া আলোকে বাহির করিতে পারেন তবে সোনায় সোহাগা হয়। সংস্কৃত এবং ইংরাজির মধ্যে মূলগত প্রথা-বৈষম্য আমরা যতটা মনে করি বাস্তবিক তাহা ততটা না হইতে পারে। অনেক স্থলে সংস্কৃত ভাষার সহিত ইংরাজি ভাষার মর্ম্মস্থানীয় ঐক্য দেখিয়া দর্শকের তাক লাগিয়া যায়। না হইবেই বা কেন? ধরিতে গেলে ইংরাজি ভাষা সংস্কৃত ভাষার বহিন্ ঝি, যে হেতু গ্রীক এবং লাটিন ভাষা সংস্কৃত ভাষার ছোটো ভগ্নী। ইংরাজি এবং সংস্কৃতের মৌলিক প্রথা-সাদৃশ্য অনেক স্থলে আমার চক্ষে পড়িয়াছে; যখনি যখনি চক্ষে পড়িয়াছে, তখনি তখনি যদি আমি তাহা টুকিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে আর কোনো গোল থাকিত না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেই সেই সময়ে আমার মন অন্যবিধ চিন্তায় নিবিষ্ট থাকাতে দুই ভাষার প্রথা সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তগুলি আমি টুকিয়া রাখিতে অবসর পাই নাই, এক্ষণে তাই সে গুলির পোনেরো আনা অংশ আমার স্মরণ হইতে সরিয়া পলাইয়াছে। কি করি নিরুপায়! তথাপি একেবারেই হাল ছাড়িয়া না দিয়া, সেই পলাতকা মহলের যৎ সামান্য অধিবাসী যাহারা কোটরের মায়া পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া এখনো পর্য্যন্ত ভিটা আঁকড়িয়া আছে—নমুনা স্বরূপে সেই দুই একটিকে আপনাদের নয়ন গোচরে টানিয়া আনিয়া "মধ্যভাবে গুড়ং দদ্যাৎ" রকমে জো সো করিয়া কাজ সারি।

একজন আপাত-দর্শী গ্রন্থ-সমালোচক সহসা মনে করিতে পারেন যে, "অন্ধশক্তি" কথাটি Blind Force এর অনুকরণ মাত্র। তাহা যদি তিনি মনে করেন, তবে সেটি তাঁর বড়ই

ভুল। সাংখ্য দর্শনের জগতের আদ্যা শক্তি (মূল প্রকৃতি) বারম্বার অন্ধের সহিত উপমিত হইয়াছে। তা ছাড়া, শারীর ভাষ্যে স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে যে, জ্ঞান-শূন্যা প্রকৃতিকে জগতের মূল কারণ বলিলে "জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত" জগদান্ধ্য দোষ পড়ে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ অন্ধভাবে চালিত হইতেছে এইরূপ একটা অসঙ্গতি দোষ পড়ে। যদি একটাকে আরেকটার অনুকরণ বলিতেই হয়, তবে অন্ধ শক্তিকে Blind Force এর অনুকরণ বলা অপেক্ষা Blind Force কে অন্ধ প্রকৃতির অনুকরণ বলা অধিক যুক্তি-সঙ্গত, যে হেতু সাংখ্য দর্শনের অন্ধ প্রকৃতিবাদ ইংরাজি সাহিত্যের জন্মিবার বহুপূর্ব্বে আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিরচিত কোনো গ্রন্থের কোনো একস্থানে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন "দ্বৈতং ন সহতে শ্রুতি" দ্বৈত সহে না; ইহার জুড়ি খাঁচার একটি কথা ইংরাজিতে এইরূপ পাওয়া যায় যে, অমুক কথা Does not bear scrutiny অর্থাৎ অমুক কথা অনুসন্ধান সহেনা। ইংরেজি এবং সংস্কৃত উভয় স্থলেই "সহে না" কথাটার ভাবার্থ অবিকল সমান। অন্ধেনৈব নীয়মানাঃ যথান্ধাঃ; অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায়। ইংরেজি ভাষায় ইহার অবিকল জুড়ি বচন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়—One blind man leading another। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, সংস্কৃত ইংরাজির সৌসাদৃশ্যের টানা জালে ভাষার একটু আধটু খোঁজ-খাঁচ পর্য্যন্তও এড়ায় নাই।

বিভীষণ যখন রাবণকে অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়, তখন রাবণ বলিলেন "আমি ভাঙিয়া যাইতে পারি কিন্তু নত হইতে পারি না" I can break but cannot bend। বাল্মীকি বলিয়াছেন তাই রক্ষা— আমরা যদি কেহ প্রসঙ্গ ক্রমে ঐকথাটি কোথাও লিখিতে সাহস করিতাম তবে নিশ্চয়ই তাহা সমালোচকের বিষ দৃষ্টিতে পড়িয়া ইংরাজি অনুকরণের কোটায় সজোরে নিক্ষিপ্ত হইত।

সংস্কৃত তো আমাদের পৈতামহী ভাষা; আমাদের সাক্ষাৎ মাতৃভাষার সঙ্গেও ইংরাজি ভাষার পুরাতন সম্পর্ক-সূত্র ছোটো খাটো উপন্যাসের আড়ালে আবডালে এখনো পর্য্যন্ত উঁকি ঝুঁকি দিতে ছাড়ে নাই। বলিলে আপনারা হাসিবেন—একটা সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি রাক্ষসের উপন্যাসে আছে Fi of fee fum! I smell the blood of an englishman"। ইহার জুড়ি আমি আমার নিতান্ত শৈশবাবস্থায় নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বক্ষণে ধাত্রীর মুখে কতবার যে শুনিয়াছি তাহার ওর নাই। এখনকার কালের বালকেরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে; এইজন্য আমি সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না যে, সভাস্থ সকল ব্যক্তিই সে ঔপন্যাসিক শ্লোকটি জানেন, তবে এটা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমার বয়সী সভাস্থজনের কাহারও নিকটে তাহা অবিদিত নাই; সেটি হচ্চে "হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ"। Fi Fo Fee Fum = ইংরাজি "হাঁউ মাউ খাঁউ; আর I smell the blood of an Englishman = ইংরাজি "মানুষের গন্ধ পাঁউ"। আঙ্গালা মুলুক পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম কোণে—বাঙ্গালা মুলুক পৃথিবীর দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে—দুই কোণের দুই ছেলে ভুলানিয়া গল্পের মধ্যে অমনতর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সৌসাদৃশ্য কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আবার, পোনেরো আনা সৌসাদৃশ্যের আড়াল হইতে এক আনা বৈসাদৃশ্য যাহা উঁকি দিতেছে সেটা আরো চমৎকার! ইংরাজ রাক্ষস "মানুষের গন্ধ পাঁউ" বলিতেছে না। বলিতেছে "I Smell the blood of an Englishman—English রক্তের গন্ধ পাঁউ"!

দেখিয়াছেন ব্যাপার!

দুই জাতির দুই ভাষার মধ্যে এইরূপ নিগূঢ় প্রথা-সাদৃশ্য শুধু দেখিলে কি হইবে? তাহা হইতে কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করা হোক। যে যে স্থানে ইংরাজি ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার মূলগত সাদৃশ্য আছে, সেই সেই স্থানে সংস্কৃত ভাষাকে আদর্শ করিয়া দেশীয় ভাষার পুষ্টি সাধন করা হ'ক; তাহাতে ভাষার সৌন্দর্য্য এবং বল বিক্রম বাড়িবে বই কমিবে না।

আর একটি এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, স্থল-বিশেষে সাধু ভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্য্যকরী হয়। কেহ যদি বলে যে, "অমুক কথাটার বন্ধন শিথিল" তবে সে বাক্যটির অর্থ উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে যদি বলে যে, "অমুক কথাটার বাঁধুনি আলগা" তবে তাহার অর্থ বুঝিতে শ্রোতার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না। আমার বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালা ভাষার ত্রিসীমার মধ্যে একটিও সাঁওতালি ভাষার বা অন্য কোনো জঙ্গলী ভাষার শব্দ নাই। "আলগা" শব্দ শুনিলে হঠাৎ মনে হয় যে, সংস্কৃত ভাষার সহিত মূলে তাহার কোনো সম্পর্ক নাই; অথচ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, তাহা অলগ্ন শব্দের অপভ্রংশ; তার সাক্ষী অলগ্ন = অলগ = আল্‌গা। অনেক সময়ে সাধু ভাষার ত, দ চলিত ভাষায় ট, ড মূর্ত্তিধারণ করে, তার সাক্ষী কর্ত্তনের ত = কাটনের ট, বৃন্তের ত = বোঁটার ট, দলনের দ = ডলনের ড; দন্তের দ ত = ডাঁটার ড ট, কোমল শাকের কঠিন ডাঁটা—কোমল ওষ্ঠ-সলগ্ন কঠিন দন্তের সহিত উপমেয়। এরূপ যখন, তখন লিপ্তের ত যে, লপেটের ট হইবে তাহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে। গেঞ্জিকরাক্ গায়ে লপেট্ হইয়া রহিয়াছে বলাও যা, আর লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে বলাও তা, একই। অনেক স্থলে সাধু ভাষার র চলিত ভাষায় ল মূর্ত্তি ধারণ করে; তার সাক্ষী চক্রের র-ফলা = চাক্‌লা এবং Cycle এর ল ফলা। কাপড় এবং কাপ্‌ড়া শব্দ স্পষ্টই কর্পট শব্দ হইতে আসিয়াছে। যেমন কর্কট = কাঁকড়া; তেমনি কর্পট = কাপড়া। তার সাক্ষী সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের এক স্থানে আছে কর্পটাবগুণ্ঠিত অর্থাৎ বস্ত্রাবগুণ্ঠিত। মাঝের রেফ কখনো বা শেষের র হয়, কখনো বা শেষের ড় হয়; তার সাক্ষী দীর্ঘের রেফ = ডাগরের র এবং দীঘলের ল। বর্দ্ধনের রেফ = বাড়নের ড়। শেষের র ফলা কখনো বা মাঝের রেফ হয় কখনো বা মাঝের ড় হয়; তার সাক্ষী—চক্র শব্দের শেষের র ফলা রেফ হইয়া চর্কা এবং Circle এর মাঝে বসিয়াছে, ও ড় হইয়া চড়ক শব্দের মাঝে বসিয়াছে। ঠাণ্ডা শব্দ স্পষ্টই স্নিগ্ধ শব্দ হইতে আসিয়াছে; তার সাক্ষী স্নিগ্ধ = ঠিন্দ = ঠাণ্ডা। ঠাওর শব্দ স্পষ্টই স্থাবর শব্দ হইতে আসিয়াছে তার সাক্ষী স্নিগ্ধ = ঠিন্দ = ঠাণ্ডা। ঠাওর শব্দ স্পষ্টই স্থাবর শব্দ হইতে আসিয়াছে; তার সাক্ষী—দেবর = দেওর, স্থাবর = ঠাওর। "এই বস্তুটাকে ঠাওর করিয়া দেখ" অর্থাৎ স্থাবর করিয়া দেখ, অর্থাৎ চক্ষের সম্মুখে স্থিরভাবে দাঁড় করাইয়া দেখ। কুল্য শব্দের নানা অর্থ অভিধানে লিখিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি অর্থ—আমরা যাহাকে বলি কুলো। ঢেঁকি শুনিলে সহজে মনে হয় যে, নিশ্চয়ই তাহা সাঁওতালদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া। আমার কিন্তু মনে হয় যে, তাহা ধক ধাতু হইতে আসিয়াছে। ধক ধাতুর অর্থ ধাক্কা দেওয়া। ধক ধাতু হইতে ধকী আসিয়াছে, আর ধকী হইতে ঢেঁকী আসিয়াছে। ঢেঁকি ধাক্কা প্রদান করে এই অর্থে ধকী। যদি বল যে, ধকী হইতে ঢেঁকি আসিবে কিরূপে? তবে তাহার উত্তর এই যে, যার তার গায়ে চন্দ্রবিন্দু এবং সানুনাসিক বর্ণের যোজনা (প্রাচীন বিধবা রমণীর

ন্যায় যখন তখন বিনা কারণে নাকিসুরে কান্না) বঙ্গভাষার একটা চিরকেলে কু অভ্যাস। কাচ যখন কাঁচ হইতে পারিল, কর্কট যখন কাঁকড়া হইতে পারিল, আকর্ষণ যখন আঁকড়ানো হইতে পারিল, হাসি যখন হাঁসি হইতে পারিল, ময়ূর পক্ষী যখন ময়ূর পখী হইতে পারিল, তখন ধকী যে ঢেঙ্কি হইতে না পারিবে কেন তাহাই জিজ্ঞাসা।

বাবা এবং মা শব্দ সংস্কৃত বাব এবং মাম শব্দ হইতে আসিয়াছে; ইংরাজি Pappa Mamma ও তাই। বাঙ্গালী দাদা এবং ইংরাজি Dad দুইই সংস্কৃত তাত শব্দের অপভ্রংশে। আমরা বলি ঠাকুর দাদা, ইংরাজেরা বলে Grand Dad। বেটা শব্দ ইংরাজি Pet শব্দের সহোদর। Max Muller এর একটি গ্রন্থে আমি দেখিয়াছিলাম যে, এক জাতীয় আধুনিক ইউরোপীয় আর্য্য ভাষায় (কোন্ জাতীয় তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না) দুহিতাকে বলে Dsi। Max Muller যদি জানিতেন যে, আমাদের দেশে দুহিতার আর এক নাম ঝি তবে তিনি কত না জানি আনন্দিত হইতেন। সংস্কৃত দুহিতা হইতে প্রাকৃত ধীদা হইয়াছে এটা জানা কথা। পুত্র যেমন পো; ধীদা তেমনি ধী; বন্ধ্যা যেমন বাঁঝা, ধী তেমনি ঝি।

আমি আমার উপসর্গ বিচার নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছি যে, মার্জ্জা হইতে মেজে হইয়াছে; দলা হইতে চাল ডালের ডাল হইয়াছে; দারু পল্লব হইতে ডাল পালা হইয়াছে; পর্য্যায় হইতে পালা হইয়াছে; ইত্যাদি।

সংস্কৃত ভাষার এইরূপ নদীর ন্যায় বিচিত্র নিম্নগতি দেখিয়া বহুকাল যাবৎ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে; তাই আমি আজ সমস্ত সভার সমক্ষে এ কথা বলিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইতেছি না যে, বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্ব্বরভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞ লোকের কার্য্য; যেহেতু সে গুলা প্রকৃতপক্ষেই সংস্কৃতের সন্তান সন্ততি।

ইংরাজি কথা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার বিহিত প্রণালী কিরূপ তাহা যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাহার সন্ধান আমি আপনাদিগকে দুই কথায় বলিয়া দিতে পারি; তাহা এই যে, যে পর্য্যন্ত অনুবাদিত বচনটি ভাবাংশে মূলের মতো, আর, ভাষাংশে মনের মতো না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না দেওয়া। এইরূপ প্রণালীতে অনুবাদের নদী সন্তরণ করিয়া আমি অনেকানেক স্থলে কূল প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে মাঝ পথে হাবুডুবু খাইয়াছিও বিস্তর। প্রস্তাবিত প্রণালীর গোটা কত দৃষ্টান্ত আমি নমুনা স্বরূপে আপনাদিগকে দেখাইতেছি, তাহা হইলেই তাহার ফলদায়কতা এবং কার্য্যকারিতা বিশিষ্টরূপে আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমার কোনো শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অনেক কাল হইল আমাকে একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে, Centripetal এবং Centrifugal force তিনি অনুবাদ করিয়াছেন—কেন্দ্র বর্ত্তিনী এবং কেন্দ্র-বর্জ্জিনী শক্তি। আমি দেখিলাম ঐ অনুবাদটি ভাবাংশে যদিচ মূলের অবিকল অনুরূপ কিন্তু ভাষাংশে "ইংরাজি অনুবাদ" এই বৃত্তান্তটি উহার গায়ে টিকিট মারা রহিয়াছে আমি তাই উহাকে ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া করিলাম "কেন্দ্রানুগা এবং কেন্দ্র তিগা শক্তি।"

"Organized labour" এ বচনটির অনুবাদ আমার বিবেচনায় "যন্ত্র বদ্ধ পরিশ্রম" হইলে মন্দ হয় না। organ = যন্ত্র; organization = যন্ত্র বন্ধন; organised যন্ত্রবদ্ধ। "যন্ত্রবন্ধন" কথাটাকে আপনারা যতটা ইংরাজী অনুকরণ ঠাওরাইতেছেন—বাস্তবিক উহা ততটা নহে। যড়যন্ত্র শব্দটা তাহা সংস্কৃত। তা ছাড়া আমরা চলরাচর কথায় বলি "অমুক কার্য্যটি যোগাড়

যত্ন করিয়া করা চাই।" যোগাড়-যন্ত্র করা আর, Organize করা দুয়ের মধ্যে অতি অল্পই প্রভেদ। কিন্তু তা বলিয়া Organic chemistryর অনুবাদ "যান্ত্রিক রসায়ন" করিলে চলিবে না। কেননা organic chemistry এ কথাটিতে organ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি, এক কথায় শরীর। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—শরীর বলিতে এখানে জীব দেহ মাত্র বুঝিলে চলিবে না, শরীর শব্দ এখানে বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতানুযায়ী ব্যাপক অর্থে গৃহীতব্য। বিজ্ঞান শাস্ত্রের মতে উদ্ভিদ পদার্থেরও শরীর আছে, জলপান করিবার জন্য তাহার মুখ আছে;—কী? না শিকড়গুলা। আলোক গ্রহণ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্বাহের জন্য তাহার চক্ষু নাসিকা আছে;—কী? না পত্রের ত্বকছিদ্রগুলা; গর্ভাধানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ আছে;—কী? না পুষ্পের কেশর এবং বীজকোষাদি। আমার বিবেচনায় তাই organic chemistryর অনুবাদ শারীরক রসায়ন হইলে ভাল হয়। শারীরিক নহে—শারীরক। মহর্ষি ব্যাস তাঁহার প্রণীত বেদান্তসূত্রের নাম শারীরক সূত্র দিয়াছেন কেন, তাহা আমি ঠিক জানি না; আমার বোধ হয়—"শরীরের অভ্যন্তরে পঞ্চকোষ এবং পঞ্চকোষের অভ্যন্তরে আত্মা" এই কথাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থের ঐরূপ নাম দিয়াছেন। আমি তাই বলি যে, মহতের ঐ দৃষ্টান্তটি অনুসরণ করা হো'ক—organic chemistry জীব শরীরের রসরক্তাদির এবং উদ্ভিদ্ শরীরের নির্যাসাদির মৌলিক উপাদান-সকলের তত্ত্ব নির্ণয়কার্যে ব্যাপৃত থাকে বলিয়া তাহার নাম দেওয়া হো'ক "শারীরক রসায়ন"। তা ছাড়া এটি শুনিতেও শুনায় ভাল যে, Inorganic chemistry ভৌতিক রসায়ন; organic chemistry—শারীরক রসায়ন।

Theory শব্দের কেহ কেহ অনুবাদ করেন উপপত্তি; এবং theoretical শব্দের অনুবাদ করেন ঔপপত্তিক। বিষম বিভ্রাট। Theory শব্দের অনুবাদ সম্বন্ধে ওরূপ একটা নির্ঘাত বিচার নিষ্পত্তি করিবার পূর্বে অনুবাদকের উচিত ছিল—উপপত্তিকে ইংরাজিতে বাস্তবিক কি বলে তাহা একটিবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা। ন্যায়শাস্ত্রের প্রকরণে উপপত্তির ঠিক উল্টাপিঠ হ'চ্চে বিপ্রতিপত্তি। "অগ্নির সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়" এইরূপ একটা অযৌক্তিক কথা উক্ত হইলে, সে কথার মধ্যে অগ্নির সংস্পর্শ এবং শৈত্যের উৎপাদন এই দুয়ের বিরোধ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহারই নাম বিপ্রতিপত্তি। পক্ষান্তরে "অগ্নির সংস্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়" এইরূপ একটা সম্ভবপর কথা উক্ত হইলে, সে কথার মধ্যে অগ্নির সংস্পর্শ এবং দাহের উৎপাদন এই দুয়ের সুসঙ্গতি যাহা দৃষ্ট হয় তাহারই নাম উপপত্তি। সংস্কৃত ভাষায় "উপপন্ন মেতৎ" এবং "সঙ্গত মেতৎ" এ দুই বাক্যের অর্থ অবিকল সমান। অতএব এটা স্থির যে, উপপত্তিকে ইংরাজীতে Theory বলে না—ইংরাজীতে বলে agreement between the subject and Predicate। Theory বলে কাহাকে? নিউটন্ যখন গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, জড়পিণ্ড সকল পরস্পরকে স্ব স্ব পরমাণুপুঞ্জের সম পরিমাণে এবং দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত পরিমাণে আকর্ষণ করে, তখন তাঁহার সেই কথাটি theory of gravitation বলিয়া পণ্ডিত মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মৎস্যের যেমন দুইটি অন্ত—ল্যাজা এবং মুড়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালীর তেমনি দুইটি অন্ত—দৃষ্ট অন্ত এবং সিদ্ধ অন্ত। দৃষ্টান্তগুলো—কাঁচা সামগ্রী raw materials; সেই কাঁচা সামগ্রী গুলোকে বিশেষ এক প্রকার সাধনের উনানে চড়াইয়া সিদ্ধ করিলেই তাহা সিদ্ধান্তে পরিণত হয়; সে সাধন কি? না ব্যাপ্তি সাধন ইংরাজী

যাহাকে বলে Generalisation। যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, তাহাই দৃষ্টান্ত; আর দেখা শুনা বৃত্তান্তের ব্যাপ্তি সাধন করিয়া অর্থাৎ generalisation করিয়া যাহা স্থির করা যায় বা স্থাপন করা যায় তাহাই সিদ্ধান্ত। গোরু রোমন্থন করে (অর্থাৎ জাবর কাটে), ছাগল রোমন্থন করে, হরিণ রোমন্থন করে, ইহা আপামর সাধারণ সকল লোকেরই দেখা কথা আর, যাহা দেখা কথা, দৃষ্ট কথা, তাই দৃষ্টান্ত শব্দের বাচ্য। পক্ষান্তরে "শৃঙ্গীমাত্রই রোমন্থক" এই দৃষ্ট কথা নহে; যেহেতু জগতের সমস্ত শৃঙ্গী জন্তুকে (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্ত শৃঙ্গী জন্তুকে) কেহই চক্ষে দেখেও নাই—দেখিবেও না। গোরু রোমন্থন করে, ছাগল রোমন্থন করে, হরিণ রোমন্থন করে এ কথা সবাই জানে—চাষাভুসারাও জানে; কিন্তু শৃঙ্গী "রোমন্থক" এই পণ্ডিতের সিদ্ধান্তটি পণ্ডিতেরাই অনুমোদন করেন—ইহাতে চাষাভুসা লোকের দন্তস্ফুট হয় না। এই জন্য গৌতম সূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে, "ইদং ইত্থম্ভূতঞ্চ ইত্যভ্যনুজ্ঞায় মানং অর্থজাতং * * * সিদ্ধান্তঃ।" "এই বটে" "এই প্রকার বটে" এইরূপ সম্মতিসূচক বাক্যে যাহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হয় অর্থাৎ অনুমোদিত হয়, তাহাকেই সিদ্ধান্ত কহা যায়। "Newton gravitaion এর theory সংস্থাপন করিয়াছিলেন" এ কথার অর্থ এই যে, তিনি বিহিত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা—তাহা—পণ্ডিতগণের অনুমোদনপযোগী করিয়া গড়িয়াছেন। অতএব Newtonian theoryর অনুবাদ আমরা সচ্ছন্দে করিতে পারি—নিউটনের সিদ্ধান্ত। তা যেন হইল—এটা যেন বুঝিলাম যে, theory = সিদ্ধান্ত; কিন্তু theoretical শব্দের অনুবাদ তুমি কি করিবে? ইহার উত্তর এই যে Theoretical শব্দের অনুবাদ আমি করি সাংসিদ্ধিক। সৈদ্ধান্তিক সাংসিদ্ধিক দুয়ের তাৎপর্য্যার্থ যদিচ একই কিন্তু দুয়ের মধ্যে সাংসিদ্ধিক শব্দটিকে আমি পছন্দ করি এই জন্য যেহেতু সাংসিদ্ধিক শব্দ পুরাকাল হইতে আমাদের দেশের পণ্ডিত মহলে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। আমাদের দেশীয় ভাষায়, সাংসিদ্ধিক সত্য (theoretical truth) তত্ত্ব শব্দের বাচ্য। তার সাক্ষী উদ্ভিদ্ তত্ত্ব বলিলে বুঝায়—উদ্ভিদ বিষয়ক স্থির সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কিনা পাকা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা প্রামাণিক সিদ্ধান্ত। আমি তাই—Practical science এবং Theoretical science এই বাক্য যুগলের অনুবাদ করি ব্যাবহারিক * বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং তাত্ত্বিক বিজ্ঞান শাস্ত্র। Theoretically জর্ম্মান-সিল্‌বের রূপো নহে কিন্তু Practically তাহা রূপারই সামিল একথাটির আমি পুরাপুরি বাঙ্গলা অনুবাদ করি এইরূপ যে তত্ত্বতঃ জর্ম্মান সিল্‌বর্ রূপো নহে কিন্তু ব্যবহারতঃ তাহা রূপোরই সামিল।

Moralityর অনুবাদ নীতি করিলে দুই এক স্থলে তাহা জো শো করিয়া চলিতে পারে কিন্তু সকল স্থলেই তাহা সংলগ্ন হয় না—অধিকাংশ স্থলেই তাহা সংলগ্ন হয় না; যেহেতু ধর্ম্ম স্বতন্ত্র নীতি স্বতন্ত্র। চাণক্যের নীতি শাস্ত্রে বলে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" শঠের প্রতি শঠতাচরণ করিবে; মনুর শাস্ত্রে বলে "ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ" পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না। নীতি শাস্ত্রের বচন নীতি শাস্ত্রেরই শোভা পায়; ধর্ম্ম শাস্ত্রের বচন ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই শোভা পায়; দুয়ের মধ্যে সাদা কালোর প্রভেদ। রাজধর্ম্ম রাজাকে সদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক

* সম্প্রতি আমি একজন নব্য এম. এ. উপাধিধারী বঙ্গযুবকের লেখনী দিয়া ব্যাবহারিক শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক শব্দ অনর্গল বাহির হইতে দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তিনি "শারীরিক" লেখেন না—লেখেন "শরিরীক" "মানসিক" লেখেন না—লেখেন "মনসিক"; কেবল ব্যাবহারিকের বেলা লেখেন ব্যবহারিক।

প্রতিপালন প্রভৃতি সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিতে বলে; রাজনীতি রাজাকে সৎ বা অসৎ যে কোন উপায়ে রিপু দমন প্রভৃতি প্রয়োজন কার্য্য অবিতর্কিতচিত্তে নিষ্পাদন করিতে বলে। ধর্ম্মের সীধা পথ আর, নীতির পেঁচাও পথ—দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অস্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহার মধ্যে একটী কথা আছে, সেটি এই যে, Honesty is the best policy ধর্ম্মানুমোদিত নীতিই প্রকৃত নীতি; এইরূপ বিবেচনার আমরা নীতি বলিতে প্রধানতঃ ধর্ম্মনীতি বুঝি, আর উচিতও সেইরূপ বোঝা; ধর্ম্ম নীতি কিনা? ধর্ম্মানুমোদিত নীতি—Moral maxim।

ধর্ম্মতত্ত্ব—Moral Science।

ধর্ম্মনীতি—Moral maxim।

নীতি বলিলে আমরা প্রধানতঃ ধর্ম্মনীতি বুঝি বলিয়া Moral training এর অনুবাদ করি নৈতিক শিক্ষা। ধর্ম্মনীতিই হ'চ্চে প্রকৃষ্ট নীতি অর্থাৎ নীতি Par excellence এই জন্য Moral training কে—নৈতিক শিক্ষা প্রকারান্তরে বলা যাইতে পারে কিন্তু তা বলিয়া ধর্ম্ম আর নীতি দুইই যে এক তাহা নহে। কর্ম্ম যেমন কৃ ধাতু হইতে আসিয়াছে ধর্ম্ম তেমনি ধৃ ধাতু হইতে আসিযাছে। যাহা করিতে হয় তাহাই কর্ম্ম যাহা ধরিয়া থাকিতে হয় তাহাই ধর্ম্ম। Morality এবং Religion দুইই দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিবার বস্তু তাই দুইই ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য, প্রভেদ কেবল এই যে,

Religion—Doctrinal ধর্ম্ম।

Morality—Practical ধর্ম্ম।

Religion কে—বিশ্বাসে ধরিয়া থাকিতে হয়।

Morality কে—কার্য্যে ধরিয়া থাকিতে হয়।

প্রকৃত কথা এই যে, Moralএর অনুবাদ জায়গা বুঝিয়া সুবিবেচনামতে করা কর্ত্তব্য। Moral courage এবং Physical courage এর মধ্যে প্রভেদ এই যে, Moral courage সাধুর লক্ষণ, Physical courage বীরের লক্ষণ; Moral courage সত্ত্বগুণ প্রধান, Physical courage রজোগুণ প্রধান। ঐ দুই ইংরাজি বাক্যের আমি তাই অনুবাদ করি—সাত্ত্বিক সাহস এবং রাজসিক সাহস। "I am morally sure এটা অমুক ব্যক্তির কাজ" ইহার অনুবাদ আমি করি "আমার অন্তরাত্মা বলিতেছে ওটা অমুক ব্যক্তির কাজ।" ইনি Physically weak but morally strong" ইহার অনুবাদ আমি করি—ইঁহার শরীর দুর্ব্বল কিন্তু অন্তরাত্মা সবল।

প্রসঙ্গাধীনে আমি স্বদেশীয় নব্য কৃতবিদ্য লেখকগণকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছি যে, কতকগুলি ভাবাজ্ঞান বর্জ্জিত নব্য লেখকের দেখাদেখি তাঁহারা যেন বিবেক শব্দের অর্থ মুচড়াইয়া তাহাকে conscience করিয়া গড়িয়া না তোলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার শারীরক ভাষ্যে, মহর্ষি কপিল তাঁহার সাংখ্য দর্শনে, পতঞ্জলি ঋষি তাঁহার যোগ শাস্ত্রে, বিবেক শব্দের ভূয়ো ভূয়ো উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উঁহাদের কেহই একটিবার ভুল ক্রমেও ঐ শব্দটি এরূপ স্থানে সন্নিবেশিত করেন নাই—যে স্থানের ত্রিসীমার মধ্যে—conscience অর্থের কিছু বিসর্গের ও ছায়া কোনো অংশে বা কোন ভাবে বা কোনো হিসাবে প্রকাশ করিতে পারে। ঐ সকল শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রকারেরা সকলেই একবাক্যে বিবেক শব্দের এইরূপ অর্থ করেন যে, উহা বিবিক্ত করে discriminate করে—অনাত্মার সংস্পর্শ হইতে আত্মাকে বিবিক্ত করে, প্রকৃতির সংস্পর্শ হইতে পুরুষকে বিবিক্ত করে, অসত্যের সংস্পর্শ হইতে সত্যকে বিবিক্ত

করে, এই অর্থে বিবেক। বিবেকের এইরূপ সর্ববাদিসম্মত প্রকৃত অর্থটি (Discriminating faculty এই অর্থটি) উলটাইয়া দিয়া তাহাকে conscience এর অনুবাদ কার্য্যে লাগান বড় যে ভাল কাজ তাহা নহে; তাহা একপ্রকার দিনে ডাকাতি। কেন না সবাই জানে যে, বিবেকের অর্থে Discriminating Faculty অথচ আমি তাহার অনুবাদ করিতেছি conscience. এরূপ করিলে অত্যন্ত অবৈধ কার্য্য করা হয়—মধ্যাহ্ন দিবালোকে একজনের কণ্ঠের হার বল পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাহা আর এক জনের কণ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। Conscience এর দেশীয় প্রতিশব্দ কি—তাহা যদি সত্য সত্যই আপনারা জানিতে ইচ্ছা করেন তবে আমাদের দেশের পুরাতন পিতামহ শ্বেতশ্মশ্রু মনু কি বলিতেছেন তাহার প্রতি একটিবার শ্রদ্ধার সহিত কর্ণপাত করুন। তিনি তাঁহার সংহিতার ১৬১ শ্লোকে বলিতেছেন;—

"যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোহস্য-স্যাৎ পরিতোষোহন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতং তু বর্জ্জয়েৎ"॥

যে কর্ম্ম করিলে তোমার অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হয়, তাহাই যত্ন সহকারে করিবে—তাহার বিপরীত কর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিবে। অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হওয়াও যা, আর conscience satisfied হওয়াও তা, দুয়ের মাঝে এক তিলও প্রভেদ নাই। অতএব এটা স্থির যে, conscience এর দেশীয় প্রতিশব্দ বিবেক নহে—conscience এর দেশীয় প্রতিশব্দ অন্তরাত্মা। কর্ণ যেমন শাব্দিক বাক্য শুনিবার বাহ্যেন্দ্রিয়, অন্তরাত্মা তেমনি অন্তর্যামী পরমাত্মার অশাব্দিক আদেশ শুনিবার অন্তরিন্দ্রিয়; তাই conscience এর আর এক নাম voice of God। আর একটা কথা এই যে, আমাদের দেশীয়-শাস্ত্রের মতানুসারে জীবাত্মা প্রত্যেক মনুষ্যের সাক্ষাৎ ভিত্তিভূমি অন্তরতম আত্মা পরমাত্মা সর্ব্ব জগতের (এবং সেই সঙ্গে জীবাত্মারও) ভিত্তিভূমি; অন্তরাত্মা মনুষ্য মণ্ডলীর Humanity এবং সেই সঙ্গে Moralityর সাক্ষাৎ ভিত্তিভূমি। বিবেক ঔদাসীন্যের লৌহ কবচে আবৃত হৃদয়; Conscience শিশুর ন্যায় অনাবৃত হৃদয়। বিবেক করে কি? না সত্যের তুলা দণ্ডে ধর্ম্মাধর্ম্ম তৌল করিয়া দেখিয়া ধর্ম্মের গুরুত্ব অবধারণ করে, তা-বই, বিবেক ধর্ম্মাধর্ম্মের স্পর্শ অনুভব করে না; তাহা যে করে, ধর্ম্মাধর্ম্মের স্পর্শ যে অনুভব করে, তাহার নাম দিই অন্তরাত্মা কি না Conscience। অন্তরাত্মা অধর্ম্মের সংস্পর্শে গ্লানিযুক্ত হয়, ধর্ম্মের সংস্পর্শে প্রসন্ন হয়; অন্তরাত্মা কাঁদে, অন্তরাত্মা ঠাণ্ডা হয়। পক্ষান্তরে, জটাধারী বিবেককে কেহই আজ পর্য্যন্ত প্রসন্ন হইতে বা বিষণ্ন হইতে, বা কাঁদিতে বা ঠাণ্ডা হইতে দেখেন নাই। অতএব এটা স্থির যে, বিবেক Conscience নহে—বিবেক Discrimination? অন্তরাত্মাই Conscience। তা যেন হইল—এটা যেন বুঝিলাম যে, অন্তরাত্মাই Conscience. কিন্তু "লোকটা বড় Conscientious" এ কথাটি পুরাপুরি বাঙ্গালার বলিতে হইলে তুমি কি বলিবে? চিরকাল যাহা বলিয়া আসিতেছি যদি তাহাই বলি—বলিব যে, লোকটা বড় ধর্ম্মভীরু তা বই, এরূপ বলিব না যে, লোকটা বড় বিবেকী (!)। একজন চাষা কর্ত্তৃকারক কাহাকে বলে তাহা জানে না—কর্ম্মকারক কাহাকে বলে তাহা জানে না—অথচ কথোপকথনের সময় কর্ত্তৃকারকের জায়গায় কর্ত্তা বসায়, কর্ম্মের জায়গায় কর্ম্ম বসায়; তেমনি একজন মূর্খ (গুহ চণ্ডাল) ধর্ম্ম কাহাকে বলে, অধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা না জানিতে পারে; অথচ এরূপ হইতে পারে যে, সে মিথ্যা কহিতে ডরায়, চুরি করিতে ডরায়। ডরায় কাহাকে? পুলিশের কনষ্টবলকে না—ডরায় সে অন্তরাত্মাকে। একজন সাঁওতালকে ধরিয়া তাহাকে নানা প্রকার

ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার জন্য বিচারপতির সাক্ষাতে দাঁড় করানো হইয়াছিল সাঁওতাল বেচারা বার-দুই শেখানো কথাটা বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই তাহা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—সে তখন কাঁদিয়া ফেলিল, আর, বলিল যে, অমুক ব্যক্তি আমাকে এই কথা বলিতে শিখাইয়া দিয়াছে। ইহারই নাম ধর্ম্মভীরুতা Conscientiousness।

Patriot শব্দের যাঁহারা অনুবাদ করেন দেশহিতৈষী, তাঁহারা নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহা করেন। Patriot শব্দের ঠিক্ প্রতিশব্দ আমাদের দেশীয় ভাষাতে নাই ও কস্মিন্‌কালে ছিল না। পুরাতন গ্রীক দেশে Sparta প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড রাজ্যের Patriotism প্রথমে তাহাদের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাহার পরে পারস্য দেশের সহিত যুদ্ধের তাড়নায় সেই সমস্ত ক্ষুদ্র Patriotism একত্র জমাট্-বদ্ধ হইয়া সমস্ত গ্রীকবাসীকে একাত্মা করিয়া তুলিয়াছিল, এবং তাহার পরে সেই জমাট্ বদ্ধ Patriotismকে Olympic games নামক উৎসব দ্বারা সময়ে সময়ে ঝালানো হইত। পুরাতন রোমান Patriotism প্রথমে রোম নগরের মধ্যেই পিঞ্জর-বদ্ধ ছিল ক্রমে ক্রমে তাহা পক্ষ বিস্তার করিয়া সারা ইটালীময় পরিব্যাপ্ত হইল। পৈতৃক ভিটা যে Patriotism এর গোড়ার কাহিনী তাহা তাহার নামেই স্বপ্রকাশ। পৈতৃক ভিটার প্রতি প্রাণের টান যাহা অধিবাসীর মনে স্বভাবতই জন্মে, সেই প্রাণের টান ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়া দেশময় উথলিয়া পড়িলে তাহারই নাম দেওয়া হয় Patriotism। তার সাক্ষী—Expatriate শব্দের মৌলিক অর্থ পৈতৃক ভিটা হইতে স্থানান্তরিত করা এবং তাহার গৌণ অর্থ স্বদেশের সহিত সম্পর্ক রহিত করা। দেশের হিত সাধন করা Philanthropist স্বতন্ত্র, আর কায়মনোবাক্যে দেশের স্বকীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী Patriot স্বতন্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য্য এবং মহত্ত্ব রক্ষণ করিয়া পিতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন তিনিই Patriot। তিনি যদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধির স্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দেশের পরাকাষ্ঠা হিতসাধন করেন, আর, বলেন যে, দেশের মহত্ত্ব যদি না রহিল তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি Patriot। পক্ষান্তরে, যাঁহারা কাটা ছাঁটা আঁটা সাঁটা পোষাক এবং দোকান সাজাইয়া গৃহ সজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন, স্বদেশের কিছুই যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে পারেন না; এমন কি, স্বদেশের সর্ব্ববাদিসম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ স্থানটিকেও যাঁহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ সিটকাইয়া ভাল বলেন। তা বই, তাহার ভালও আপন চক্ষে দেখেনও না—দেখিতে জানেনও না। যাঁহারা স্বদেশের গৌরবেও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, স্বদেশের অপমানেও আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন না, তাহা দূরে থাকুক উল্টা আরো যাঁহারা স্বদেশকে নিচু করিয়া আপনারা উঁচু হইবার চেষ্টায় যাচিয়া মান এবং কাঁদিয়া সোহাগের কর্দ্দমাক্ত পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হন, তাঁহারা যদি স্বদেশের মাথা হেঁটকরা-দেহের যাঁতা চালাইবার উপযোগী মহা মহা বহ্বাড়ম্বরের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া দেশ হিতৈষিতার ধ্বজা উড়াইতে এক মুহূর্ত্তও ক্ষান্ত না হ'ন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাদিগকে Gariboldi বলিব না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ওরূপ Gariboldi ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আমরা Patriot বলিলে যথার্থ যাহা তিনি ছিলেন তাঁহাকে তাহাই বলা হয়। আপনারা হয় তো মনে করিতেছেন যে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, দীন দুঃখীদিগের মা বাপ ছিলেন, বিধবা রমণীদিগের সন্তাপানলে নয়ন জল বর্ষণ করিতেন, সেই কারণে আমি তাঁহাকে Patriot বলিতেছি। এরূপ অবিচার আপনারা আমার প্রতি করিবেন না। তিনি যদি এক শত

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, শত সহস্র দরিদ্র লোককে Rothschild করিয়া দিতেন, দশকোটী বিধবার মৃত সাধবা পুনর্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল সেই কারণে তাঁহাকে আমি Patriot বলিতাম না, তাহা হইলে বলিতাম তিনি মস্ত এক Philanthropist : Patriot তাঁহাকে বলিতেছি আরেক কারণে। যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লেখনী যন্ত্র দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে হাঁ ইনি Patriot যেহেতু ইনি খাওয়া পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সারাংশ সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা বিদ্যা বিনয় দয়া দাক্ষিণ্য মহত্ত্ব এবং সদাশয়তা সমস্তই আপনাতে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্যসত্যই Patriot ছাঁচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে "এ দেশের কিছু হইবে না" বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া বাষ্পগদ্গদ লোচনে গৃহকোটরে ঢুকিয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচল শিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পূর্ব্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোনো একজন খ্যাতনামা Patriot ছিলেন—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি যাইতেছেন, অথচ কেহই তাঁহার সহিত কাজে যোগ দিতেছে না।

Patriot বলিতে আমি যাহা বুঝি তাহা বলিলাম। Patriotism শব্দের অনুবাদ কিরূপ হইলে ভাল হয়, তাহা আমার ঘটে যোগাইতেছে না। যা' তা' খেলো সামগ্রীকে patriotism বলিয়া patriot নামের গায়ে, আর দেশীয় লোকের চোখে, যথেষ্ট ধূলি নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং হইতেছে; এখন আমার দেশীয় ভ্রাতারা এইরূপ ধূলির আবির খেলা হইতে ক্ষান্ত হইলে আমি বাঁচি—patriot শব্দের অনুবাদ ধীরে সুস্থে পরে হ'বে! Patriotism শব্দের গৌরবান্বিত পদবীতে "স্বদেশবাৎসল্য" এই মাটির পুতুলটি প্রতিষ্ঠিত করিলে তাহাতে আর কিছু হো'ক না হো'ক—বঙ্গ সাহিত্যের খেলা-ধূলা কার্য্য অনেক কাল নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারিবে—আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঢের।

তাহার পরে আসিতেছে—বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্য আলোচনা ও সেই সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ। "দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য" এই বাক্যটির মাথা নিচু পা উঁচু অবস্থা ঘুচাইয়া উহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করানো উচিত; উহাকে করা উচিত "কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন।" কেননা, প্রথমে কাব্য, পরে ইতিহাস, পরে বিজ্ঞান, পরে দর্শন, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের উত্তরোত্তর ক্রমান্বয় পদ্ধতি।

বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও মনুষ্য প্রথম বয়সে কাব্যের, দ্বিতীয় বয়সে ইতিহাসের, তৃতীয় বয়সে বিজ্ঞানের, চতুর্থ বয়সে তত্ত্বজ্ঞানের, কিছু না কিছু টুক্‌রা টাক্‌রা পাথেয় সম্বল মনোভাণ্ডারে সংগ্রহ করে।

প্রথম বয়সে মনুষ্য যখন মা'য়ের মুখে শোনে "এটা করিতে নাই—ওটা করিতে নাই" তখন তাহা কেন করিতে নাই জিজ্ঞাসা করে না; ধাত্রীর মুখে যখন শোনে যে "সাপের মাথায় সাত রাজার ধন মাণিক আছে" তখন তাহার বুদ্ধিতে তাহা কেনবাক্য। এই বয়সে

কল্পনার কুহকে মুগ্ধ হইয়া সকল মনুষ্যই অশিক্ষিত কবি হয়।

তাহার পরে গতানুগতিকতা শেখে—"বাবা এইরূপ করে আমিও এইরূপ করিব" "পাঁচজনে এইরূপ করে আমিও এইরূপ করিব" "মাষ্টার মহাশয় এইরূপ করিয়া বই পড়ে—আমিও এইরূপ করিয়া বই পড়িব" এইরূপ আপাতদর্শী বুদ্ধিতে চালিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা যে যাহা বলে এবং যে যাহা করে তাহাই শেখে। এই বয়সে মনুষ্য পিতৃ-পিতামহ-সেবিত বাঁধা রাস্তায় বাঁধা চালে চলিতে শিক্ষা করিয়া অশিক্ষিত সভ্য হয়।

তাহার পরে মনুষ্য জ্ঞাতব্য বিষয় কতক বা দেখিয়া শেখে, কতক বা ঠেকিয়া শেখে। যখন ঠেকিয়া শেখে তখন তার চক্ষু ফোটে। পরের কথায় নির্ভর করিয়া এবং পরের দেখাদেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলিতে গিয়া যখন সে বার পাঁচ ছয় ঠকে, তখন সে সকল বিষয় আপনার চক্ষে দেখিয়া, আপনার কর্ণে শুনিয়া, আপনার বুদ্ধিতে বিচার করিয়া যাহার মধ্যে যতটুকু সত্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহার মধ্য হইতে তাহা টানিয়া বাহির করে এবং তদনুসারে কর্ত্তব্য স্থির করে। এই বয়সে মনুষ্য স্বাধীনতায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া অশিক্ষিত বিজ্ঞ হয়।

তাহার পরে মনুষ্য—বাস্তবিক আমি কতটুকু স্বাধীন—কতটুকু পরাধীন; বাস্তবিক আমার ক্ষমতার দৌড় কতটুকু; বাস্তবিক আমার কোথায় স্থিতি কোথায় গতি, কোথা হইতে উৎপত্তি বাস্তবিক আমি কি করিতে সংসারে আসিয়াছি; সংসারের আদি কি, অন্ত কি, সত্য কি; কর্ত্তব্য কি, এই সকল বিষয় মনের মধ্যে তোলা পাড়া করিয়া দেখে; সংক্ষেপে আপনাকে আপনি সত্যের তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া দেখে এবং সেই আত্ম-পরীক্ষা হইতে (Socrates এর know thyself হইতে) সার সার জ্ঞানামৃত মন্থন করিয়া তাহার গুণে ধীর নম্র শ্রদ্ধাবান্ এবং ভক্তিমান্ হয়; এই বয়সে মনুষ্য বিবেক এবং বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া অশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হয়।

মনুষ্যের বয়সের গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের গতি ধাপে ধাপে যেরূপ নীচু হইতে উঁচু দিকে ফিরিয়া যাইতে থাকে, তাহারই আমি একটি আনুপূর্ব্বিক চুম্বক-দৃশ্য যত অল্প কথায় পারি চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু নৈয়ায়িকদিগকে আমি বড ডরাই বিশেষতঃ এ দেশের এবং এ কালের নৈয়ায়িকদিগকে আমি বাঘের মত ডরাই! এক জন নৈয়ায়িক ঘানির ঘূর্ণনে কৌতূকাবিষ্ট হইয়া কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গরুর গলায় ঘন্টা কেন? কলুর মুখে যখন শুনিলেন যে ঘণ্টার শব্দে জানিতে পারা যায় গোরু চলিতেছে, তখন সে কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না; তিনি তাঁহার কুশাগ্রীয় সূক্ষ্ম বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া বলিলেন যে, "গোরু যদি দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে?" সমালোচক তেমনি আমাকে কি বলিবেন, আমি তাহা জানি; তিনি প্রবীণ বিজ্ঞতা সহকারে বলিবেন যে, "তুমি বলিতেছ মনুষ্য তৃতীয় বয়সে অশিক্ষিত বিজ্ঞ হয়, চতুর্থ বয়সে অশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হয়; কিন্তু যদি সে আন্দামান উপদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করে। ইহার তুমি কি উত্তর দাও"? ইহার উত্তর আমি এই দিই যে, "আমার ঘাট হইয়াছে!" মাথা নাই তার মাথা ব্যথা! আন্দামানীর তৃতীয় বয়স হইলে, তবে তো সে তৃতীয় বয়সে অশিক্ষিত বিজ্ঞ হইবে! তাহা তাহার ভাগ্যে হয় কই! আন্দামানী চিরজীবনই প্রথম বয়সের গণ্ডীটাতে হামাগুড়ি দ্যায়—চিরকালই সে শিশু থাকে। কাজেই আন্দামানী অশিক্ষিত কবি পর্য্যন্ত হইয়াই ক্ষান্ত থাকে। সুশিক্ষিত সভ্য লোকেরা সহস্র সাধ্য সাধন করিয়াও, যাহা দেখিতে পান নাক, আন্দামানীর ন্যায় অশিক্ষিত কবিরা তাহা বিনা চেষ্টায় দেখিতে পায় অরণ্যের আড়ালে আবডালে ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ বনদেবতা প্রভৃতি কত কি যে কল্পনাচক্ষে

দেখিতে পায়, তাহার ওর নাই।

মনুষ্য যদি সুশিক্ষিত কবি হইতে ইচ্ছা করে তবে রীতিমত কাব্যশাস্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত বিজ্ঞ হইতে হইলে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন; সুশিক্ষিত প্রাজ্ঞ হইতে হইলে, দর্শন-শাস্ত্রের অনুশীলন—তাহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক।

বঙ্গভাষার অধিকারায়ত্ত প্রদেশে সুশিক্ষা পথের ঐ চারিটি সোপান পংক্তি কাটিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—এ বৃত্তান্তটি আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ের খুবই একটি শুভ চিহ্ন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা-বিতরণ করা এক প্রকার তেলা মাথায় তেল দেওয়া—সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য তাহা নহে। সাহিত্য-পরিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্চে অশিক্ষিত মহলে সুশিক্ষার আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করা;—যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞানানুশীলন করিয়াই যাহাতে কালোচিত সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন, ধীরে ধীরে তাহার পথ প্রস্তুত করা।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ে সুশিক্ষার পথের কণ্টক তিন শ্রেণীর ব্যক্তি—সুশিক্ষার পথের দীপ-স্তম্ভ এক শ্রেণীর ব্যক্তি। পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর ব্যক্তি হচ্চেন, প্রথম—না পড়িয়া পণ্ডিত।

দ্বিতীয়—বই মুখস্থ করিয়া পুঁথিগত বিদ্যার জাহাজ!

তৃতীয়—ইংরাজী বিদ্যার অসারাংশ লেহন করিয়া, তমোতে আপাদমস্তক পরিপূরিত, স্ফীত, উদ্ধত, দিশাহারা কাণ্ডজ্ঞানরহিত কি যেন কি!

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তি সুশিক্ষাপথের কণ্টক। পক্ষান্তরে,

দেশোচিত সংস্কৃত বিদ্যা এবং কালোচিত ইংরাজী বিদ্যার মর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, দুয়ের যাঁহারা সারাংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন :

দেশ এবং কাল দুয়ের যাঁহারা মর্ম্মস্থানীয় ধাতু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উভয়ের ভেদ অবগত হইয়াছেন।

যাঁহাদের নাড়ী-জ্ঞান আছে;

যাঁহারা কাহাকে কি বলে, কাহাকে কি বলে না, তাহা বিধি মতে বিচার করিয়া ঠিক্ ঠাক বুঝিয়াছেন;

কাহাকে সভ্যতা বলে, কাহাকে সভ্যতা বলে না; কাহাকে Patriotism বলে, কাহাকে Patriotism বলে না; কাহাকে স্বাধীনতা বলে, কাহাকে স্বাধীনতা বলে না; তাহা এবং তাহার ভিতরকার মারপ্যাচ, সমস্তই যাঁহাদের ভাল করিয়া জানা হইয়াছে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, কাহারো কোনো তক্কা রাখি না ভাব এবং হাম্বড়া ভাব স্বাধীনতা নহে, তাহা তমোগুণের অধীনতা;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, গৃহে হিতাকাঙ্খী গুরুজনের অধীনতা, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপালক প্রভুর অধীনতা এবং রণক্ষেত্রে সেনাপতির অধীনতা পরাধীনতা নহে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, ভদ্রসমাজোচিত নম্র ব্যবহার কাপুরুষত্বের লক্ষণ নহে; আর ঔদ্ধত্যপ্রকাশ, Spirit ফলানো এবং মৌখিক গর্ব্ব-আস্ফালন বীরত্বের লক্ষণ নহে;

যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে শিখেরা জজমাজিষ্টরকে সেলাম করে বলিয়া তাহারা কাপুরুষ নহে; আর বাঙ্গালীরা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করে না বলিয়া, তাহারা

মস্ত বীর পুরুষ নহে,

মোট কথা এই যে, যাঁহারা এ দেশ এবং এ কাল, ভারতবর্ষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দী দুয়েরই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রসজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞতা এবং প্রাজ্ঞতা, এই চারিটি অমূল্য রত্ন উপার্জ্জন করিয়াছেন,কাব্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া রসজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন; এবং দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া প্রাজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহাদের শ্রেণীর ব্যক্তিরাই বঙ্গের সুশিক্ষা পথের দীপ-স্তম্ভ। শেষোক্ত শ্রেণীর সুযোগ্য ব্যক্তিদিগের উপরেই সাহিত্য-পরিষদের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে।

অতঃপর আসিতেছে, সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা। পত্রিকা খানি সাহিত্য-সেবক-দিগের বাণিজ্য তরী। তাহা উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-বিজ্ঞানাদির গুরুভার বহন করিয়া বন্দরে বন্দরে যাতায়াত করিতেছে, মন্দ না। তাহা যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিতে থাকিলে, তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এ আমাদের বলবতী আশা ফলবতী না হইবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ যখন নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় অমন এক জন উদ্যমশীল সদাশয় এবং সুদক্ষ নাবিক তাহার হাল ধরিয়া রহিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুই তাঁহার স্থানের ঠিক উপযুক্ত— ইংরাজিতে যাহাকে বলে, The right man in the right place

আমাদের সুগোচরার্থে মোট কথা যাহা আমার বক্তব্য, তাহা এই যে, এই দুই বৎসর সাহিত্যপরিষৎ যে ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তাহার স্থায়িত্বের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহার উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইলে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত ইংরাজী-সংস্কৃতজ্ঞ ভদ্র বিনীত এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের জোট-পাট সংঘটন করিয়া, কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিলে ভাল হয়, তাহা আমার যতদূর সাধ্য তাহা আমি সংক্ষেপে বলিয়া চুকাইয়াছি, আপনাদের বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে আপনারা যাহা ভাল বোঝেন, তাহাই করিবেন।

এইখানে আমি আজ একটি আনন্দজনক বিষয়ের প্রজ্ঞাপন করিয়া, মধুরেণ সমাপয়েৎ করিতে পারিতাম, যে হেতু ইহারই মধ্যে পরিষদ গোটা চার পাঁচ আয়াসসাধ্য অনুসন্ধান কার্য্য যেরূপ বিচক্ষণতা এবং নিপুণতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন—তাহা অনতিবিলম্বে গুণগ্রাহী সাধারণের নিকট যথোচিত আদরভাজন হইবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি আজ মধুরেণ সমাপয়েৎ করিবার এমন সুযোগ পাইয়াও এ যাত্রায় তাহা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইতেছি; কেন না আমিও শ্রান্ত হইয়াছি—আপনারাও শ্রান্ত হইয়াছেন। তা বলিয়া আপনারা মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। বর্ত্তমান প্রবন্ধ ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সময় এই প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ভাগেই হউক, আর পৃথক্ কার্য্য বিবরণীতেই হউক, ঐ অভিনন্দনীয় বার্ত্তাগুলির যথাবিহিত পর্য্যালোচনার ত্রুটি হইবে না।

অতঃপর এ দুই বৎসর আপনারা আমাকে সভাপতির গৌরবান্বিত আসনে অধিরূঢ় করাইয়া, যেরূপ সম্মানিত করিয়াছেন এবং আমার কার্য্যের অসমীচীনতা যেরূপ সদয় দৃষ্টিতে উপেক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে, এখন যদি আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া অবসর প্রদান করিতে সম্মত হন, তবে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলুন, তাহা হইলে, আমি আগামিবৎ যোগ্যতর সভাপতির যথাবিহিত সংকারের জন্য, স্থান খালি করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে সভাপতির আসন হইতে সরিয়া দাঁড়াই।

# উপসর্গের অর্থ-বিচার

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রণেতা বোপদেব তাঁহার ব্যাকরণের ললাট ফলকে এইরূপ একটা চিত্তদমানিয়া ঘোষণা-বাণীর ধ্বজপতাকা লট্‌কাইয়া দিয়াছেন ঃ—

"অহং চ ভাষ্যকারশ্চ, কুশাগ্রীয় ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যেজড়বুদ্ধয়ঃ॥

আমি এবং ভাষ্যকার—আমাদের দুজনার উভয়েরই বুদ্ধি কুশাগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ; তাহা সত্ত্বেও আমরা এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত সাধ্যসাধনা করিয়াও শব্দাম্বুধির পার পাইলাম না—কী ছার জড়বুদ্ধি অপরেরা!" তিমি মৎস্যের দশাই যখন এইরূপ, তখন, আমাদের ন্যায় পুঁটিপাঁটা শ্রেণীর ভাষার ব্যাপারীদের কী হইবে গতি? কোনো চিন্তা নাই। অকূল শব্দাম্বুধির একস্থানে আমি Behring strait এর ন্যায় একটা সরু সোঁতা দেখিতে পাইয়াছি—তাহার এ পারে বঙ্গ-ভারতীয় এবং ও-পারে ইঙ্গ-ভারতীয় পীঠস্থান। এই দুই পারের দুই বিস্তীর্ণ ভাষাক্ষেত্র হইতে উপসর্গের পাকা ধান্য সংগ্রহ করিয়া শ্রোতৃ মহাজনদিগকে দিয়া তাহার মূল্য যাচাই করাইয়া লইব মনে করিয়াছি ; আমাদের এ যাত্রার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

অতএব আর-বেশী ভূমিকা না করিয়া তাহাতেই এক্ষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্র এবং নি উপসর্গের
পরস্পর প্রতিযোগিতা
দ্রষ্টব্য।

বঙ্গ-ভাষার প্র = ইংরাজি ভাষার Pro
বঙ্গ-ভাষার নি = ইংরাজি ভাষার In

প্র এবং নি উপসর্গের পরস্পর
প্রতিযোগিতার
দৃষ্টান্ত।

প্র এবং নি এই দুই উপসর্গের দৃষ্টান্ত।

প্রশ্বাস ... ... নিঃশ্বাস।
প্রবৃত্তি ... ... নিবৃত্তি
প্রবাস ... ... নিবাস
প্রবেশ ... ... নিবেশ
প্রক্ষেপ ... ... নিক্ষেপ
প্রকৃষ্ট ... ... নিকৃষ্ট

এই দৃষ্টান্তগুলিতে প্র এবং নি এই দুই উপসর্গের অর্থ স্পষ্ট ধরা দিতেছে। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে,

প্র = pro = forth

নি = in

প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে ; নি উপসর্গের লক্ষ্য ভিতরের দিকে। তাহার সাক্ষী—

প্রশ্বাস = breathing forth

নিশ্বাস = inhailing

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যেও প্র এবং নি উপসর্গের ঐরূপ প্রতিযোগিতা দেখিতে পাওয়া যায় যথা,—

প্রবৃত্তি = pro-pensity = সম্মুখের দিকে ঝোঁক।

নিবৃত্তি = ভিতরের দিকে বৃত্তি টানিয়া লওয়া।

প্রবাসের লক্ষ্য বাড়ীর বাহিরের দিকে।

নিবাসের লক্ষ্য বাড়ীর ভিতরের দিকে।

প্রবেশের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে ; যেমন, সম্মুখস্থিত অরণ্যে প্রবেশ। নিবেশের লক্ষ্য ভিতরের দিকে , যেমন পুস্তকের অভ্যন্তরে মনোনিবেশ। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে ;— এক দিক্ দিয়া দেখিলে যাহা প্র, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা নি। কোন শব্দের বাচ্য বিষয়কে কোন্ দিক্ দিয়া দেখা হইতেছে, তাহা সেই শব্দের প্রচলিত অর্থ দৃষ্টে অতীব সহজে জানা যাইতে পারে। যেখানে দেখিবে, যে, প্র-পূর্ব্বক কোন একটি শব্দের সহিত নি-পূর্ব্বক আর একটি শব্দের অর্থ সাদৃশ্য দেদীপ্যমান, সেখানে নিশ্চয়ই জানিবে যে, দুই শব্দের অর্থ দুই বিপরীত দিক দিয়া অবধারণ করা হইতেছে। proclivity এবং inclination এই দুই শব্দের অর্থ অবিকল একইরূপ ; অথচ পূর্ব্বোক্ত শব্দের আদিতে pro, শেষোক্ত শব্দের আদিতে in। দুই শব্দের অর্থ ঝোঁক। কিন্তু ঝোঁকের লক্ষ্য তাহার দুই প্রান্তের দুই বিভিন্ন দিকে :—

ঝোঁকই বলো, টানই বলো আর প্রবৃত্তিই বলো, তাহা লক্ষ্যকর্ত্তার proclivity, লক্ষ্য বস্তুর প্রতি inclination।

প্রবেশ শব্দের প্র প্রবেশ কর্ত্তার সম্মুখ দিক্ দেখাইয়া দেয় ; নিবেশ শব্দের নি লক্ষ্য বস্তুর ভিতরের দিক্ দেখাইয়া দেয়। নিক্ষেপ এবং প্রক্ষেপ শব্দের প্রচলিত অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে, যাহা বলিলাম তাহার যাথার্থ্য আরও স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। নিক্ষেপ শব্দের বিশেষ দৃষ্টি লক্ষ্য বস্তুর ভিতরের দিকে।

নিক্ষেপ = to throw in.

যেমন, দুর্গ মধ্যে গোলা-নিক্ষেপ, কিন্তু যখন আমরা বলি যে, "অমুক পুঁথিতে এই বচনটি প্রক্ষিপ্ত" তখন বুঝিতে হইবে যে, পুঁথির বহিস্থিত প্রক্ষেপ কর্ত্তার দিক্ হইতেই প্রক্ষেপ শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। এ স্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, গোলাও দুর্গের অভ্যন্তরে নিপাতিত হয়, প্রক্ষিপ্ত বচনও পুঁথির অভ্যন্তরে নিপাতিত হয় ;—ইহার বেলাই বা প্র হয় কেন, আর, উহার বেলাই বা নি হয় কেন? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে. পৃথক্ ফল যাহা দেখিতেছ, তাহা এক যাত্রার ফল নহে। দুর্গের মধ্যে নিপাতিত হইবার জন্যই গোলা হইয়াছে— গোলার কাজই তাই ; গোলা দুর্গাভ্যন্তরে অথবা শত্রুর বক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলেই তাহার জন্ম সার্থক হয়। কিন্তু পুঁথির অভ্যন্তরে নিপাতিত

হওয়া প্রক্ষিপ্ত বচনের পক্ষে নিতান্তই অবৈধ কার্য্য। প্রক্ষিপ্ত বচনের সহিত পুঁথির কোন প্রকার আন্তরিক সম্বন্ধ না থাকাতে সে জায়গায় প্র-উপসর্গের গদি ঠেস্ দিয়া বসিতে নি উপসর্গের নিতান্তই বাধো বাধো ঠ্যাকে।

প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট শব্দের প্রচলিত অর্থ উত্তমাধম। এ অর্থ কোথা হইতে আইল? আইল যেখান হইতে, তাহা এখন আর কাহারও নিকটে গোপন থাকিতে পারে না।

প্রকৃষ্ট = প্র + কৃষ্ট = সাম্‌নে টানিয়া আনা।

নিকৃষ্ট = নি + কৃষ্ট = ভিতরে টানিয়া রাখা।

গো-বিক্রেতা ভাল গোরুকে সাম্‌নে টানিয়া আনে—যে, ক্রেতা তাহা দেখুক্ ; আর, তাহার বিপরীত কারণে অধম গোরুকে ভিতরে টানিয়া রাখে।

প্রদর্শনীয় = ভাল ; তাই প্রকৃষ্ট = ভাল।

অপ্রদর্শনীয় = মন্দ , তাই, নিকৃষ্ট = মন্দ।

এই প্রসঙ্গে এটাও বলিয়া রাখা শ্রেয় মনে করিতেছি যে,

গ্রহণীয় = ভাল , তাই উৎকৃষ্ট (টানিয়া তোলা) = ভাল।

বর্জ্জনীয় = মন্দ ; তাই অপকৃষ্ট (টানিয়া ফেলিয়া দেওয়া) = মন্দ।

পণ্ডিত মহাশয়কে প্রয়োজন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হয় তো বলিবেন "প্রকৃষ্টরূপে যোজন"। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আমরা বলি pro-যোজন—সম্মুখ দিকে যোজন। ইংরাজিতে এইরূপ একটি বাক্য-প্রয়োগ প্রচলিত আছে যে, I am looking forward to a time when & c., এই কথাটিতে প্রয়োজনীয় লক্ষ্য বস্তুর সম্বন্ধে forward শব্দটি কেমন সুন্দর বসিয়াছে তাহা দেখা হউক্ , তাহা দেখিলে, প্রয়োজন শব্দের গোড়ায় কি সূত্রে প্র গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। প্রয়োজনীয় বস্তুকে মনোনেত্রের সম্মুখে গঠন করিয়া তোলা—যোজনা করিয়া তোলা, আর, তাহার উদ্দেশে সম্মুখ দিকে দৃষ্টি প্রসারণ-পূর্ব্বক পথ চাহিয়া থাকা, নূতন কিছুই নহে , সেই সূত্রে প্রয়োজন শব্দের আদিতে প্র বসিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, এক দিক্ দিয়া দেখিলে যাহা প্র, আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা নি। এইরূপ দিক্ পরিবর্ত্তন গতিকে অনেকগুলি প্র-পূর্ব্বক দেশীয় শব্দের ইংরাজি প্রতিশব্দ in-পূর্ব্বক (অর্থাৎ নি-পূর্ব্বক) হইয়া গিয়াছে ; তাহার সাক্ষী

প্রভাব = in-fluence

প্রগাঢ় = in-tense

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশীয় এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় প্র-উপসর্গের প্রয়োগ সাদৃশ্য অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহার সাক্ষী

প্র-বচন = pro-verb

প্রণয়ন (পুস্তক-প্রণয়ন) = pro-duce

প্রকীর্ত্তন = pro-claim

প্রলম্বন = prolongation

প্রচুর = profuse

প্রজন = progeny *

---

* শাস্ত্রে আছে "প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহ-দীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোস্তি কশ্চন॥"

এতদ্ব্যতীত, প্রবাহ, প্রসারণ, প্রদান, প্রচার, প্রতান, প্রভা, প্রকাশ, প্রবর্দ্ধন, প্রদীপ, প্রদেশ, এইরূপ প্র পূর্ব্বক নানা শব্দের মধ্য হইতে প্র-উপসর্গের সম্মুখ-প্রবণতা অর্থ জাজ্বল্যমান ফুটিয়া বাহির হইতেছে। নি-উপসর্গেরও অন্তর্নিষ্ঠতা অর্থ অনেকানেক নি পূর্ব্বক শব্দের গাত্রে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—কেবল দুই চারিটি স্থলে তাহা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। নিদান শব্দের ঠিক্ অর্থ কি তাহা উপাদান শব্দের সহিত তাহাকে তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রাচীর গঠন করিবার সময় আমরা বাহির হইতে উপাদান সংগ্রহ করি, কিন্তু নিদান সেরূপে সংগৃহীত হইতে পারে না, কেননা নিদান নিতান্তই অন্তরের সামগ্রী। ইংরেজি ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, "to consist of" এবং "to consist in" এই দুইরূপ কথার দুই রূপ অর্থ। "অমুক consists of এই এই সামগ্রী" বলিলে বুঝায় যে, সে সামগ্রীগুলি তাহার উপাদান ; আর, "অমুক consists in এই সামগ্রী" বলিলে বুঝায় যে, সেটি তাহার নিদান। তাহার সাক্ষী Humanity consists of intellect, animality, life and body' এ কথা বলিলে বুঝায় যে বুদ্ধি, মন, প্রাণ এবং শরীর, এগুলি মনুষ্যত্বের উপাদান। আর, যদি বলি যে, 'Humanity consists in rationality' তবে তাহাতে বুঝায় যে প্রজ্ঞা মনুষ্যত্বের নিদান।

ন্যায়-শাস্ত্রে নিগমন শব্দের অর্থ-ইংরাজিতে যাহাতে বলে conclusion.

(১) নি = in

(২) গমন = coming

(৩) নিগমন = incoming

(উপরে 'come' এবং 'গম' 'cow' এবং 'গৌ' এই প্রকার শব্দসাদৃশ্যের সূত্র ধরিয়া গমন শব্দের অর্থ করিলাম coming ; ফলেও এই রূপ দেখা যায় যে আমরা যেখানে বলি 'তোমার ওখানে যা'ব ইংরাজেরা সেখানে বলে 'I will come to you)। ন্যায় শাস্ত্রের conclusion এর সঙ্গে income-এর কোনোও প্রকার সম্বন্ধ আছে—ইহা শুনিলে টোলের অধ্যাপকেরা দুঃখের হাসি হাসিবেন তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে ; কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিতেছেন, এ সে income নহে—লক্ষ্মীর income নহে। এ income সরস্বতীর income—বুদ্ধির লোহার সিন্দুকে তত্ত্বের income। আমরা কথায় বলি—"এ থেকে আস্‌চে" অর্থাৎ এইরূপ যুক্তি হইতে আসিতেছে। conclusion যুক্তি-পথের মধ্য দিয়া বুদ্ধির বাহির হইতে বুদ্ধির ভিতরে আগমন করে—তাই তাহা নিগমন। মনে কর দূরে উচ্চাকার কি একটা বস্তু আমার নয়নগোচর হইতেছে—কিন্তু তাহা খোঁটা কি মনুষ্য তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাহা যে কি তাহার আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না। তাহার পরে ঠাহরিয়া দেখিলাম যে, সে বস্তুটা ক্রমশঃ আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমার বুদ্ধিতে আসিল যে, এটা নিশ্চয়ই মনুষ্য। বুদ্ধিতে যে আসিল—কোথা হইতে আসিল? "চলিতেছে" এই যুক্তি হইতে। যুক্তি কি? না যোজনা। কিসের সঙ্গে কিসের যোজনা। যে মাত্র আমার মনোমধ্যে ঐ দুই ভাবের যোজনা (Synthesis) হইল, অমনি আমার বুদ্ধিতে আসিল "এ নিশ্চয়ই মনুষ্য।" নিগমন কি অর্থে income তাহা এখন বুঝিতে পারা গেল যুক্তি পথ দিয়া বুদ্ধিতে আসা = বুদ্ধির অভ্যন্তরে আগমন = নিগমন এই অর্থে। ন্যায় শাস্ত্রের 'ন্যায়' শব্দটি কী? তাহা নি + আয়। আয় শব্দের অর্থ আগমন। টাকা ঘরে আসিলে তাহারই

নাম আয়। কোন একটি তত্ত্ব অন্যের নিকটে শুনিয়া তাহা যদি মনোমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, তবে তাহা বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। পক্ষান্তরে, যাহা যুক্তিদ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা বুদ্ধির আয়ত্তাভ্যন্তরে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপ যুক্তি পথের মধ্যদিয়া বুদ্ধির অভ্যন্তরে তত্ত্বের আয় অর্থাৎ আমদানি ন্যায়-শব্দের বাচ্য ; যেহেতু ন্যায় = নি + আয়। ইউক্লিডের কৃত একটি জ্যামিতির সিদ্ধান্ত তুমি যখন যুক্তি পরিচালনা করিয়া বুদ্ধিতে আয়ত্ত কর—তখন বুদ্ধির অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ হইয়া তোমার নিজস্ব সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ নিজস্ব সম্পত্তির ভাব হইতে ন্যায়ান্যায়ের ভাব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যাহাতে যাহার নিজের অধিকার তাহাই তাহার নিজস্ব সম্পত্তি—তাহাই তাহার নি + আয়। যাহাতে যাহার অধিকার নাই, তাহা কখনই তাহার নিজস্ব হইতে পারে না। চুরি করা সামগ্রী কখনই চোরের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে পারে না ; চোর যদি সহস্রবার বলে, যে, সে সামগ্রী তাহার নিজের, তথাপি তাহা তাহার নিজের নহে। তাহা তাহার ন্যায় নহে নি + আয় নহে তাহা অন্যায়। আমি নিজে যুক্তি খাটাইয়া যে কোন তত্ত্ব উপার্জ্জন করি, তাহাই আমার বুদ্ধির নিজস্ব সম্পত্তি ; ন্যায়-শাস্ত্র অনুসারে তাহাই আমার ন্যায় (= নি + আয়)। তেমনি আবার, আমি নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন বা উৎপাদন করি, তাহাতেই আমার নিজের অধিকার বর্ত্তে, তাহাই আমার নিজস্ব ধন ; নীতি-শাস্ত্র অনুসারে তাহাই আমার ন্যায় নি + আয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায়ই বলো, আর নীতিশাস্ত্রের ন্যায়ই বলো, নিজস্ব সম্পত্তির ভাব দুয়েরই গোড়া'র কথা। নি-উপসর্গের লক্ষ্য উভয় স্থলেই ভিতরের দিকে।

যিনি যাহা সুযুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ; যিনি যাহা সদুপায় দ্বারা উপার্জ্জন করেন, তাহাই তাঁহার অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কোন ব্যক্তি যদি যথেচ্ছা-মূলক কল্পনা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত সকল মনোমধ্যে পোষণ করেন, তবে কোন বিষয়েরই সত্যাসত্য তাঁহার বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। তেমনি আবার, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের সম্পত্তি অন্যায়রূপে হস্তগত করিয়া নিজে ভোগ করেন, তবে তাহা তাঁহার অধিকারাভ্যন্তরে প্রবেশ পায় না বলিয়া তিনি তাহা জীর্ণ করিতে পারেন না—আত্মসাৎ করিতে পারেন না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, ন্যায় শাস্ত্রের "ন্যায়" এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের "ন্যায়" দুয়েতেই নি-উপসর্গের অন্তর্নিহিতা অর্থ সমানরূপে বলবৎ। নিজ = নি × জ ; যেগুণ যাহার অন্তর্জাত তাহাই তাহার নিজগুণ।

নি-উপসর্গ কোনো কোনো স্থলে নিষেধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সেটা তাহার মুখ্য অর্থ নহে—গৌণ অর্থ। নিবৃত্তি শব্দের মুখ্য অর্থ বৃত্তিকে ভিতরে টানিয়া লওয়া ; তাহা হইতেই তাহার গৌণ অর্থ দাঁড়াইয়াছে বৃত্তি-শূন্যতা।

প্র-উপসর্গের সহিত নি-উপসর্গের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা দেখা গেল ; অতঃপর তাহার সহিত সং এবং বি এ দুই উপসর্গের কাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তদুপক্ষের ভূমিকা স্বরূপে গোটা দুই কথা বলা আবশ্যক।

প্রথম কথা এই যে, সং-উপসর্গ কখন কখন আপনার গাত্র হইতে অনুস্বার ঝাড়িয়া ফেলিয়া স হয়। স-উপসর্গের অর্থ, সহ, ইহা বিদ্যালয়ের শিশুছাত্রেরাও জানে, কিন্তু সং উপসর্গেরও যে গোড়ার অর্থ তাই—ইহা বালক দূরে থাকুক, পণ্ডিত মহাশয়েরাও জানেন কি না সন্দেহ

কেননা তাহা জানিলে তাঁহারা এরূপ কথা কখনই বলিতেন না যে, সং = সম্যক্‌রূপে। সায়নাচার্য্যকৃত বেদভাষ্যে "সংবদ্ধং" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "সহবদ্ধ", অতএব সং যে, সহ, ইহা এক প্রকার বেদবাক্য ; একদিকে এই যেমন দেখা গেল, যে, স এবং সং দুয়েরই গোড়ার অর্থ, সহ, আর একদিকে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই গোড়ার অর্থের মধ্য হইতে দোঁহার দুই শাখা অর্থ দুই দিকে ছট্‌কিয়া বাহির হইয়াছে ; তাহা এই—

স' এর অর্থ সমান ;

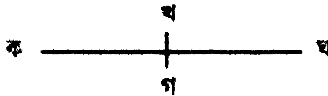
সং এর অর্থ এক সঙ্গে,

তার সাক্ষী—

সপত্নী = পত্নী ইনি যেমন—উনি তেমনি—উভয়েরই সমান।

সংগম = একসঙ্গে উপস্থিতি।

ইংরাজি ভাষায় সং এবং স' এর অবিকল অনুবাদ con এবং co। সং যেমন অনুস্বার ফেলিয়া দিয়া স হয়, con তেমনি n ফেলিয়া দিয়া co হয় co এবং con এ দুয়ের মধ্যে যে, অতীব নিকট সম্বন্ধ তাহার প্রমাণ এই যে, conterminous হয় co এবং conterminons এই দুই শব্দের একই অর্থ। মনে কর




ক খ রেখার খ-প্রান্ত এবং গ ঘ রেখার গ-প্রান্ত এক স্থানে মিলিত হইয়াছে ; এরূপ অবস্থায় ক খ এবং গ ঘ রেখাদ্বয়কে conterminous ও বলা যাইতে পারে, conterminons ও বলা যাইতে পারে ; —খ এবং গ সমস্থানে পড়িয়াছে বলিয়া রেখাদ্বয় conterminous ; খ এবং গ একসঙ্গে মিলিত হইয়াছে বলিয়া রেখাদ্বয় conterminous। ও দুই শব্দের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ এইরূপ ; —

Conterminous = সামপ্রান্তিক

Conterminons = সাম্প্রান্তিক ;

স-এর মুখ্য অর্থ কিন্তু সহ ;—

সবান্ধব = বান্ধব সহ ;

সক্রোধ = ক্রোধ সহ

স'এর এইরূপ সহবর্ত্তিতা অর্থ হইতেই তাহার সমকক্ষতা অর্থ গজাইয়া উঠিয়াছে ; তার সাক্ষী—

সপত্নী = co পত্নী = rival পত্নী

সঙ্গিনী = সুখদুঃখের copartner

সোদর = co জঠর জাত

সহৃদয় = co হৃদয় = sympathetic

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তিও "তোমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি" না লিখিয়া স'য়ে বফলা দিয়া লেখেন "তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি" ; "সিংহ এবং ব্যাঘ্রের মধ্যে সাজাত্য সম্বন্ধ" না লিখিয়া— লেখেন "সিংহ এবং ব্যাঘ্রের মধ্যে স্বাজাত্য সম্বন্ধ"

"গো এবং গবয়ের মধ্যে সারূপ্য রহিয়াছে" না লিখিয়া— লেখেন "গো এবং গবয়ের মধ্যে স্বারূপ্য রহিয়াছে"। "অমুক ব্যক্তি স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন" এরূপ স্থলে স'য়ে বফলা দেওয়া যে নিতান্তই আবশ্যক এ কথা আমি অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাটাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, তোমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি" এখানে স'য়ে বফলা দেওয়া হইতেছে শুদ্ধ কেবল গায়ের জোরে। যেখানে "তোমার সপক্ষ" বলিলেই সহজে তাহার অর্থ বুঝা যায়, সেখানে "তোমার স্বপক্ষ" বলিয়া, অর্থাৎ তোমার আপনার পক্ষ বলিয়া, মিথ্যা একটা গণ্ডগোল বাধাইবার প্রয়োজন কি? ব-ফলা না দিয়া সাদাসিধা লিখিলেই তো হয় যে, তোমার সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি অর্থাৎ তোমার সমপক্ষে বা সহপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি— তোমার বিপক্ষে বা বিরোধী পক্ষে সাক্ষ্য দিই নাই। এই গেল আমাদের প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা এই যে, বি উপসর্গটি বড় সহজ পাত্র নয়—তাহা এক প্রকার সিদ্ধির ঝুলি। একই বি-উপসর্গ হইতে কোনো স্থলে বা বিসর্জ্জন কোনো স্থলে বা বৈপরীত্য, কোনো স্থলে বা হেয়তা, কোনো স্থলে বা বিশেষত্ব, কোন স্থলে বা পরিবর্ত্তন, কোনো স্থলে বা অসামঞ্জস্য, এইরূপ নানা স্থলে নানা অর্থ বিজৃম্ভিত হইয়া পরীক্ষকের চক্ষে ধাঁদা লাগাইয়া দেয় ; তাহার সাক্ষী—

| | |
|---|---|
| বিসর্জ্জন অর্থ .. | সজন, বিজন<br>সধবা, বিধবা<br>সবস্ত্র, বিবস্ত্র |
| বৈপরীত্য অর্থ ... | অনুলোম, বিলোম<br>সপক্ষ, বিপক্ষ<br>অনুরক্ত, বিরক্ত |
| হেয়তা অর্থ .. | সুশ্রী বিশ্রী<br>ধর্ম্ম বিধর্ম্ম<br>জাতি, বিজাতি |
| বিশেষত্ব অর্থ ... | দ্বেষ, বিদ্বেষ<br>দলিত, বিদলিত<br>হীন, বিহীন |
| পরিবর্ত্তন অর্থ ... | বর্ণ, বিবর্ণ<br>প্রকৃতি, বিকৃতি<br>প্রকাশ, বিকাশ |
| অসামঞ্জস্য অর্থ ... | অঙ্গ, ব্যঙ্গ<br>সদৃশ, বিসদৃশ<br>সকলাঙ্গ, বিকলাঙ্গ |

উপরি উক্ত দৃষ্টান্ত গুলির প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, বি-উপসর্গের গোড়া'র অর্থ একটা কিছু আছে—তাহাই অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নানা অর্থে পরিণত হয়। একই প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অঙ্কুর যেমন মৎস্য দেহে পাকনা-রূপে, পক্ষি-দেহে

ডানা-রূপে, এবং মানব-দেহে হস্তরূপে পরিণত হয়, তেমনি খুব সম্ভব যে, বি উপসর্গের গোড়ার অর্থ বিভিন্ন অবস্থা গতিকে বিভিন্ন শাখা-অর্থে পরিণত হইয়াছে। বি-উপসর্গের সেই গোড়া'র অর্থটি কি, এবং তাহা কোন্ সূত্রে কোন্ শাখা-অর্থে কিরূপ করিয়া পরিণত হইয়াছে, তাহারই অন্বেষণে এক্ষণে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। বি-উপসর্গের প্রচলিত অর্থ-গুলির মধ্যে তাহার গোড়া'র অর্থ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়—শাখা অর্থই অনেক ; তাহার কারণ আর কিছু না—খাঁটি রূপা'র ঘটিবাটী বাজারে দুষ্প্রাপ্য। আর একটি কথা এই যে, টাকা অপেক্ষা খাঁটি রূপা দেখিতে মলিন বলিয়া হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে তাহা অতীব অধম শ্রেণীর রূপা। অতএব, বি-উপসর্গের মুখ্য অর্থটি যাহা আমরা খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিয়াছি, তাহা যদি প্রথম দৃষ্টিতে পাঠকের মনঃপূত না হয়, তবে তজ্জন্য তাহাকে আমরা দোষ দিব না—প্রথম দৃষ্টিতে তাহা না হইবারই কথা।

উদাহরণ-মালা

| | | |
|---|---|---|
| প্রকীর্ণ | বিকীর্ণ | সংকীর্ণ |
| প্রক্ষিপ্ত | বিক্ষিপ্ত | সংক্ষিপ্ত |
| প্রবর্দ্ধন | বিবর্দ্ধন, | সম্বর্দ্ধন |
| প্রকাশ, | বিকাশ, | সংকাশ |

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্র = pro = forth, এখন বক্তব্য এই যে

বি = dis .

সং = con

তাহার সাক্ষী

বিবাদী সুর = discord

সংবাদী সুর = concord

"পুষ্প প্রকীর্ণ হইতেছে" বলিলে বুঝায় যে, পুষ্প সম্মুখে ছড়ান হইতেছে, "পুষ্প বিকীর্ণ হইতেছে" বলিলে বুঝায় যে পুষ্প আশপাশে ছড়ান হইতেছে, "পুষ্পরাশি সংকীর্ণ রহিয়াছে" বলিলে বুঝায় যে পুষ্পরাশি একত্র ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রহিয়াছে। শেষোক্ত স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে অনেকে যখন একত্র ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া অবস্থিতি করে, তখন সকলের ঝোঁক কেন্দ্রাভিমুখে। তেমনি

প্রক্ষিপ্ত = সম্মুখে ক্ষিপ্ত
বিক্ষিপ্ত = আশপাশে ক্ষিপ্ত
সংক্ষিপ্ত = একস্থানে কেন্দ্রীভূত

প্রবর্দ্ধন = সম্মুখে বর্দ্ধন
বিবর্দ্ধন = আশপাশে বা আড়ে বর্দ্ধন
সম্বর্দ্ধন = সাকল্যে বর্দ্ধন

প্রকাশ = সম্মুখে কিরণ প্রসারণ
বিকাশ = আশপাশে আলোকের কিরণ অথবা পুষ্পের পাপড়ি বিস্তার
সংকাশ = কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত আভা

রজন-সংকাশ বলিলে বুঝায় যে রজতের গাত্রে যেরূপ শুভ্র আভা ঘনীভূত দেখা যায় সেইরূপ সমজ্জ্বল। উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত-গুলির প্রতি চক্ষু বুলাইয়া আমরা পাইতেছি যে

প্র-উপসর্গের লক্ষ্য সম্মুখে;
বি-উপসর্গের লক্ষ্য আশপাশে;
সং উপসর্গের লক্ষ্য কেন্দ্রাভিমুখে।

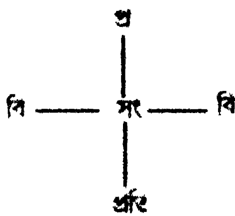
প্র
|
সং ———— বি

পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হোক্। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে :— বর্ত্তমান্ প্রবন্ধে সম্মুখ পার্শ্ব কেন্দ্র প্রভৃতি স্থান-বাচক অথবা দিক্ বাচক শব্দ যাহা যখন উল্লেখ করা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহার অর্থ যেন লৌকিক প্রথানুযায়ী মোটামুটি ভাবে গ্রহণ করা হয়; তাহা না করিয়া কেহ যদি তাহার অর্থ নিক্তির ওজনের তৌল করিয়া গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার জানা উচিত যে, এখানে আমরা জ্যামিতিক তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি না—ভাবাতত্ত্বের আলোচনা করিতেছি। জাহাজ চালাইবার সময় বটে—ধ্রুব-তারা দেখিয়া অথবা কম্পাসের কাঁটা দেখিয়া অতীব সাবধানে দিক্ নিরূপণ করা হইয়া থাকে আর কর্ত্তব্যেও তাই; কিন্তু কথাবার্ত্তা চালাইবার সময় লোকে ধ্রুবতারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উত্তর-পশ্চিমকেও উত্তর বলিতে কুণ্ঠিত হয় না—উত্তর-পূর্ব্বকেও উত্তর বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। শেষোক্ত প্রকার লৌকিক প্রথাটিকেই আমরা এখানে আদর্শ মান্য করিতেছি। আমাদের এখানকার অভিধানে সম্মুখ দিক্ও যা—সম্মুখ ঘেঁসা দিক্ও তা—দুইই সম্মুখ দিক্; পার্শ্ব এবং পার্শ্ব ঘেঁসা স্থান দুইই আশপাশ; কেন্দ্র এবং কেন্দ্র ঘেঁসা স্থান দুইই কেন্দ্র স্থান।

আর একটি কথা এই যে প্র-উপসর্গের অভিপ্রেত সম্মুখের দিক্ বিশেষ কোন একটা ধরা বাঁধা দিক্ নহে। আমি যখন চিৎ হইয়া শয্যায় শয়ন করি, তখন কড়িকাটের দিক্ আমার সম্মুখ দিক্। আমি যখন দোতালা ঘরের জান্লার দ্বার দিয়া মুখ বাড়াইয়া কে গৃহে প্রবেশ করিতেছে, তাহা নিরীক্ষণ করি, তখন নীচের দিক্ আমার সম্মুখ দিক্। অতএব "বৃক্ষ প্রবর্দ্ধিত হইতেছে" এই কথাটির ভিতরে প্র-উপসর্গের বিশেষ সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে নিম্নলিখিত যুক্তি সোপানের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য :—

(১) যে দিকে যাহার গতি সেই দিক্ তাহার সম্মুখ দিক্।
(২) বৃক্ষের গতি উপর দিকে।
(৩) সুতরাং উপর দিক্ই বৃক্ষের সম্মুখ দিক্।
(৪) অতএব উপর দিকে বৃক্ষের বর্দ্ধন
= সম্মুখে বর্দ্ধন
—প্রবর্দ্ধন

তেমনি আমার "গোমুখী হইতে গঙ্গা প্রসৃত হইতেছে" বলিলে এক হিসাবে যেমন বুঝায় যে গঙ্গা নীচে নিপতিত হইতেছে, আর এক হিসাবে তেমনি বুঝায় যে, গঙ্গা সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু "তরু প্রবর্দ্ধিত হইতেছে" না বলিয়া যদি বলা যায় যে, তরু বিবর্দ্ধিত হইতেছে, অথবা 'গঙ্গা প্রসৃত হইতেছে" না বলিয়া যদি বলা যায় যে, গঙ্গা বিসৃত হইতেছে, তবে উভয় স্থলেই বুঝায় যে, উদাহৃত বস্তু আড়ে অথবা পার্শ্বে বৃদ্ধি পাইতেছে।




পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হউক্। এখানে এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিকীর্ণ = আশপাশে ছড়ানো বিজন = জন মনুষ্য বিবর্জ্জিত। কোথায় আশপাশে আর, কোথায় বিবর্জ্জিত, দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। অতএব তুমি যে বলিতেছ যে, বি উপসর্গের গোড়া'র অর্থ পার্শ্ব-প্রবণতা, আর, সেই গোড়া'র অর্থটি অবস্থা গতিকে রূপান্তরিত হইয়া বিবর্জ্জন অর্থে পরিণত হইয়াছে—এ কথা কোন কার্য্যেরই নহে ; কেননা আশপাশ শব্দের মধ্য হইতে বিবর্জ্জন অর্থ টানিয়া বাহির করা অদ্ভুত ভেল্‌কি বাজি। সাপুড়ে যেমন লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া রাজবাটীর সুপরিষ্কৃত প্রাঙ্গণের আশপাশ হইতে কেউটিয়া সাপ টানিয়া বাহির করে, উহাও সেইরূপ একটা কৃত্রিম কাণ্ড, তাহাতে আর ভুল নাই। ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতির কোন্ কাজটা ভেল্‌কি-বাজি নহে? মনের আনন্দ হইতে যদি মুখের হাসি বাহির হইতে পারে, তবে বি-উপসর্গের পার্শ্ব প্রবণতা হইতে বিবর্জ্জন অর্থ বাহির হইতে না পারিবে কেন? বিশেষতঃ যখন আমরা দেখিতেছি যে, মুখের হাস্য এবং মনের আনন্দ, দুয়ের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান দুইপাশে ঘাড় নাড়া এবং মনের প্রত্যাখ্যান এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান তাহা অপেক্ষা এক তিলও অধিক নহে। পক্ষী যেমন বাম দক্ষিণ পার্শ্বে চক্ষু হেলন দ্বারা অভক্ষ সামগ্রী আশপাশে সরাইয়া ফেলিয়া গোবরের মধ্য হইতে ভক্ষ্য কীট বাছিয়া লয়, আমরাও তেমনি দুই পার্শ্বে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার্য্য তত্ত্ব আশপাশে সরাইয়া ফেলিয়া সম্মুখস্থিত বিষয় হইতে স্বীকার্য্য তত্ত্ব বুদ্ধির অভ্যন্তরে টানিয়া লই। মনে কর দর্শকের সম্মুখ প্রদেশে ক্রোশ খানেক দূরে একটা গোরু দাঁড়াইয়া আছে। দর্শক দূরতাপ্রযুক্ত গোরুটাকে অতীব ক্ষুদ্রাকৃতি দেখিয়া মনে ভাবিলেন, "ওটা খরগোশ"। এইরূপ ভাবিয়া কাল্পনিক খরগোশটাকে ধরিবার জন্য মাঠ ভাঙ্গিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। পোয়াটাক পথ অগ্রসর হইয়া থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "না—এটা খরগোশ না—এটা ছাগল।" খরগোশকে মনোনেত্রের সম্মুখ হইতে একপার্শ্বে সরাইয়া ফেলিয়া ছাগলকে মনোনেত্রের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। তাহার পরে তথা হইতে আধ ক্রোশটাক পথ অগ্রসর হইয়া দর্শক বলিলেন "না—এটা ছাগল না—এটা গোরু।" ছাগল পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হল, আর, গোরু মনোনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পরে দর্শক যতই সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, গোরুটা ততই স্পষ্টাকার ধারণ করিয়া আত্ম-সমর্থন করিতে লাগিল। তখন দর্শক স্বীকার করিলেন যে, হাঁ এটা গোরু। গোরুকে তিনি মনোনেত্রের সম্মুখে আনিয়া তাহার যাথার্থ্য শিরোধার্য্য করিলেন, তাই তিনি সম্মুখ দিকে মাথা নাড়িয়া "হাঁ" বলিলেন। গোরুকে যেমন তিনি মনোনেত্রের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, ছাগলকে এবং খরগোশকে তেমনি মনোনেত্রের সম্মুখ হইতে পার্শ্বে সরাইয়া দিলেন ; আর, "পার্শ্বে সরাইয়া দিলাম" এই ভাবটি ইঙ্গিতচ্ছলে ব্যক্ত করিবার জন্য, দুইপার্শ্বে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না—এটা খরগোশ না ; না—এটা ছাগল না"। আশ পাশের ভাব কি সূত্রে অবস্থা-গতীকে বিবর্জ্জন-ভাবের সহিত জড়িত হইয়া পড়ে, এক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে ; তাহা আর কিছু না—স্বীকার্য্য বিষয়কে মনোনেত্রের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য বর্জ্জনীয় বিষয়কে আশপাশে নিক্ষেপ করিবার আকাঙ্ক্ষা , এই সূত্রেই পার্শ্ব-প্রবণতার সহিত বর্জ্জনীয়তা কার্য্যগতিকে জড়িত হইয়া পড়ে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে বি-উপসর্গের মধ্যে বৈপরীত্যের ভাব কি সূত্রে প্রবেশ করে? ইহার উত্তর এই যে, বি-উপসর্গের পার্শ্ব-প্রবণতা এবং বর্জ্জনীয়তা দুইই বৈপরীত্যের প্রবেশ-দ্বার। প্রথমে পার্শ্ব-প্রবণতার দ্বার দিয়া কিরূপে বৈপরীত্য প্রবেশ করে, তাহা দেখা যাক্।

প্রকৃত কথা এই যে, বি-উপসর্গের বৈপরীত্য মুখ্য বৈপরীত্য নহে, প্রতি-উপসর্গের বৈপরীত্যই মুখ্য বৈপরীত্য ; তার সাক্ষী—

প্রাচী = পূর্ব্ব, প্রতীচী = পশ্চিম

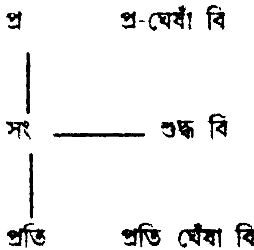
প্র এবং প্রতি'র মধ্যে এইরূপ পূর্ব্ব-পশ্চিমের প্রভেদ। কথাটা এই :—

(১) একদিকে প্র-উপসর্গের সম্মুখ-প্রবণতা ;

(২) আর একদিকে প্রতি-উপসর্গের বৈপরীত্য ;

(৩) মাঝখানে বি-উপসর্গের পার্শ্ব-প্রবণতা।—

বি-উপসর্গ এইরূপ দুয়ের মাঝখানে পড়া'তে, তাহার গাত্রে কখনও বা প্র-উপসর্গের—কখনও বা প্রতি-উপসর্গের—ছায়া সংক্রামিত হয়।




পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করা হৌক্। জেলে যখন জাল নিক্ষেপ করে, তখন জাল সম্মুখে প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে বিস্তারিত হয় ; এই গতিকে "জাল প্রসারণ কর" এবং "জাল বিস্তার কর" দুয়ের অর্থ একই প্রকার দাঁড়ায়। বৃক্ষ অঙ্কুরিতাবস্থা হইতে ক্রমশই উচ্চে প্রবর্দ্ধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে ; এই গতিকে দুয়ের অর্থ একই প্রকার হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ঘটনা-সূত্রে প্র এবং বি উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রামিত হয়। প্র এবং বি'র মধ্যে পরস্পরের ছায়া-সংক্রমণ এই যেমন দেখা গেল, প্রতি এবং বি'র মধ্যেও অবিকল সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লোমাবলী বিপরীত দিকে ফিরান হইলে সেই সঙ্গে তাহা আশেপাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে ; এই গতিকে প্রতিলোম এবং বিলোম এ দুই শব্দের অর্থ অবিকল একই রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন, বিবর্জ্জনের দ্বার দিয়া বি-উপসর্গে কিরূপে বৈপরীত্য প্রবেশ করে, তাহা দেখা যাক্।

পৃথিবীতে যদি কেবল ভাল আর মন্দ এই দুই শ্রেণীর বস্তু থাকিত—ভালমন্দের মাঝামাঝি কিছুই না থাকিত, তাহা হইলে "ভাল না" বলিলেই মন্দ বুঝাইত, "মন্দ না' বলিলেই ভাল বুঝাইত ; কিন্তু ভাল এবং মন্দের মাঝামাঝি অসংখ্য বস্তু থাকাতে "মন্দ না" বলিলে "না ভাল না মন্দ" বুঝায়, "ভাল" বুঝায় না ; "ভাল না" বলিলেও সেইরূপ "না ভাল না মন্দ বুঝানো উচিত—কিন্তু কাজে দেখা যায় তাহার বিপরীত। "ভাল না" বলিলে মন্দই বুঝায়। সূক্ষ্ম বিচারে

ভাল না = না ভাল না মন্দ ;

কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে

কেবল, "মন্দ না" কথাটাই = না ভাল না মন্দ ;

ভাল না = মন্দ।

এরূপ হয় কেন? এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় কেন?

ইহার কারণ আর কিছু না—"তোমার এ কাজটা অতি মন্দ হইয়াছে" না বলিয়া আমরা যখন বলি যে, "তোমার এ কাজটা ভাল হয় নাই" তখন তাহার অর্থই এই যে, "তোমার এ কাজটা খুবই মন্দ হইয়াছে—তবে কিনা ভদ্রতার অনুরোধে সেরূপ স্পষ্ট কটু কথা তোমার সাক্ষাতে বলিতে আমার মুখে বাধ বাধ ঠেকিতেছে।" এরূপ স্থলে ভাল-না' অর্থ শুধু কেবল ভাল না হইয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না—এখানে তাহার অর্থ প্রকৃত প্রস্তাবেই মন্দ। এমন কি ইংরাজি সংবাদ পত্রে যদি কোথাও এরূপ লেখা থাকে যে, "অমুক has told what is not true" তবে তাহার অর্থাই এই যে অমুক has told a downright lie। এইরূপ লৌকিক ভদ্রতা রক্ষার দায়ে পড়িয়া বিবর্জ্জন অনেক সময় বৈপরীত্যের কটুত্ব-প্রশমন কার্য্যে, অর্থাৎ বিষ-প্রশমন কার্য্যে, নিযুক্ত হয় ; আর সেই গতিকে বিবর্জ্জন এবং বৈপরীত্য উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রামিত হয়।

আর এক কথা এই যে, এমন কতকগুলি সামগ্রী আছে, যাহার গায়ে বিবর্জ্জনের একটু আঁচ লাগিলেই তাহার মূল্য তদ্দণ্ডে ধূলিসাৎ হইয়া যায় ;—যেমন সরলতা। সরলতা খাঁটি হইলেই তবে তাহা সরলতা নামের যোগ্য—মাঝামাঝি সরলতা সরলতাই নহে। এই জন্য "অকপট" বলিলেই কপটের ঠিক উল্টা বুঝায়—সরলতা বুঝায়। অতএব দুইটি দ্বার দিয়া বর্জ্জন ভাবের গণ্ডির ভিতরে বৈপরীত্যের ভাব প্রবেশ করে ;— একটি হচ্চে লৌকিক ভদ্রতা রক্ষা করা, আর একটি হচ্চে খাঁটি বস্তুর বিশেষ মর্য্যাদা রক্ষা করা। শেষোক্ত দ্বার দিয়া বৈপরীত্য কেন নয়—বৈপরীত্যের লাঙ্গুল ধরিয়া অনেক সময় হেয়তা অর্থ ও বিবর্জ্জনের ইষ্ট গণ্ডির মধ্যে বল পূর্ব্বক প্রবেশ করে। বস্তুর গাত্রে বিবর্জ্জনের একটু আঁচ লাগিলেই তাহা জাতিচ্যুত হইয়া হেয় পদবীতে নিপাতিত হয়। ধর্ম্ম অতীব ইষ্ট বস্তু এইজন্য বিধর্ম্ম (অর্থাৎ আশপাশের ধর্ম্ম) লোকের চক্ষে অনেক সময়ে সাক্ষাৎ পাপ বলিয়া প্রতীয়মান হয় সুপথ অতীব ইষ্ট বস্তু, এইজন্য বিপথ (অর্থাৎ আশপাশের পথ) কুপথেরই সামিল। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, সমস্ত কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যাইতেছে, যে বি-উপসর্গের পার্শ্বপ্রকাত্য, বিবর্জ্জন, বৈপরীত্য, হেয়তা এই চারিপ্রকার অর্থ পরস্পরের সহিত অতীব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূত্রে জড়িত রহিয়াছে।

এই সুযোগে অপ উপসর্গের ব্যাপারটা এক কথায় চুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে ; সে কথাটি এই যে, বিবর্জ্জন এবং হেয়তা বি-উপসর্গের গৌণ অর্থ, কিন্তু অপ-উপসর্গের তাহাই মুখ্য অর্থ। তাহার সাক্ষী—

হেয়তা অর্থ ... { অপধর্ম্ম, বিধর্ম্ম / অপকর্ম্ম, বিকর্ম্ম / অপদেবতা }

বিবর্জ্জন অর্থ ... { অপবর্জ্জন, বিবর্জ্জন / অপগত, বিগত / অপেত, বীত }

ইংরাজীতে অপ = ab , তাহার সাক্ষী

abnormal = অপ- normal

abdicate = অপবর্জ্জন

বিবর্জ্জন এবং হেয়তা এই দুই অর্থে বি-উপসর্গ এবং অপ-উপসর্গ উভয়েই নির্বিশেষে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া অপ-উপসর্গ কখন কখন ইংরাজিতে de (অর্থাৎ বি) মূর্ত্তি ধারণ করে ; তেমনি আবার, ab অর্থাৎ অপ উপসর্গ কখন কখন দেশীয় ভাষায় বি-মূর্ত্তি ধারণ করে ; তাহার সাক্ষী।

অপযশ = defamation ;

to abstain = বিরত হওয়া।

অপ-উপসর্গ সম্বন্ধে এই যাহা ইঙ্গিত করিলাম ইহাই যথেষ্ট ; কেননা, উহার অর্থ এত স্পষ্ট যে, তদুপলক্ষে অধিক বাক্য ব্যয় করা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। একস্থলে কেবল অপ উপসর্গের একটু প্যাঁচাও অর্থ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু বিবর্জ্জনের সহিত পার্শ্ব প্রণবতার সম্বন্ধ যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে এখন আর সে অর্থ কাহারও নিকটে অপরিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অপাঙ্গ শব্দের অপ-উপসর্গে পার্শ্ব প্রবণতা, হেয়তা এবং বিবর্জ্জন তিনই এক সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। অপাঙ্গ শব্দের অর্থ নয়নের কোণ। যাহা আদরের বস্তু তাহাকে আমরা নয়নের সম্মুখে আনয়ন করি, কিন্তু যাহাকে আমরা দেখিতে না পারি, তাহাকে আমরা নয়নের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলি, আর সে ব্যক্তি পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলে তাহার প্রতি আমরা নয়নের কোণ দিয়া আড়ভাবে দৃষ্টি করি—"এখনো আছে কি গিয়াছে, গেলে আপদ যায়" এই ভাবে দৃষ্টি করি। অপাঙ্গের পার্শ্ব-প্রবণতার সহিত পরিবর্জ্জনের এইরূপ ব্যঙ্গব্যঞ্জক সম্বন্ধ (Correspondence) দেখিতে পাওয়া যায়। তবে স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় ব্যাপারে অপাঙ্গের ওরূপ বিষাক্ত অর্থ একেবারেই উল্টাইয়া গিয়া অপাঙ্গ দৃষ্টি অমৃত-বৃষ্টিরই নামান্তর হইয়া দাঁড়ায় ; কেন যে, এরূপ হয়, তাহার বিশেষ একটি কারণ আছে ;—প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে নয়নের সম্মুখে আনয়ন করিবার ভরপুর ইচ্ছা থাকিলেও প্রণয়িনী লজ্জাবশতঃ সে ইচ্ছায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়, কাজেই সেরূপ স্থলে অপাঙ্গ দৃষ্টি প্রকৃত অপাঙ্গ দৃষ্টি নহে—তাহা অপাঙ্গ দৃষ্টির ভাণ মাত্র। অপাঙ্গ দৃষ্টি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,—

(১) চক্ষেরই অপাঙ্গদৃষ্টি কিন্তু মনের সম্মুখ দৃষ্টি—যেমন দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার অপাঙ্গ দৃষ্টি।

(২) চক্ষেরই সম্মুখ দৃষ্টি, কিন্তু মনের ভীষণ অপাঙ্গ দৃষ্টি—যেমন ওথেলোর প্রতি ইয়াগো'র অপাঙ্গ দৃষ্টি।

(৩) মন এবং চক্ষু দুয়েরেই অপাঙ্গ দৃষ্টি—যেমন ক্যালিবানের প্রতি মিরাণ্ডার অপাঙ্গ দৃষ্টি।

কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, তাহা ডাহা গদ্য ; এই জন্য বর্ত্তমান স্থলে অপাঙ্গ বলিতে তৃতীয় শ্রেণীর সাদাসিধা অপাঙ্গ ভিন্ন প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর হেঁদো অপাঙ্গ বুঝাইতে পারে না।

অতঃপর বি উপসর্গের মধ্যে বিশেষত্ব কোনখান দিয়া প্রবেশ করে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্।

বিশেষ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতে হইলে তৎপূর্ব্বে শেষ শব্দের অর্থ কি তাহা জানা আবশ্যক। অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হৌক,—

শেষ = পরিণাম = পর্য্যাবসান = পরিসমাপ্তি।

শিষ্ট = পরিণত = পর্যাবসিত = পরিসমাপ্ত।

শিষ্ট শব্দের প্রচলিত অর্থ — ইংরাজিতে যাহাকে বলে finished gentleman। ইহা হইতেই আসিতেছে যে, শিষ্টাচার = শিষ্টোচিত gentlemanly আচার ব্যবহার = যাঁদের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইয়াছে—যাঁহারা finished হইয়াছেন—তাঁহাদের অনুযায়ী আচার ব্যবহার। শিষ্য শব্দের অর্থ এই যে, যাহাকে finish করিয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ বিদ্যার সংস্কারদ্বারা যাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু এক্ষণকার বিদ্যালয়ের যেরূপ বিপর্যায় শিক্ষা-প্রণালী তাহাতে বালকদিগাকে finish করিয়া তুলিতে গিয়া তাহাদিগাকে প্রকৃত প্রস্তাবেই finish করা হইয়া থাকে অর্থাৎ একেবারেই সারিয়া ফেলা হইয়া থাকে। শিক্ষা-শব্দের অর্থের finish করিবার ইচ্ছা। শেষের অর্থ যখন জানিতে পারা গেল, তখন বিশেষের অর্থ জানিতে মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব হইবে না। শেষের অর্থ যখন পরিসমাপ্তি, তখন বি-শেষের অর্থ বি-পরিসমাপ্তি অর্থাৎ আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তি, ইহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। নিম্নে প্রণিধান করা হৌক,—

de = বি,

termination = শেষীকরণ;

determination = বিশেষীকরণ।

বিশেষিত হওয়া = নানাদিকের একটা কোন দিকে determined হওয়া = নানা শাখার একটা কোন শাখায় পরিসমাপ্ত হওয়া।

বস্ত্রের ভাব একটি সামান্য ভাব, এই সামান্য ভাবটির গাত্রে আমি যদি শ্বেতবর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা একতর শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—শ্বেতবস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়; উহার গাত্রে আমি যদি শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে পীতবর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা আর এক শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—পীত বস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়; উহার গাত্রে যদি নীলবর্ণের ভাব যোজনা করি, তবে উহা তৃতীয় আর এক শাখায় পরিসমাপ্ত হয়—নীল বস্ত্রে পরিসমাপ্ত হয়। এইরূপ আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তির নামই বিশেষ প্রাপ্তি। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, "Jack of all trades is master of none" যে ব্যক্তির সব কাজই কিছু কিছু আসে, সে ব্যক্তি কোন কাজেই সুপরিপক্ক নহে। এক এক ব্যক্তি এক একটি কার্য্যে লাগিয়া থাকিয়া তাহাতেই সে পরিপক্কতা লাভ করিয়া অপরাপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্‌রূপে বিশেষিত বা বিপরিসমাপ্ত হয়; আর, সেই সঙ্গে সাধারণ লোক-মণ্ডলীর আশ পাশ দিয়া নানাপ্রকার শাখা-মণ্ডলী বিনির্গত হইয়া পরস্পর হইতে উত্তরোত্তর পৃথক্‌রূপে বিশেষিত হইতে থাকে—সাধারণ লোক-মণ্ডলী নানাপ্রকার বাধ্যবাধকতার বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিত-মণ্ডলী, কৃষকমণ্ডলী, বণিক্‌মণ্ডলী, কারিকরমণ্ডলী, সেনামণ্ডলী এইরূপ বিভিন্ন শাখামণ্ডলীতে পরিসমাপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ আশপাশের শাখায় পরিসমাপ্তি = বিপরিসমাপ্তি = বিশেষ প্রাপ্তি। পার্শ্ব প্রবণতার সহিত বিশেষত্বের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়াই আমরা বলিতেছি যে, বি-উপসর্গের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অর্থের দ্বার দিয়া শেষোক্ত অর্থ প্রবেশ করিয়াছে—পার্শ্ব-প্রবণতার দ্বার দিয়া বিশেষত্ব প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে কেবল এই একটি কথা বলিবার আছে যে, তুমি বলিতেছ বটে যে, পার্শ্ব-প্রবণতার দ্বার দিয়া বিশেষত্ব প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু তাহাই যে ঠিক্ তাহা কে বলিল? তাহার পরিবর্ত্তে আমি যদি বলি যে, বিশেষত্বের দ্বার দিয়া পার্শ্ব-

প্রবণতা প্রবেশ করিয়াছে, তবে তাহাতে কি দোষ হয়? ইহার উত্তর এই যে, তাহাতে এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয়; তাহার সাক্ষী—

প্র উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখ-প্রবণতা;
নি উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ অন্তর্নিষ্ঠতা;
সং উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা;

সমস্তই দিক্ দেশের সম্বন্ধ সূচক। বি-উপসর্গ যখন উহাদেরই দলভুক্ত তখন এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত যে, তাহারও মুখ্য পরিচয় লক্ষণ, উহাদেরই অনুরূপ দিক্দেশের সম্বন্ধসূচক।

অতঃপর পরিবর্ত্তন এবং অসামঞ্জস্য এই দুই ভাব বি উপসর্গের মধ্যে কোথা হইতে কি সূত্রে প্রবেশ করে, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক।

সুবিখ্যাত ডারুইন এক জোড়া কপোত লইয়া তাহাদের বংশানুক্রমে বিশিষ্টতম লম্বপুচ্ছদিগের জোড়া মিলাইয়া অল্পকালের মধ্যে তদুৎপন্ন সন্তান-সন্ততির আকার এরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়া ছিলেন যে, পরিশেষে সেই কপোত বংশে কপোত এবং ময়ূরের মাঝামাঝি জাতিবিশেষ ফলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বলে variety হইতে Species-এর উদ্ভাবন, ব্যাকৃতি হইতে বৈজাত্যের উদ্ভাবন, অর্থাৎ আকৃতি পরিবর্ত্তন হইতে বিশেষ জাতির উৎপত্তি। পরিবর্ত্তন এবং বিশেষত্ব দুয়ের মধ্যে যখন এইরূপ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন উভয়ের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রামিত হইবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, বি উপসর্গের পরিবর্ত্তন-সূচকতা, পার্শ্ব-প্রবণতা, বিহীনতা এবং বিশেষত্ব এই চারি দ্বারের প্রত্যেকের মধ্য দিয়াই অসামঞ্জস্য ভাব অতি সহজে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রথমতঃ বৈষম্য ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তন ঘটিতেই পারে না; তাহার সাক্ষী পৃথিবীতে শীতোষ্ণের বৈষম্যই বায়ুর দিক্ পরিবর্ত্তন এবং চাল পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ বৈষম্যের যথোপযুক্ত মাত্রার ন্যূনাধিক্য হইলেই পরিবর্ত্তনের স্রোতঃ ব্যাহত বা উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার অসামঞ্জস্যে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ কোন প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনার পার্শ্ব দিয়া প্রদর্শনীয় গোরুর পঞ্চম চরণের ন্যায় ফাঁকড়া বাহির হইলে তাহা অসামঞ্জস্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া দর্শকের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হয়। চতুর্থতঃ কোন একটি বস্তু অঙ্গ হীন হইলে তাহা হইতে অসামঞ্জস্য বিজৃম্ভিত হয়। পঞ্চমতঃ কোন একটি বস্তুর বিশেষত্ব অতিমাত্র পরিস্ফুট হইলে চতুর্দিকস্থ আর আর বস্তুর সহিত তাহার মিশ খায় না—তাহারই নাম অসামঞ্জস্য। বিকার শব্দের মুখ্য অর্থ পরিবর্ত্তন ঘটনা; কিন্তু জ্বর বিকারের বিকার একপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল পরিবর্ত্তন ঘটনা। বিসদৃশ শব্দের মুখ্য অর্থ সাদৃশ্য হইতে পার্শ্বে বিচ্যুত, কিন্তু প্রচলিত অর্থ খাপছাড়া বা বেমানান্। বিকল শব্দের মুখ্য অর্থ কলাহীন বা অঙ্গহীন কিন্তু বিকল অবস্থা বলিলে বুঝায় যে তদবস্থাপন্ন ব্যক্তির মর্ম্ম গ্রন্থি সকল অব্যবস্থিত ভাবে ছিন্ন ভিন্ন। বিকট শব্দের মুখ্য অর্থ বিশেষরূপে পরিস্ফুট, কিন্তু "বিকট শব্দ" বলিলে বুঝায় অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর শব্দ।

নানাদিক্ দিয়া আমরা এইরূপ প্রাপ্ত হইতেছি, যে, পার্শ্ব-প্রবণতা, বিহীনতা, বৈপরীত্য, হেয়তা, বিশেষত্ব, পরিবর্ত্তন, অসামঞ্জস্য সমস্তেরই মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ ভাবের মিল রহিয়াছে। অতএব প্রথমে যেমন আমাদের মনে হইয়াছিল—বি উপসর্গ কেমন করিয়া না

জানি অন্তগুলো ভাবের বোঝা একাকী বহন করে—এক্ষণে তাহার ধন্দ অনেকটা মিটিয়া গেল ; আর সেই সঙ্গে এটাও বুঝিতে পারা গেল যে, বি উপসর্গের মুখ্য অর্থ পার্শ্ব-প্রকাশতা।

প্র, বি এবং সং এই তিন উপসর্গের উদাহরণ-মালা ইতিপূর্ব্বে যাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি—সাহিত্যের উদ্যান হইতে ফুল তুলিয়াই আমরা সে মালা গাঁথিয়াছি। এবারে, দর্শনারণ্য হইতে রুদ্রাক্ষ ফল সংগ্রহ করিয়া আর এক রকমের মালা গাঁথিবার উপক্রম করিতেছি ;—তাহা দার্শনিকদিগের কাজে লাগিতে পারে।

## উদাহরণ মালা

প্রচার = সম্মুখে ব্যাপ্তি
বিচার = বিশেষে ব্যাপ্তি
সংচার = সাকল্যে ব্যাপ্তি
[ যেমন ইস্পাঞ্জের অভ্যন্তরে জলের সঞ্চার ]

প্রকার (Process) = সম্মুখাস্থিত লক্ষ্যের সাধনোপযোগী কার্য্য
বিকার = আশপাশে ছটকিয়া পড়া লক্ষ্যহীন কার্য্য
সংস্কার = অন্তঃকরণে কেন্দ্রীভূত বীজরূপী কার্য্য
প্রজ্ঞা = সম্মুখবর্ত্তী অপরোক্ষ তত্ত্ব জ্ঞান
বিজ্ঞান = পার্শ্ব-ঘেঁসা আপেক্ষিক (অর্থাৎ relative) তত্ত্বজ্ঞান
সংজ্ঞা = কেন্দ্র স্থানীয় বীজ জ্ঞান

উপরি প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত গুলির মধ্যে, বিচার, সংস্কার, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান এবং সংজ্ঞা, এই পাঁচটি শব্দের মুখ্য অর্থ অবধারণ করা, দর্শনতত্ত্বান্বেষীদিগের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক।

বিচার বলে কাহাকে ? চার = চালনা। কোড়ায় অস্ত্র চালনা করা হইতেছে, আর, কোড়ায় অস্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে, দুয়ের অর্থ একই ; তা ছাড়া দাঁড় চালনা করা আর দাঁড় ply করা একই। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, চার = চালনা = প্রয়োগ = to apply। বিচার = বিশেষে চারণ = বিশেষে প্রয়োগ। মনে কর এক ব্যক্তির হস্তে আর ব্যক্তির নামাঙ্কিত ঘাড়ি ধরা পড়াতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি প্রতি চৌর্য্য অপরাধ আরোপ করিয়া তাহাকে বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। বিচারপতি এ অবস্থায় কি করেন? প্রথমে সাক্ষিগণের মুখে ঘাড়ি স্থানান্তরিত হইবার বিশেষ বিবরণ অবগত হ'ন। তাহার পরে, সেই বিশেষ বিবরণের অঙ্গীভূত ধৃত ব্যক্তির আচরিত বিশেষ কার্য্যটিকে চৌর্য্য বলা যাইতে পারে কিনা, তাহা মনে মনে বিচার করেন ; যাহা তিনি করেন তাহা আর কিছু না— চৌর্য্যের স্বরূপ নির্ব্বাচন (definition) যাহা বিধান-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই তিনি উপস্থিত ঘটনাতে চারণ করেন বা প্রয়োগ করেন ;—ইহার নাম বিশেষে সামান্যের চারণ—ইহারই নাম বিচার।

সংস্কার শব্দের অর্থ কি ? সাধনীয় কার্য্যের নানা ডালপালা অন্তঃকরণ মধ্যে বীজ ভাবে কেন্দ্রীভূত থাকিলে তাহাকেই আমরা বলি সংস্কার ; সুতরাং সংস্কার শব্দ সং উপসর্গের কেন্দ্রাভিমুখিতার বিশেষ একটি প্রমাণ স্থল। যখন দেখিতেছি যে, হংস-শাবক অণ্ড হইতে বাহির হইয়াই জলে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ করে, তখন কাজেই বলিতে হয় যে, সন্তরণ করিতে হইলে যত প্রকার পদ-চালনা কার্য্য আবশ্যক, সমস্ত হংসের অন্তঃকরণে বীজ-ভাবে কেন্দ্রীভূত

রহিয়াছে ; সেই কেন্দ্রীভূত কার্যাকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা বলি যে জলে সন্তরণ করা হংসের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার।

প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ শাস্ত্রানুসারে প্রজ্ঞাতব্য বিবেক। সম্মুখবর্তী জ্ঞাতব্য বিষয়কে আশপাশের সমস্ত ডালপালা হইতে বিবিক্ত করিয়া জানা = খোসা ছাড়াইয়া শাঁস গ্রহণ করা = প্রজ্ঞা। গণিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান—সমগ্র জ্ঞানবৃক্ষের বিশেষ বিশেষ শাখা প্রশাখা, এইজন্য সমগ্র জ্ঞানের তুলনায় বলা যাইতে পারে।

বিজ্ঞান = বিশেষ বিশেষ শাখায় পরিসমাপ্ত বিশিষ্ট রূপ জ্ঞান

= Science

প্রজ্ঞা করে কি? না নানা বিজ্ঞান প্রবাহিনীর সাগরসঙ্গম হইতে সার মন্থন করিয়া মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ এবং জগতের চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে যথা-সম্ভব তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করে ; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে

প্রজ্ঞা = ভালজ্ঞান = Wisdom

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে প্রজ্ঞা অগ্রে কি বিজ্ঞান অগ্রে? ফল জ্ঞান অগ্রে কি শাখা জ্ঞান অগ্রে? ইহার উত্তর এই যে এক হিসাবে ফল অগ্রে, আর এক হিসাবে শাখা অগ্রে। ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা বাহির হয় সুতরাং ফল অগ্রে। আবার শাখা হইতে বৃন্ত, বৃন্ত হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল বাহির হয়, সুতরাং শাখা অগ্রে। অতএব ভাবিয়া দেখিলে প্রজ্ঞা বিজ্ঞানের মূলও বটে—ফলও বটে ; তাহার সাক্ষী— বেকন্ এবং দে-কর্ত্তার প্রজ্ঞা-বাণী গুলি আরিস্তটেলিক এবং আরবিক বিজ্ঞানের ফল, কিন্তু নিউটনিক মূল। তেমনি বেদোপনিষদের প্রজ্ঞা-বাণী গুলি প্রাচীনতর বিজ্ঞানালোচনার ফল এবং ভারতবর্ষের মধ্যমাঙ্গীয় বিজ্ঞানের মূল। লোক সমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে , তাহার পরে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করে ; তাহার পরে শিক্ষিত বিজ্ঞানকে সংসার-ক্ষেত্রে খাটাইয়া বহুদর্শিতা-সূত্রে প্রাজ্ঞ হইয়া ওঠে। যাঁহারা বিদ্বান্ মাত্র, তাঁহারা নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক এবং শাস্ত্রের উদাহরণদ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রেত মত সমর্থন করেন , কিন্তু প্রজ্ঞা ব্যক্তি শাস্ত্র এবং যুক্তির ক্বাথ বাহির করিয়া লইয়া এবং তাহার সিটি পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বপুরুষেরা প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত, আর অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে তাহা বুঝাইবার জন্য অনন্ত নামক একটা বৃহৎ সর্পের কল্পনা করিয়াছিলেন। "পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত" এ কথাটি শুনিতে খুব সহজ ; কিন্তু প্রথমে ঐ কথাটি যাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, তিনি তাহার তৎকালোচিত বহুদর্শিতায় নিউটন অপেক্ষা যে, কোন অংশে ন্যূন ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। নিউটন বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিলেন যে পৃথিবী ভারাকর্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁহার এই আবিষ্কৃত তত্ত্বটির তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের প্রজ্ঞাবাণীর তুলনায় তাহা শিশুর অর্দ্ধস্ফুট বচনের ন্যায় অসম্পূর্ণ—যদিচ বিজ্ঞান অংশে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা "পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ; যদি বল যে সূর্য্য সূর্য্যান্তরের আকর্ষণের "উপর প্রতিষ্ঠিত" তবে তাহার পরে আইসে যে "সূর্য্যান্তর কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত ;" যদি বল যে "সূর্য্যান্তর অবশিষ্ট জগতের

আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত" তবে তাহার পরেই আইসে যে "অবশিষ্ট জগৎ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত" ; যদি বল যে, "অবশিষ্ট জগৎ স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ আপনার উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত"—তাহা বলিতে পারা যায় না ; কেন না যদি জড়জগতের বড়ই হউক আর ছোটই হউক্ কোন একটি অংশ স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তবে পৃথিবী কি দোষ করিল? পৃথিবী স্বপ্রতিষ্ঠিত না হয় কেন? তা শুধু নয়—পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুই স্বপ্রতিষ্ঠ না হয় কেন? "প্রত্যেক জড় বস্তু এবং জড়-বস্তু-সঙ্ঘ অন্যের আকর্ষণে বিধৃত" এই না তোমার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত? তবে আর তুমি কিরূপে বলিবে যে, জগতের অমুক অংশ স্বপ্রতিষ্ঠ! প্রজ্ঞা কিন্তু আশপাশে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একেবারেই নির্ঘাত বলিয়া দিলেন যে, পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত—ইহার উপরে আরও কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না। কেহ যেন ভুল না বোঝেন—এরূপ না মনে করেন যে, যাহা ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, এইরূপ ঐকান্তিক তত্ত্ব লইয়া—অর্থাৎ একটা ঋজু রেখার দুই অন্ত নাই কেবল এক অন্ত আছে এইরূপ ঐকদেশিক (Abstract) তত্ত্ব লইয়া—প্রজ্ঞার যতকিছু বাণিজ্য ব্যবসায়। প্রজ্ঞার নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তোমার আমার চক্ষে ঐকান্তিক বা ঐকদেশিক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না—ইহা সত্য ; কিন্তু এটাও তেমনি সত্য যে যাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞান-দূরবীক্ষণের একান্ত এবং অপরান্ত উভয় অন্ত সমসূত্রে মিলাইয়া তাহার মধ্য দিয়া অনন্তের প্রতি পরিষ্কার সম্মুখদৃষ্টি প্রসারণ করেন ; আর তাঁহাদের সেই নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁহারা যাহা অবলোকন করেন, তাহা সমীচীন সত্য বই আর কিছুই হইতে পারে না। অনন্তের প্রতি তুমি আড় দৃষ্টি প্রয়োগ করিতেছ—কাজেই তোমার অনন্ত একটা ঐকান্তিক অর্থাৎ (Abstract) আবছায়া মাত্র ; কিন্তু আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্য-মণ্ডলী যাঁহারা নিখিল জগৎ সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া অনন্তের প্রতি সম্মুখ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনন্তও কি তোমার আমার অনন্তের ন্যায় অপদার্থ এবং শূন্য একান্ত মাত্র, Abstraction মাত্র? তাহা হইতে পারে না। তাঁহাদের দুই একটি কথার আভাসে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের অনন্ত অখণ্ড এবং পরিপূর্ণ সত্য, আর তাহা তাঁহাদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ বিরাজমান। অতএব এটা স্থির যে, প্রজ্ঞা শব্দের আদিতে প্র, আর বিজ্ঞান শব্দের আদিতে বি, দুই শব্দের আদিতে যে দুই উপসর্গ বসিয়াছে—ঠিকই বসিয়াছে। প্রজ্ঞা = জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ অপরোক্ষ তত্ত্বের উপলব্ধি, তাই তাহার আদিতে প্র ; বিজ্ঞান = সমগ্র সত্যের আশ পাশ দিয়া পরিস্ফুটিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি নানা প্রকার শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধীয় বৈশেষিক জ্ঞান, তাই তাহার আদিতে বি। এখন সংজ্ঞা কাহাকে বলে তাহা দেখা হো'ক্।

প্রজ্ঞা = ফলজ্ঞান (Wisdom)

বিজ্ঞান = শাখাজ্ঞান (Science)

সংজ্ঞা = বীজজ্ঞান (Consciousness)

বীজজ্ঞানে ফলজ্ঞান এবং শাখাজ্ঞান দুইই অপরিস্ফুট আকারে সমাহিত রহিয়াছে বা কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, আর, সেই সমাহিত ভাবটি ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিবার জন্য সংজ্ঞা শব্দের আদিতে সং উপসর্গ নিযুক্ত রহিয়াছে। সং কি? না একস্থানে কেন্দ্রীভূত বীজজ্ঞান। কোন্ স্থানে? না জ্ঞাতার অন্তঃকরণে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা, শাখা

হইতে ফল, তেমনি সংজ্ঞা হইতে (Consciousness হইতে) লৌকিক জ্ঞান বা বিষয় বুদ্ধি বা Common sense, বিষয় বুদ্ধি হইতে বিজ্ঞান বা Science, বিজ্ঞান হইতে প্রজ্ঞা বা Wisdom। Consciousness হ'চ্চে বীজ, বিষয় বুদ্ধি হ'চ্চে অঙ্কুর, বিজ্ঞান হ'চ্চে ডালপালা, প্রজ্ঞা হচ্চে ফল। ধান্য যখন মাটির ভিতরে থাকে তখন তাহা বীজ; যখন তাহা শীষের আগায় বিরাজ করে, তখন তাহা শস্য। এক শস্য যেমন আর এক গাছের বীজ হইতে পারে, তেমনি এক কালের প্রজ্ঞা আর এক কালের সংজ্ঞা হইতে পারে, তাহার সাক্ষী—বেদোপনিষদ্ মহাভারত রামায়ণ বাইবেল এবং সেক্সপিয়রের প্রজ্ঞাবাণী এক্ষণে জন সাধারণের সংজ্ঞায় সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ এইরূপ হইয়াছে যেন সে-সকল মহাবাক্য জন্মাবধি সকলের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল। সং এবং আধান এই দুয়ের যোগে সমাধান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সমাধি কি? না একত্র সমাধান—একত্র সমাবেশ—সমস্ত মনোবৃত্তি একস্থানে জড় করা। "বাণ সন্ধান কথা হইতেছে" বলিলে বুঝায়—সমস্ত মনোবৃত্তি বাণের সহিত একযোগে লক্ষ্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। সং উপসর্গ সংজ্ঞা শব্দের আদিতে বসিয়া ইঙ্গিতচ্ছলে বিজ্ঞান করিতেছে যে, জ্ঞানের সমস্ত ভাবী শাখা প্রশাখা এবং ফলফুল শিশুর সংজ্ঞার ভিতরে জড়পুঁটুলি হইয়া রহিয়াছে; সংজ্ঞারূপী মুকুলের অভ্যন্তরে তাহার আশপাশের পাপড়ি—বিজ্ঞান, এবং সম্মুখের বীজকোষ প্রজ্ঞা, দুইই কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম তাহার আদ্যোপান্ত স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে

প্র-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখ-প্রবণতা
বি-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ পার্শ্ব-প্রবণতা
সং-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা।

অতঃপর পরি-উপসর্গের কিরূপ অর্থ তাহা দেখা যা'ক্। বি-উপসর্গের লক্ষ্য আশপাশে পরি-উপসর্গের লক্ষ্য চতুর্দ্দিকে; তাহার সাক্ষী—

পরিধি = circumference
পর্য্যায় = পরি - আয় = ঘুরে ফিরে আসা।
পর্য্যায়ক্রমে = পালা-ক্রমে = periodically।

পর্য্যায় এবং পালার মধ্যে মর্ম্মান্তিক (অর্থাৎ অস্থি মজ্জাগত) অভিন্নতা সম্বন্ধে কাহারও মনোমধ্যে যদি কোনো প্রকার "কিন্তু" বা দ্বৈধ থাকে, তবে তিনি নিম্নে প্রণিধান করুন:—

ঘোরা = to turn } ইহা হইতে আসিতেছে যে {
∴ পর্য্যায় = পরে পরে ঘুরে আসা
∴ পর্য্যায়ক্রমে = by turns.....ক
∴ your turn = তোমার পালা
∴ by turn = পালাক্রমে.....খ

ক বলিতেছে যে, পর্য্যায়ক্রমে = by turn
খ বলিতেছে যে, by turn = পালাক্রমে } অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে,

পর্য্যায়ক্রমে = পালাক্রমে।

এ যেন হইল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে; সেটি এই যে, পর্য্যায়ের পালা স্বতন্ত্র, আর ডালপালা'র পালা স্বতন্ত্র। এরূপ দ্বৈধস্থলে কর্ত্তব্য যাহা তাহা এই :—

ক ১।। যখন নবাবি চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, চলন হইতে চাল আসিয়াছে।

ক ২।। যখন আতপ চালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, তণ্ডুল হইতে তাঁড়ুল আসিয়াছে, তাঁড়ুল হইতে তাউল আসিয়াছে, তাউল হইতে চাউল আসিয়াছে।

খ ১।। যখন গাছের ডালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দারু হইতে ডাল আসিয়াছে। কেহ বলিতে পারেন যে, দারুকে ডাল বলিলে দারু-শব্দের নিতান্তই ব্যাপ্তি-সংকোচ করা হয়, যেহেতু দারু-শব্দের অর্থ কাঠ। ইহারই জুড়ি আর একটি কথা এই যে, পানীয় শব্দ হইতে খোট্টার ব্যবহার্য্য পানী (জল) আসিতে পারে না; যেহেতু পানীয়কে জল মাত্র বলিলে দুগ্ধাদিকে পানীয়ের কোটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া পানীয় শব্দের ব্যাপ্তি-সংকোচ করা হয়। আপত্তিকারীর জানা উচিত যে, কার্য্যগতিকে অনেক সময় মূল-শব্দের ব্যাপ্তি সংকোচ অনিবার্য্য। কাঠুরে কুড়ালের ঘায়ে প্রথমেই গাছের এক পার্শ্ব কাটিয়া ফেলে। সেই কর্ত্তিত খণ্ডের শাখাংশই জ্বালানি কাঠ, অবশিষ্ট অংশ পল্লব। এইরূপে পাইতেছি যে,

শাখাপল্লব = শাখা + পল্লব = জ্বালানি কাঠ + পল্লব = দারু + পল্লব = দারুপল্লব = ডালপালা।

খ ২।। যখন মুগের ডালের কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে,

যেমন, মেজে = মার্জ্জ্য = মার্জ্জিতব্য অর্থাৎ মার্জ্জনী দ্বারা কিনা ঝাঁটা দ্বারা মার্জ্জিতব্য তেমনি, ডাল = দাল্য = দলিতব্য অর্থাৎ জাঁতায় দলিতব্য। দলিয়া (অর্থাৎ ডলিয়া) বাহির করা হয়, তাই দাল্য বা ডাইল।

অতএব যেমন কল্য হইতে কাল্ আসিয়াছে, তেমনি, দাল্য হইতে ডাল আসিয়াছে।

গ ১।। যখন গাছপালার কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, পল্লব হইতে পালা আসিয়াছে।

গ ২।। যখন তস্কর ভীত যাত্রি-গণের মধ্যে পালা-ক্রমে রাত জাগিয়া চৌকি দিবার কথা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে,

পর্য্যায় হইতে পর্য্যা আসিয়াছে, পর্য্যা হইতে পালা আসিয়াছে।

কি আশ্চর্য্য! পর্য্যায়ের র্য্য ল-বেশ ধারণ করিয়া পালা-শব্দের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছে। এইরূপেই—লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া গাঙ্গুর্য্যের র্য্য গাঙ্গুলির মধ্যে এতকাল ধরিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়া আসিতেছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও কেহ এরূপ প্রশ্ন করিল না যে চট্টোপাধ্যায় চাটুয্যে, বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁড়ুয্যে, মুখোপাধ্যায় মুখুয্যে—একা কেবল গঙ্গোপাধ্যায় গাঙ্গুলি হইল কি অপরাধে!

আমি কিন্তু দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, গাঙ্গুলির উলি, মুখুয্যে-চাটুর্য্যে-বাঁড়ুয্যের উর্য্যে ভিন্ন আর কিছুই নহে। পালার মূল স্বাদ আর গাঙ্গুলির মূল বৃত্তান্ত অবিকল একই রূপ তাহার সাক্ষী—

পর্য্যায় = পর্য্যা = পালা
গাঙ্গুর্য্যে = গাঙ্গুলি

লোকে বলে যে, গঙ্গোপাধ্যায় হইতে গাঙ্গুলি হইয়াছে, চট্টোপাধ্যায় হইতে চাটুয্যে হইয়াছে, মুখোপাধ্যায় হইতে মুখুয্যে হইয়াছে—ইত্যাদি। কোন কোন শব্দাচার্য্য, উপাধ্যায়

শব্দের উপরে আসুরিক অস্ত্র চিকিৎসা চালাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন না। প্রথম উদ্যমেই তাঁহারা উপাধ্যায়ের পা কাটিয়া ফেলিয়া তাহাকে উধ্যায় করেন; তাহার পরে সুদীর্ঘ উপবাসের শোষণে উধ্যায়ের কণ্ঠের হাড় বাহির করিয়া তাহাকে উধ্যা করেন ; তাহার পরে ক্রমান্বয়ে উধ্যাকে পিটিয়া উজ্ঝা এবং উজ্ঝাকে ঈষৎ বাঁকাইয়া উঝো করিয়া ছাড়িয়া দেন। উপাধ্যায় যখন উঝোমূর্তি ধারণ করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন আমি এক আঁচড়েই বুঝিতে পারিলাম যে, সে উঝো কোন কার্য্যেরই নহে—যেহেতু তাহার মাথায় রেফ নাই। উপাধ্যায়ের উধ্যাকে যতই কেন মুচড়াও না,—কিছুতেই সে বাগ মানিবে না; কেননা উধ্যা হইতে রেফযুক্ত উর্ধ্যা বাহির করা দেবতারও অসাধ্য। তুমি হয়ত বলিবে যে, "রেফে আমার প্রয়োজন নাই—আমি ইংরাজিতে নাম সাক্ষর করিবার সময় Mookerjy না লিখিয়া Mookerjey লিখিব ; কিন্তু তাহা বলিলে চলে কই! রেফে তোমার প্রয়োজন না থাকিতে পারে—কিন্তু আমার নিকট তাহা বহুমূল্য সামগ্রী; যেহেতু আমি অনেক চিন্তা ব্যয় করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বটির সন্ধান পাইয়াছি যে, গাঙ্গুর্য্যের রেফের মধ্যে দিয়া গাঙ্গুলির লি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। রেফ উর্য্যের শিখা মাত্র নহে যে, তাহা ছাঁটিয়া ফেলিলেই হইল—রেফ ফণীর মণি; রেফ গেলে উর্য্যের সবই যায়। ব্যাকরণের সন্ধি হইতে পাইতেছি যে,

রি + অ = র্য্য

তা'ছাড়া অন্তাস্থ য'য়ে য-ফলা দিয়া তাহাতে রেফ দিলে তাহার প্রকৃত উচ্চারণ র্জ্জ নহে—তাহার প্রকৃত উচ্চারণ রিঅ। রিঅ যে অ ফেলিয়া দিয়া রি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহা তো হইতেই পারে; তার সাক্ষী

চাতুর্য্য = চাতুরি অ = চাতুরি;
মাধুর্য্য = মাধুরি অ = মাধুরি।

এইরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, র্য্য হইতে রি অতিসহজে আসিতে পারে; যখন রি আসিতে পারে তখন লি'ও আসিতে পারে। এমন কি "ডলয়োরলয়োরভেদঃ" এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে রি'এর আর এক নামই লি, তাহার সাক্ষী—অভিধান খুলিয়া দেখ, দেখিবে যে, অঙ্গুরি এবং অঙ্গুলি উভয়েরই অর্থ আঙুল। এই জন্যই আমি বলি যে, গাঙ্গুর্য্যের রেফের মধ্য দিয়াই গাঙ্গুলির ল বাহির হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে গাঙ্গুলি যেন গাঙ্গুর্য্যো হইতে আসিল—গাঙ্গুর্য্যো স্বয়ং কোথা হইতে আসিল? গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্য হইতে তো নহেই!—আমাকে যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি বলিব "গাঙ্গুর্য্যো" আসিয়াছে গাঙ্গীয় (গঙ্গাতীরবাসী) + আর্য্য হইতে "গাঙ্গ্যার্য্য" হইতে। যদি বল যে, আর্য্য হইতে উর্য্যো আসিবে কেমন করিয়া? তবে তাহার উত্তর এই যে, কদর্য্য হইতে কদুর্জ্জি আইল কেমন করিয়া? প্রথমতঃ গাঙ্গ্যার্য্য হইতে গাঙর্য্য অতি সহজেই আসিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ কদর্য্য হইতে যেমন করিয়া কদুর্য্যি আসিয়াছে, গাঙর্য্য হইতে তেমনি করিয়া গাঙুর্য্যি আসিয়াছে তৃতীয়তঃ পর্য্যা হইতে যেমন করিয়া পালা আসিয়াছে, গাঙুর্য্যি হইতে তেমনি করিয়া গাঙুলি আসিয়াছে। অতঃপর বক্তব্য এই যে, র্য্য হইতে র্য্যি র্য্যা, এবং র্য্যো তিনই অতি সহজে বাহির হইতে পারে। র্য্য হইতে র্য্যি তো বাহির হইতে পারেই তার সাক্ষী আচার্য্য = আচার্য্যি তা ছাড়া য্য হইতে য্যা বাহির হইবার পক্ষেও লেশমাত্র বাধা দৃষ্ট হয় না, যেহেতু অকারের মূল উচ্চারণ আকারের সহিত অবিকল সমান—কেবল আকার অপেক্ষা তাহা কিয়ৎ পরিমাণে

হ্রস্ব। পণ্ডিত মহাশয়েরা এক্ষণে যেরূপ বালকদিগকে "কর খল" পড়ান, সেরূপ অশুদ্ধ উচ্চারণ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কুত্রাপি ছিল না—এমন কি বিদ্যাপতির আমলে উহা বঙ্গের কোন স্থানে ছিল কি না সন্দেহ। ব্যাকরণ শাস্ত্র মানিতে হইতে বলি এবং বলী'র মধ্যে যেরূপ উচ্চারণের কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ—পদ্ম এবং পদ্মা'র মধ্যেও অবিকল সেইরূপ। আর একটি কথা এই যে শব্দের শেষ স্থানীয় স্বর হ্রস্ব হইলেও তাহাকে একটু দীর্ঘ করিয়া উচ্চারণ করা আবশ্যক— কেন না তাহা না করিলে তাহা রীতিমত পরিস্ফুট হইতে সময় পায় না। এই জন্য মাধুরি যদিচ মাধুরিঅ হইতে আসিয়াছে, তথাপি আমরা মাধুরি লিখিবার সময় ইকারটাকে দীর্ঘ করিয়া দিই। অতএব উপবীতের ত হইতে যেমন পইতার তা আসিয়াছে, তেমনি য্য হইতে য্যা অতি সহজেই আসিতে পারে। আর য্যা তো যো হইয়াই রহিয়াছে তাহার সাক্ষী—"সাতকাণ্ড রামায়ণ সীতে কা'র ভার্য্যে।" আর একটি কথা এই যে আমাদের এই বঙ্গ-ভারতী ভাগীরথী-মাতার পার্শ্বচরী হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে পদপ্রসারণ করিয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা মৈথিলি ভাষার ন্যায় আধ-খোট্টাই ভাষা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; তার সাক্ষী বিদ্যাপতির বাঙ্গালা ভাষা। এই জন্য খুব সম্ভব যে পূর্ব্বে আমাদের দেশে মুখুয্যে শব্দ আধ খোট্টাই ছাঁদে উচ্চারিত হইত—'মুখুয্যা' এইরূপে উচ্চারিত হইত। এইরূপ নানাবিধ যুক্তির একত্র সমাধান দ্বারা আমরা পাইতেছি যে মুখুয্যে দুইরূপে আসিতে পারে :— অকারের দীর্ঘ আকার এই সূত্রে এক দিক্ দিয়া আমরা পাইতেছি যে,

মুখার্য্যা = মুখয্যা = মুখুয্যে

আর ইকারের গুণ একার এই সূত্রে আর এক দিক্ দিয়া পাইতেছে যে,

মুখার্য্য = মুখয্য = মুখুর্য্যি = মুখুয্যে

এখনও জিজ্ঞাসা মিটিতেছে না। কেহ বলিতে পারেন—লোকে যে বলে "ফুলের মুখুটি"—মুখুটি কোথা হইতে আইল? ইহার উত্তর স্পষ্ট পড়িয়া আছে;—

| | |
|---|---|
| মাধুর্য্য = মাধুরি অ | অঙ্গুরীয় = অঙ্গুটি |
| মুখুয্যে = মুখুরি অ | মুখুরিঅ = মুখুটি |

র মূর্দ্ধণ্য বর্ণ কিন্তু তাহার রব অস্পষ্ট ; ট মূর্দ্ধণ্য বর্ণ কিন্তু তাহার টঙ্কার সুস্পষ্ট; অতএব র যে কখন কখন ইতর-ভাষা পল্লীতে ট-বেশে দেখা দিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। চাটুটি মুখুটিরই সহোদর, কিন্তু চাটুটির দুই ট'য়ে টক্কর টক্কর বাধিয়া গোলোযোগ উপস্থিত হওয়াতে দ্বিতীয় ট প্রথম ট'য়ের নিকটে নরম হইয়া ত হইল—চাটুটি নরমিয়া চাটুতি হইল। চাটুয্যে মহাশয় ইহাতে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন—তিনি বলিতে পারেন যে "বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিখিয়াছি কোন্ গাঁই? —চাটুতি গাঁই'—তুমি আমাকে আজ নূতন শিখাইতে আসিয়াছ যে চাটুতি চাটুর্য্যে'র অপভ্রংশ? তোমার তো স্পর্দ্ধা কম নহে!" ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে চাটুতি গাঁই বলিয়া যে একটা গাঁই আছে, তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত—মুক্তকণ্ঠে—স্বীকার করিতেছি; কিন্তু চাটুতি গাঁই চট্টগ্রাম হইতে আইল কেমন করিয়া সেটাও তো একবার ভাবিয়া দেখা উচিত! আমি জানি যে যশোহর প্রদেশে নরেন্দ্রপুর নামে একটি গ্রাম আছে; ঐ নামটির উৎপত্তি-বিবরণ আর কিছু না—অনতিপূর্ব্বে ঐ গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী কোন একটি গ্রামে নরেন্দ্র নামক একজন মাথালো ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ঐ গ্রামটি নূতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার নাম দিলেন নরেন্দ্রপুর। এইরূপ ব্যক্তি-

বিশেষের নামে গ্রামের নামকরণ আমাদের দেশে এত প্রচলিত যে তাহার নিদর্শন পথে ঘাটে ছড়াছড়ি যাইতেছে; তার সাক্ষী—মুর্‌শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুরসিদ কুলি খাঁ; আমেদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা গুজরাটের শাসনকর্ত্তা আমেদ; রামগিরিতে রামচন্দ্র এক সময়ে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম রাম-গিরি। এরূপ প্রথা কেবল আমাদের দেশেই আবদ্ধ নহে; আমেরিকা-খণ্ডে উহার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; তার সাক্ষী—চিরস্মরণীয় মহাত্মা ওয়াসিংটনের নামানুসংজ্ঞিত ওয়াসিংটন নগর; পেনের প্রতিষ্ঠিত পেন্‌সিল্‌বানিয়া উপরাজ্য ইত্যাদি। উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গদেশের সহিত আমেরিকার প্রথা-সাদৃশ্যের বিশেষ একটি কারণও আছে; তাহা আর কিছু না—বঙ্গদেশে যেমন এক সময়ে ব্রাহ্মণ কুলের নূতন পত্তন হইয়াছিল, আমেরিকা প্রদেশে সেইরূপ ইউরোপীয় জন-মণ্ডলীর নূতন পত্তন হইয়াছিল। তা ছাড়া, প্রধান আর একটি কথা এই যে পূর্ব্বতনকালে ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত গ্রামের অধিবাসীরা অধিষ্ঠাতৃ-ব্রাহ্মণকুলের কুল-মাহাত্ম্যে আপনাদিগকে বিশিষ্টরূপে গৌরবান্বিত মনে করিত। তখনকার আমলের অধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ এবং অধিষ্ঠিত গ্রাম দুয়ের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা দেখিলে মনে হয়—অধিষ্ঠাতৃ ব্রাহ্মণকুল যেন অধিষ্ঠিত গ্রামের আত্মা, আর অধিষ্ঠিত গ্রাম যেন অধিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণের শরীর। অধিষ্ঠাতা এবং অধিষ্ঠান-ভূমির মধ্যে এমনতর যেখানে ঘনিষ্ঠতা, সেখানে উভয়ের মধ্য দিয়া উভয়ের পরিচয়-জ্ঞানের প্রথা প্রচলিত হইবে—ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরূপ স্থলে পরিচয়-জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি কিরূপ হওয়া সম্ভবপর তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে, তাহার একটি নমুনা এই :—

প্রশ্ন। কোথাকার আর্য্য।

উত্তর। চট্টগ্রামের আর্য্য = চট্টার্য্য = চাটুয্যে।

প্রশ্ন। কোন্‌ গ্রাম।

উত্তর। চট্টার্য্যের গ্রাম = চট্টার্য্যগ্রাম = চাটুতি গাঁই।

চট্টগ্রাম হইতে কেমন করিয়া চাটুতি গাঁই আসিতে পারে—এ জিজ্ঞাসার এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল বটে, কিন্তু তাহার উত্তপ্ত চিতা ভস্ম হইতে আর একটা জিজ্ঞাসা গাত্রোত্থান করিল; তাহা এই যে, গ্রামের ব্যালাই বা চাটুতিগ্রাম হইল কেন, আর ব্রাহ্মণের ব্যালাই বা চাটুয্যে মহাশয় হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণকে "তত্র ভবান্‌" বলিয়াও আশ মেটে না কেন, আর, ব্রাহ্মণের আসন-বসনকে "তৎ" বলিয়াই "যথেষ্ট বলা হইয়াছে" মনে করা হয় কেন? যাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বলিবেন যে, ঘটিবাটির পক্ষে একটা যৎসামান্য তকারান্ত বা টকারান্ত নামই যথেষ্ট—তৎ বা Thatই যথেষ্ট; কিন্তু ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নাম উহারই মধ্যে শুনিতে একটা লম্বা চওড়া হওয়া বিধেয়; আর, যাহা বিধেয় তাহা কার্য্যগতিকে স্বভাবতই ঘটিয়া উঠে—যেমন চাবা'র মুখ দিয়া সত্যকথা স্বভাবতই বাহির হইয়া পড়ে। মুখুটি-শব্দ অপেক্ষা যে মুখুয্যে-শব্দ মুখার্য্য-শব্দের নিকট-সম্পর্কীয়—শ্রোতার কর্ণই তাহার সমুচিত কষ্টিপাথর; সুতরাং কাহারও কর্ণ থাকিতে তিনি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, একদিকে মুখুটি এবং আর একদিকে মুখুয্যে—দুয়ের মধ্যে মুখুয্যে—অপেক্ষাকৃত সাধুভাষা; আর, তাহা অপেক্ষাকৃত সাধুভাষা বলিয়াই ব্রাহ্মণের ব্যালা আমরা তাঁহাকে মুখুয্যে মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করি; আর তাঁহার বাস-গ্রামের ব্যালা

"মুখুটি গ্রাম" বলিয়া সংক্ষেপে সারি। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে—সেটি ভুলিলে চলিবে না;—আমেরিকায় ওয়াসিঙ্গটন, পেন্সিল্‌বানিয়া, এবং আর গোটা দুত্তিন স্থান তত্তৎ প্রতিষ্ঠাতার নামে অনুসংজ্ঞিত হইয়াছে দেখিয়া—নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে কেহ? আর এরূপ কথা বলে না যে, নিউইয়র্ক চিকাগো প্রভৃতি আমেরিকা'র সমস্ত প্রদেশেই স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাতার নামে অনুসংজ্ঞিত। অতএব, মুখুটি এবং চাটুতি এই দুই গ্রামের নাম মুখার্য্য এবং চট্টার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বন্দিঘাটিও যে বন্দার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মনে করিতে হইবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই; বরং পৃথক পৃথক্ ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত গ্রামের নাম পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা এবং ঘটনা সূত্রে পৃথক্ পৃথক্ প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছিল মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই পর্য্যন্তই আমি সহজ করিয়া বলিতে পারি, আর বলিয়াছিও তাই—যে, বন্দার্য্য হইতে শুধু কেবল বাঁড়ুয্যে আসিয়াছে, কিন্তু মুখার্য্য হইতে মুখুয্যে এবং মুখুটি দুইই আসিয়াছে; চট্টার্য্য হইতে চাটুয্যে এবং চাটুতি দুইই আসিয়াছে। আর্য্য হইতে কিরূপে উর্য্যো এবং উলি আসিতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে দেখাইয়া চুকিয়াছি; অধিকন্তু একটু পূর্ব্বে এটাও দেখাইলাম যে, অঙ্গুরীয় হইতে অঙ্গুটি আসিয়াছে যদি সত্য হয়, মুখুরিঅ হইতে মুখটি আসিবে—চাটুরিঅ হইতে চাটুটি'র ভাই চাটুতি আসিবে—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর যেখানে রাশ নাম আর ডাক নামের ন্যায় একই গ্রামের একটি নাম চট্ট এবং আর একটি নাম চাটুতি, সেখানে চট্টার্য্য গ্রাম (চাটুতি গাঁই) যে চট্টগ্রামেরই নামান্তর হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? মুখুটি এবং চাটুতি যেখান হইতেই আসুক্ না কেন—আমার যেটা মুখ্য প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত (Hypothesis) সেটা এই যে, আর্য্য হইতে উর্য্যো এবং উলি এই দুইটি যমক সহোদর বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। আমার এই প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তটি আমি চাটুয্যে, মুখুয্যে, বাঁড়ুয্যে, গাঙ্গুলি এই চারি স্থানে খাটাইয়া দেখিলাম যে, উহাদের চতুঃসীমার মধ্যে কোন স্থানেই তাহা তিলমাত্রও ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন সুপণ্ডিত ব্যক্তি আর এক প্রকার সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা বলেন যে, উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে, ওঝা হইতে উঝ্যা আসিয়াছে। উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে, ইহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত শিরোধার্য্য করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বলি—কথাটার প্রতি একটু ধীর ভাবে প্রণিধান করা হউক—যে ওঝা'র মাথায় যেহেতু শিখা নাই (অর্থাৎ রেফ নাই) এই জন্য ওঝা হইতে কোন প্রকারেই গাঙ্গুলির উলি আসিতে পারে না; তা ছাড়া আর একটি কথা এই যে, উপাধ্যায় যখন একবার উপবীত পরিত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ য-ফলা পরিত্যাগ করিয়া) ওঝা হইয়াছে, তখন আবার সে যে কাঁচিয়া উপবীত (অর্থাৎ য-ফলা) ধারণ করিয়া উঝ্যো হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। উপাধ্যায় হইতে যে ওঝা আসিয়াছে, তাহা তুমিও বলিতেছ—আমিও বলিতেছি, কিন্তু "উপাধ্যায় হইতে ওঝা আসিয়াছে" এই মাত্র বৃত্তান্তের বলে কিছু এটা প্রমাণ হয় না যে, ওঝা হইতে উর্য্যো বা উলি আসিয়াছে; বরং উপরে আমি যাহা বলিলাম তাহাতে যথোচিত প্রমাণ হইতেছে যে, ওঝা হইতে উলিও আসিতে পারে না—উঝ্যোও আসিতে পারে না; উলি আসিতে পারে না কেন? না যেহেতু ওঝা'র গলায় উপবীত নাই। পক্ষান্তরে আমি যথেষ্ট প্রমাণ সহকারে দেখাইয়াছি যে, উর্য্যো এবং উলি দুইই আর্য্য হইতে অতি সহজে আসিতে পারে, যেহেতু আর্য্যের মস্তকে শিখা উড্ডীয়মান—জমকালো

রেফ; আর তাহার গল-দেশে উপবীত লম্বমান— দিব্য সর্পাকৃতি য-ফলা। অতএব আর্য্যের কাজ আর্য্য করুন, ওঝার কাজ ওঝা করুন, তাহা হইলেই দেখিতে ভাল হয়, নচেৎ পরস্পরের অধিকার হস্তক্ষেপ করিয়া অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষের কাহারও তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই—তৃতীয় পক্ষ জন সমাজেরও তথৈবচ—অতএব তাহাতে ক্ষান্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

শব্দ ভাঙিয়া গড়িয়া মুচড়িয়া এই যে আমি একটা নতুন সিদ্ধান্ত দাঁড় করাইলাম যে মুখার্য্য হইতে মুখুয্যে হইয়াছে—গাঙ্গার্য্য হইতে গাঙ্গুলি হইয়াছে—বন্দার্য্য হইতে বাঁড়ুয্যে হইয়াছে—সাধারণ লোকমণ্ডলীর স্থূল দৃষ্টিতে ইহা এক প্রকার ভেল্কি বাজী মনে হইতে পারে, তাঁহারা তো জানেন না যে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত Max Muller ভট্টাচার্য শরমা হইতে Helena বাহির করিয়াছেন, দহনা হইতে Daphne বাহির করিয়াছেন। ভাষা তত্ত্বের বিচিত্র গতি বিষয়ে তাঁহাদের চক্ষু একেবারেই বদ্ধ-কপাট। শব্দের মার পাঁচ ছাড়িয়া দিয়া, এবার, একটা চক্ষে দেখা এবং কাণে শোনা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি—দেখি যদি তাহাতে তাঁহাদের কাহারো চক্ষু ফুটাইতে পারি। কিন্তু এ সভায় যাঁহারা অদ্য উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় তো আমি মুখ খুলিতে না খুলিতেই আমার সমস্ত মন্তব্য কথা বুঝিয়া বসিয়া আছেন—আর তাঁহাদের মধ্যে এমনই দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ পণ্ডিতের অভাব নাই যাঁহারা অনেক বিষয়ে আমার অর্দ্ধস্ফুট চক্ষু পূর্ণ মাত্রায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন;— এ সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যদি আমার বক্তব্য বিষয়টি ভাল ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য অপক্ষপাতে বিচার করেন, তাহা হইলেই আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বে পত্নীরা স্ব স্ব স্বামীকে আর্য্য-পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অধুনাতন কালের অন্তঃপুর প্রদেশে স্বামীকে না হউক—স্বামীর ভ্রাতাকে প্রকারান্তরে আর্য্যপুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করা হইয়া থাকে, যেহেতু আর্য্যপুত্র যা আর ঠাকুরপোও তা একই। শ্বশুর হ'চ্ছেন ঠাকুর বা আর্য্য আর শ্বশুরের পুত্র হ'চ্চেন ঠাকুর-পো বা আর্য্য পুত্র। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে ঠাকুর শব্দ আর্য্য শব্দের এক প্রকার অবিকল অনুবাদ। ইহা হইতে আসিতেছে যে, চট্ট-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ চট্টার্য্য, বন্দ-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ বন্দার্য্য, গাঙ্গী-ঠাকুরের অবিকল অনুবাদ গাঙ্গ্যার্য্য। অতএব অধুনাতন কালে ব্রাহ্মণেরা যেভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাবিত হ'ন—পূর্ব্বে এক সময়ে যে তাঁহারা ঠিক সেইভাবে আর্য্য বলিয়া সম্ভাবিত হইতেন—এরূপ অনুমান কেবল অনুমান মাত্র নহে; কেননা একটি চক্ষে দেখা কথা এবং আর একটি কাণে শোনা কথা এই দুইটি প্রত্যক্ষ বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ সৌসাদৃশ্য ঐ অনুমানটির অটল ভিত্তিমূল। আর্য্যপুত্র শব্দটি সকলেই পুস্তকে দেখিয়াছেন আর ঠাকুর-পো শব্দটি সকলেই কাণে শুনিয়াছেন, এখন দুইটিকে নিক্তির ওজনে তৌল করিয়া দেখুন— দেখিবেন যে দু'য়ের মধ্যে একচুলও ভাবের ইতর বিশেষ নাই। তুলাদণ্ডের দুইদিকের দুই ভারপাত্রের একটিতে রাখিলাম ঠাকুর পো এবং আর একটিতে রাখিলাম আর্য্য-পুত্র; তুলাদণ্ড দুইদিকের কোন দিকেই হেলিল না—দুই ভারপাত্র সমসূত্রে স্থির রহিল। একদিকের ভারপাত্র হইতে পো এবং আর একদিকের ভারপাত্র হইতে পুত্র এই দুই সমান অংশ উঠাইয়া লইলাম। এ পাত্রে অবশিষ্ট রহিল ঠাকুর আর ও পাত্রে অবশিষ্ট

রহিল আর্য্য। ইহাতেও দুইদিকের দুই ভার পাত্র পূর্ব্ববৎ সমসূত্রে স্থির রহিল। অতএব হইতেছে যে, আর্য্য=ঠাকুর।

অনতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে অধুনাতন-কালে ব্রাহ্মণেরা যেভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষিত হ'ন—পূর্ব্বে এক সময়ে তাঁহারা ঠিক সেই ভাবে আর্য্য বলিয়া সম্ভাষিত হইতেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে অধুনাতন কালে ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে ঠাকুর বলিয়া সম্ভাষিত হ'ন? এ প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজে হইতে পারে। পথের কোন ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া অতিথি করিবার ইচ্ছা হইলে গৃহী ব্যক্তি দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "ঠাকুর এই দিকে আসুন।" এমন কি রাঁধুনে বামুনকেও আমরা বামুন ঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে কোন ব্রাহ্মণের কোন বিশেষ গুণ দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ঠাকুর বলি না—সাধারণতঃ সকল ব্রাহ্মণকেই ঠাকুর বলি। অতএব মিষ্টর যেমন ইংরাজের সাধারণ উপাধি—আর্য্য তেমনি পূর্ব্বে এক সময়ে ঠাকুরের ন্যায় ব্রাহ্মণবর্গের সাধারণ উপাধি ছিল, তাহাতে আর ভুল নাই। তাহা যদি হইল—আর্য্য যদি ব্রাহ্মণের সাধারণ উপাধি হইল—তবে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগের অবশ্য বিশিষ্ট উপাধি আছে, —সে উপাধি কি? আপাততঃ তিনটি বিশিষ্ট উপাধি প্রধানতঃ আমার চক্ষে পড়িতেছে—(১) ভট্টাচার্য (২) আচার্য্য এবং (৩) উপাধ্যায়। তা ছাড়া আরো অনেকগুলি বিশিষ্ট উপাধি আছে—যেমন বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার ন্যায়রত্ন ইত্যাদি; কিন্তু শেষোক্ত উপাধিগুলি বিশিষ্ট হইতেও বিশিষ্ট—ও গুলি বিশিষ্টতর। বিশিষ্টতর উপাধিগুলির সহিত আপাততঃ আমাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু পূর্ব্বে এই যে তিনটি উপাধির কথা আমি উল্লেখ করিলাম—যে ভট্টাচার্য, আচার্য্য এবং উপাধ্যায়, এগুলি হ'চ্চে বিশেষ বিশেষ অধ্যাপক-মণ্ডলীর বিশেষ বিশেষ উপাধি। আমাদের দেশে যাঁহারা স্মৃতি ন্যায় কাব্য অলঙ্কার ব্যাকরণ এই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপক তাঁহারা শুধু আচার্য্য অর্থাৎ সামান্য আচার্য্য আচার্জ্জি ঠাকুর। এ দেশের সভ্যসমাজে স্মৃতি দর্শন এবং সাহিত্যের ন্যায় জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের তেমন কোন বিশেষ মর্য্যাদা ছিল না, এইজন্য শুধু আচার্য্য যাঁহাদের উপাধি তাঁহারা পুরোহিতদিগের ন্যায় নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হ'ন। ভট্টাচার্য এবং আচার্য্য উভয়েই Professor। ভট্টাচার্য্য স্মৃতিদর্শন এবং সাহিত্যের Professor বলিয়া বিশেষ সম্মানার্হ, আচার্য্য সামান্য জ্যোতিষিদিগের Professor বলিয়া অবজ্ঞাস্পদ। আর এক শ্রেণীর অধ্যাপক হ'চ্চেন উপাধ্যায়। উপাধ্যায় শব্দের অর্থ অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে যে, অধ্যাপক উপদেশক বেদের এক দেশ যিনি অধ্যয়ন করা'ন। খুব সম্ভব যে সর্ব্ব প্রথমে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকেই বেদের কোন না কোন দেশ অধ্যয়ন করাইতেন; কিন্তু বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের বংশজাত ব্রাহ্মণেরা বেদের কোন দেশই অধ্যয়ন করা'ন না।

বহুদর্শী সুবিদ্বান পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সেদিন সভা সমীপে প্রসঙ্গ ক্রমে একটি ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যাহা উপস্থিত করিয়াছিলেন—ইতিপূর্ব্বে তাহা আমার জানা ছিলনা। তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বতন কালে যাঁহারা বেদাধ্যয়ন করাইয়া বৃত্তিগ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল আর সেই শ্রেণী ছিল আর সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ উপাধি ছিল

'উপাধ্যায়'। তাঁহার এ কথাটা বেস্ আমার মনে লাগিতেছে, কেননা পুরাতন গ্রীক্ দেশের শেষাবস্থায় ঐরূপ বিদ্যাদানের বিনিময়ে বৃত্তি গ্রহণের প্রথা সুরু হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদর্শিত ঐতিহাসিক দূরবীণের মধ্য দিয়া আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, বৃত্তি যোগাইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আকাঙ্ক্ষা ছাত্র মণ্ডলীর অভিভাবকদিগের মনে জোয়ারের জলের ন্যায় ক্রমশই প্রবর্দ্ধিত হইতেছে, আর তাহার প্রবল তোড়ে উপাধ্যায় মণ্ডলীর অধ্যাপনা শালায় ভাঙ্গন ধরিয়া ভট্টাচার্য্যগণের চতুষ্পাঠির দিন দিন অবয়ব-পুষ্টি হইতেছে। তাহার কিয়ৎপরে দেখিতেছি, যে ছাত্রহীন উপাধ্যায়েরা আপন আপন পাততাড়ি গুটাইতেছেন। তাহার পরেই সবেগে যবনিকা পতন। সেই যবনিকা পতন অবধি এ কাল পর্য্যন্ত উপাধ্যায়-শ্রেণী নিতান্তই বেকার অবস্থায় পড়িয়াছেন। এখন তাঁহারা বেদও পড়া'ন বা বেদাঙ্গও পড়ান না। এক্ষণে একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভট্টাচার্য্য পদবী কেবল বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে, আর একদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ মাত্রই লোকসমাজে ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত। উপাধ্যায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা ভট্টাচার্য্যের দলে মিশিয়া ভট্টাচার্য্য হ'ন, তাঁহারাই কেবল অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হ'ন; আর সেই উপলক্ষে তাঁহারা তাহাদের পৈতৃক উপাধি (উপাধ্যায়) বিসর্জ্জন দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বিদ্যালঙ্কার তর্কালঙ্কার বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ভট্টাচর্য্যোচিত উপাধি পরিগ্রহ করেন, কিন্তু এরূপ যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প; অধিকাংশ উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা কার্য্যের কোন ধারই ধারেন না অথচ অধ্যাপনা কার্য্য পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগের একটি প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। শেষোক্ত ব্রাহ্মণদিগের মান বজায় রাখিবার জন্য উপচারচ্ছলে (অর্থাৎ out of courtesy) তাঁহাদের নামের শেষ ভাগে উপাধ্যায় পদবী অদ্যাবধি সংযোজিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাজে উপাধ্যায় ছিলেন ইহারা কেবল নামে উপাধ্যায়। এই গতিকে— বেদাধ্যাপক বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের নামের পরিশিষ্ট ভাগে দুই কারণে এইরূপ উপাধি সংযোজিত হইল, (১) তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম বজায় রাখিবার জন্য উপাধ্যায় উপাধি, এবং (২) তাঁহাদের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার দৃষ্টে সাধারণ ব্রাহ্মণ জাতি-সুলভ আর্য্য উপাধি। সাঁটে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, উপাধ্যায় বেদাধ্যাপক ব্রাহ্মণদিগের পোষাগি উপাধি, আর আর্য্য তাঁহাদের আটপৌরে উপাধি। আমাদের দেশের ভাষাও দুইরূপ পোষাগি ভাষা এবং আটপৌরে ভাষা। সাধুভাষা পোষাগি ভাষা, ইতর ভাষা আটপৌরে ভাষা। এখন বক্তব্য এই যে, আটপৌরে ভাষার পর্ণকুটীরে আর্য্য শব্দ উর্য্যে এবং উলি বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছে; আর সেইসঙ্গে পোষাগি ভাষার প্রশস্ত অট্টালিকায় উপাধ্যায় শব্দ যেমন তেমনি অবিকৃতভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। গঙ্গঠাকুর পোষাগি ভাষাতেই পোষাগি উপাধি ধারণ করিয়া গাঙ্গোপাধ্যায় হ'ন। কিন্তু আটপৌরে ভাষাতে তিনি আটপৌরে উপাধি ধারণ করিয়া সামান্য গঙ্গার্য্য বা গাঙ্গুলি হইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে উপাধ্যায়ের উপাধি কেবল বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কুলেরই উপাধি ছিল—সকল ব্রাহ্মণের নহে। খুব সম্ভব যে ঘোষাল উপাধি ঘোষার্য্য হইতে আসিয়াছে—সান্যাল উপাধি সান্যার্য্য হইতে আসিয়াছে। এরূপ হইলেও হইতে পারে যে, যেমন চট্টগ্রামের বা চাটুতি গ্রামের চট্টার্য্য তেমনি, ঘোষ পাড়ার ঘোষার্য্য। পর্য্যায়ের

র্য্যা যখন পাল্‌লা'র ল হইয়াছে, তখন ঘোষার্য্যের র্য্যা ঘোষালের ল হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে ঘোষালের যেহেতু পোষাপি উপাধি নাই এইজন্য সন্দেহ হয় যে তিনি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সোপাধ্যায় ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; অথচ আবার ঘোষাল কুলীনের মন্ত্রপূত পাঁচের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন; —ইহার ভিতরে কি যে নিগূঢ় রহস্য লুকায়িত আছে, ইতিহাসবেত্তারা তাহা বলিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা যাহা আমার মনে হইতেছে তাহা এই—মাদ্রাজ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণদিগের উপাধি আইয়র। আইয়র যে আর্য্য হইতে আসিয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই। পূর্ব্বে মাদ্রাজ নিতান্তই অনার্য্য প্রদেশ ছিল, সুতরাং মাদ্রাজ অঞ্চলে আর্য্যই যে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বোচ্চ উপাধি হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পরি উপসর্গের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া এ আবার কি একটা নূতন উপসর্গে আসিয়া পড়িলাম। গতিক যখন এইরূপ, তখন আমার পক্ষে আজ মহামান্য সভাপতি এবং সভ্য মহোদয়গণের অনুমতি লইয়া—এই খানেই বিশ্রাম করা শ্রেয়। তা বলিয়া আপনারা মনে করিবেন না যে আমি আমার হাতের কার্য্য অর্দ্ধ সমাপন করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া পলাইতেছি। প্রত্যেক উপসর্গের সম্বন্ধেই আমি সাধ্যানুসারে ভাবিয়া চিন্তিয়া এক একটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি, যদি আপনারা তাহা শুনিতে ভার বোধ না করেন, তবে বারান্তরে আমি তাহা নিঃশেষে বলিয়া ফেলিয়া আমার মনের ভার লাঘব করিতে কোনো বাধাকেই বাধা জ্ঞান করিব না—কেননা আপনাদের মত অভিজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলী অন্যত্র দুর্লভ।

অব উপসর্গের লক্ষ্য নিচের দিকে। প্রথমতঃ নিচু দুই প্রকার—(১) দেশে নিচু এবং (২) ভাবে নিচু। দ্বিতীয়তঃ ভাবে নিচু দুই প্রকার—(১) লৌকিক ভাবে নিচু (২) দার্শনিক ভাবে নিচু। সবশুদ্ধ ধরিয়া তিন প্রকার নিচু পাওয়া যাইতেছে—(১) দেশে নিচু, (২) লৌকিক ভাবে নিচু, (৩) দার্শনিক ভাবে নিচু। অব উপসর্গের এই তিনপ্রকার নিচু অর্থেরই উদাহরণ যথেষ্ট রহিয়াছে; তাহার গোটাকত নমুনা দেখাইতেছি প্রণিধান করা হোক :—

| | |
|---|---|
| দেশে নিচু | অবরোহণ<br>অবতরণ<br>অবলুণ্ঠন |
| লৌকিক ভাবে নিচু | অবজ্ঞা<br>অবহেলা<br>অবমাননা |
| দার্শনিক ভাবে নিচু | অবাস্তব<br>অবধারণ<br>অবগতি |

অবতরণ, অবরোহণ, অবলুণ্ঠন এই তিন শব্দের আদিস্থিত অব-উপ-সর্গের দেশে নিচু অর্থ, আর অবজ্ঞা অবহেলা অবমাননা এইতিন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গের লৌকিক ভাবে নিচু অর্থ ঐ ঐ শব্দের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

প্রণিধান করা হোক ঃ—

অবরোহণ = নিচে নাবা।

অবতরণ = নিচে অবতীর্ণ হওয়া।

অবলুণ্ঠন = নিচে গড়াগড়ি দেওয়া।

অবজ্ঞা = হেয় জ্ঞান করা = নিচু করিয়া দেখা।

অবহেলা = নিচে হেলন করা = নিচে ঠেলিয়া ফেলিবার মত ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করা।

অবমাননা = নিচু করিয়া মানা = তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। অবধান শব্দের মৌলিক অর্থ—নিচের দিকে প্রণিধান; কিন্তু কালক্রমে "নিচের দিকে" এই সূক্ষ্ম অংশটি ব্যাঙাচির ল্যাজের ন্যায় খসিয়া গিয়া উহার মূলাংশটিমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে—শুধু প্রণিধান এই অর্থটি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অবলোকন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গেরও ঐরূপ দশা। উভয় স্থলেই অব-উপসর্গের নিম্নশীলতা অর্থ সাপের পা'য়ের মতো লুপ্তাবশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। তোমার আমার চক্ষে সাপের পা আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক; কিন্তু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা—চর্ম্মচক্ষে এক আনা এবং জ্ঞানচক্ষে পনেরো আনা সবশুদ্ধ ধরিয়া ষোলো আনা—সাপের পা তাহার পাঁজরের ভিতরে লুক্কায়িত দেখেন। অবধান এবং অবলোকন শব্দের আদিস্থিত অব-উপসর্গের নিম্নশীলতা অর্থ সাপের পায়ের মতো লুপ্তাবশিষ্ট আকার ধারণ করিলেও ঐ দুই শব্দের গোটা দুই মুখ্য প্রয়োগ স্থলে উহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির নিকটে স্পষ্ট ধরা পড়ে। প্রণিধান করা হউক ঃ—

সাবধান = স + অবধান।

এ শব্দটি প্রধানতঃ পথের কাঁটা খোঁচা এবং জঞ্জাল উপলক্ষেই ব্যবহৃত হয়। "দেখো যেন কাদায় পা পড়ে না—দেখো যেন পায়ে কাঁকর বেঁধে না—দেখো যেন ভিজে মাটিতে পা পিছলোয় না সাবধান!" এই সকল স্থানে সাবধান শব্দের অর্থ স্পষ্টই নিচের দিকে মনোযোগী হওয়া। তা ছাড়া চাসা রাইয়ত "অবধান" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া জমিদারের দৃষ্টি নিচের দিকে, অর্থাৎ আপনার দিকে আকর্ষণ করে। কৃপাবলোকন = কৃপা পাত্রের প্রতি অবলোকন = নিচু ব্যক্তির প্রতি উঁচু ব্যক্তির অবলোকন। নিম্নগামী স্নেহ-দৃষ্টি উপলক্ষেই আমরা বেশীর ভাগ মুখাবলোকন শব্দ ব্যবহার করি, যেমন পুত্রের মুখাবলোকন, বধূর মুখাবলোকন ইত্যাদি। তবে কিনা স্নেহ-দৃষ্টি বা রসপূর্ণ দৃষ্টি মাত্রই নিম্নগামী—বাস্তবিক নিম্নগামী যদি নাও হয় তথাপি ভাবে নিম্নগামী তাহাতে আর ভুল নাই। এইজন্য উচ্চস্থানীয় বস্তুর প্রতি যখন আমরা সস্নেহ অথবা রসপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করি, তখন সেই রসাত্মক ঊর্দ্ধগামী দৃষ্টিকেও এক হিসাবে অবলোকন বলা যাইতে পারে।

এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, অব-উপসর্গের দেশে নিচু এবং লৌকিক ভাবে নিচু এই দুই প্রকার অর্থ তাহার মধ্য হইতে খুব সহজে বাহির করা হয়; কিন্তু তাহার দার্শনিক ভাবের নিচু অর্থ উন্মোচন করা অতটা সুখসাধ্য নহে—উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া তাহা টানিয়া বাহির করিতে হয়।

ইংরাজি ন্যায় দর্শনের ভাষা "To class under" কাহাকে বলে তাহা কাহারো অবিদিত

নাই। এখানে অব উপসর্গের অর্থ বিশেষ এক প্রকার সম্বন্ধে নিচু; কি সম্বন্ধে? না ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধে। ব্রাহ্মণ জাতি একটি ব্যাপক শ্রেণী, আর রাঢ়ি শ্রেণী বারেন্দ্র শ্রেণী, বৈদিক শ্রেণী এগুলি হচ্ছে তার অবান্তর শ্রেণী অর্থাৎ নিম্নস্থ শ্রেণী।

অবধারণ কাহাকে বলে?

অবধারণ করা আর কিছু না—অবধারিতব্য বিষয়টি কোন্ সুপরিজ্ঞাত শ্রেণীর নিম্নে অবস্থিতি করে তাহা স্থির করা। তার সাক্ষী—সম্মুখস্থিত জীবকে গোরু বলিয়া অবধারণ করাও যা, আর, তাহাকে গোরু শ্রেণীর বা গোজাতির নিম্নে নিক্ষেপ করাও তা একই কথা। অবগত হওয়া কাহাকে বলে? সংস্কৃত ভাষায় অনেক স্থলে গত শব্দের অর্থ প্রাপ্ত , যেমন

নিদ্রাগত = নিদ্রাপ্রাপ্ত,

শরণাগত = শরণ-প্রাপ্ত ;

অবগত হওয়া = অব + গত হওয়া = নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া। কাহার নিম্নে কাহাকে প্রাপ্ত হওয়া? জিজ্ঞাস্য বিষয়কে কোনো একটি সুপরিজ্ঞাত শ্রেণীর নিম্নে প্রাপ্ত হওয়া ; তার সাক্ষী— "কাফ্রীদিগকে বর্ব্বরজাতি বলিয়া অবগত হইলাম" এই কথাটি নৈয়ায়িক ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে বলা উচিত যে, কাফ্রীদিগকে বর্ব্বর শ্রেণীর নিম্নে প্রাপ্ত হইলাম।" ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ একপ্রকার দার্শনিক আধার আধেয় সম্বন্ধ বা আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ। এই কারণ গতিকে পাশ্চাত্য ন্যায় দর্শনের অবয়ব-ব্যূহে হেতু স্থানীয় এবং উদাহরণ স্থানীয় ব্যাপক তত্ত্বের নাম দেওয়া হইয়াছে Premise। এদেশীয় ন্যায় দর্শনের অবয়ব-ব্যূহের অভ্যন্তরে যদিচ Premise এর তুল্যার্থবোধক কোনো একটা পৃথক অবয়বের উল্লেখ নাই, কিন্তু দেশীয় ন্যায় দর্শনের মূল গ্রন্থে যে স্থানটিতে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেই স্থানটিতে Hypothesis-এর নাম দেওয়া হইয়াছে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত, আর, Premise এর নাম দেওয়া হইয়াছে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত। Premise এবং Hypothesis এর এই দুই খাঁটি স্বদেশীয় তান্ত্রিক সংজ্ঞা (Technical term) আধুনিক বঙ্গীয় লেখকদিগের হয় তো বা কোন না কোন সময়ে কাজে লাগিয়া যাইতে পারে ; অতএব প্রণিধান করা হোক্—

গৌতম সূত্রের ভাষ্যকার বলিতেছেন "অনবধারিতার্থ পরিগ্রহঃ তদ্-বিশেষ পরীক্ষনায় অভ্যুপগম সিদ্ধান্তঃ" বিশেষের পরীক্ষা অভিপ্রায়ে (Verification-এর) অনবধারিত বিষয় গ্রহণ করার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। আপেল-পাত দেখিয়া নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তখন সেটা তাঁহার অনবধারিত বিষয় ছিল—অনবধারিত হইলেও তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন ; কি অভিপ্রায়ে গ্রহণ করিলেন? না তৎসংক্রান্ত বিশেষ বিবরণের পরীক্ষা অভিপ্রায়ে ; অর্থাৎ সেই সিদ্ধান্তটিকে বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখিয়া তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে। তবেই হইতেছে যে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত Hypothesis। কিন্তু অভ্যুপগম শব্দটার বোজায় পায়া ভারি—তাহা বাঙলায় চালানো দুষ্কর, যদিচ তাহার অর্থ খুব সোজা। অভ্যুপগত কি? না যাহা সম্মুখে উপগত বা উপস্থিত। আপেল-পাত দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণের সিদ্ধান্ত নিউটনের মনোনেত্রে উপস্থিত হইল—অভ্যুপগত হইল, তাই তাহার নাম অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত ; সে সিদ্ধান্তটি তখন মনোনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইল

মাত্র—তাহা কতদূর সত্য তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা ভবিষ্যতের কার্য্য ;—তখনকার কার্য্য তাহা নহে—তখনকার কার্য্য সেই অভ্যাগত অতিথিকে Hypothesis বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে পরীক্ষিতব্যের কোঠায় স্থান দান করা। এখানে অভ্যাগত এবং অভ্যুপগত এই দুই শব্দের অর্থ-সাদৃশ্য সবিশেষ দ্রষ্টব্য। অতএব, অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত যে, Hypothesis ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তবে কি? না যাহা বলিলাম—শব্দটা বেজায় ভারিখিাগোচের! কিন্তু আর একদিকে তেমনি এটাও দেখা উচিত যে, ভারিখিাগোচের ওজন-সই ভাষা দর্শন-শাস্ত্রের অঙ্গের ভূষণ। যদি দশকোশী তাদের ভাষা দর্শন-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিয়ম করা যায়, তাহা হইলে জগত্‌বিখ্যাত জর্ম্মন-দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের সর্ব্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহার এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হয় যে, তাহাকে চিনিতে পারা কঠিন হইয়া উঠে। অত কথায় প্রয়োজন নাই—মহর্ষি গৌতম যখন Hypothesis কে অভ্যুপগম-সিদ্ধান্ত নামে সংজ্ঞিত করিয়াছেন তখন তাহা উল্টানো তোমার আমার সাধ্য নহে। এই গেল অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত। অধিকরণ সিদ্ধান্ত কি? মহর্ষি গৌতম স্বয়ং বলিতেছেন "যৎ সিদ্ধৌ অন্য প্রকরণ সিদ্ধিঃ সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ।" যাহা সিদ্ধ হইলে অন্য প্রকরণ সিদ্ধ হয় তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকার বলিতেছেন "যস্যার্থস্য সিদ্ধৌ অন্যে অর্থা অনুসজ্যন্তে" যে বিষয় সিদ্ধ হইলে অন্যান্য বিষয় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ হয়, ন তৈর্বিনা সোঽর্থঃসিদ্ধ্যতি সেই সকল অস্বাশ্রিত বিষয় ব্যতিরেকে তাহা আপনা আপনি সিদ্ধ হয় না, আর, তেঽর্থা যদধিষ্ঠানা" সেইসকল অস্বাশ্রিত বিষয় যাহাতে ভর করিয়া অবস্থিতি করে "সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ" তাহারই নাম অধিকরণ সিদ্ধান্ত। ইহার অস্মংকৃত টীকা এইরূপ :— "মনুষ্য জ্ঞানবান্ জীব" এই বিষয়টি সিদ্ধ হইলে "দেবদত্ত জ্ঞানবান জীব" এ বিষয়টি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধ হয় ; দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এবং আর আর ব্যক্তি (individual) যদি জ্ঞানবান জীব না হয়, তবে "মনুষ্য জ্ঞানবান জীব" এ কথাটা কাঁচিয়া যায় ; কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানবান জীব" এ কথাটা যদি পাকা পোক্ত রকমে সিদ্ধ হয়, তবে "দেবদত্ত জ্ঞানবান জীব" এ কথাটা তাহারই লেজুড় ধরিয়া পার হইয়া যায়। এরূপ স্থলে "মনুষ্য জ্ঞানবান জীব" এই সিদ্ধান্তটি অধিকরণ শব্দের বাচ্য। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে যাহার নাম Premise, দেশীয় ন্যায় শাস্ত্রে তাহারই নাম অধিকরণ। Premise এবং অধিকরণ উভয়েরই অর্থ আশ্রয়-স্থান। ফলে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধকে একপ্রকার আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধরূপে কল্পনা করিবার প্রথা প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় দেশীয় দর্শন শাস্ত্রেই আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধ যদিচ ঠিক গণিত শাস্ত্রানুযায়ী উচ্চ নীচ সম্বন্ধ নহে, তথাপি তাহা ভাবে একপ্রকার উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ; তার সাক্ষী—

আশ্রিত কর্ম্মচারী under officer = নিচের কর্ম্মচারী। দার্শনিক হিসাবে যেমন ব্যাপ্য শ্রেণী ব্যাপক শ্রেণীর আশ্রিত, জ্যামিতিক হিসাবে তেমনি অংশ অংশীর আশ্রিত। এইজন্য এক হিসাবে যেমন ব্যাপ্য শ্রেণীকে অবান্তর শ্রেণী (কিনা নিম্নস্থ শ্রেণী) বলা হইয়া থাকে তেমনি ঠিক সেই হিসাবে না হউক তাহারই অনুরূপ আর এক হিসাবে অংশ বিচ্ছিন্ন অংশকে অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ নিম্নের শেষাংশ বলা হইয়া থাকে। অবশেষ অবচ্ছেদ এবং অবকাশ

এই তিন শব্দের জ্যামিতিক ভাবের নিচু অর্থ অতীব স্পষ্টাকার ধারণ করিয়াছে, তার সাক্ষী—

অবশেষ = নিচের শেষভাগ = প্রথম অংশ বা প্রধান অংশ অপনীত হইলে দ্বিতীয় অংশ কি না লেজুড় অংশ যাহা পড়িয়া থাকে।

অবচ্ছেদ = নিম্নস্থ বিষয়ের ছেদ = মূল বস্তু হইতে খণ্ডাংশের ছেদ।

অবকাশ = আশ্রিত শূন্য এই অর্থে নিচের শূন্য = অংশ স্থানীয় শূন্য।

যেমন, মৌচাকের মধ্য হইতে মৌমাছিরা উড়িয়া পালাইলে পরিত্যক্ত শূন্য ঘরগুলি মৌচাকের মধ্যস্থিত অবকাশ ; — ইংরাজিতে যাহাকে বলে Vacuum। Vacation কেও ভাবে গতিকে অবকাশ বলা যাইতে পারে, বলা হইয়াও থাকে।

আমরা যখন কথায় বলি "আমার অবকাশ নাই" তখন সেটা অবকাশ শব্দের একটা আলঙ্কারিক প্রয়োগ মাত্র। যদিচ বস্তুরই ফাঁক সম্ভবে, কার্য্যের ফাঁক সম্ভবে না ; তথাপি আমরা কার্য প্রবাহের মধ্যস্থিত শূন্য কালাংশকে ফাঁক রূপে কল্পনা করিয়া— সেই কালাশ্রিত ফাঁককে অবকাশ নামে সংজ্ঞিত করিয়া থাকি। এই সকল স্থলে অব উপসর্গের অর্থ জ্যামিতিক ভাবের নিচু অর্থাৎ আশ্রিত খণ্ডাংশ এইভাবে নিচু। অবকাশ এবং অবসর এই দুই শব্দের অর্থ প্রায় একই রূপ। সর কিনা নাড়িবার চাড়িবার পরিসর ; তাহারই নাম ফাঁকা স্থান। সর = ফাঁকা স্থান আর কাশ = শূন্য আকাশ, দুয়ের মধ্যে কেবল নামেরই প্রভেদ। এতক্ষণ ধরিয়া অব উপসর্গ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম সমস্ত কুড়াইয়া আমরা এইরূপ পাইতেছি—

(১) অবতরণ অবরোহণ অবলুণ্ঠন এ শব্দ গুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ পষ্টাপষ্টি দেশে-নিচু।

(২) অবজ্ঞা অবহেলা অবমাননা, এগুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ লৌকিক ভাবে-নিচু।

(৩) অবান্তর, অবধারণ, অবগতি এগুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ দার্শনিক ভাবে-নিচু।

(৪) অবশেষ, অবচ্ছেদ, অবকাশ এগুলিতে অব-উপসর্গের অর্থ জ্যামিতিক ভাবে-নিচু।

তাহার পর আসিতেছে প্রতি উপসর্গ। প্রতি উপসর্গের মুখ্য অর্থ দিক্‌ বৈপরীত্য। মনে কর তুমি আমাকে একখানি পত্র পাঠ করিতে দিলে, আমি তাহা পাঠ করিয়া তোমাকে প্রত্যর্পণ করিলাম। এরূপ স্থলে পত্রখানি গ্রহণ করিবার সময় আমি তাহা পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে টানিয়া লই, অবে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার সময় তাহাকে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে চালাইয়া দিই। এইপ্রকার দিক-বৈপরীত্যই প্রতি-উপসর্গের মৌলিক অর্থ তা বই উহার আর আর যত প্রকার অর্থ আছে সমস্তই ঐ মৌলিক অর্থ হইতে উৎপত্তিলাভের স্পষ্ট নিদর্শন স্ব স্ব ললাটে ধারণ করে। "অমুক ব্যক্তি সদ্ব্যবহার করিল বা অসদ্ব্যবহার করিল, সন্তুষ্ট হইল বা বিরক্ত হইল" এরূপ বলিতে প্রতি উপসর্গের মন্ত্রগুণে হঠাৎ মনে হয় যেন সে দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তি পশ্চিম মুখো এবং আর এক ব্যক্তি পূর্ব্বমুখো অথবা এক ব্যক্তি উত্তরমুখো এবং আর এক ব্যক্তি দক্ষিণ মুখো হইয়া দণ্ডায়মান থাকা কালীন উভয়ের মধ্যে ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইল। এরূপ যে মনে হয় অবশ্য তাহার কারণ আছে, সে কারণ এই—

(১) মনশ্চক্ষে বা চর্ম্মচক্ষে পরস্পরের সাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে দুইজনের মধ্যে কোন প্রকার

সত্য যদিচ এক বই দুই নহে, কিন্তু তথাপি তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশকালপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। বৈদান্তিক আচার্য্যেরা তাই বলেন—

সত্তা তিন প্রকার,
(১) পারমার্থিক সত্তা ;
(২) ব্যবহারিক সত্য ;
(৩) প্রাতিভাসিক সত্য ;

আর, তদনুসারে তাঁহারা জ্ঞানরাজের পংক্তি-বিভাগ ধার্য্য করিয়াছেন তিনটি :

(১) পরাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান,
(২) অপরাবিদ্যা বা বিজ্ঞান,
(৩) অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞান।

বিজ্ঞান ব্যষ্টি-জ্ঞান বা শাখা জ্ঞান ; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান। মোট জ্ঞানের মোট সত্যের নাম পারমার্থিক সত্য। সে সত্য কী—আপনারা আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সত্য কথা যদি বলিতে হয়—তবে এ সভার মাঝখানে সহসা আমি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আবার—একটা কথা কোমর বাঁধিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়া পথের মাঝখানে থামিয়া যাওয়া দোষ। অতএব জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির মোটামুটি রকমের একটা মিমাংসা যাহা আমার মনে উপস্থিত হইতেছে—সংক্ষেপে তাহা আপনাদের সুবিবেচনায় সমর্পণ করিতেছি প্রণিধান করুন।

সাম্প্রদায়িক দলাদলি এবং দার্শনিক মতামতের রাজ্যে নগর-সংকীর্ত্তনের ধূম বেজায় অতিরিক্ত। সে নগর-সংকীর্ত্তন কম নহে কীর্ত্তন! তাহা মতবাদীদিগের স্ব স্ব মতের এবং দলপতিদিগের স্ব স্ব দলের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন। সে নগর সংকীর্ত্তনের খোল পিটান হ'চ্চে বাদের বাদ্যোদ্যম আর, করতাল সঙ্ঘর্ষণ হচ্চে ISM এর ঝমাঝম-ধ্বনী। বাদের বাদ্যোদ্যমের চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে বিবাদের উম্মত্ত কোলাহল ; ISM এর ঝমাঝম ধ্বনির—চরম পর্য্যাপ্তি হ'চ্চে SCHISM এর দন্ত-আস্ফালন। আমাদের দেশে যত প্রকার বাদ আছে তাহার মধ্যে সন্দার শ্রেণীর প্রধান দুই মল্ল হ'চ্চে অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ। দেশ-শুদ্ধ লোকের এইরূপ ধারণা যে, উপনিষদের তত্ত্বমসি বাক্যটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ তাহা অদ্বৈতবাদ। আমার কিন্তু এটা ধ্রুব বিশ্বাস যে, উপনিষদে এক যা বাদ আছে সত্যবাদ, তদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বাদ তাহার ত্রিসীমার মধ্যে নাই। তবে যদি উপনিষদ-শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের ঐ সাঙ্কেতিক সাধনমন্ত্রটিকে কোনো দার্শনিক পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের অঙ্গীভূত করিয়া সাজাইয়া দাঁড় করান্—সে কথা স্বতন্ত্র ; যিনি সাজাইয়া দাঁড় করান্ তিনি তাহার জন্য দায়ী, তা বই উপনিষদ্ তাহার জন্য ঘূণাক্ষরেও দায়ী নহে। তত্ত্বমসি বচনটির শব্দার্থ যে কি তাহা কাহারো অবিদিত নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর বালকেরাও জানে যে, তৎ শব্দের অর্থ তাহা বা সে-বস্তু, ত্বং শব্দের অর্থ তুমি। "তৎ ত্বং" কি না সে-বস্তু তুমি। কথাটা ওটা যে নিতান্তই একটা হেঁয়ালি-ঢঙের বচন, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। কাজেই, উহার প্রকৃত মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্যটি তলাইয়া না বুঝিলে উহা কেবল একটা মুখের কথা হইয়া—ফাঁকা আওয়াজ হইয়া—বাতাসে উড়িয়া যায়। ত্বং শব্দের বাচ্যার্থ তুমি—একথা খুবই সত্য ; কিন্তু তাহার ভাবার্থ আত্মা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আমি যেমন তোমাকে ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি, তুমিও তেমনি আমাকে ত্বং বলিয়া

সম্বোধন কর ; আর, বেদান্তের সেই যে এই দেবদত্ত ("সোহয়ং দেবদত্তঃ") যিনি ভাগ্যক্রমে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, ইহাকে আমরা উভয়েই ত্বং বলিয়া সম্বোধন করি। তুমি ত্বং আমার নিকটে, আমি ত্বং তোমার নিকটে, দেবদত্ত ত্বং আমাদের উভয়েরই নিকটে। অতএব, আকা কেবল তুমিই যে ত্বং তাহা নহে , তুমিও ত্বং, আমিও ত্বং, দেবদত্তও ত্বং। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ত্বং আমি-তুমি-তিনি'র প্রতিনিধি স্বরূপ, এক কথায়—সমষ্টি আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ। তবেই হইতেছে যে ত্বং শব্দের বাক্যার্থ যদিচ "তুমি" বই না, কিন্তু তাহার ভাবার্থ সমষ্টি আত্মা কিনা পরমাত্মা। এমতে দাঁড়াইতেছে, যে, "তত্ত্বমসি" বচনটির বাক্যার্থ যদিচ "যে বস্তু তুমি" কিন্তু তাহার ভাবার্থ "সে বস্তু পরমাত্মা"। উপনিষদে তত্ত্বও আছে—তদ্ব্রহ্মও আছে—দুইই আছে। তার সাক্ষী "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" ; ইহার অর্থ এই যে, যে বস্তুকে বিশেষ মতে জানিতে ইচ্ছা কর—সে বস্তু ব্রহ্ম। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতিই বিশেষ মতে জানিবার বস্তু, আর সেইজন্য সাংখ্যের পরিভাষায় ব্রহ্ম প্রকৃতিরই আর এক নাম। গীতাশাস্ত্রে ব্রহ্ম শব্দ স্থল-বিশেষে প্রকৃতি অর্থে এবং স্থল-বিশেষে পরম পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন

"সর্ব্ব যোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহৎ যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ প্রকৃতি। আবার

"পরব্রহ্ম পরংধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যং আদিদেবং অজং বিভুং॥
আহুত্বাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।"

এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ পরম পুরুষ। বেদান্ত শাস্ত্রে কিন্তু তৎসৎ শব্দ এবং তদ্ব্রহ্ম শব্দের মধ্যে মূলেই কোনো অর্থ-ভেদ নাই। সৎ শব্দের অর্থ ধ্রুব সত্য। সকল শাস্ত্রের মতেই পুরুষ অপরিবর্তনীয় ধ্রুব সত্য—প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশীল। তবেই হইতেছে যে "তৎসৎ" বলাও যা (অর্থাৎ "সে বস্তু ধ্রুব সত্য" বলাও যা) আর, "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা" বলাও তা, একই কথা। এইরূপে আমরা পাইতেছি যে, তিন স্থানের এই যে তিনটি উপনিষদ্-বচন (১) ত্বত্বং, (২) তদ্ব্রহ্ম, (৩) তৎসৎ, তিনটিরই ভাবার্থ "সে বস্তু পরম পুরুষ পরমাত্মা।" তৎ শব্দের সামান্য অর্থ হ'চ্চে চেয়ার-টেবিল-ঘটিবাটি'র ন্যায় যা-তা জ্ঞেয় বস্তু অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবার বস্তু। সৎশব্দের বহুবচন হচ্চে "সন্তঃ", সন্তঃ শব্দের অর্থ সৎপুরুষেরা! এতদনুসারে দাঁড়াইতেছে এই যে, সৎ শব্দের সামান্য অর্থ তুমি-আমি তিনি প্রভৃতির ন্যায় যে-সে সৎলোক বা সৎপুরুষ ;আর তাহার বিশেষ অর্থ পরমপুরুষ পরমাত্মা। বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে ব্রহ্ম শুধুই কেবল পরম জ্ঞেয় বস্তু নহেন—শুধুই কেবল তৎ নহেন ; একদিকে যেমন তিনি জ্ঞানের পরম লক্ষ্য তৎ, আর এক দিকে তেমি তিনি আত্মার পরমপ্রতিষ্ঠা সদাত্মা বা পরমাত্মা। 'তৎ' কিনা সত্যস্বরূপ পরম বস্তু ; "সৎ" কিনা মঙ্গল স্বরূপ পরম আত্মা। ইংরাজি দার্শনিক ভাষায়—তৎ হ'চ্চে Fundamental Substance, সৎ হ'চ্চে Supreme Subject। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে আর বেশী বাক্যব্যয় এবং সময়-ব্যয় না করিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তব্য কথাটার উপসংহার করি।

পারমার্থিক সত্যের মূল মন্ত্রও তৎ-সৎ। এই মহা মন্ত্রটির অর্থ আমার বুদ্ধির খদ্যোতালোকে আমি যেটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই :—

তৎ কিনা জ্ঞেয় প্রকৃতি।

সৎ কিনা জ্ঞাতা পুরুষ।

তৎ উপাদান কারণ।

সৎ নিমিত্ত কারণ।

তৎ সত্তৎ ; সৎ মঙ্গল।

"ওঁ তৎসৎ" কিনা যিনিসৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা তিনি সত্য এবং মঙ্গল একাধারে ; তিনি জানিবার বস্তু এবং জানিবার কর্ত্তা একাধারে ; তিনি Substance এবং Subject একাধারে তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ একাধারে, তিনি প্রকৃতি এবং পুরুষ একাধারে ; তিনি মাতা এবং পিতা একাধারে ; এক কথায়—তিনি মোট জ্ঞানের মোট সত্য ; আর তাহারই নাম পারমার্থিক সত্য।

পারমার্থিক সত্য যেমন মোট জ্ঞানের মোট সত্য ; ব্যবহারিক সত্য তেমনি বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য ; যেমন— জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের গ্রহাদিঘটিত সত্য, বীজগণিতের সংখ্যা-ঘটিত সত্য ক্ষেত্রতত্ত্বের স্থানাধিকার ঘটিত সত্য ; রসায়ন বিজ্ঞানের দ্রব্য গুণ-ঘটিত সত্য ; ইত্যাদি।

পারমার্থিক সত্য এবং ব্যবহারিক সত্য ছাড়া আর এক রকমের সত্য আছে যাহার শাস্ত্রীয় নাম—প্রাতিভাসিক সত্য। "প্রাতিভাসিক" অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Phenomenal। রীতিমত বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা সত্যকে (যেমন পৃথিবী গোলাকার এই একটি সত্যকে) বিজ্ঞান-রাজ্যে যত্ন সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া তাহার জন্য যথোপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় ; আর সেই সঙ্গে মনের সংস্কার-মূলক আপাত-সুলভ সত্যকে (পৃথিবী চ্যাপ্‌টা এই রকমের কাঁচা সত্যকে) দ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বিজ্ঞান-রাজ্যের সুপরীক্ষিত সত্য খুব কাজের সত্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু তথাপি তাহা ব্যবহারিক সত্য বই পারমার্থিক সত্য নহে। বিজ্ঞানের সত্যকে ব্যবহারিক সত্য বলিবার কারণ কি—আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমার বিবেচনায় সে কারণ এই :—

বড় বড় বণিক্ মহাজনেরা কিম্বা—আর জাহাজ-বোঝাইকরা সমগ্র বিক্রেয় বস্তুর মোট ভাঙিয়া তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ পৌরজনের ব্যবহারার্থে আপনারা বিক্রয় করেন না ; সে কার্য্যের ভার তাঁহারা খুচরা জিনিসের ব্যাপারীদিগের হস্তে গছাইয়া দ্যান্। তত্ত্বজ্ঞানের সমগ্র সত্য বিজ্ঞানের বাজারে চলিতে পারে না এই জন্য— যেহেতু অতবড় মহামূল্য সামগ্রী যে-মানুষ ক্রয় করিতে পারে তদুপযুক্ত ক্রোড়পতি বিদ্বজ্জন সমাজে সুদুর্লভ। তাহা ক্রয় করিতে হইলে বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত শমদমাদির পরাকাষ্ঠা আবশ্যক। যিনিই যত বড় পণ্ডিত হউন্ না কেন তাঁহার ঘর-পোরা বিরাট্ বিশ্ব-কোষেও অত মূল্যের তপস্যা নিধির সিকির সিকিরও সংস্থান নাই। পৌরজনেরা যেমন স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সামগ্রী-সকল ছোটো খাটো দোকানদারদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে, তা' বই বড় বড় বণিক্ মহাজন দিগের নিকট হইতে ক্রয় করে না, বিদ্যার্থী ব্যক্তিরা তেমি স্ব স্ব ব্যবহার্য্য সত্য-সকল বিজ্ঞানের দোকানদারদিগের নিকট হইতে ক্রয়

করেন, তা' বই তত্ত্বজ্ঞানের মহাজনদিগের নিকট হইতে ক্রয় করেন না ; আর সেই জন্য বিজ্ঞানের সত্যসকল ব্যবহারিক সত্য নামে সংজ্ঞিত হইয়াছে।

আমাদের এই ভারতবর্ষ যে, বিজ্ঞানের জন্মভূমি তাহার আমি সন্ধান পাইয়াছি নানা প্রকার লক্ষণ দৃষ্টে ; কিন্তু তাহা কৃতবিদ্য সমাজের বিচারালয়ের প্রখর বুদ্ধি জুরি-মহোদয়গণের নিকটে প্রমাণ করিতে পারিবার মতো ঐতিহাসিক সাক্ষীর জোগাড় করিয়া ওঠা আমি বড় সহজ মনে করি না। যাহাই হো'ক্ না কেন—পূর্ণ বিচারালয়ের মাঝখানে দ্বাদশ শপথকার মহোদয়গণের মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতে একটুও ভীত নই যে, পুরাকালে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের বয়স যদিচ খুব অল্প ছিল—কিন্তু তাঁহার সেই কাঁচ বয়সেই তিনি যেরূপ তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে বড় বড় প্রবীণ পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধির মাথা হেঁট হইয়া যায়। এ বিষয়ে বেশী ওকালতি করা আমার পক্ষে নিতান্তই একটা তেলামাথায় তেল দেওয়ার ন্যায় বাহুল্য কার্য্য , কেননা, পুরাতন ভারতে জ্যোতিষ-বিদ্যা, বীজগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, রসায়ন-বিদ্যা, পশুপালনী-বিদ্যা, স্থাপত্য-বিদ্যা, চিত্রকর্ম্ম, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি অনেককানেক বিদ্যা কতদূর যে কালোচিত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা ত্রিজগতে রাষ্ট্র। তা ছাড়া—রাবণের পুষ্পকবিমানের কথার ভিতরে যদি কোনো প্রকার ঐতিহাসিক সত্য চাপা দেওয়া থাকে—তবে তো ত্রেতাযুগেরই জিত! কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার একটা তাম্রলিপি বা আর কোনো প্রকার মাতব্বর-গোচের ঐতিহাসিক দলিল ভারতবাসীর হস্তগত না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোনো কথার উচ্চবাচ্য না করাই ভারতের উকিল ব্যারিষ্টার-গণের পক্ষে সৎপরামর্শসিদ্ধ।

ঘড়ি কি বলিতেছে তাহা জানি না—কিন্তু আমার কণ্ঠের তেজ নরমিয়া আসিতেছে দেখিয়া আমার মন বলিতেছে সময় নাই। অতএব আর কাল বিলম্ব না করিয়া আমার অবশিষ্ট বক্তব্যটিকে একটি ক্ষুদ্র উপকথা'র বেশ পরিধান করাইয়া তাহার প্রতি আপনাদের কৃপাদৃষ্টি যাচ্ঞা করিতেছি। আপনাদিগকে মাঝে মাঝে হুঁ দিতে বলিতে আমি সাহস করি না—কেবল যদি আপনারা গল্পটিকে অযোগ্য-বোধে শ্রবণদ্বার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া না দ্যা'ন, তাহা হইলে আমি আজ আপনাকে যথেষ্ট অনুগৃহীত মনে করিব।

পুরাকালে আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞান ছিলেন সভ্যতা রাজ্যের রাজর্ষি। পরাবিদ্যা ছিলেন রাজমহিষী। বিজ্ঞান ছিলেন তাঁহাদের সবে মাত্র একটি পুত্র। স্মৃতিপুরাণ ছিলেন রাজমন্ত্রী। রাজর্ষি তত্ত্বজ্ঞান মনে মনে সংকল্প করিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির ন্যায় পত্নী সহ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম সাত আট বৎসরের অধিক না—তা নইলে রাজর্ষি বিজ্ঞানকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইতেন। তাহা যখন দেখিলেন হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যশাসনের ভার তাঁহার প্রবীণ মন্ত্রিবর স্মৃতি-পুরাণের হস্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বনে গমন করিবার পূর্ব্বে রাজ্যময় ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণকে ডাকাইয়া প্রজারা যাহাতে অক্ষয় রাজ-ভাণ্ডারের অমৃতোপম ভক্ষ্য পানীয় সকল সুলভ মূল্যে পাইতে পারে তাহার একটা সদ্ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন ; আর সেই সঙ্গে—কিরূপে বিজ্ঞানকে ধীরে ধীরে সর্ববিদ্যার এবং সর্ব্বগুণে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়া যথোপযুক্ত বয়সে রাজধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে এবং বিশেষত বিজ্ঞান

যাহাতে বিপথে পদার্পণ না করে তাহার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সেই বিষয়ের একটা সারগর্ভ উপদেশ-পত্র স্বহস্তে লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া মন্ত্রিবরের হস্তে তাহা সযত্নে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর রাজর্ষির আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রিবর ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া পুনঃপুন শপথ করিলেন যে, তাঁহার জীবন থাকিতে উপদেশ পত্রের একটি কথারও তিনি অন্যথাচরণ করিবেন না। অনতিপরে রাজর্ষি-তত্ত্বজ্ঞান পত্নী সহ তপোবনে প্রয়াণ করিলেন।

মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজ-ভাণ্ডারের অপর্য্যাপ্ত ভক্ষ্য-পানীয় সকল যাহাতে প্রজারা সুলভ মূল্যে পাইতে পারে, তাহার উচিত মতো ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অনেক কালের বহুদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা রীতিমত কাজে খাটাইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এবং সবদিক্ বাঁচাইয়া যে দ্রব্যের যে-মূল্য ধার্য্য করিলেন, তাহা প্রজাদিগের আদবেই মনঃপূত হইল না। কিয়ৎ পরে সমস্ত প্রজাবর্গ একযোট হইয়া মন্ত্রিবরের নিকটে এইরূপ আবেদন জানাইল যে, "ন্যায়মতে রাজভাণ্ডারের ভক্ষ্য-পেয় সকল আমরা বিনামূল্যে পাইবার অধিকারী। নিতান্তই যদি আমাদিগকে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়, তবে এক টাকার জিনিস এক পয়সা মূল্যে লইতে আমাদের মনকে কোনোমত প্রকারে লওয়াইলেও লওয়াইতে পারি ; নচেৎ আমরা না খাইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি তার সিকি পয়সা বেশী মূল্যে আমরা তাহা লইব না।"

মন্ত্রিবর ফাঁপরে পড়িলেন! মন্ত্রিবরেব মন্ত্রিণী ঠাকুরাণী ছিলেন দুই সপত্নী। তাঁহার কৌশল্যা ছিলেন রক্ষানীতি, আর, তাঁহার কৈকেয়ী ছিলেন লোকরঞ্জনা। প্রজাদের ঐরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা উভয় মন্ত্রিণী ঠাকুরাণীরই কর্ণে পৌঁছিল। মন্ত্রিবর মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়া ভাল করিয়া আহার করিতেছেন না দেখিয়া বড় মন্ত্রিণী রক্ষানীতি বলিলেন "ভাবচ কেন অত ; প্রজাদের যারা প্রধান মোড়ল—যাদেব বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, তাদের সবাইকে ডাকিয়ে এনে ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেই তারা বুঝবে , আর প্রধানেরা বুঝলই ক্রমে ক্রমে সবাই বুঝবে তা হলেই আপদ বালাই চুকে যাবে।" ছোট মন্ত্রিণী লোকরঞ্জনা বলিলেন "দিদি যা বলচেন তা যদি ভাল বোঝো তবে তাই কর'। সখীমণি ঘাটে জল তুলতে গিয়েছিল—জল তুলে এনে আমাকে ব'ল্লে যে, রাস্তায় লোকেব ভিড় হ'য়েচে এম্নি যে, দুই দণ্ড তাকে পথের একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'য়েছিল ;আর, প্রজারা সবাই মিলে যা ব'লছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব সে শুনেচে, তার চ'কের সাম্‌নে, প্রধান মোড়োলেরাই বা কি, আর খুচরো চাসাভুসোরাই বা কি, সবাই মিলে ব'লছিল যে, তারা না খেয়ে মর্‌বে তবুও তারা এক টাকার সামগ্রী এক পয়সার বেশী দাম দিয়ে নেবে না। দেশসুদ্ধ লোক না খেয়ে ম'চ্চে—আমি তা চ'কে দেখতে পার্‌ব না , তার আগে যা'তে তা আমাকে দেখতে না হয়, আমি তা না-খেয়েই হোক্ আর বা-খেয়েই হোক্—যেমন ক'রে হোক্—ক'রে ক'ম্মে চুকে নিশ্চিন্তি হ'ব।

তা হ'লেই দিদি ঘরের একেশ্বরী হ'বেন আর তোমার সব আপদ বালাই চুকে যাবে।" মন্ত্রিবর তাঁর কৈকেয়ীঠাকুরাণী লোকরঞ্জনা'র শক্ত আব্দার কিছুতেই থামাইতে পারিলেন না তিনি আর কোনো উপায় না দেখিয়া রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ তণ্ডুলের সহিত নানা প্রকার অর্থহীন এবং অসার ক্রিয়াকর্ম্মের ভেজাল মিশাইয়া প্রজাদিগের মধ্যে এক টাকার জিনিস সিকি পয়সা

মূল্যে বিলি করিতে আরম্ভ করিলেন। বিজ্ঞানের বয়স তখন যদিও খুব কম তথাপি মন্ত্রিবরের ঐরূপ গর্হিত কার্য্য তাঁহার একটুও ভাল লাগিল না। বিজ্ঞানের মুখ ভার দেখিয়া মন্ত্রিবর তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আমার কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছ? কেন যে আমি এইরূপ দেশকাল-পাত্রোচিত বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনা করিতেছি, এখনো তোমার তাহা বুঝিতে পারিবার সময় হয় নাই ; আমার মতো যখন চুল পাকিবে তখন তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিবে যে, বৃদ্ধ মন্ত্রীটি ছিলেন বলিয়া, রাজ্য এখনো পর্য্যন্ত টেঁকিয়া আছে, নহিলে কোন্ কালে তাহা রসাতলে যাইত।" বিজ্ঞান বলিল "আপনি ঐ যে কদর্য্য সামগ্রীগুলো বাজারে চালাইয়া দিতেছেন, ও যে বিষ!" মন্ত্রিবর স্মৃতিপুরাণ বলিলেন "ঐ দ্রব্যগুলারই মধ্যে দুই চারি কৌটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত আছে তাহা অমনধারা দশ দশ হাঁড়ি বিষকে গিলিয়া খাইতে পারে।" মন্ত্রিবরের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সূত্রে মনান্তর ঘটিল। বিজ্ঞান একদিন কথাপ্রসঙ্গে মন্ত্রিবরকে বলিল, "আমি বালক বলিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহ্য করিবেন তাহা আমি জানি, কিন্তু তবুও আমি বলিতেছি যে এ রাজ্যের মঙ্গল নাই! বছর-আষ্টেক পরে যখন আপনার দুর্নীতির ফল পাকিয়া উঠিবে, তখন আপনি বলিবেন যে, সত্য কথা বালকের মুখদিয়া বাহির হইলেও তাহা সত্য বই মিথ্যা নহে, আর অশুভ কার্য্য প্রবীণের হস্ত দিয়া বাহির হইলেও তাহা অশুভ বই শুভ নহে।" বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাঁদিতে কাঁদিতে আপনার জননী ভারতভূমির নিকট হইতে জন্মের মতো বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর কিয়ৎপরে ঈশ্বরের কৃপায় এবং আপনার বাহুবলে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের কথাই ফলিল। অসার এবং অধম সামগ্রী সকল উদরস্থ হওয়াতে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হাড়ে হাড়ে নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। অন্তঃসারশূন্য অলীক অপদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়া কর্ম্মের ভারে তত্ত্বজ্ঞানের রাজভাণ্ডারের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম চাপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর্য্যসভ্যার জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী তমসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়া আর্য্যসভ্যতা অধম বর্ব্বরতায় পর্য্যবসিত হইল তাই আমাদের আজ এই দশা!

বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞানের অপব্যবহারের যে কিরূপ বিষময় ফল এই তো তাহা দেখিলাম। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণা অপার! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা বিজ্ঞানের সত্য জ্যোতিকে তিল মাত্রও খর্ব্ব করিতে পারেও নাই, পারিবেও না। আমাদের দেশে তত্ত্বজ্ঞানের এত যে অপব্যবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্তু তথাপি তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সুমঙ্গল শান্তিকে একচুলও টলাইতে পারেও নাই পারিবেও না।

প্রবীণ স্মৃতিপুরাণ নবীন বিজ্ঞানকে এই যে একটি কথা বলিয়াছিলেন— যে, রাজ-ভাণ্ডারের ভক্ষ্যপেয় সামগ্রীতে সহস্র ভেজাল মিশ্রিত থাকা সত্ত্বেও তাহার ভিতরে এক আধ কৌটা অমৃত যাহা সঙ্গোপিত রহিয়াছে তাহা সকল রোগের মহৌষধ, তাঁহার এ কথা সত্য বই মিথ্যা নহে ; তা'র সাক্ষী—রামায়ণ এবং মহাভারত এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক সভ্যতাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার, তা'ও বলি—মন্ত্রিবরের উপর রাগ করিয়া বিজ্ঞান যে, তাঁহার পিতার অনভিমতে আপনার জননীতুল্য জন্মভূমিকে পশ্চাতে

ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম ভূগোলখণ্ডে আপনার রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এটা তাঁহার উচিত কার্য্য হয় নাই। ব্যবহারিক সত্যের জ্ঞানোপার্জ্জন মনুষ্যবুদ্ধি কর্ত্তৃক হইয়া ওঠা যতদূর সম্ভবে—বিজ্ঞানের তাহা হইতে বাকি নাই যদিচ, কিন্তু তথাপি ইহা কম আক্ষেপের বিষয় নহে যে, পারমার্থিক সত্যে ক-খ-গ-ঘ-ও আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে ধরা দিল না। বিজ্ঞানের উচিত ছিল—ভারতভূমি পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার দেবতুল্য পিতার নিকটে পারমার্থিক সত্যের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্রের যথাবিহিত সাধন দ্বারা তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের শূন্য উপর-মহলটা পুরাইয়া লওয়া। তাহা না করিয়া তিনি তাঁহার অর্দ্ধশিক্ষিত অবস্থায় ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা'তে তাঁহার রাজ্যমধ্যে এক্ষণে যেরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, তাহা যে অবশ্যম্ভাবী—প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বুঝিতে পারিয়া—কলিতে দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশের পরে ক্লেশ, ভয়ের পরে ভয় যাহা যাহা ঘটিবে তাহা ভারতময় ঢ্যাঢ়রা পিটিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। অতএব বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারতমন্ত্রীর হিতপরামর্শ শোনে্ তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন, ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার লোকপূজ্য পিতা'র নিকটে দীক্ষিত হউন্; দীক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যসভ্যতা'র যৌবরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার রাজর্ষি পিতার চিরপোষিত মনস্কামনা পূরণ করুন্, তাহা হইলে তাঁহার পৈতৃক প্রাচ্যরাজ্যেরও মঙ্গল হইবে। আমার ক্ষুদ্র উপকথাটি ফুরাইল। আমারও শান্তি হইল, আপনাদেরও শান্তি হইল, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

---